ইন্দ্রধনু

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
অরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম মুদ্রণ—
শুভ মহালয়া, ১৩৬১

ছবি এঁকেছেন—
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইবন্ধু রায়
শ্রীসমর দে
শ্রীনারায়ণ দেবনাথ

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণ সংস্থাপন—
প্রদ্যুৎ সাহা
লেজারবাইট
৭, কামার ডাঙ্গা রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪৬

ছেপেছেন—
বরুণচন্দ্র মজুমদার
বি. পি. এম'স্ প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উত্তর)

নিবেদন—

মাথার ওপরে আকাশে, ধনুকের মতন আধখানা গোল, থাকের পর থাক সাজানো, ওঠে সাত-রঙা ইন্দ্রধনু, কেউ বলে রামধনু।

পৃথিবী থেকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা, অবাক হয়ে দেখে যেন স্বপ্ন ফুটে উঠেছে রঙীন হয়ে...দেখতে দেখতে কখন আবার মিলিয়ে যায় আকাশে, মিলিয়ে যায় স্বপ্নেরই মত, ভুলে-আসা স্মৃতির মতন।

আদিম মানুষ বিস্ময়ে তাকে বলতো দেবরাজ ইন্দ্রের ধনু।

বিজ্ঞান এসে প্রমাণ করে দিল, ধনুকের মত চেহারা বটে কিন্তু ধনুক নয়.....বৃষ্টির জলকণা আর আকাশ-চারী অণু-পরমাণু আর সূর্য্যের আলোর খেলা। সূর্য্যের শাদা আলো জলকণাপুষ্ট আকাশ-চারী অণু-পরমাণুতে প্রতিফলিত হয়ে সাতটা রঙে ভেঙে পড়ে। সূর্য্যের শাদা আলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সেই সাতটা রঙ....

তবু, বৃষ্টি-ধোয়া অলস অপরাহ্ণে এই মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে মাটির ছেলেমেয়ে যখন সুদূর আকাশে সেই সাত-রঙা ধনু-কে দেখে, বিজ্ঞানের সমস্ত বিশ্লেষণের বাস্তবতাকে ভুলে মন তখন চলে যায় স্বপ্নের রাজ্যে, মনে হয় আকাশে ছড়ানো সেই সাতটা রঙের থাকের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে আছে জীবনের সব-চাওয়া আর না-পাওয়ার জমা-খরচ....

ঠিক অমনি আকাশের ইন্দ্রধনুর মত আমাদের প্রত্যেকের মনের আকাশে ওঠে সাত-রঙা ইন্দ্রধনু...জীবনের সব বাস্তবতা, সব দুঃখ-দৈন্যের ওপরে জেগে ওঠে চির-সৌন্দর্য্যের সাত-রঙা সেতু। দুঃখী যে, তার কাণে কাণে বলে, ভেঙে পড়ো না, উঠে বসো, দীর্ঘশ্বাসে কালো করো না আকাশ, সকল দুঃখের শেষ আছে, আছে আনন্দ....পরাজিত যে, তার ক্লান্ত মনে জাগিয়ে তোলে আশার আশাবরী, বলে, পরাজিত হয়ে যে-মাটিতে গিয়েছ পড়ে, সেই মাটি ধরেই আবার উঠে দাঁড়াও, আবার রঙীন হয়ে উঠবে পৃথিবী নতুন জয়ের উল্লাসে।

প্রত্যেকের মনের কোণে লুকিয়ে আছে এই রঙীন স্বপ্নের রামধনু, যা থেকে শত নৈরাশ্যের মধ্যেও সে পায় আশার ইঙ্গিত, বারবার পড়ে গিয়েও পায় এগিয়ে চলবার শক্তি।

ইন্দ্রধনু হলো সেই অপরূপ স্বপ্নের সাত-রঙা ছবি, যে স্বপ্ন থেকে মানুষ পায় শক্তি, যে কল্পনা থেকে মানুষ পায় আদর্শের প্রেরণা।

পৃথিবীর বাস্তব ইতিহাসের দিকে যদি ভাল করে চেয়ে দেখ, তাহলে দেখবে, পৃথিবীর ভাগ্যকে সবল হাতে ভেঙে চুরে বার বার করে নতুন করে গড়েছে তারাই, যারা স্বপ্ন দেখতে ভয় পায় নি!

জীবনের সমস্ত বাস্তবতার শিয়রে জেগে বসে আছে স্নেহাতুরা জননীর মত এক অপরূপ অবাস্তব সাত-রঙা স্বপ্ন...মাটির পৃথিবীর সমস্ত নোংরা আবর্জ্জনার ওপরে ফুটে আছে বৃষ্টি-ধোয়া সৌন্দর্য্যের এক অপরূপ সাত-রঙা ইন্দ্রধনু...

এবার শরতে তাই তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি বর্ষণক্লান্ত নীল আকাশের সেই ইন্দ্রধনুর প্রেরণাকে...

যে সপ্ত রঙ দিয়ে গড়া ইন্দ্রধনু, প্রতিদিন রাত্রিশেষে সূর্য্যদেব সেই সপ্ত রঙের সপ্ত অশ্ব নিয়ে বেরোন দিগ্বিজয়ে...

প্রার্থনা করি, সেই সপ্ত রঙের স্পর্শে সুন্দর হয়ে উঠুক তোমাদের জীবন, নব নব সৃষ্টির রঙীন উল্লাসে ভরে উঠুক তোমাদের পৃথিবী।

দেব সাহিত্য কুটীর

উপহার—

যে সব লেখা আছে

● ***মণি ও মুক্তা***

● ***তর্কে বহু দূর***

বিষয় | | | | পৃষ্ঠা

দুখের বোঝা

—অনুরূপা দেবী

আমায়... কাঙাল করে ছেড়ে দিলে,
কি সুখ তুমি পেলে হরি ?
আমি...কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াই,
ডেকে ডেকে কেবল মরি !

দুখের বোঝা ভারী হয়ে
মাথার উপর বস্‌ল চেপে,
দুখের জ্বালায় জ্বলছে জীবন,
থেকে থেকেই উঠছি কেঁপে ;
আমি...কোন্ ভরসায় চলবো পথে
পাবার লাগি চরণ-তরী ?

আমার মা

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমি বেঁচে আছি। আমি এখনও মরিনি। অথচ তোমরা সবাই জানো—আমি মরে গেছি। খবরের কাগজে আমার মৃত্যু-সংবাদ পর্য্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, সেদিন রাত্রে আমার এই আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর জন্য বিরাট এক শোকসভা আহ্বান করা হয়েছে। চারিদিকে আলো জ্বলছে, মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বক্তারা একের পর এক বক্তৃতা দিচ্ছেন। বেঁচে থাকতে যারা আমার নাম পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারতো না, আমার নামে নানারকম কুৎসা রটনাই ছিল যাদের একমাত্র কাজ, তারাও দেখি, আমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, আর আমি সেই সভারই পেছনের দিকের একটা বেঞ্চির একধারে মুখে চাদর ঢাকা দিয়ে অচেনা লোকের ভিড়ের মাঝে চুপটি করে' বসে।

বেশ মজা। না?

কিন্তু মজা হয়ত' তোমাদের কাছে হ'তে পারে। আমার কাছে নয়। বেঁচে থেকে আমি মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করছি। প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমার কেমন করে' যে কাটছে তা একমাত্র আমিই জানি।

কেমন করে' এ-ঘটনা ঘটলো আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এর পেছনে যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, আমি না জানিয়ে গেলে তোমরা কেউ জানতে পারবে না।

তাই জানাচ্ছি সেকথা। শোনো।

এমন একটা-কিছু বিরাট ঘটনা নয়। মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে।

আমার মা-বাবার আমি একমাত্র সন্তান। আমার যখন জ্ঞান হলো, দেখলাম—আমাদের মস্ত বড় বাড়ী। বাবা মস্ত বড়লোক। বাড়ীতে লোকজন ঠাসা। বড়লোকের বাড়ীতে যা হয়, আমাদের বাড়ীতেও তাই। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন—যাদের কোথাও কিছু নেই, যারা একটি পয়সা রোজগার করতে পারে না, খায় দায় আর ঘুমোয়, এইরকম সব নিষ্কর্ম্মা লোক তাদের গুষ্টিবর্গ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের বাড়ীতে।

অথচ আপনার বলতে আমরা মাত্র তিনজন। বাবা, মা আর আমি।

দোতলায় আমাদের শোবার ঘরের পাশেই ছিল ঠাকুর-ঘর। আগাগোড়া মার্ব্বেল পাথর দিয়ে মোড়া।

প্রতিদিন সকালে দেখতাম—মা স্নান করে' পিঠে একপিঠ কালো চুল এলিয়ে দিয়ে, লাল চওড়া পাড় পাটের শাড়ী পরে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে বসতেন। উঠে আসতেন আমার খাবার সময়। আমাকে খাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে মা কি করতেন জানি না, ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই দেখতাম, মা আমার খাবার নিয়ে জানলার কাছটিতে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ধ্যের সময় মা'র আবার সেই পূজারিণীর বেশ। আবার সেই ঠাকুর-ঘর।

আমি আর ঠাকুর! ঠাকুর আর আমি! এ-ছাড়া মা'র যেন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নেই!

বাবা বাইরে-বাইরেই থাকেন। দিনের বেলা তাঁকে একরকম দেখতেই পাই না।

হঠাৎ এক একদিন দেখি, বাবা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন, মাকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যান, কি-সব তাঁদের কথা হয়, তারপর বাবা চলে যান বাইরে, মা আসেন আমার কাছে।

মা বাবার কথার মধ্যে একটা কথাই আমি আমার মা'র মুখে বার-বার শুনেছি। মা বলছেন বাবাকে : টাকা টাকা করেই কি জীবনটা কাটিয়ে দেবে? টাকার নেশা তোমাকে পেয়ে বসেছে।

বাবা কোনোদিন বলতেন—হ্যাঁ।

আবার কোনোদিন দেখতাম তিনি হাসতে হাসতে চলে যেতেন।

এই নিয়ে একদিন একটা বড় হাসির কথা মাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। কিন্তু কথাটা আমার এখনও মনে আছে।

মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : টাকার নেশা কি মা? টাকা খেলে নেশা হয়?

মা হাসতে হাসতে আমাকে আদর করে' কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন—ও-সব কথা তুমি এখন বুঝতে পারবে না বাবা। বড় হও, তখন বুঝবে।

বুঝেছিলাম। বড় হয়ে সেকথা আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলাম। কেমন করে' বুঝেছিলাম সেকথা পরে বলছি!

আর-একদিনের আর-একটা কথা।

মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : তুমি যে দিনরাত ঠাকুর-ঘরে বসে থাকো মা, কি বল তোমার ঠাকুরকে?

মা আবার আমাকে তেমনি আদর করে' বললেন : কি আর বলবো বাবা! ঠাকুরের কাছে আমার শুধু একটিমাত্র প্রার্থনা—তুমি যেন তোমার বাবার মত না হও।

জিজ্ঞাসা করলাম : কেন মা? বাবার মত হব না?

না বাবা। বলেই মা আমার অন্যদিকে তাকালেন। দেখলাম মা'র চোখ দুটি জলে ভরে এসেছে।

কাজেই আর আমার কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

মা আমার কেন যে সেকথা বলেছিলেন, বুঝতে খুব বেশি দেরি হলো না।

ইস্কুলে আমি বরাবরই খুব ভাল ছেলে। কোনো বছর ফার্স্ট হই, কোনো বছর সেকেণ্ড। সে বছর তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। বেশ বড় হয়েছি। সবই বুঝতে শিখেছি।

মা আমার চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছেন। [পৃঃ ৩

মা'র সঙ্গে বাবার তখন প্রায়ই ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়ার কারণও বুঝতে পারছি। আমাদের বড়লোকের জৌলুস্ কেমন যেন কমে কমে আসছে। বাবার মেজাজ্ খিট্‌খিটে হয়ে গেছে। আগেকার মতন এখন আর সব সময় বাইরে বাইরে কাটান না। এখন প্রায়ই দেখি তিনি বাড়ীতেই বসে থাকেন। দু'খানা মোটব ছিল। একখানা বিক্রি করে' দেওয়া হয়েছে। পাঁচ ছ'জন চাকর ছিল। এখন মাত্র দু'জন। আত্মীয় পোষ্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা কম হয়ে এসেছে।

আমার এক দূর সম্পর্কেব পিসিমা ছিলেন বাড়ীতে। নীচের প্রায় তিন-চারখানা ঘব তিনি আব তাঁর ছেলেমেয়েরা দখল করে' থাকতেন। তাঁর স্বামী ছিলেন হাঁপানীর রুগী। দিবারাত্রি খক্ খক্ করে' কাশতেন আর সবাইকে গালাগালি দিতেন।

তাঁব ছেলেরা ছিল এক-একটি খাঞ্জা খাঁ নবাব। তিন ছেলে আর দুই মেয়ে। বড় ছেলে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েই স্কুল ছেড়ে দিলে। বাকি দু'জন তো ইস্কুলের ধার-পাশ দিয়েও গেল না। বড় মেয়ের বিয়ের নাকি সব ঠিক করে' ফেলেছেন পিসিমা নিজেই। এখন টাকা চাই। বাবা নাকি ক্যাশিয়ারকে দু'হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলে দিয়েছেন। কিন্তু দু'হাজার টাকায় মেয়ের

বিয়ে হয় না। এই নালিশ নিয়ে পিসিমা সেদিন এলেন আমার মা'র কাছে।

—যতীনকে তুমি একবার বলে দাও বৌ, তাহ'লেই হবে।

মা বললেন : তুমি জানো না দিদি, তা এ-কথা বলছো। ওর অবস্থা এখন খুব খারাপ। অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেছে। আমরা এখন কি করবো তাই ভাবছি।

কথাটা পিসিমা বিশ্বাস করলেন না। ধরে বসলেন—তোমাকে বলতেই হবে। কন্যাদায় বলে কথা। দিলে পুণ্যি আছে।

মা তাঁকে অনেক করে' বুঝিয়ে বললেন। বললেন : ওইতেই তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে যেমন করে' হোক্ পার করে' দাও দিদি, নইলে কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না। শেষে হয়ত' ওই দু'হাজারও পাবে না।

কিন্তু চিরটা কাল যিনি পরনির্ভর, তিনি তা শুনবেন কেন? রাগ করে' নিলেন না দু'হাজার টাকা। বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে দিবারাত্রি গজ্‌রাতে লাগলেন।

তাঁর টুক্‌রো টুক্‌রো বাক্যবাণ কানে এসে বাজতে লাগলো।—মান-সম্মান রাখতেই যদি না চাইবি তো আমাদের রেখেছিলি কেন?

—কুলিন ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার মতন পুণ্যি আর কিছু আছে?

বুড়ো পিসে-মশাই নড়তে চড়তে পারেন না। কাশতে কাশতে শ্বাস তলিয়ে যায়, দম নিতে কষ্ট হয়, তবু তিনি বলতে ছাড়েন না। বলেন—

—টাকার গরমেই ম'লো। আমি যদি একটু সুস্থ থাকতাম তাহ'লে একবার দেখিয়ে দিতাম—টাকা কিরকম করে' রোজগার করতে হয়। টাকায় টাকায় ধুল-পরিমাণ করে' ফেলতাম।

কাশির ধমক্ আসে। বাধ্য হয়ে চুপ করতে হয়। তারপর আবার আরম্ভ করেন।

—টাকা যদি দিলিই না কাউকে তো কিসের টাকা। মর্ মর্ শালা টাকার অহঙ্কারেই মর্।

সম্পর্কটা শালা-ভগ্নিপতির তাই রক্ষা। নইলে আমি নিজেই একদিন ওদের তাড়িয়ে দিতাম বাড়ী থেকে।

মাকে বললাম একদিন : এই সব নিমকহারাম মানুষগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে' দিতে হয় মা।

আমার মা বড় নির্ব্বিরোধী মানুষ। বললেন : ওদের কথায় রাগ করিসনে বাবা। ওরা এমনিই হয়। আত্মসম্মানবোধ ওদের নেই। থাকলে এমন করে' পরের বাড়ীতে আজীবন বাস করতে পারে না। যাক্, ঠাকুর যতদিন রেখেছেন, ততদিন থাক্।

রাগ আমার সত্যিই হয়েছিল। বললাম : তুমি বলছো থাক্, কিন্তু নিজেদের এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই, অথচ কিরকম অভিশাপ দেয় শুনেছো?

আমার কথার জবাব না দিয়ে মা তাঁর ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি—এই ঠাকুর-ঘরই যেন তাঁর একমাত্র আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মা যা' বলেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাই সত্য হলো।

পিসিমা তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য দু'হাজার টাকাও পেলেন না। আমাদের সর্ব্বনাশা বিপদ এসে

গেল একেবারে অকস্মাৎ-বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত!

বাবা যে ভেতরে ভেতরে কি করেছিলেন তিনিই জানেন। দেখতে দেখতে মাত্র দিন দশ-পনেরোর ভেতর আমরা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। টাকা গেল, মা'র গয়নাগাঁটি যা কিছু ছিল সব গেল, শেষ পর্য্যন্ত এতবড় বাড়ী—তাও একদিন ছেড়ে দিয়ে আমরা পথে এসে দাঁড়ালাম।

ভবানীপুরে ছোট্ট একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমরা তিনজন গিয়ে উঠলাম। বাবা মা আর আমি।

সেদিন কিন্তু পিসিমার জন্যে সত্যিই আমার কষ্ট হয়েছিল। রুগ্ন পিসে-মশাইকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হলো গ্রামে। সেখানে তাঁদের নাকি একখানা বাড়ী আর কিছু জমাজমি এখনও আছে।

আমাদের আবার তাও নেই।

আমার মা কিন্তু সর্ব্বংসহা। নিরাভরণা হৃতসর্ব্বস্বা মা আমার নিজের হাতে রান্না করেন, ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম্ম সবই করতে হয় তাঁকে। মুখে একটি কথা নেই। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।

বাবা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান লুকিয়ে লুকিয়ে। আবার বাড়ী ঢোকেন সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ ঢেকে। সামান্য যা কিছু আনেন, তাই দিয়েই আমাদের কোনোরকমে চলে যায়।

সে বছর আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। পাশ করবো নিশ্চয়ই।

কিন্তু তারপর?

আমার মাকে আমি চিনি। তাই একদিন চুপি চুপি মা'র কাছে বসলাম। ভয়ে ভয়ে ডাকলাম : মা!

মা মুখ তুলে চাইলেন।

বললাম : যাব একদিন শ্যামবাজারে? মামাবাবুর কাছে?

মা মুখ তুলে চাইলেন।

মা'র সহোদর ভাই। আনন্দময় চ্যাটার্জ্জি। মস্ত বড়লোক।

মা একটু চুপ করে' রইলেন। বললেন : কি জন্যে যাবি বাবা? ভিক্ষে চাইতে?

মা'র দু'চোখ ছাপিয়ে জল এলো। আর তাঁর মুখের পানে আমি তাকাতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।
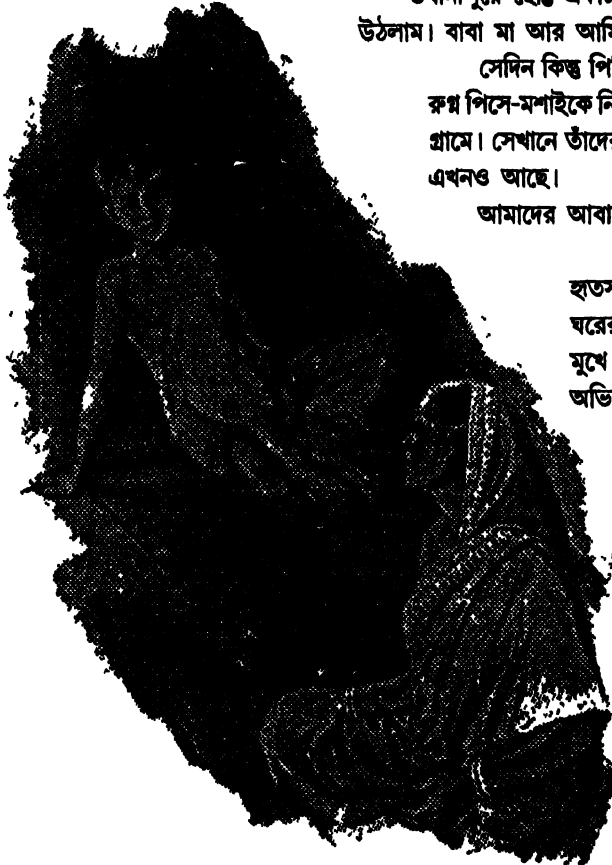
ভেবেছিলাম, টাকা-পয়সা অভাবে পড়া যদি আমার বন্ধই হয়ে যায় তো যাক্। যেখান থেকে হোক্, যেমন করে' হোক, কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করে' বাবাকে বলবো—আপনি বসে থাকুন।

বলতে হলো না। আমার পরীক্ষার খবর তখনও বেরোয়নি। বাবা সেদিন দুপুরে বাড়ী ফিরে এসেই শুয়ে পড়লেন।

আমাদের যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুও হয়ে গেল।

তিনদিনও তাঁকে শুয়ে থাকতে হলো না। বুকের অসহ্য যন্ত্রণায় সেদিন রাত্রে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সারারাত আমরা তাঁর শিয়রের কাছটিতে চুপ করে' বসে। মা আর আমি।

এত বড় একটা মানুষ—যাঁর অর্থ-সম্পদের অন্ত ছিল না, আজ তাঁর চিকিৎসা করবার জন্য ডাক্তার এলো না।

ডাক্তারের প্রয়োজনও আর হলো না। রাত্রি প্রভাত হবার আগেই তাঁর সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেল।

মা আর চুপ করে' থাকতে পারলেন না। জীবনে এই প্রথম আমি আমার মাকে এমন প্রাণ খুলে কাঁদতে দেখলাম।

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। টাকা চাই। লোক চাই।

কি করবো ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। হঠাৎ নজরে পড়লো আমার পড়ার বইগুলোর দিকে।

মা দেখতে পেলে না। বইগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে।

সবই হলো।

কিন্তু কেমন করে' হলো সে-সব কথা আর নাই-বা বললাম। চরম দুঃখের দিনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়—যেন হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের পরিচয়।

সার্টিফিকেটের জন্য কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? কোন্ ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাত পাতবো? এ-পাড়ায় নতুন এসেছি। অপরিচয়ের একটা সঙ্কোচ ছিল মনে, তবু গিয়ে দাঁড়ালাম প্রতিবেশী একজন ডাক্তারের দরজায়।

ডাক্তারবাবু তখন সবেমাত্র তাঁর ডাক্তারখানায় এসে বসেছেন। আমার কথা শুনে, আমার মুখের পানে তাকিয়ে বোধহয় তাঁর দয়া হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে এলেন আমার সঙ্গে।

কিন্তু এমন মানুষও আছে পৃথিবীতে। এত দয়াও থাকে মানুষের হৃদয়ে।

ডাক্তারবাবু আমাকে কিছুই করতে দিলেন না। সবই তিনি নিজে করলেন। এ যেন তাঁরই দায়।

অদৃষ্টে আমাদের উপবাস ছিল অনিবার্য্য। কিন্তু কেমন করে' কি যে হয়ে গেল কে জানে! কে পাঠালো এই ডাক্তারবাবুটিকে? কে বাঁচালো আমাদের এমন করে'?

চোখ তো আমাদের জলে ভরেই ছিল, ডাক্তারবাবুকে দেখলে সে জল যেন উপ্‌চে গড়িয়ে আসতো দু' চোখ বেয়ে।

এমন দিনে আমার পরীক্ষার খবর বেরুলো। পাশ তো করেইছি, এমন কি প্রথম দশ জনের মধ্যে

হয়েছি একজন।

চেষ্টা করলে কলেজে বেতন লাগবে না জানি, কিন্তু আমি যদি পড়া নিয়ে থাকি, দু'বেলা অন্নের ব্যবস্থা কে করবে?

ডাক্তারবাবু এলেন। হাত ধরে টেনে তুললেন আমাকে। বললেন : আয় আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—কলেজে।

মাথা হেঁট করে' দাঁড়িয়েছিলাম।

মা ছুটে এসে বললেন : না।

—না?

আমরা দুজনেই অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম মা'র মুখের পানে।

মা বললেন ডাক্তারবাবুকে—ছেলেকে পড়াতে কার না ইচ্ছে হয় বাবা। কিন্তু তাহলে আমাকে কারও বাড়ীতে একটা কাজ ঠিক করে' দিতে হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন : আমাকে তুই এত বোকা ভাবিস্ কেন বল্ তো? সব ঠিক করেছি। এ-বাড়ীটাও তো আজ ছেড়ে দিতে হবে। ভাড়া দিবি কেমন করে'?

—কোথায় যাব?

ডাক্তারবাবু বললেন : যে-বাড়ীতে ঝি'র কাজ করবি সেই বাড়ীতে। ভারি তো খরচ, একটা বিধবা মা আর একটা ছেলে। একখানা ছোট ঘর হলেই যথেষ্ট। চল্ চল্ আর দেরি করিসনি বাপু। আমার কাজ আছে।

কথাটা তিনি মিথ্যা বলেননি। সবই ঠিক করেছেন। আর সেটি আর-কোথাও নয়, তাঁর নিজেরই বাড়ীতে।

দোতলার একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন আমাদের, বললেন : কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। ঝির কাজ করতে হয়, এইখানেই কর্।

দুটো বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল।

আই-এস্-সি পাশ করলাম।

ডাক্তারবাবুর বড় মেয়ে অচলা—বিধবা। অনেকদিন থেকে বলছেন—তোমার মাকে আর আমাকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে চল বিনু।

সেদিন রবিবার। বললাম, চল।

দক্ষিণেশ্বর-মন্দির থেকে বেরুচ্ছি, দোরের কাছে নাম ধরে ডাক শুনে মা আমার পেছন ফিরে তাকাতেই দেখেন, মামাবাবু।

কতদিন পরে দেখা দুই ভাই-বোনে। এই একটিমাত্র বড় আদরের বোন। কলকাতা শহরেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে বড়লোকের বাড়ীতে। কিন্তু বিয়ের পরেই কি একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি যেন হয়েছিল আমার বাবার সঙ্গে মামাবাবুর। আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল বুঝি দু'জনেরই। তারপর তার আর কোনও মীমাংসা হয়নি। কাজেই মুখ দেখাদেখি ছিল বন্ধ।

মার সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে সবই গেছে মুছে।

মা হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন মামাবাবুকে, মামীমাকে। আমিও প্রণাম করলাম।

আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মামাবাবু বললেন, তা একেও তো পাঠাতে পারতিস মাঝে মাঝে।—কিরে, পড়াশুনা হচ্ছে, না, বাপের মত—

মা বললেন ঃ আই-এস্-সিতে থার্ড হয়েছে এবছর।

মামাবাবু আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। নিতান্ত আপনজনের সে স্নেহমাখা দৃষ্টি—মনে হলো যেন কতকালের চেনা!

—তোকে যে এ-অবস্থায় দেখবো তা আমি ভাবতে পারিনি সুশী। বলতে বলতে মামাবাবু মন্দিরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন। চোখ দুটো তাঁর জলে ভরে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে' চোখ মুছলেন।

মামীমা এতক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতক্ষণে কথা বললেন ঃ তা এখানে আবার বসলে কেন?

মামীমার মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও মামাবাবু বলতে পারলেন না। ঠোঁট দুটো তাঁর থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগলো। চোখ দিয়ে আবার দর্ দর্ করে' জল গড়িয়ে এলো।

আমার মাও আর থাকতে পারলেন না। আঁচলে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন মামাবাবুর পাশেই।

ডাক্তারবাবুর মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন মামীমা। বললেন ঃ থাক্ ওরা দু' ভাই বোন। এসো আমরা কথা বলি।

তাঁরা দু'জনেই সরে' গেলেন সেখান থেকে একটু দূরে।

মামাবাবু একটু সাম্‌লে নিয়ে বললেন ঃ টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি কিরকম রেখে গেছে? দেখাশোনা করছে কে?

'তবু আসিসনি আমার কাছে?' [পৃঃ ১০

মা এইবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন ঃ ও-সব কথা জিজ্ঞাসা কোরো না দাদা।

—কেন? দিয়ে গেছে শেষ করে'?

—হ্যাঁ।

—বাড়ীটা কি ভাড়ায় বসিয়েছিস?

—বাড়ী নেই।

—বাড়ীটাও গেছে? এত এত টাকা, অতবড় বাড়ী...

মা বললেন : মরবার সময় ডাক্তার ডাকতে পারিনি। ভবানীপুরে ছোট্ট একটি ভাড়ার বাড়ীতে উনি মারা গেছেন।

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : বিধবা ও মেয়েটি কে?

মা জবাব দিতে পারছিলেন না। গলাটা তাঁর বন্ধ হয়ে এসেছিল।

আমিই বললাম : ওঁদেরই বাড়ীতে আছি আমরা। ওঁর বাবার দয়ায়—

মামাবাবু কথাটা আমাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন : তবু আসিসনি আমার কাছে?

মা'র দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগলো।

মামাবাবু বললেন : বেশ করেছিস্। আয়। ওঠ্। কোথায় গো তোমরা? এসো।

মামাবাবুর প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়িয়েছিল মন্দিরের বাইরে। আমরা সবাই উঠলাম সেই গাড়ীতে।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো মামাবাবুর বাড়ীর ফটকে। প্রকাণ্ড রাজার বাড়ীর মত বাড়ী, মা'র মুখে শুনেছি—আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল এই বাড়ীতে। তারপর এই এলাম।

ডাক্তারবাবুর মেয়েকেও ছাড়লেন না মামাবাবু। আমাকে শুধু বললেন : এই গাড়ী নিয়ে তুমি চলে যাও ডাক্তারবাবুর বাড়ী। ডাক্তারবাবুকে এখানে ধরে নিয়ে এসো।

আমার যে এত বড় একজন মামা আছেন—ডাক্তারবাবু আজ প্রথম শুনলেন সেকথা।

মামাবাবুর সঙ্গে আলাপ জমাতে তাঁর আর কতক্ষণ!

মাকে বললেন : ওরে হতভাগা মেয়ে—একথা আমাকে একটিবার বললেই তো পারতিস!

মামাবাবু বললেন : বলেনি লজ্জায়।

ডাক্তারবাবু বললেন : লজ্জা! লজ্জা কিসের মা? বিষয়-সম্পত্তি আজ আছে কাল নেই। আমার বয়েস অনেক হলো মা, অনেক দেখলুম। লক্ষ্মীর আর এক নাম চঞ্চলা। এক জায়গায় বেশিদিন কিছুতেই থাকতে চায় না। তা বেশ হয়েছে, অনেক [illegible] পেয়েছিস মা, এবার একটু সুখে থাক্।

যার অমন সোনার চাঁদ ছেলে, তার ভাবনা কিসের।

তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় নিলাম।

ডাক্তারবাবু আমার একখানা হাত মামাবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন : এই নিন্ মশাই আপনার ভাগ্‌নেকে। এ একেবারে হীরের টুকরো। এমন ছেলে হয় না। আমি গরীব মানুষ, কোনও ব্যবস্থাই করতে পারিনি। অতি কষ্টে পড়াশোনা করেছে, তবু—আই-এস্-সিতে থার্ড।—আপনার ছেলেপুলে ক'টি?

মামাবাবু বললেন : দুটি মেয়ে। ছেলে নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন : বাস্। এই আপনার ছেলে।

মামাবাবু বললেন : নিশ্চয়ই। ওকে আমি আর এখানে পড়াবো না। বিলেতে পাঠাবো। ডাক্তারী পড়বে।

ডাক্তারবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন। তাঁর আনন্দ যেন আর ধরে না। বললেন : বাস্, বাস্,

বাস্, বাস্! বিনু, খুব বড় ডাক্তার হয়ে আসবে। আমি ততদিন বাঁচবো না, আমি দেখতে পাব না। না পাই, ওপরে থেকে আশীর্ব্বাদ করবো। না কি বল্?

আবার তাঁকে প্রণাম করলাম। তাঁর পায়ে মাথা আমার হেঁট হয়েই থাকে। এই রকম মানুষ আছে বলেই পৃথিবীটা এখনও বাসের অযোগ্য হয়নি।

ডাক্তারবাবু বললেন : এবার আমি চলি। কই রে অচলা, আয়। আমার হাতে রুগী আছে মশাই, আমিও ডাক্তার। তবে ছোট ডাক্তার মশাই, বড় নই। বড় আর হতে পারলুম কই! দুষ্ট লোকে সব রটিয়ে দিয়েছে—গরীব লোকের কাছে আমি নাকি ফিজ নিই না। বাস্, কেউ আর সহজে পয়সাকড়ি দিতে চায় না। আর দেবেই-বা কেমন করে' বলুন! আপনার মত অবস্থা ক'টা লোকের আছে? সব তো গরীব। দিনে দিনে যেন আরও গরীব হয়ে যাচ্ছে। গরীবের কি কম জ্বালা! দু'বেলা ভাল করে' খেতে পায় না। খেতে না পেলেই রোগে ধরে। বাস্, রোগে ধরলেই ডাক্তার। আর ডাক্তারে ধরলেই ওষুধ। কোথায় পাবে বলুন তো! চলি মশাই, বিনুর মামা, রোগ আর ওষুধের নাম ছাড়া আর কারও নাম আমার মনে থাকে না মশাই, কিছু মনে করবেন না, নমস্কার!—দেখেছিস্ অচলা, কত বড় গাড়ী! বিনুভাই বড় ডাক্তার হয়ে আসবে বিলেত থেকে, তখন এমনি গাড়ী কিনবে, বাস্, সেই গাড়ীতে চড়ে আমি খুব হাওয়া খেয়ে বেড়াবো—না কি বল্ বিনু!—হো হো করে' হাসতে হাসতে তিনি গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

আমার জীবনের আর-এক পর্ব্ব সুরু হলো। মামাবাবু ডাক্তারবাবুর কথা সত্যিই রেখেছেন। আমাকে দেখেন ঠিক নিজের ছেলের মত। সব কাজে ডাকেন, পরামর্শ করেন। বলেন, এতদিন আসতিস্ যদি হতভাগা, সব-কিছু তোকে দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যেতুম।

কিন্তু এখানে এসে অবধি একটা ব্যাপার আমি প্রায়ই লক্ষ্য করছি—মামাবাবুর সঙ্গে মামীমার যেন মনের মিল নেই। কথা-কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি যেন লেগেই আছে।

ঝগড়ার গোলমালটা শুনতে পাই, কিন্তু কিসের ঝগড়া বুঝতে পারি না।

বাড়ীতে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। মামাবাবুর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। দু'জনেই শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। অবস্থা ভাল। বেশ আনন্দেই আছে তারা।

মামাবাবুর এক শালা—মামীমার সহোদর ভাই, স্ত্রীপুত্র নিয়ে এই বাড়ীতেই থাকতো।

হঠাৎ একদিন দেখলাম, ফটকে গাড়ী দাঁড়িয়ে। সপরিবারে সে গাড়ীতে গিয়ে উঠছে। আমাকে দেখেই সে বললে : আজ বাড়ী যাচ্ছি। অনেক দিন হয়ে গেল।

তারা চলে যেতেই বাড়ী একেবারে ফাঁকা।

স্নান করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার মা'র গলার আওয়াজ পেয়ে থমকে থামলাম। শুনলাম মা জিজ্ঞাসা করছেন মামীমাকে : তোমার ভাই কি দেশে গেল?

মামীমা বললেন : হাঁ গেল। এখন আর ওর থেকে কি হবে? তোমার ছেলেই তো বাবুর কাজকর্ম্ম সব দেখছে।

খেতে বসেছি। মা কাছে এসে বসলেন। বললেন : তোর বি-এস-সি পড়ার কি হলো? কলেজে যাচ্ছিস্ না কেন?

বললাম : ক্লাস বসতে দেরি আছে। মামাবাবু বলছিলেন ডাক্তারী পড়বার কথা।
—তাই যাহোক্ কিছু কর্ বাবা। ঘুরে ঘুরে বেড়াস্ নে।
মামাবাবুকে বললাম।
মামাবাবু বললেন : তোমাকে আমি বিলেত পাঠাব ডাক্তারী পড়তে।
বললাম : মা কি দেবেন আমাকে বিলেত যেতে?

মামাবাবু জবাব দেবার আগেই পাশের দরজা দিয়ে মামীমা ঘরে ঢুকলেন। বললেন : কেন দেবে না? ভাই-এর মেলা টাকা, ভাগ্নেব জন্যে বিশ-পঞ্চাশ হাজার যদি খরচ করে তো তার আপত্তি করবার কি থাকতে পারে?

কথার সুর কেমন যেন বাঁকা-বাঁকা।

মামাবাবু ভাবতেও পারেননি—মামীমা এমন কবে' হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমার সুমুখেই কথাটা বলে বসবেন। তিনি যেন বেশ একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন : আঃ, তুমি আবার এ-ঘবের মধ্যে এলে কেন?

মামীমার গলার সুর চড়ে গেল। বললেন : নিশ্চয়। আমার বলবার কি অধিকার।

মামাবাবু চটে গেলেন। বললেন : আমার টাকা আমি যা-খুশী তাই কববো।

এতক্ষণে বুঝলাম—এঁদের মনোমালিন্যের মূল কোথায়। থামিয়ে দেবাব চেষ্টা করলাম। বললাম : আপনাবা চুপ করুন। বিলেতে আমি যাব না।

মামাবাবু বলে উঠলেন : কেন যাবিনে? নিশ্চয় যাবি। যেতে হবে।

মামীমা বললেন : মনে থাকে যেন, নিজের দুটো মেয়ে আছে, তাদেরও দুটো ছেলেমেয়ে আছে। তারাই পাবে এই সম্পত্তি। তাদের টাকা তুমি এম্‌নি করে উড়িয়ে দিতে পারো না।

"কেন দেবে না? ভাইএর মেলা টাকা.."

মামাবাবু বললেন : তাদের অভাব নেই। তাদের বাপের টাকা আছে।
আঙুল বাড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে মামীমা বললেন : ওই যিনি আজ উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন,

তারও বাপের টাকা ছিল। সে-সব খেয়ে শেষ করে' এখন তোমাকে খেতে এসেছে।

কথাটা ধক্ করে' আমার বুকে এসে বাজলো। আমি আর চুপ করে' থাকতে পারলাম না। হাত জোড় করে' মামীমাকে বললাম ঃ আপনি চুপ করুন মামীমা। আমরা আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

ঘর থেকে আমি বেরিয়ে আসছিলাম।

মামাবাবু আমার পথ আগ্‌লে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ খবরদার বিনু! রাগ করে' তোরা যদি চলে যাস্ আমি কিছু বাকি রাখবো না।

মামীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন ঃ ওদের যেতে হবে না। ওরা থাক্, আমিই চলে যাচ্ছি।

সেদিন যে আগুন জ্বললো, সে আগুন আর সহজে নিবলো না।

পোড়া অদৃষ্ট আমাদের! কেনই-বা গেলাম দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। কেনই বা দেখা হলো মামাবাবুর সঙ্গে। বেশ ছিলাম আমরা গরীব অনাত্মীয় ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে। বড়লোক মামার বাড়ীতে নাই-বা আসতাম!

মা বললেন ঃ চল বাবা আমরা ভবানীপুরে চলে যাই।

—যেতে তো চাই মা, কিন্তু মামাবাবু—

কথাটা আমার মুখ দিয়ে যেন বেরোতে চাইলো না।

মা ধরে বসলেন ঃ বল্।

কি বলবো?

কি যেন বলতে বলতে থেমে গেলি!

বললাম ঃ মামাবাবু সেদিন আমার হাতখানা চেপে ধরে কি বললে জানো মা? বললে, ওর কাছে আমাকে একলা ফেলে তোরা যাস্‌নে বাবা। তোরা চলে গেলে আমি মরে যাব।—

এর পরে আমাদের যত কষ্টই হোক্, যাওয়া চলে না।

আমরা রইলাম। কিন্তু মামীমাকে কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব হলো না। কারও কথা না শুনে বাড়ীর একটা পুরণো চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন তাঁর বাপের বাড়ী।

মামাবাবু রেগে টং হয়ে তক্ষুণি ড্রাইভারকে ডেকে বললেন ঃ

গাড়ী বের কর।

গাড়ী নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ভেবেছিলাম—গেলেন বুঝি মামীমাকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সন্ধ্যায় ফিরে এলেন একা। মুখের চেহারা এত গম্ভীর যে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না।

দু'দিন তিনি কারও সঙ্গে কথাই বললেন না।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি—কাকে যেন তিনি টেলিফোন করছেন। একপাশে চুপ করে' দাঁড়িয়ে ছিলাম। গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো—তাঁর শরীরে কোথাও যেন যন্ত্রণা হচ্ছে, ডাক্তারকে আসতে বলছেন।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ শরীর কি খারাপ মনে হচ্ছে?

মামাবাবু হাতের ইসারায় আমাকে কাছে বসতে বললেন। ভাল করে' কথা পর্য্যন্ত বলতে পারছেন না তিনি। ধীরে ধীরে বললেন : অনেকদিনের পুরণো অসুখ, ভাল হয়ে গিয়েছিল, আবার জানিয়েছে কাল থেকে। বুকের যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে।

ডাক্তার এলেন।

ইন্‌জেক্‌শানের পর ইন্‌জেক্‌শান্‌ চল্‌তে লাগলো।

মা'র মুখখানি গেল শুকিয়ে। আমাকে ডেকে বললেন : তোর মামীমাকে আনবার জন্যে লোক পাঠিয়ে দে।

—অনেকবার বলেছি। মামাবাবু বারণ করছেন।

রাত্রির দিকে যন্ত্রণা বাড়লো।

মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন : করুক্‌গে বারণ। খবর না দিলে অন্যায় হবে। তোর বাবার ঠিক এমনি হয়েছিল।

কিন্তু মামীমাকে আনাবার কোনও ব্যবস্থাই আমি করলাম না। ক্রমাগত মনে হতে লাগলো—মামীমা কাছে থাকলে মামাবাবুর বুকের যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না।

পরের দিন দুপুরে ঠিক আমার বাবার মত মামাবাবুর চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের ভবানীপুরের ডাক্তারবাবুর কথা। এরকম বিপদের দিনে আমাকে কেউ যদি সাহায্য করতে পারেন—একমাত্র তিনিই পারবেন। ছোট্ট একখানি চিঠিতে তাঁকে আসবার জন্য অনুরোধ করে' গাড়ী পাঠিয়ে দিলাম।

কিন্তু এমনি আমার অদৃষ্ট, যেই ডাক্তারবাবু বাড়ীতে পা দিয়েছেন, মা কেঁদে উঠলেন।

কাছে গিয়ে দেখি, সব শেষ হয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, হা ভগবান! আমি কি তোদের শ্মশানের বন্ধু হবার জন্যেই জন্মেছি?

মৃতদেহ রেখে দিয়েছিলাম। খবর পেয়ে মামীমা এলেন।

এসেই সুরু হলো কান্না আর আমাকে গালাগালি।

—আমি আগেই বলেছিলাম, ও এসেছে ওকে খাবার জন্যে।

মা বললেন : আর আমাদের এখানে থাকা চলে না বিনু। চল ভবানীপুরেই চলে যাই।

সেই ভালো।

যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময় মামাবাবুর এটর্নী মিত্তিরমশাই-এর গাড়ী এসে দাঁড়ালো ফটকে।

মামাবাবুর সঙ্গে একদিন মাত্র আমি গিয়েছিলাম তাঁর আপিসে। আমাকে দেখেই বললেন, আমি কলকাতায় ছিলাম না বাবা, নইলে অসুখের খবর পেয়েই আমি আসতাম। তুমিই তো আনন্দময়ের ভাগনে?

বললাম : আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি বললেন : কাল তাহ'লে তুমি একবার এসো আমার আপিসে। উইলের প্রোবেট্‌ নিতে হবে।

বললাম : মাকে নিয়ে আজ আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

মিত্তিরমশাই বললেন : ও, তাহলে তো দেখছি কোনও খবরই তুমি জানো না। আনন্দময় তোমাকেই

যে তার সব-কিছুর মালিক করে' দিয়ে গেছে।

আমার মাথাটা তখন ঝিম্ ঝিম্ করছে। কি যে করবো, কি যে বলবো, কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিত্তিরমশাই বললেন : আনন্দময়ের স্ত্রী কোথায় রয়েছেন বাবা? এলাম যখন, একবার দেখা করেই যাই। ডাকো।

বললাম : আমার সঙ্গে ব্যাক্যালাপ নেই। আপনি ডাকুন।

সর্ব্বনাশ!—মিত্তিরমশাই বলে উঠলেন : তাহলে তো আগুন জ্বলবে বাবা। থাক্, আমি চলি। তুমি কাল এসো।

মিত্তিরমশাই চলে গেলেন।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কাঠের পুতুলের মত।

মা ডাকাডাকি করছেন। ভবানীপুর যাবেন তিনি। এখানে থাকতে চান না।

উইলের খবরটা মাকে জানালাম।

মা নির্ব্বাক্।

কিছুক্ষণ চুপ করে' থাকবার পর মা বললেন : তুই থাক্ বিনু, আমাকে কাশীতে দিয়ে আয়। আমি কাশী যাব।

অথচ আমার তখন এম্‌নি অবস্থা, এক পা নড়বার উপায় নেই। ভবানীপুর থেকে ডাক্তারবাবুকে আনালাম।

মার সঙ্কল্প থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারলে না।

মা গেলেন কাশী।

মিত্তিরমশাই ঠিকই বলেছিলেন।

উইলের সংবাদ শুনে মামীমা বোমার মত ফেটে পড়লেন। বললেন : এ উইল জাল।

কেউ তাঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলে না। তিনি সেই এক কথা বারংবার বলতে লাগলেন : ও যখনই এসেছে এ-বাড়ীতে তখন জানি এম্‌নি একটা সর্ব্বনাশ করবে ও। ওর বাপ্‌টা ছিল জালিয়াৎ। মাকে ওই জন্যে কাশী পাঠিয়ে দিলে।

মামীমার বাবা জমিদার। দাদা উকিল।

এই উইল যে মামাবাবু নিজে করে' গেছেন সেকথা কেউ বিশ্বাস করলেন না।

মামলা রুজু হলো হাইকোর্টে।

আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মিত্তিরমশাইকে গিয়ে বললাম : এখন আমার কি করা উচিত সেই পরামর্শই দিন।

মিত্তিরমশাই বললেন : উইল আমিই করেছি বাবা। আমি জানি আনন্দময় স্বেচ্ছায় সুস্থমনে সুস্থদেহে তোমাকেই তার সব-কিছু দিয়ে গেছে। তোমার মামীমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যখন বলছেন—তাঁর স্বামীর উইল জাল উইল, তখন তিনি তাই প্রমাণ করুন।

মামলা চলতে লাগলো।

আর চলতে লাগলো আমার উদ্দেশ্যে অকথ্য কুকথ্য ভাষা।

তাঁরও জেদ চড়ে গেল, আমারও জেদ চড়ে গেল।

একই বাড়ীতে থাকি, অথচ এইরকম একটা বিশ্রী ব্যাপার দিনে-দিনে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো। ভাবলাম, বাড়ীতে লোকজন রেখে দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করি।

এমন দিনে মামীমার বাবা আর তাঁর দাদা আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। দুজনকেই প্রণাম করে' বসালাম আমার ঘরে।

মামীমার বাবা বললেন ঃ এর একটা মীমাংসা করে' নাও বাবা।

আমি বললাম ঃ যা বলবেন আমি তাই করতে রাজী। এ সম্পত্তি তাঁরই, তিনিই মালিক, আপনারা বিশ্বাস করুন, উইল জাল করা দূরে থাক্, আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না।

মামীমার দাদা বললেন ঃ তাহ'লে বেশ, তুমি এক কাজ কর। অর্দ্ধেক সম্পত্তি ওকে ছেড়ে দাও।

—এক্ষুণি দিচ্ছি। শুধু জালিয়াৎ অপবাদটা তিনি যেন আমাকে না দেন। এইটুকু অনুরোধ আমি তাঁকে করবো।

তাঁরা সানন্দে এই সংবাদটি বহন করে' নিয়ে গেলেন মামীমার কাছে।

মামীমা বললেন ঃ কখখনো না। এ সম্পত্তি—হয় আমার, নয় তার। অর্দ্ধেক নিতে আমি রাজী নই।

মীমাংসা হলো না।

হাইকোর্টের বিচারে তিনি হেরে গেলেন।

শুনলাম, মামীমা তাঁর বাপ্-দাদার সঙ্গে এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

আমি নিজে গেলাম তাঁর কাছে। এ-বাড়ী ছেড়ে যেতে আমি তাঁকে নিষেধ করবো, ক্ষমা চাইবো, বলবো—আমার ওপর আপনার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গেছেন আমার মামাবাবু। তাঁর সেই আদেশটুকু আমাকে পালন করতে দিন।

এই কথা বলবার জন্যেই গিয়েছিলাম।

প্রণাম করবার জন্যে যেই আমি মাথা হেঁট্ করেছি, মামীমা আমার মাথার ওপর এক লাথি মেরে চীৎকার করে' উঠলেন—

—দূর হ্ জালিয়াৎ আমার চোখের সুমুখ থেকে!

দু'চোখ আমার জলে ভরে এলো। চলে এলাম সেখান থেকে।

মামীমা সত্যিই বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

বাড়ীতে আমি একা।

মামীমা নেই, মা নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই। শুধু এক বিরাট অট্টালিকা আর প্রচুর ধন-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী নিঃস্ব নিঃসম্বল কপর্দ্দকশূন্য এক ভিখারীর পুত্র।

সেই সব দিনের কথা আমার মনে হতে লাগলো—বাবার অন্তিমশয্যায় নিরুপায়ের মত বসে বসে যেদিন কেঁদেছিলাম আমি আর আমার মা! অর্থাভাবে ডাক্তার ডাকতে পারিনি। মৃতদেহের সৎকারের

জন্য পুরণো কয়েকখানি বই ছিল সেদিন আমার একমাত্র সম্বল।

আর আজ?

এত প্রচুর অর্থ—কি করবো, কেমন করে' ব্যয় করবো বুঝতে পারছি না।

মাকে এইবার নিয়ে আসি কাশী থেকে।

কাশী যাবার জন্যে সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করে' দিচ্ছে আমার চাকর, এমন সময় একখানি চিঠি।

কাশীর চিঠি। মা লিখেছেন।

আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না বিনু। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। মরবার আগে একটিবার দেখতে ইচ্ছে করছে। যদি সময় পাও তো এসো।

মনে তুমি কষ্ট পাবে বলে একটি কথা তোমাকে আমি বলিনি। অর্থের নেশায় মেতে তোমার বাবা জীবনে বহু অপকর্ম্ম করে, তার প্রায়শ্চিত্ত করে' গেছেন শেষ জীবনে। তোমারও শরীরে তোমার বাবার রক্ত। তাই ঠাকুরের কাছে দিবারাত্রি প্রার্থনা করছি, তোমার অপরাধ তিনি যেন ক্ষমা করেন।

একটি কথা শুধু জেনে রেখো বাবা—অর্থ মানুষের প্রয়োজন, কিন্তু অর্থের সঙ্গে অনর্থ আসে। অর্থ মানুষকে কখনও সুখী করতে পারে না। অর্থের মধ্যে সুখের সন্ধান তোমার বাবাও করেছিলেন। কিন্তু তুমি নিজের চোখে দেখেছো—সুখ-শান্তি তিনি পাননি।

আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও। ইতি—

তোমার হতভাগিনী
মা

"দুর হ' জালিয়াৎ আমার সুমুখ থেকে।" [পৃঃ ১৬

কাশী গেলাম।

গিয়ে দেখি, যে বাড়ী ভাড়া করে' মাকে আমি রেখে এসেছিলাম, সেখানে তিনি নেই। খবর পেলাম—তিনি আমবেড়িয়া ছত্রে চলে গেছেন।

দাতব্য ছত্রে গেছেন আমার মা? কেন? কোন্ দুঃখে?

ছত্রে গিয়ে যা দেখলাম—তার চেয়ে আমার মাথায় যদি আকাশের বজ্র নেমে আসতো, তাও বোধ

করি ছিল ভাল।

ছত্রের ছোট্ট একটি অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ঘরে মলিন শয্যায় আমার মা'র মৃতদেহ—সাদা একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। গত রাত্রে তিনি মারা গেছেন। ছত্রের যিনি ম্যানেজার, তিনি টেলিগ্রাম করেছেন আমাকে।

টেলিগ্রাম করে' তাঁরা আমার আসার অপেক্ষায় বসে।

মার হাতের একখানি চিঠি আর পাঁচশ' টাকা তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন : আপনার মা এইগুলি আমাকে দিয়ে গেছেন আপনাকে দেবার জন্যে।

আপনি যদি না আসতেন—আমার ওপর আদেশ ছিল তাঁর মৃতদেহ সৎকার করবার পর টাকা যা বাঁচবে, তা' যেন আমি বিতরণ করে' দিই দীন দুঃখী অন্নহীন ভিখারিণী যারা—তাদের মধ্যে। আর এই চিঠিখানি আপনাকে যেন পাঠিয়ে দিই।

তখন চোখের জলে চিঠি আমি পড়তে পারছিলাম না। তবু পড়লাম—

মা লিখেছেন—

বিনু—

দেখা বোধহয় আর হলো না। আমার স্বামী আমার জন্য একটি কানাকড়ি রেখে যাননি। আমি তাই তোমার দেওয়া টাকা তোমাকেই ফেরত দিয়ে গেলাম। আবার আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও। কিন্তু বাবা, আমার শেষ অনুরোধ, তোমার বাবার মত অর্থের মোহে যে-হাত দিয়ে তুমি তোমার মামার উইল জাল করেছো, সে হাত দিয়ে আমার মুখাগ্নি যেন কোরো না।

মা—

মা—মা আমার!

আমি কেমন করে' তোমাকে বুঝিয়ে বলবো—উইল আমি জাল করিনি! তুমি আমার বাবাকে জানতে, তাই তুমি আমাকে ভুল বুঝে চরম শাস্তি দিয়ে গেলে। কিন্তু মা আমার, এ শরীরে তোমার রক্ত আছে যে মা! হয়তো-বা শুধু সেই জন্যই অর্থের প্রতি মোহমুক্ত হয়ে আমি থাকতে পেরেছি।

মা'র মুখাগ্নি আমি করিনি।

আমি নিরপরাধ। কিন্তু নিজের সন্তানকে ভুল বুঝে যে চলে গেল, তার ভুল আমি ভাঙ্গাবো কেমন করে'?

কি করবো আমি এই রাজার ঐশ্বর্য্য নিয়ে?

এ জীবন আমি রাখবো না। পরলোক যদি থাকে তো সেইখানে গিয়ে মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো—আমাকে তুমি ক্ষমা কর মা।

মা'র শেষ-কৃত্য শেষ করে' একটা কাগজে লিখলাম—"আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়। আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম।"

আমার মৃত্যু-সংবাদ মামীমার হাতে পৌছে দেবার জন্য পাগলের মত আমার ম্যানেজারকে লিখে দিলাম—ছত্রের ম্যানেজারের নাম দিয়ে—

গত রাত্রে আপনার মনিব সুবিনয় মুখোপাধ্যায় মারা গিয়াছেন। এই সংবাদটি কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়া দিয়া আপনি এখানে আসিবেন।

তাঁহার মাতাঠাকুরাণী গত রবিবার রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইতি।

পাগলের মত কাশীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একটা ডাকঘর নজরে পড়তেই চিঠিখানি ডাকে দিয়ে দিলাম।

তার পর কবে কতদিন পরে আমার ঠিক মনে নাই, কলকাতা ফিরে এলাম ট্রেণে চড়ে।

আত্মহত্যা আমি করতে পারিনি।

মা'র কথাই সত্য কিনা তাই-বা কে জানে।

বাবার রক্ত আমার শরীরে। মামাবাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে আবার সেই পথে টেনেছে কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

হাওড়া ষ্টেশনে পা দিতেই সকালের খবরের কাগজে দেখি—আমার মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হয়েছে। সারাদিন আত্মগোপন করে' সন্ধ্যার অন্ধকারে মামাবাবুর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি—আমারই মৃত্যুতে শোকসভা বসেছে।

তারপর সবই তো বলেছি।

এখন কে বলে দেবে আমি কি করবো?

তর্কে বহু দূর

ব্যাঙের বন্ধু সাপ

উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে শঙ্করাচার্য্য অরণ্যে অরণ্যে, তপোবনে তপোবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথাও উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পান না। অবশেষে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে কদম্ববন নামে এক অরণ্যে উপস্থিত হলেন। অরণ্যে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর শরীর যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। তিনি একটা পুকুরের ধারে গাছতলায় বসলেন। হঠাৎ দেখেন, পুকুরের ভেতর থেকে কতকগুলি ব্যাঙ বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কেউটে সাপও সেই দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। শঙ্কর চোখ বুঁজলেন, এখুনি সাপটা ব্যাঙগুলোকে খেয়ে ফেলবে। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার, সাপটি ফণা বিস্তার করে ব্যাঙগুলির মাথায় যেন ছাতি ধরে আছে। ব্যাঙগুলিও নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে শঙ্কর বুঝলেন, এই অরণ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন মহাপুরুষ আছেন, যাঁর তপস্যার প্রভাবে এই অঘটন ঘটেছে। তাঁর অনুমান সত্য হলো, তিনি সেখানে তাঁর কাম্য গুরু আচার্য্য গোবিন্দপাদের দর্শন পেলেন।

এক যে ছিল রাজা

—অন্নদাশঙ্কর রায়

[এই ব্যালাড জাতীয় কবিতাটি ঠিকমতো পড়তে হলে কোন্‌খানে কোন্‌খানে থামতে হবে ও কোন্‌খানে কোন্‌খানে ছুটতে হবে তার একটা ইঙ্গিত নিচে দিচ্ছি।

এক যে...ছিল রাজা দেয় না সাজা...লোকটি...ভালো বেজায়।
একদা...ঘোর বনেতে নির্জনেতে...থাকবে...বলে সে যায়।]

এক যে ছিল রাজা
এক যে ছিল রাজা দেয় না সাজা লোকটি ভালো বেজায়
একদা ঘোর বনেতে নির্জনেতে থাকবে বলে সে যায়।

তার পর খবর নেই
তার পর খবর নেই ব্যাপার এই রানীকে ভাবিয়ে তোলে
তা শুনে উজীর বুড়ো নাজীর খুড়ো পড়ল গণ্ডগোলে।

রাজাদের অশ্বশালায়
রাজাদের অশ্বশালায় সন্ধানে যায় আছে কি তাজী ঘোড়া ?
সে ঘোড়া চড়তে জোয়ান কে আগুয়ান, পাবে তোড়া।

একটা ছিল বাজী
একটা ছিল বাজী আরবী তাজী চেহারা বেবাক শাদা
সে ঘোড়ার লায়েক সোয়ার মেলা যে ভার। চড়লে পড়বে, দাদা।

তা ছাড়া বাঘের ডরে
তা ছাড়া বাঘের ডরে দিন দুপরে সে পথে চলতে মানা
তাই তো হয় না জোয়ান কেউ আগুয়ান, করে সব টালবাহানা।

ছিল এক বিশ্বাসী জন
ছিল এক বিশ্বাসী জন রাজার আপন, সে বলে, আচ্ছা, রাজী
বাঁচি বা পড়ি মরি ঘোড়ায় চড়ি কেয়াবাৎ আরবী তাজী।

সেকালে হয়নি বাইক
সেকালে হয়নি বাইক ছুটল পাইক
ঘোড়াতে টগবগিয়ে
দু'ধারে রইল খাড়া দেখল যারা
নীরবে হকচকিয়ে।

চলল বায়ুরথে
চলল বায়ুরথে বনের পথে
চলল জোর কদমে
সন্ধ্যা হবার আগে এড়িয়ে বাঘে
থামবে একটি দমে।

ঘোড়াটি সত্যি খাসা
ঘোড়াটি সত্যি খাসা মুখের ভাষা শুনলে সমঝ করে
ছোটে সে রাজার কাজে বনের মাঝে ভাগে না বাঘের ডরে।

তখনো হয়নি বিকাল
তখনো হয়নি বিকাল হেন কাল পিছনে ডাকল কেঁটা
আঁশটে গন্ধ ও কার! কেবা আর! সাক্ষাৎ যমের বেটা!

এক বার পিছন ফিরে
এক বার পিছন ফিরে সে মূর্তিরে অদূরে দেখতে পেয়ে
সোয়ারি প্রাণের দায়ে ঘোড়ার গায়ে চাবকায়, চলে ধেয়ে।

দৌড়ে বাঘের সাথে
দৌড়ে বাঘের সাথে কম তফাতে ঘোড়া সে পারবে কত
ছুটতে বনবাদাড়ে কাঁটার মারে পায়ে তার হাজার ক্ষত।

পাছাতে বসল কামড়
পাছাতে বসল কামড় এর পর
ঘোড়া কি চলতে পারে!
সোয়ারি হাত নাগালে গাছের ডালে
সবেগে লম্ফ মারে।

হায় হায় ঘোড়া গেল
হায় হায় ঘোড়া গেল বাঘে খেলো
কামড়ে একটা কিনার
বাকীটা রইল পড়ে খাবে পরে
রাত্রেই বাঘের ডিনার।

বাঘটা ধীরে ধীরে
বাঘটা ধীরে ধীরে চলল ফিরে কোথা যে গভীর বনে
ক্রমে তার গন্ধটাও হয় উধাও ভয় আর নাইকো মনে।

মাটিতে নামল পাইক
মাটিতে নামল পাইক চার দিক যতনে রাখল দেখে
তার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে রাজার পাশে ছুটল এঁকে বেঁকে।

কাছেই বানর পাহাড়
কাছেই বানর পাহাড় উপরে তার উঠল হামা দিয়ে
দেখল রাজা মশায় ধ্যানধারণায় মশগুল ঠাকুর নিয়ে।

পড়ল চরণ ধরে
পড়ল চরণ ধরে নিরুত্তরে রইল একুশ মিনিট
রাজা তো প্রশ্ন করে ভেবে মরে লোকটা হলো কি ফিট!

শেষটা গেল জানা
শেষটা গেল জানা বাঘের হানা আহাহা ঘোড়ার মরণ
মহারাজ ভীষণ ক্ষেপে রাগে কেঁপে ছাড়িয়ে নিলেন চরণ।

বন্দুক তৈরি ছিল
বন্দুক তৈরি ছিল কাঁধে নিল,
বলল, বাঘটা কোথায় ?
বাঘ কি ফলে গাছে ধারে কাছে
চাইলে বাঘ দেখা যায় ?

সামনে চলল পাইক
সামনে চলল পাইক ঠিক ঠিক
চলল বনের দেশে
সেই যে গাছের গোড়া যেথায়
ঘোড়া সেখানে থামল এসে।

আহাহা আরবী তাজী
আহাহা আরবী তাজী খোশমেজাজী একে যে ধরল বাঘা
সে বাঘে দেখতে পেলে অবহেলে হবে আজ গুলী দাগা।

বুনোরা এলো ছুটে
বুনোরা এলো ছুটে সবাই জুটে বাঁধল বাঁশের মাচান
চার দিকে রইল ছিপে টিপে টিপে চুপচাপ রাজা যা চান।

চাঁদিনী অর্ধ রাতে
চাঁদিনী অর্ধ রাতে গন্ধে মাতে
নিঃঝুম অর্ধ যোজন
বাঘটা ঘোড়ার খোঁজে ওই এলো যে
সারতে নৈশ ভোজন।

তাক করে ছুটল গুলী
তাক করে ছুটল গুলী মাথার খুলি
বাঘটা গর্জে ওঠে
হৈ চৈ করে সবাই বুনো ক'ভাই
বাঘটা লাফিয়ে ছোটে।

গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম
গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম বার দুই বাজল আওয়াজ
বাঘ বীর পড়ল ভুঁয়ে মাথা নুয়ে থামলেন রাজাধিরাজ।

ভারত-মাতার মন্দির
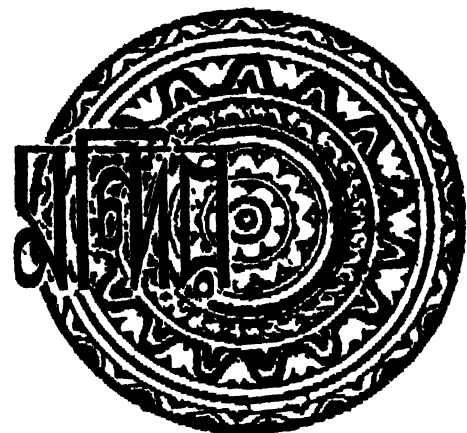
—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কেরা এক বিচিত্র সভার আয়োজন করেছেন। শিব-জটা-বিহারিণী গঙ্গার তীরে শিব-নগরী কাশীধামে এই সভা হবে।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের শিল্পীদের, সাহিত্যিকদের, চিন্তা-নায়কদের এই মহাসভায় আহ্বান করা হয়েছে। সভার উদ্দেশ্য হলো, ভারত-রাষ্ট্রে একটি অভিনব মন্দির গড়ে তুলবেন, যে-মন্দির গঠনের দিক দিয়ে হবে ভারত-শিল্পের চরম নিদর্শন।

এ মন্দিরে কোন বিগ্রহ থাকবে না। মন্দিরের গর্ভকক্ষে দেবতার বেদীতে শুধু জ্বলবে দীর্ঘ-শিখা এক অনির্ব্বাণ প্রদীপ। ভারতের সাধনার প্রতীক।

শাহ্‌জাহান যেমন একদিন ভারতের তথা এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আহরণ করে এনে, সমস্ত বিভিন্ন শিল্পকে একটি শুভ্র আয়তনের মধ্যে সুষমাবদ্ধ করে কালজয়ী মূর্ত্তি দিয়েছিলেন, তেমনি আবার আজ ভারতের রাষ্ট্রনায়কেরা আজকের যুগের ভারত-শিল্পীদের সাধনাকে এই অভিনব মন্দিরে রূপায়িত করে তোলবার সংকল্প করেছেন।

সেইজন্যে এই সভা থেকে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের শিল্পীদের আহ্বান করা হয়েছে, সভায় অনুমোদিত হলে ভারতের বাইরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্পীদেরও আমন্ত্রণ করা হবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, শিল্পের ক্ষেত্রে, সৃজনের ক্ষেত্রে এ হবে স্বাধীন ভারতের মৈত্রীর আহ্বান।

এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে থাকবে ভারতের বিচিত্র ও বিরাট সাধনার শ্রেণীবদ্ধ নিদর্শন। কোন প্রকোষ্ঠে থাকবে ভারতের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, কোন প্রকোষ্ঠে থাকবে চিত্র-শালা, কোন প্রকোষ্ঠে থাকবে ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তি, কোন প্রকোষ্ঠে থাকবে ভারতের বিস্ময়কর কুটীর-শিল্পের সংগ্রহ। মন্দিরের মধ্যস্থলে বিরাট নাটশালায় থাকবে ভারতের ইতিহাসের পথ-স্রষ্টাদের মর্ম্মরমূর্ত্তি।

এই নাটশালার দেয়ালে দেয়ালে, নতুন ভারতের চিত্র-শিল্পীরা অক্ষয় রঙে এঁকে রাখবে, ভারতের

সুদীর্ঘ জীবনের সেই সব ঘটনা, যেসব ঘটনার মধ্যে অমর হয়ে আছে ভারতের প্রাণ।

কোন্ কোন্ ঘটনাকে চিত্রায়িত করা হবে, তা ঠিক করবার জন্যে এই সভায় রসিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ছোট কমিটি গঠিত হবে, কারণ এই ঘটনা-নির্ব্বাচনের মধ্যে ভারতের প্রাণের স্পন্দনকে ধরা চাই।

যে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর নির্ব্বাচন এই কমিটির কাছে পাঠাতে পারবেন। আমি আগে থাকতে আমার নির্ব্বাচন এই 'ইন্দ্রধনু'র পাতায় রেখে গেলাম।

প্রথম চিত্র

'হে কৃষ্ণ, এ যুদ্ধে প্রয়োজন নেই!"

কুরুক্ষেত্র।

পূর্ব্বদিকে হিরন্বতী নদীর তীরে পাণ্ডবদের বিরাট বাহিনী। পশ্চিমদিকে কৌরবদের রণ-সজ্জা।

মধ্যে পড়ে আছে তৃণপূর্ণ বিরাট প্রান্তর। এখনি যুদ্ধ আরম্ভ হবে।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সারথিরূপে অর্জ্জুনকে রথে নিয়ে প্রান্তরে প্রবেশ করলেন।

অর্জ্জুন সামনে সেই বিরাট-শত্রুবাহিনীর অধিনায়করূপে দেখলেন, তাঁরই সব পরমাত্মীয়। হঠাৎ তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। রথ থেকে নেমে গাণ্ডীব ত্যাগ করে অর্জ্জুন বলে উঠলেন, হে কৃষ্ণ, এ যুদ্ধে প্রয়োজন নেই। কি হবে অকারণ নরহত্যায়?

বাসুদেব হেসে অর্জ্জুনকে আদেশ করলেন, গাণ্ডীব তুলে নিয়ে যুদ্ধ করতে।

অর্জ্জুন তর্ক করেন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। বাসুদেব তার উত্তর দেন। জন্ম নিলো গীতা। ভারত-বাণী। ভগবৎ-বাণী। যে-বাণীর ভেতর আছে দুঃখ-জয়ী, অবসাদ-জয়ী, মৃত্যুজয়ী মন্ত্র।

দ্বিতীয় চিত্র

নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে পদ্মাসনে এসে বসেন এক সন্ন্যাসী। রাজার কুমার, মানুষের দুঃখ দেখে হয়েছেন সন্ন্যাসী। সব পেছনে ফেলে রেখে বেরিয়েছেন, খুঁজে বার করতে, কি করে এই দুঃখ-বেদনা-জরা-মৃত্যুর হাত থেকে মানুষ পেতে পারে মুক্তি। কঠিন সাধনায় কেটে যায় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তবু মেলে না সন্ধান। অবশেষে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে এসে বসলেন, সংকল্প করলেন,

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভং
নৈবাসনাৎ কায়মথস্স লিষ্যতে।

—বহুকল্প-দুর্লভ সেই বোধি বা জ্ঞান যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ এই আসন ছেড়ে আর উঠছি না...যদি সে-সাধনায় দেহের মাংস গলে পড়ে যায়, হাড় যায় শুকিয়ে, যাক্!

বোধিবৃক্ষতলে বসে থাকে সন্ন্যাসী, গভীর ধ্যানে। চলে যায় বর্ষা-শরৎ, শীত-হেমন্ত। শুকিয়ে আসে সারা দেহ। পড়ে থাকে শুধু কতকগুলি হাড়।

দূর থেকে দেখে সুজাতা, কি যেন জ্বলছে বোধি-বৃক্ষ-তলে। এগিয়ে আসে। কংকালের ভেতর কাঁপছে প্রাণ। শুভ্র পাত্রে নিয়ে আসে পরমান্ন। সুজাতার পরমান্নের রসে আবার ধীরে ধীরে জেগে ওঠে সন্ন্যাসীর শুষ্ক দেহ। জেগে ওঠেন বুদ্ধ। বলেন, আমি পেয়েছি দুঃখ-জয়ের মন্ত্র।

পরমান্নের রসে জেগে ওঠে সন্ন্যাসীর শুষ্ক দেহ।

তৃতীয় চিত্র

গভীর রাত্রি। কলিঙ্গের যুদ্ধ-ক্ষেত্র। শত সহস্র কলিঙ্গের বীর নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোয় রণ-ক্ষেত্রে পড়ে আছে, মৃত। মৃতদের পাশ

থেকে অর্দ্ধমৃত আহতরা আর্ত্তনাদ করছে। রক্তে মাটী কর্দ্দমাক্ত হয়ে গিয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসছে মৃত সৈন্যদের নারীদের বিলাপ। সে বিলাপের ধ্বনির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নরমাংস-লোলুপ বন্যপশুদের আনন্দ-চীৎকার।

সেই মৃত্যুর মহাশ্মশানে রাত্রি-নিশীথে উন্মাদের মত একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিজয়ী সম্রাট অশোক, ভারত-ঈশ্বর।

"তুমি পরিবেশন করেছ মৃত্যু, আমি পরিবেশন করছি অমৃত।"

তাঁর যুদ্ধলিপ্সু অন্তরের ভেতর থেকে আজ উঠছে এক মহা-তিরস্কারের বাণী। কে যেন রুদ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছে, কি মূল্য এই বিজয়ের? নরহত্যায় যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, কতদিন তা থাকবে স্থির? কিবা তার সার্থকতা?

সহসা বিজয়ী সম্রাটের চোখে পড়লো, অন্ধকার রণক্ষেত্রে যেন একটা মশাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্রাট এগিয়ে যান। দেখেন, মৃত্যুর সেই মহাশ্মশানে বেদনার ঘোর অন্ধকারে দীপ্ত আশ্বাসের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন শীর্ণকায় এক বৌদ্ধ ভিক্ষু, তৃষ্ণার্ত্তকে দিচ্ছেন জল, অসহায়কে দিচ্ছেন সান্ত্বনা।

সম্রাট এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি?

ভিক্ষু বলেন, আমি ভগবান বুদ্ধের দাস। তুমি পরিবেশন করেছ মৃত্যু, আমি পরিবেশন করছি অমৃত।

সেই মৃত্যুকণ্টকিত কলিঙ্গের রণক্ষেত্রে বিজয়ী সম্রাট অশোক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর চরণ-তলে রেখে দেন তাঁর তরবারি, নতজানু হয়ে বলেন, এই আমি ভগবান বুদ্ধের নামে ত্যাগ করলাম তরবারি, হে ভিক্ষু, আমাকে দেখাও কল্যাণ-ধর্ম্মের পথ।

চতুর্থ চিত্র

পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে শিল্পীরা লিখছে, দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসন।

—আমি বাহুবলে সারা ভারতবর্ষ জয় করেছি, আমি জানি এই রুধিরাক্ত জয়ের কি পরিণাম। তাই অনাগত মানুষের জন্যে এই পাথরের অক্ষরে লিখে রেখে যাচ্ছি আমার চরম স্বীকৃতির কথা, যুদ্ধে নয়, রুধিরাক্ত জয়ে নয়, কল্যাণ-ধর্ম্মে, মানব-মৈত্রীতে হবে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।

দূরে, বন্দরে দেখা যায় দাঁড়িয়ে সব তরী...তরীতে উঠছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা...তাঁদের সাথী হলো ভিক্ষু-বেশে সম্রাটের পুত্র-কন্যা...তাঁরা যাবেন ভারতের বাইরে, দেশে-দেশান্তরে, সঙ্গে নিয়ে ভারতের বাণী...

ভগবান বুদ্ধের বাণী।

পঞ্চম চিত্র

একটা বিরাট পট। পটের মধ্যস্থলে সিংহাসনে বসে আছেন সম্রাট বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

পটের এক অংশে দেখি, কালিদাস লিখছেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্...পাশে পড়ে রয়েছে মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের পুঁথি।

আর একদিকে শান্ত কুটীর-প্রাঙ্গণে বসে তৈল-দীপের আলোয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লিখছেন, বিষ্ণু-পুরাণ, শিব-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ...

বিশাখদত্ত লিখছেন মুদ্রা-রাক্ষস, শূদ্রক লিখছেন মৃচ্ছকটিক, জগতের প্রথম বাস্তবতামূলক নাটক। অমরসিংহ সংকলন করছেন তাঁর অমর অভিধান।

অন্য এক অংশে, চতুর্দ্দিকে ছড়ানো রয়েছে গ্রীক ভাষায় গ্রীক-বিজ্ঞানের পুঁথি, তার মধ্যে বসে আর্য্যভট্ট, বরাহ-মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, রচনা করছেন বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র।

পটের আর একপাশে শিল্পীরা গড়ে তুলছেন সারনাথের অপরূপ মঠ, পাথর কুঁদে ফুটিয়ে তুলছেন শতদল...

কালিদাস লিখছেন অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্...

অপর পাশে অজন্তার গুহা-গৃহের দেয়ালে ভিক্ষুব্রতী ভারতের নামহীন অমর চিত্র-শিল্পীরা তুলির টানে ফুটিয়ে তুলছেন রঙ আর রেখার অমর সুষমা...

পটের তলার দিকে বিরাট অগ্নি-কুণ্ডের সামনে লৌহ-শিল্পীরা গড়ে তুলছেন সব লৌহ-স্তম্ভ, যার একটি আজও অক্ষতভাবে বিরাজ করছে দিল্লীতে...আজকের পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকেরাও বিস্ময়ে যার দিকে চেয়ে থাকেন, আজও তাতে পড়েনি এতটুকু মরচে।

ষষ্ঠ চিত্র

গঙ্গা আর যমুনার সঙ্গমে...প্রয়াগ-তীর্থ।

তীর্থের ঘাটে জনারণ্য...এতটুকু জায়গা খালি নেই। প্রয়াগের জলে স্নান সেরে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন করছেন মহা-দান-মহোৎসব-ব্রত পালন।

ভগ্নী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে বস্ত্র চেয়ে নিয়ে রাজপোষাকও বিতরণ করে দিলেন। [পৃ. ৩১

প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর এই প্রয়াগ-তীর্থে মুক্ত আকাশের তলায় হর্ষবর্দ্ধন করেন এই মহাদান-উৎসব।

এ বৎসর চীন থেকে এসেছেন বৌদ্ধ পর্য্যটক হুয়েন সাং। সম্রাট তাঁকে পাশে নিয়ে এসেছেন নদীর তীরে। বিদেশী রাষ্ট্রের বরেণ্য অতিথি। পরমাত্মীয় কারণ বুদ্ধ-শিষ্য।

পঁচাত্তর দিন ধরে হবে এই দানের উৎসব। প্রত্যেক পাঁচ বছর ধরে সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে যে অর্থ ও ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করেন, এই দান-উৎসবে তা নিঃশেষে দান করেন।

প্রথম দিন গঙ্গা-যমুনার তীরে সম্রাট ভগবান বুদ্ধের করলেন পূজা। দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিন করলেন শিব আর সূর্য্যদেবের পূজা।

চতুর্থ দিন তিনি সমাগত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান করলেন। হুয়েন সাং গণনা করে দেখলেন প্রায় দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দানে পরিতৃপ্ত হলো।

তারপর কুড়ি দিন ধরে চল্লো ব্রাহ্মণদের দান। তারপর দশদিন জৈন এবং অন্যান্য ধর্ম্মের লোকদের দান করলেন। তারপর দশ দিন ধরে চল্লো সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, সাধু-সন্তদের দান।

তারপর একমাস ধরে চল্লো, রাজ্যের অনাথ, আতুর, দরিদ্র-অসহায়দের দান, নিঃশেষে শেষ কর্পদ্দক পর্য্যন্ত।

তখন সম্রাট উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে দান করলেন তাঁর ব্যক্তিগত আভরণ ও আবরণ। যা কিছু স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মুক্তা ছিল, সব নিঃশেষিত হয়ে গেল। বাকি রইলো শুধু সম্রাটের পরণের রাজপোষাক। সর্ব্বশেষ দিন ভগ্নী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একটা বস্ত্র চেয়ে নিয়ে তাও বিতরণ করে দিলেন।

নিঃশেষে নিজেকে রিক্ত করে শরতের সুনীল মেঘের মত হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ সুন্দর।

সপ্তম চিত্র

সমস্ত দেশ ছেয়ে নেমেছে অন্ধকার। অজ্ঞানের অন্ধকার। সে অন্ধকারে সমস্ত ভারত হয়ে গিয়েছে বিচ্ছিন্ন, টুকরো-টুকরো।

এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ভাবে শত্রু। বৌদ্ধ-ভিক্ষু হিন্দুকে কুৎসিত ভাষায় নিন্দা করে, হিন্দু পুরোহিত কুৎসিত ভাষায় দেয় গালাগাল বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভুলে গিয়েছে ত্রিপিটক, হিন্দু পুরোহিতেরা ভুলে গিয়েছে শাস্ত্র। অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমস্ত দেশ এগিয়ে চলেছে অপমৃত্যুর দিকে। কারুর চোখে পড়ে না ভারতবর্ষের সমগ্র চেহারা, ভারতের সাধনার সমগ্র রূপ।

সেই মহাদেশব্যাপী ঘোর অন্ধকারে দেখি, একটি মশাল এগিয়ে চলেছে! বাইশ-তেইশ বছরের মুণ্ডিত-মস্তক এক সন্ন্যাসী পায়ে হেঁটে চলেছে, অরণ্য-পর্ব্বত-প্রান্তর পেরিয়ে ভারতবর্ষের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত। হাতে তার জ্ঞানের অনির্ব্বাণ আলো। একটি মানুষ, এই বিরাট মহাদেশের অন্ধকার ঘোচাবার ভার একা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছেন শঙ্করাচার্য্য।

সারা ভারতবর্ষ ঘুরে পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেন, তাঁদের পরাজিত করেন। যেসব শাস্ত্রের কথা তারা ভুলে গিয়েছিল, একা বসে সেইসব শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করেন। এগারোখানা উপনিষদকে নতুন করে ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরলেন, নতুন করে বেদের ভাষ্য রচনা করলেন, নতুন করে গীতার ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর জ্ঞানের আলোয় ভারত আলোকিত হয়ে উঠলো, তাঁর অপরূপ প্রার্থনায় ভক্তির মরাগাঙ্গে জোয়ার দেখা দিল। পায়ে হেঁটে তিনি ভারতের চার প্রান্তে তাঁর দিগ্বিজয়ের স্তম্ভস্বরূপ চারটি মন্দির রচনা করলেন, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমে সারদা মঠ, উত্তরে হিমালয়ে যোশী মঠ, পূর্ব্বে পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ। চারদিকে এই চারিটি মঠের খুঁটি দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভারতকে আবার এক করে গেঁথে গেলেন।

এই বিরাট কাজ শেষ করে যখন মহাপ্রয়াণ করলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ বছর।

অষ্টম চিত্র

দিল্লী শহরকে বিধ্বস্ত করে বাবর বিজয়ীরূপে প্রবেশ করলেন ভারতের ইতিহাসে। ভারতের ইতিহাসে সুরু হলো এক নতুন অধ্যায়।

দিল্লী-প্রবেশের দিন বাবরের সৈন্যরা লুটের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। বাবর আদেশ দিলেন, যদি কোন সৈন্য লুট করে, তখনি তার প্রাণদণ্ড হবে। বহুদিন থেকে বাবরের সৈন্যরা স্বদেশ ছেড়ে বাবরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। মধ্য-এশিয়ায় তাদের স্বদেশে ফিরে যাবার জন্যে তাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

বাবর প্রাসাদে প্রবেশ করতেই দেখেন, সামনের দেয়ালে একজন কবিতায় লিখে রেখেছে, হে সম্রাট, মনে কর তোমার স্বদেশের রৌদ্র-উজ্জ্বল প্রান্তর, তার চির-অভ্যস্ত জীবন, ভারতবর্ষের এই ভিজে হাওয়া ছেড়ে ফিরে চল সেখানে!

বাবর তৎক্ষণাৎ তার তলায় আর একটি কবিতা লিখলেন, স্বদেশের জন্যে যার মন ব্যাকুল হয়েছে, সে স্বদেশে ফিরে যাক। বাবর এই ভারতবর্ষ ছেড়ে আর কোথাও যাবে না, ভারতবর্ষকে সে তার নতুন স্বদেশ বলে গ্রহণ করলো।

"হরের্নামৈব কেবলম্!"

বাইরে থেকে ভারতবর্ষে কত না বিজয়ী এসেছেন, কেউ আর একথা বলেন নি...কেউ ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেন নি। তাই সেদিন বাবর ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করে ভারতের সভ্যতার ধারায় একটা নতুন মিশ্রণকে সত্য করে তুলেছিলেন। কাপড়ের টানা-পোড়েনের মতন তাই সেদিন থেকে ভারতের জমিতে হিন্দু আর মুসলমান এক হয়ে মিশে যায়।

নবম চিত্র

নবদ্বীপের পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে সুন্দরকান্তি এক তরুণ হাতে মশাল নিয়ে সিংহের মতন গর্জ্জন করে ওঠে, হরের্নামৈব কেবলম্!

কাজী নিষেধ করেছেন, নবদ্বীপে রাস্তায় কেউ হরিনাম করবে না। তাই তরুণ একা মশাল হাতে বেরিয়েছে, কাজীর এই শাসনের সে প্রতিবাদ করবে। একাই।

নবদ্বীপবাসীরা ঘরের ভেতর থেকে দেখে, তরুণ নিমাই পণ্ডিত সিংহ-বিক্রমে গর্জ্জন করতে করতে মশাল হাতে একা চলেছে। দেখতে দেখতে, একটি মশাল দুটি হয়, দুটি চারটি হয়, নিমাই যত এগিয়ে চলে, তত পেছনে বেড়ে ওঠে মশালধারীর সংখ্যা।

কাজী প্রাসাদ থেকে শুনলেন, বাইরে যেন সমুদ্রের গর্জ্জন হচ্ছে। বারাণ্ডায় এসে দেখেন, সামনে শত-সহস্র মশাল জ্বলছে। শত-সহস্র মশালের আলোয় তরঙ্গ-গর্জ্জনে উঠছে শত-সহস্র কণ্ঠ থেকে হরিনাম।

একটি মানুষের এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, শুধু নবদ্বীপের কাজীকে নয়, সমগ্র হিন্দু-সমাজকে সেদিন ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। জাতি-ভেদে জীর্ণ এবং প্রাচীন সমাজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে মহাবিপ্লবীর মতন তিনি জাতি-সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে মানুষকে ডাক দিয়ে গেলেন, মানুষের ভগবানের নামে। আচার আর অনুষ্ঠানের জঞ্জাল থেকে, শাস্ত্রের শুকনো বিতর্কের শত বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেলেন মানুষের মনকে।

দশম চিত্র

ভারতের শেষ প্রান্তের দিকে সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলে কালিকট শহরের বন্দরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে য়ুরোপের পর্ত্তুগাল্ থেকে একটি জাহাজ এসে থামলো।

জাহাজ থেকে নামলেন, জাহাজের অধিনায়ক ভাস্কো-দা-গামা। তাঁর পেছনে পর্ত্তুগালের পতাকাবাহী একদল সৈনিক।

যুগ যুগ ধরে য়ুরোপ চেষ্টা করছিল, সমুদ্র-তরঙ্গের ভেতর দিয়ে ভারতে আসবার পথ। ভাস্কো-দা-গামা কৃতকার্য্য হলেন।

সেই পথ দিয়ে য়ুরোপ এলো ভারতবর্ষের মাটিতে। জগতের ইতিহাসে, ভারতের ইতিহাসে সুরু হলো এক অভিনব অধ্যায়।

একাদশ চিত্র

তার প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলিকাতার বন্দর থেকে ফর্বস্ নামে একটা স্টীমার ছাড়ছে।

সেই স্টীমারে গিয়ে উঠলেন দীর্ঘকায় অপূর্ব্ব সুন্দর একজন বাঙালী। রাজা রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম বাঙালী, যিনি সমাজের নিষেধকে উপেক্ষা করে, ব্রাহ্মণদের শাসন তুচ্ছ করে, যুগ-যুগান্তের অচলায়তনকে ভেঙ্গে সমুদ্র-পথে ইংলণ্ডে পদার্পণ করলেন। য়ুরোপের অন্তরের কথা ভারতবর্ষে শোনালেন। ভারতবর্ষের অন্তরের কথা য়ুরোপকে জানালেন। য়ুরোপ আর ভারতবর্ষের মাঝখানে, মহা-যোজকের মত দাঁড়িয়ে আছেন রাজা রামমোহন রায়।

দ্বাদশ চিত্র

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে আকাশের দিকে দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে একজন লোক।

গভীর নিশুতি রাত্রি। আকাশে পূর্ণ-চাঁদ। পূর্ণ-চাঁদের আলো গঙ্গার তরঙ্গে শত-শত টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।

ধীরে ধীরে সেই লোকটি চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গার জলে নেমে আসে। দুহাত তুলে আকুলভাবে

ডাকে, ওরে, তোরা কোথায়? তোরা আয়, তোরা আয়, তোদের জন্যে অমৃতের পূর্ণকুম্ভ নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি! ওরে আয়!

প্রতিদিন রাত্রি নিশীথে গঙ্গার তীরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আকুলভাবে আহ্বান করেন তাঁর লীলার সঙ্গীদের। দুশ্চর কঠোর সাধনায় তিনি পেয়েছেন সর্ব্ব ভেদ-মুক্তির মন্ত্র। সমস্ত বিশ্বকে একসূত্রে গাঁথবার নব মানব-ধর্ম্ম। তাই তিনি আহ্বান করছেন তাঁদের, যাঁরা নিজেদের জীবনের সাধনায় সেই বিশ্বত্রাণ-মন্ত্রকে ছড়িয়ে দেবেন সারা বিশ্বে। তিনি জানেন, তাঁরা যেখানেই থাকেন, তাঁরা আসবেন। আকাশে-বাতাসে বাজে তাঁদের পদধ্বনি। তাঁরা আসবেন বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে, ভারতের অরণ্য পর্ব্বত পেরিয়ে, তাঁরা আসবেন য়ুরোপ থেকে, আসবেন আমেরিকা থেকে, সারা বিশ্ব থেকে এসে তাঁরা মিলিত হবেন দক্ষিণেশ্বরের এই মানব-তীর্থে।

পায়ে হেঁটে যাবে দূর দাণ্ডীর সমুদ্র-উপকূলে। [পৃঃ ৩৫

ত্রয়োদশ চিত্র

গঙ্গার তীরে লোকে লোকারণ্য। সেই অগণিত লোকের ভীড়ের ভেতর থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে, স্বর্ণ-কান্তি দীর্ঘকায় একজন লোক। দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ বাতাসে উড়ছে। চারদিক থেকে লোক এসে তাঁর হাতে রাখী বাঁধে, তিনিও তার উত্তরে অপরের হাতে রাখী বেঁধে দেন। দেখতে দেখতে সমস্ত লোক তাঁকে সামনে রেখে শহরের রাজপথে এসে দাঁড়ায়। গন্ধর্ব্ব-তুল্য তাঁর কণ্ঠ থেকে ওঠে গান,

আমার সোণার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি!

সমস্ত রাজপথ মুখরিত করে শত-সহস্র কণ্ঠে জেগে ওঠে মাতৃ-বন্দনা।

সেদিন ছিল বাংলায় রাখী-বন্ধনের দিন। রাখী-বন্ধনের মিছিলের পুরোধারূপে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজ বাংলাকে ছাড়িয়ে, ভারতকে ছাড়িয়ে, সারা বিশ্বে চেয়ে দেখি, রাখী হাতে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রাখী-বন্ধনের মহাকবি। পূর্ব্ব আর পশ্চিমের হাতে বাঁধা তাঁরই রাখী। একাল-

সেকাল, অস্ত-উদয়, আলো-আঁধার তাঁরই সুরের রাখীতে বাঁধা। সুদূর তারকা যে-রাখীতে বাঁধা তৃণফুলের সঙ্গে, যে-রাখীতে বাঁধা প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষ, সেই রাখী তিনি বেঁধে গিয়েছেন তাঁর অমর সাহিত্যে, বাংলা ভাষায়।

চতুর্দ্দশ চিত্র

এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ, হাতে লাঠি, পরণে ছোট্ট একটি কাপড়, যে-রকম ছোট কাপড় পরে ভারতের দরিদ্র চাষীরা, দীর্ঘ পা ফেলে একা এগিয়ে চলেছেন। খালি হাঁটুর ওপর সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে। হাঁটুটা যেন জ্বলছে!

শীর্ণকায় বৃদ্ধ একা পায়ে হেঁটে যাবে দূর দাণ্ডীর সমুদ্র-উপকূলে! সেখানে গিয়ে সমুদ্রের জল তুলে খানিকটা নুন তৈরী করবে, যেটুকু নুন হয়ত এক পয়সা খরচ করলেই বাড়ীর পাশের মুদীর দোকান থেকে কিনতে পাওয়া যায়।

বৃদ্ধের এই পরিকল্পনার কথা শুনে জগৎশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। ইংরেজ শাসকেরা ঠোঁট উল্‌টিয়ে হেসে বল্লেন, Crank...পাগল...

এই পাগল চল্লিশ কোটি লোকের স্বাধীনতা নিজের জীবন দিয়ে অর্জ্জন করে গেল। পিশাচ-মন্ত্রে দীক্ষিত পৃথিবীকে শিখিয়ে গেল মানব-অস্তিত্বের নব মর্য্যাদা।

পঞ্চদশ চিত্র

ভারতের পূর্ব্ব-সমুদ্রের তীরে সুবৃহৎ এক উপল-আসনে দেবাদিদেব মহাদেবের মতন বসে দিব্য-কান্তি এক পুরুষ-প্রবর। ভারতের বাণী-মূর্ত্তি। শ্রীঅরবিন্দ।

শূন্যে তাঁকে ঘিরে রয়েছেন, ব্যাস-বাল্মীকি, যাজ্ঞবল্ক্য-পতঞ্জলি, শঙ্কর-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ...

নীচে পিঁপড়ের সারের মতন চলেছে লোক। চলেছে নতুন পৃথিবীর দিকে, নব-চেতনার পথে।

সামনে পূর্ব্ব-সমুদ্রকে রক্তরাগে রঞ্জিত করে উঠছে সূর্য্য। দিব্য-চেতনার সূর্য্য।

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

[ছড়ার ছন্দে]

প্রবাল-দ্বীপে আজো সোনার খাটে শুয়ে
ঘুমোয় রাজার মেয়ে রূপোর কাঠি ছুঁয়ে।
নেইকো কোনো মানা নিদ্‌মহলের মাঝে,
স্বপন দেখে বালা—হাঁকিয়ে পক্ষিরাজে
আসছে রাজার ছেলে গলায় মুক্তোহার।
আকাশ-পথে তুলে আওয়াজ চমৎকার
ছুটছে ঘোড়া তার তারায় হেনে ক্ষুর—
নিম্নে তের নদী সপ্ত সমুদ্দুর।

আসছে রাজার ছেলে সোনার কাঠি হাতে
স্তব্ধ নিঝুম নিযুত কুহু-আঁধার রাতে।
গেছে শিকার-খোঁজে রাক্ষসেরা সবে,
ফিরবে যখন আলো ফুটবে কালো নভে।
রাজার মেয়ের পাশে নেইকো এখন কেউ
হাঁকছে ঝড়ো হাওয়া ডাকছে সাগর-ঢেউ।
তারি মাঝে যেন মিষ্টি বাঁশির সুর
আসছে রাজার ছেলে পেরিয়ে সমুদ্দুর।

দীঘির অতল তলে ফটিক-স্তম্ভ আছে
কৌটো তারি মাঝে তারি ভেতর বাঁচে
কালো ভ্রমর-বেশে রাক্ষসদের প্রাণ,
ঘুমায় রাজার মেয়ে কে দেবে সন্ধান ?
সোনার কাঠির ছোঁয়া রাজকন্যা জানে।
খবর তো সেই দেবে রাজকুমারের কানে
জাগবে যখন মেয়ে ঘুম হবে তার দূর—
আসছে রাজার ছেলে পেরিয়ে সমুদ্দুর।

জানে রাজার মেয়ে পক্ষিরাজে তুলে
সাত সমুদ্র তের নদীর কূলে কূলে
রাজার ছেলে তারে আনবে অবশেষে
অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া দেশে।
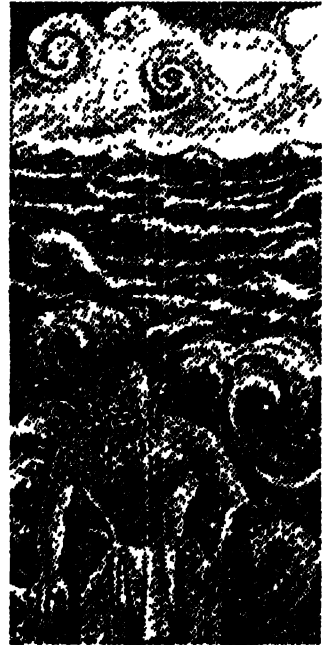
রুপোর-কাঠি-ছোঁয়া ঘুমের মাঝখানে
ঘোড়ার পায়ের ধ্বনি শুনছে মেয়ে কানে,
সেই আশাতেই তার স্বপন পরিপুর—
মিলিয়ে আসে ক্রমে সপ্ত সমুদ্দুর।

ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী বলছে আজো শোনো,
"এক ছিল রাজবালা, রাজার ছেলে কোনো।"
আমি কিন্তু জানি "ছিল" নয় তো—"আছে"
তোমার আমার সবার বুকের কাছে কাছে।
দেয়, দেখা দেয় তারা সন্ধ্যা যখন নামে
ঠাকুরমাকে ঘিরে ডাইনে এবং বামে
কেউ বা রাজার মেয়ে কেউ রাজপুত্তুর,
মধ্যে ব্যবধান সপ্ত সমুদ্দুর ॥
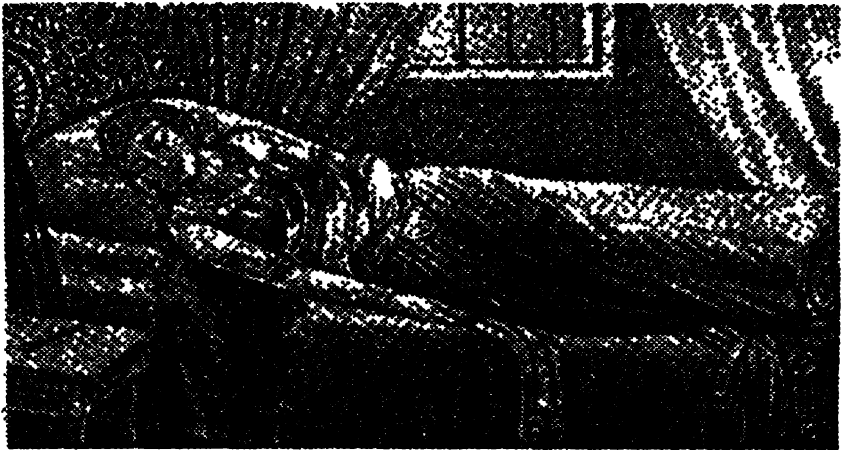
কিশোর রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হিমালয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ।

আকাশের দিকে তাকাও। পর্বতশিখরের স্বচ্ছ আকাশ। অম্লান অক্ষরে জ্বলছে কেমন তারাগুলো!

গ্রহ-তারার পরিচয় নাও। চলে এস জ্যোতিষ্কমণ্ডলে।

ছোট ছেলেকে নিজের হাতে শেখান দেবেন্দ্রনাথ। যে আকাশে রাজত্ব করছে রবি হয়ে তার খোঁজ নাও। সূর্যই তো গ্রহরাজ। আর 'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।'

আকাশের খোঁজ নেওয়া মানে বিকাশের খোঁজ নেওয়া। আকাশ দেখলেই মনে মনে সঙ্কল্প করবে আমিও প্রকাশিত হব। আলোকিত হব। অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকব না।

একেবারে একটা পাশের ঘরে শোয় রবীন্দ্রনাথ। প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি। কাচের জানলা দিয়ে শেষ রাত্রের পাহাড় দেখে। ভোর হয়নি, তারাগুলোও যাই-যাই করছে, সেই ধূসর আবছায়ার মধ্যে। পাহাড়ের চূড়ায় স্বপ্নপুরীর ঐশ্বর্যের মত বরফ জমে। অন্ধকারেই ঝলমল করে, ঝলমল করে।

সেই দুঃসহ শীতে উঠেছেন দেবেন্দ্রনাথ। গায়ে একখানি লাল রঙের শাল। হাতে মোমবাতি নিয়ে চলেছেন বারান্দায়। বাইরের বারান্দায়, কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চলেছেন নিঃশব্দে, কারু যেন না ঘুম ভাঙে। কোথায় চলেছেন উনি? বাতি দিয়ে কি করবেন?

বাতিটি নিবিয়ে দেবেন। বারান্দায় পৌঁছে বসবেন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। বসবেন উপাসনায়। ঈশ্বরের কাছে এসে বসার নামই উপাসনা।

চোখ চেয়ে চেয়ে সব দেখছে রবীন্দ্রনাথ। একদিকে উন্নতগম্ভীর হিমালয় আরেকদিকে প্রশান্ত-গম্ভীর পিতৃদেব। ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হবে শুধু আকাশে নয়, জীবনের উদার ও অগাধ অনুভবে। সূর্যোদয়ের জন্যে এই প্রতীক্ষা এই প্রস্তুতির নামই উপাসনা।

সমস্ত ছবিটি রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়। অমনি একটি নিঃশব্দ ও নিগূঢ় নিবেদনের

জন্যে মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

ভোর হলে ছেলেকে পাশে ডেকে নেন দেবেন্দ্রনাথ। ছেলের সঙ্গে আরেকবার উপাসনা করেন। উপনিষদের মন্ত্র পড়িয়ে শোনান।

উপনিষদের মন্ত্র পড়িয়ে শোনান।

যা কিছু দেখছ চোখের সামনে, যা কিছু বা দেখছ না, যা নড়ছে চলছে হচ্ছে সরে যাচ্ছে সবই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন। তিনি অণুর অণু, মহানের মহান্। তাঁর দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান, তাঁর প্রভাতেই সকলে প্রভান্বিত। তাঁর ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, উৎপত্তি-বিনাশ নেই, অপচয়-উপচয় নেই।

মুগ্ধের মত শোনে রবীন্দ্রনাথ। অর্থ সব বোঝে না কিন্তু ধ্বনিটি আনন্দময় লাগে। আনন্দময় লাগে সেই মন্ত্রমুখর নিস্তব্ধতা।

চারদিকে এত যে সব ধ্বনি, পাতার মর্মর, নদীর কলস্বন, ভ্রমরের গুঞ্জন, বিহঙ্গের কাকলী—কি এদের অর্থ? শুধু একটি আনন্দের বিজ্ঞাপন। জলে স্থলে আকাশে একজন আনন্দময় বিরাজ করছেন তারই স্বীকৃতি।

তাঁকে দেখ। তাঁকে অনুভব করো। কেই বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণচেষ্টা করত যদি আকাশে বাতাসে তিনি আনন্দময় হয়ে না থাকতেন।

হিমালয় থেকে ফিরে এসে সেণ্টজেবিয়ার্সে ভর্তি হল রবীন্দ্রনাথ। যদি এবার খোদ সাহেবি ইস্কুলে কিছু ফল হয়। মন যায় পড়াশোনায়।

সবাই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে। আক্ষেপ করছেন বড়দিদি, বড় হলে রবি একটা মানুষের মতো হবে এই সবাই আশা করেছিলাম। কিন্তু কি দুর্দৈব, সেই আশাই কিনা নষ্ট হল সমূলে।

তবু ইট-কাঠ-দেয়ালের ইস্কুল আকর্ষণ করতে পারল না। তার চেয়ে দেখি এই আরেক বিদ্যালয়। অমিত জীবন আর সৌন্দর্যের বিদ্যালয়। সেই ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। সেখানে শুধু একজন শিক্ষক।

শুধু শিক্ষক নন, সখা। সমবয়সী। সব সময়ে সমবয়সী।

সেন্টজেবিয়ার্সে একটি মহৎ হৃদয়ের স্পর্শ পেল রবীন্দ্রনাথ। সাময়িকভাবে বদলি খাটতে এসেছে এক অধ্যাপক, নাম ডি পেনেরাণ্ডা, স্পেন দেশে বাড়ি। স্পেন দেশে বাড়ি বলে ইংরিজি উচ্চারণে একটু বাধো-বাধো। সেই কারণে ছেলেরা বিশেষ শান্ত থাকে না ক্লাশে। যেটুকু সম্ভ্রম তাঁর শিক্ষক হিসাবে প্রাপ্য তার চেয়ে যেন কম পান। মুখখানি বিমর্ষ হয়ে থাকে। তার জন্যে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবা দূরের কথা, কারুর কাছে নালিশ পর্যন্ত করেন না। নম্র হয়ে সহ্য করেন প্রতিদিনের অপ্রসাদ। যেন আশা করেন কেউ একদিন বুঝবে তাঁর গ্লানিহীন ম্লানিমাকে।

"তোমার কি শরীর ভালো নেই?"

মুখশ্রী সুন্দর নয় কিন্তু বেদনার ি
একটি লাবণ্য ঢেলে দিয়েছে। সেই
রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে। মনে হয়
উপাসনা করতে দেখেছে হিমালয়ে, সেই
নিবিড় করে আঁকা তার চোখ দুটিতে। অ
বিশ্বাস আর সমর্পণের স্তব্ধতা। অন্তরে
মহৎ হয় আননের শ্রীটিও পবিত্র হয়ে

কি একটা লিখতে দিয়েছেন ছে
নিজে ঘুরে ঘুরে দেখছেন কে কি রকম লি
একদম কলম চলছে না রবীন্দ্রনাথের। মা
করে কলম হাতে কি সব ভাবছে সে এলো
কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন পেনেরাণ্ডা। লিখছে না বলে কোথায় ধমক দেবেন, তা নয়, পিঠের উপর হাত রেখেছেন সস্নেহে। নুয়ে পড়ে জিগগেস করছেন মধুরস্বরে, তোমার কি শরীর ভালো নেই?

ছোট্ট একটি কথা, কিন্তু যেন সুধা-সমুদ্রের ঢেউ। মন বড় হলেই যেন হাত ও হাতের সঙ্গে হাতের স্পর্শ অত বড় হয়। নতভঙ্গির প্রীতিস্পর্শটিই ঈশ্বরস্পর্শ।

তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স, প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল রবীন্দ্রনাথের। হঠাৎ শেষ রাত্রে বাড়ির পুরোনো দাসী আর্তনাদ করে উঠল। ঘুম ছেড়ে উঠে বসল রবীন্দ্রনাথ, তবে কি মা আর নেই? অনেকদিন ধরে ভুগছেন, আছেন অন্তঃপুরের তেতলায়। বোটে করে গঙ্গায় ছিলেন কিছুকাল, বিশেষ উপকার হয়নি। তবে আজ কি সব শেষ হয়ে গেল? তবে আর কান্নাকাটি

নেই কেন? দাসীর মুখ কে চাপা দিলে?

মিট্‌মিটে বাতির আলোয় স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না রবীন্দ্রনাথ।

সকাল হলে বুঝল। শুনল মা মারা গেছেন।

কাকে বলে মৃত্যু, সে যেন কী ঘোরদন্ত মহাকায়, কী অসহ্দর্শন ভয়ঙ্কর, বিষণ্ণ হল রবীন্দ্রনাথ। কি করে তাকাবে তার মার দিকে? দাঁড়াতে পারবে তো কাছে গিয়ে?

বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়ে শুনিয়েছে।

আহা, ঐ দেখ, বাইরে উঠোনে মাকে আনা হয়েছে, শুয়ে আছেন খাটের উপর। ভোরের আলোটি ঈশ্বরের ভালোবাসার মত গায়ে এসে পড়েছে। এই মৃত্যু? এ তো শান্তি, এ তো সুখসুপ্তি। এ তো ক্ষমার মত স্নিগ্ধ, মার্জনার মত মনোহর।

কোনো কিছু একটা নিশ্চিহ্ন হয়ে উচ্ছিন্ন হয়ে গেল এ তার ছবি নয়। একটা কক্ষ ছেড়ে চলেছে আরেক কক্ষে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে সেই চিরযাত্রার ছবি।

এই সেদিনও মাকে বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়ে শুনিয়েছে। কৃত্তিবাসের চলতি বাংলা রামায়ণ নয়, অনুষ্টুভ ছন্দের সংস্কৃত রামায়ণ। হিমালয়ের আশ্রয়ে এনে দেবেন্দ্রনাথ ছেলেকে দিয়েছেন সেই মহাকবির উদার স্পর্শ। গায়ত্রী-গীতা-উপনিষদের পর এই বাল্মীকির রামায়ণ। মা কত খুশি হয়েছেন। সন্তানগর্বের সুখ এক বস্ত্রাঞ্চলে ধরেনি। লোক ডেকে এনে বিতরণ করেছেন অকাতরে। দেখ, দেখ, কোথা থেকে আমার রবি তার দীক্ষা নিয়ে এসেছে, কোন্ উদয়তীর্থের উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া থেকে।

সেই মা কি আর কথা কইবেন না? এই যে চুপ করে আছেন এ কি আরেক-রকম কথা কওয়া নয়? এই যাকে শেষ বলছি এই কি অশেষ নয়? অন্তই কি নয় অনন্তের দুয়ার?

অশ্রুধৌত মুখে রবীন্দ্রনাথ ফিরল শ্মশান থেকে। গলির মোড়ে এসে তেতলায় বাবার ঘরের

দিকে দৃষ্টি পড়ল। বেলা অনেক হয়েছে তবু বাবা ওঠেননি আসন থেকে। উপাসনায় বিনিশ্চল হয়ে আছেন।

শোকের সরোবরে ফুটে উঠেছে একটি সান্ত্বনার শতদল। বেদনা বিশ্রাম পেয়েছে নিবেদনে। সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপ নিবৃত্তি পেয়েছে স্বীকৃতিতে, শরণাগতিতে।

মা আগে সীমাবদ্ধ ছিলেন এখন পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। তাঁর আঙুলের আগায় যে সুন্দর স্পর্শটি ছিল তাই এখন চলে এসেছে ফুলের পাপড়িতে, তাঁর চোখে ছিল যে কোমল আশীর্বাদ তাই এখন ফুটে রয়েছে তারার বিন্দুতে, শিশিরবিন্দুতে, তাঁর অঙ্গভরা যে ভালোবাসা তাই এখন ছড়িয়ে রয়েছে দিনের আলোয় রাতের অন্ধকারে।

কবিতা লিখে ফেলল রবীন্দ্রনাথ। সেই যে হিমালয় দেখে এসেছিল তার কবিতা :

হিমাদ্রিশিখরে শিলাসনপরি
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়।

খুব একটা উঁচু সুরে তার বেঁধে নিল। কবিনেত্র উন্মোচন করেই দেখল প্রথম হিমাদ্রিশিখরকে আর মহাকবি ব্যাসকে। যেন প্রথম দৃষ্টিপাতেই সমীচীন দিগ্‌দর্শন হল। ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমুক্ত জাগরণের জন্যেই সেই কবিতা—প্রথম কবিতা ঠিক-ঠিক দেখল সেই ভারতবর্ষের চেহারা। তার পরিবেশ, তার পটভূমি। ব্যাস আর হিমালয়।

প্রথম কবিতার বই 'বনফুল'। যে বনের ছবি আঁকল রবীন্দ্রনাথ সেটিও হিমালয়ের পদমূলে।

প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ।
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান।
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান।।

তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে। একবার তাকালো অনেক উঁচুতে, অভ্রস্পর্শী চূড়ার দিকে, আরেকবার তাকালো অনেক দূরে, অভ্রস্পর্শী দিগন্তরেখায়। উঁচু আর দূর, দূর আর উঁচু, বৃহৎ আর মহৎ, মহৎ আর বৃহৎ—তুমি ভারতবর্ষের কবি, তুমি অমিতবর্ষ বসুন্ধরার কবি।

উচ্চ হতে উচ্চ গিরি
জলদে মস্তক ঘিরি'
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন।

দেবতার সিংহাসনটি দেখ। কোথায় সেই সিংহাসন? আর কোথায়! তোমারই মনের মধ্যে। সেখানে সোনা কোথায়? কোথায় মণিমাণিক্য? ভালোবাসাই সোনা, অশ্রুকণাই মণিমাণিক্য।

সেদিন একলা বসে আপনমনে গান গাইছিলাম। জলে-স্থলে শুনছিল কে কান পেতে বুঝিনি। হঠাৎ চেয়ে দেখি, হে মহারাজ, তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসেছ। নেমে এসেছ আমারই দীনহীন ঘরের দুয়ারে। নির্জন দেখেই আসতে সাহস পেলে। আর কোনো সুর তোমার কানে যায় না, শুধু কান্নার সুরটুকুই তোমার কানে যায়। কী বিরাট তোমার সভা, কত তাতে জ্ঞানী-গুণী, তবু এই গুণহীনের গান

তোমার কানে গেল। তুমি তোমার দুটি বাহুর বরণমালা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে। কত গান তুমি শুনছ দিন-রাত, কিন্তু তোমাকে ভালোবেসে তোমার জন্যে কেউ কাঁদছে এমন গান তুমি আর কোথাও শোনোনি। শুনলে, আর অমনি ফেলে এলে সিংহাসন, মহারাজ ছিলে, ভিখিরি হয়ে গেলে।

ষোল বছর বয়স, 'কবিকাহিনী' লিখল রবীন্দ্রনাথ। লিখতে-লিখতে বিশাল এক রাজত্বের মধ্যে চলে এল। অন্তহীন দিগন্তহীন মহাদেশ। তার নাম কি? তার নাম মানব-হৃদয়।

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন
গম্ভীর সে নিশীথিনী সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি সমুচ্চ সে গিরিবর
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল
পারেনা পূরিতে তারা বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন॥

মানুষের মনের মতন বড় আর কি আছে? কত বড় পৃথিবী, তার চেয়ে কত বড় সমুদ্র, তার চেয়ে আরো কত বড় আকাশ। ঈশ্বর সকলের চেয়ে বড়। সেই ঈশ্বর মানুষের মনের মধ্যে।

কিন্তু মৃত্যুর পরে কি আর কিছুই নেই? কিছুই থাকবে না?

কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল আবার গেল মিশায়ে তাহাতে?
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সাথে
মুহূর্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?

বড়ো হয়ে মাকে একদিন স্বপ্ন দেখলেন রবীন্দ্রনাথ। দেখলেন তিনি যেন সেই ছোট বালক আর মা যেমন থাকেন বাড়িতে তেমনি আছেন। আছেন তো আছেন, সব সময়েই তো তা নিয়ে সচেতন থাকা চলে না ব্যস্ততার সংসারে। তাই যেমন আগে মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে চলে যেত, তেমনি উদাসীন ভাবে চলে গেল রবীন্দ্রনাথ। বারান্দায় গিয়ে হঠাৎ মনে হল, ও কি, ঘরের মধ্যে ঐ মা বসে আছেন না? তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে। মা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরলেন, কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি এসেছ?

যদি মায়ের ঐ স্পর্শটি পেতে চাও, ঐ স্বরটি শুনতে চাও, ছুটে যাও মায়ের কাছে। তাঁর পায়ের ধুলো মেখে তোমার ললাট নির্মল করো।

সংসারে মা বিরাজ করছেন সর্বময়ী কর্ত্রীর মত। যদি তাঁর কাছে তুমি না-ও যাও তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না, তাঁর সেবাস্নেহ অকৃপণই থাকবে। তুমি অবাধ্য হও অযোগ্য হও, কিছু এসে যাবে না— তাঁর ভাণ্ডার অখণ্ড। তেমনি ঐ মায়ের মতই ঈশ্বর। তাঁকে না মানো না জানো, ভুলেও একবার তাঁর দিকে না তাকাও, তোমাকে তিনি তাই বলে ঠকাবেন না, ফেলে দেবেন না। অন্নজল তোমাকে ঠিকই পরিবেশন করবেন, ধনেজনে ঠিকই পরিপূর্ণ রাখবেন তোমাকে। কিন্তু তা দিয়েই কি তোমার মন ভরবে? তোমার মন কেঁদে-কেঁদে উঠবে, সেই স্বরটি কোথায়, সেই স্পর্শটি কোথায়? মা রয়েছেন বসে, তুমি

তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছ, পেলে না তাঁর হাতের ছোঁয়া, শুনলে না তাঁর গলার স্বর, তোমার মত অসম্পূর্ণ আর কে আছে?

তাই বঞ্চিত কোরো না নিজেকে। মায়ের ঘরের পাশ কাটিয়ে চলে যেও না। ছুটে এসে মায়ের পায়ের কাছটিতে এসে পৌঁছোও। মাকে ধরো। নাও তাঁর স্পর্শের অমিয়। শোনো তাঁর কণ্ঠের মাধুরী।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদের জজ। থাকেন শাহীবাগে, বাদশাহি আমলের প্রাসাদে। নিচে দিয়ে ক্ষীণকায়া সাবরমতী নদী বালির বিছানায় শুয়ে আছে। প্রকাণ্ড অফুরন্ত বাড়ি, দুপুরের নির্জনে একা-একা ঘুরে বেড়ায় রবীন্দ্রনাথ আর ভরা গলার কপোতকূজন শোনে। কত বই কত ছবি, কত সব রহস্যপুরীর ছোট-ছোট বাতায়ন। সব ফেলে সংস্কৃত বইগুলি নিয়ে বসে। সাধ্য নেই মানে বোঝে। কিন্তু সবই তো বোঝবার জন্যে নয়, কিছু-কিছু আবার বাজবার জন্যে। সংস্কৃত কথার ধ্বনি আর ছন্দ তন্ময় করে রাখে। যেন মৃদঙ্গে গম্ভীর ঘা পড়ছে আর তালে-তালে মনেও উঠছে সেই বাজনার ঢেউ। যার ধ্বনি এত সুন্দর তার অর্থ যেন কত গভীর!

মা বিরাজ করছেন সর্বময়ী কর্ত্রীর মত। [পৃঃ ৪৪

তেতলার ছোট ঘরে রাত্রে শোয় রবীন্দ্রনাথ। শোয় আর কখন, ঘরের সামনেকার প্রকাণ্ড ছাদে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। উপরে জ্যোৎস্নাঢালা পারহারা আকাশ আর সামনে বালির প্রান্তর, তার গা ঘেঁসে সুদূরের সঙ্কেতময়ী সাবরমতী—হঠাৎ একরাত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে গান চলে এল ভাসতে-ভাসতে।

যেন এক মুক্ত গগনের পাখি! মুক্ত পবনের সুগন্ধ!

ছুটি, ছুটি, গুহাগৃহ থেকে নির্ঝরিণী ছুটি পেয়েছে। মৃত্তিকার গৃহ থেকে মুক্তি পেয়েছে সহজ তৃণাঙ্কুর।

কথা এল। নিজেই সুর দিল গুনগুন করে। গেয়ে উঠল তারপর।

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো।
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।

রহস্যময়ী রাত্রি কথা কইছে তার আকাশ-মৃত্তিকাব্যাপী অব্যাহত স্তব্ধতায়। সে কথাটি শোনো কান পেতে। তারপর নিজের স্তব্ধতার সুরটি সেই কথার সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যখন রাত্রির অন্তরের কথাটির সঙ্গে তোমার অন্তরের কথাটি যুক্ত হবে—একটি সম্মিলিত স্তব্ধতা—তখন, তখনই তার নাম হবে উপাসনা।

তুমিই আমার গভীর-গোপন, তুমিই আমার পরম-আপন। তুমি এই নিশীথরাত্রে যে শান্তির বাণীটি মেলে দিয়েছ তাই আমি আমার জীবনে গেঁথে নেব। যে দীপ জ্বেলেছ এই নক্ষত্রদ্যুতিতে তাই আমারও অন্তরের অন্ধকার আকাশে জ্বলবে অনির্বাণ। সহস্র-চক্ষু তুমি, ঐ নক্ষত্রদ্যুতি তোমারই নয়নদ্যুতি। অম্বরেও যেমন অন্তরেও তেমনি।

তর্কে বহু দূর

সচল বিশ্বনাথ

কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন, বিরাট দেহ উলঙ্গ মহাপুরুষ...ত্রৈলঙ্গ স্বামী। হঠাৎ আকাশ কালো করে এলো ঝড়, সঙ্গে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে ঝড় প্রলয়ের মূর্তি ধরলো। বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। স্বামীজির একজন শিষ্য সেই ঝড়ের মধ্যে ছুটে এসে দেখে, স্বামীজি নির্বিকার একা বসে আছেন গঙ্গার তীরে। কাতরভাবে পায়ে পড়ে শিষ্য বলে, বাবা, চলুন এখান থেকে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেন, আমার এখান থেকে গেলে চলবে না। কেন? তখন স্বামীজি গঙ্গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, দেখছো, একটা নৌকো ডুবছে? শিষ্য অন্ধকারে কিছুই দেখতে পায় না। সামনে চেয়ে দেখে, স্বামীজিও নেই। কিছুক্ষণ পরে দেখে, স্বামীজি গঙ্গার জল থেকে উঠে আসছেন আর তাঁর পেছনে যাত্রী-ভরা একটা নৌকো ; নৌকোর যাত্রীরা তীরে উঠে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কেঁদে বলে, বাবা, তুমি সচল বিশ্বনাথ।

নতুন খাবার

—কাজী নজরুল ইসলাম

কম্বলের অম্বল
        কেরোসিনের চাট্‌নি,
চামচের আমচুর—
        খাইছ নি নাৎনি?
আমড়া—দামড়ার
        কান দিয়ে ঘ'সে নাও,
চাম্‌ড়ার বাটীতে
        চট্‌কিয়ে ক'সে খাও!
শেয়ালের ন্যাজ
গোটা-দুই পঁ্যাজ
        বেশ ক'রে ভিজিয়ে,
ঘুট্‌ ক'রে খেয়ে ফেল!
মুখে কোন্‌ কথা এল?
        "কি মজার চীজ্‌ই এ!"

ঝুম্‌কো লতার পাতা
লাল পুতুলের মাথা
বেঁধে কারো টিকিতে,
ঢেঁকিতে বেশ ক'রে
পাড় দিয়ে তার পরে
খেয়ো মেখে 'সিকি'তে!
দাদার গায়ে কাদা
সাথে ছেঁচা আদা
খুব ক'সে মাখিয়ে,
বেরালীর নাকে
কিম্বা কারু টাকে—
খেয়ো দেখি
নেচি ক'রে পাকিয়ে!

তর্কে বহু দূর

কারাকক্ষে নারায়ণ

আলীপুরে জেলের কারাকক্ষে মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় বসে আছেন এক বিপ্লবী নেতা। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। আদালতে বিচাব হচ্ছে। কিন্তু বন্দীর মুখে কোন চাঞ্চল্য নেই। সেই বায়ুহীন আলোহীন সেলে বন্দী ধ্যানস্থ। হঠাৎ সেই কারাকক্ষ আলোকিত হয়ে উঠলো। বন্দী চোখ চেয়ে দেখেন, সামনে যে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার বদলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বংশী মুখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ...সামনের উঠোনে যে শুকনো গাছটা ছিল, সেটা সবুজ পাতায় আর ফুলে ভরে উঠেছে...তার তলা দিয়ে বন্দী দেখেন, রাখাল বালকেরা চলেছে গরু নিয়ে গোচারণে। একদা যিনি জন্মেছিলেন কারাকক্ষে, ভক্তের আহ্বানে সেই কারাকক্ষেই তিনি তাঁকে দর্শন দিলেন। আলীপুরের কারাকক্ষেই যোগিবর শ্রীঅরবিন্দ ভগবান বাসুদেবের দর্শন পেলেন।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

গৌর ছুটতে ছুটতে এসে যে খবরটি দিলে তাতে আমাদের চক্ষু একেবারে চড়ক গাছ।

"ঘনাদা আবার বুঝি মেস্ ছেড়ে যায়!"

"আবার?!?!"

"কি হল কি?!"

ছুটির দিন দুপুর বেলায় বসবার ঘরের মেঝেয় সবে তখন সতরঞ্চটা পেতে তাসজোড়া নিয়ে বসেছি। হঠাৎ এ-সংবাদে যেন যুদ্ধের সময়কার সাইরেনের আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

প্রথম চোটটা গৌরের ওপরই গিয়ে পড়ল। শিশির ত' মারমূর্ত্তি হয়ে বললে—"তুই—তুই—নিশ্চয়—তুই-ই সব নষ্টের মূল।"

"আহা আমি মূল হতে যাব কেন?"

—গৌর নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল—"সব নষ্টের মূলে ওই ফুটো!"

"ফুটো!!"

"হ্যাঁ দেখবেই চল না।"

আর দুবার বলবার দরকার হ'ল না। গৌরের পিছু পিছু সবাই ঘনাদার তেতালার ঘরে গিয়ে উঠলাম।

উঠেই বুঝলাম ব্যাপারটা গুরুতর।

আমাদের এতজনকে এমন হুড় মুড় করে তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখেও ঘনাদার কোন ভাবান্তর নেই।

তিনি গম্ভীর মুখে তাঁর জিনিষপত্র গোছানোয় তন্ময়।

জিনিষপত্র বলতে সাধের গড়গড়াটি বাদে একটি ছোট কম্বল জড়ানো বিছানা ও একটি পুরানো রঙচটা ঢাউস তোরঙ্গ।

এই তোরঙ্গটি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহলের বস্তু। তার ভিতর কি যে আছে আর কি যে নেই, এ নিয়ে বহুদিন আমাদের অনেক গবেষণা তর্কাতর্কি হয়ে গেছে।

কারুর সামনে কোনদিন এ তোরঙ্গ খুলতে ঘনাদাকে দেখা যায় নি। নিন্দুকেরা তাই এমন কথাও বলে থাকে যে তোরঙ্গটি ঘনাদার গল্পেরই চাক্ষুষ রূপ। ওর ভেতর থেকে ঘনাদা না বার করতে পারেন এমন জিনিষ নেই কিন্তু আসলে ওটি একেবারে ফাঁকা।

আমাদের দেখে আজকেও ঘনাদা সশব্দে তোরঙ্গের ডালাটি বন্ধ করে দিতে ভোলেন না, তারপর তাঁর সেই কম্বল জড়ানো বিছানা নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন যেন সাত রাজ্যের ধন তার মধ্যে তিনি জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

শিশির সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে,...

"ব্যাপার কি ঘনাদা? এত বাঁধা-বাঁধি কিসের?" —আমাদের জিজ্ঞাসা করতেই হয়।

ঘনাদা এতক্ষণে যেন আমাদের দেখতে পান। বিছানা বাঁধা থামিয়ে একটু দুঃখের হাসি হেসে বলেন,—"আর কেন? এখানে থাকা'ত আর চলল না!"

"কেন ঘনাদা!"

"কি হল কি?"

আমাদের প্রশ্ন ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতর হয়ে ওঠে। শিবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"কালকের মাংসের চপ্‌টা কি সুবিধের হয়নি?"

গৌর তাতে রসান দিয়ে বলে,—"আজ ত আবার গঙ্গার ইলিশ এসেছে।"

শিশির সাগ্রহে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে,—"ভাতে, না কাঁচা ঝোল কোন্‌টা আপনার পছন্দ?"

কিন্তু ভবী আজ কিছুতেই ভোলবার নয়। গঙ্গার ইলিশের নামেও ঘনাদাকে টলান যায় না। শিশিরের সিগারেটের টিনের দিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না করে তিনি ক্লান্তভাবে বলেন, "আমার পছন্দে কি যায়-আসে আর। আমি ত আর থাকছি না।"

"থাকছেন না! কেন বলুন ত! ওয়াশিংটন কি লণ্ডন থেকে জরুরী ডাক এল নাকি?" —এই সঙ্কটকালেও শিবুর মুখ ফস্‌কে রসিকতাটা বোধ হয় বেরিয়ে যায়। আমরা কিন্তু শিবুর ওপর ক্ষেপে যাই।

"কি পেয়েছিস কি ঘনাদাকে! হেট্ করে ডাকলেই অমনি উনি চলে যাবেন? সে ইডেন কি ডালেস্ হলে যেত! বলে কতদিন সাধ্যসাধনা করেও ওঁকে নিয়ে যাওয়া যায় না! না, না, সত্যি কি ব্যাপার বলুন ত ঘনাদা!"

ঘনাদা কেন বলা যায় না, একটু যেন প্রসন্ন হয়েছেন মনে হয়। বিছানা বাঁধার যে দড়িগাছটা এতক্ষণ ধরে নানাভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন সেটা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলেন,—"কেন, সত্যি জানতে চাও?"

"চাই বই কি!"—আমরা সমস্বরে আগ্রহ জানাই।

উঠে দাঁড়িয়ে যেন কোন দারুণ রহস্য উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছেন এই ভাবে ঘনাদা আমাদের ইসারায় ঘরের একটা দেয়ালের কাছে নিয়ে যান। তারপর হঠাৎ নাটকীয় ভাবে একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলেন,—"দেখো!"

গৌরের কাছে ব্যাপারটা আগে একটু জেনে তৈরী থাকলেও আমরা প্রথমটা একটু হতভম্বই হয়ে যাই।

ঘনাদার আজকাল দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে না কি? শাদা দেওয়ালে স্বপ্ন দেখছেন! তারপর অবশ্য ব্যাপারটা চোখে পড়ে।

মেঝে থেকে দেওয়াল যেখানে উঠেছে, সেখানে একটি কোণে একটি পেন্‌সিল গলাবার মত ছোট একটা ফুটো!

আমরা অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করি, কিন্তু ঘনাদা যেন সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছেন এমনি ভাবে বলেন,—"এই ফাটা ফুটো ঘরে মানুষ বাস করতে পারে!"

এক আঙুল একটা ফুটোয় ঘরটা কেন মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে বুঝতে তখন আর আমাদের বাকি নেই।

অপরাধটা আমাদের সবাইকার। নিচের কলতলাটা অনেকদিন থেকেই ভেঙে চুরে গেছল। বাড়িওয়ালাকে অনেক ধরে-টরে দিন কয়েক আগে আমরা সে জায়গাটা নতুন সিমেণ্ট দিয়ে মেবামতের ব্যবস্থা করেছি।

কলতলা মেরামত দেখেই ঘনাদা আব্দার ধরেছিলেন, কলতলাব সঙ্গে তাঁর ঘরটাও একবার মেরামত চূণকাম করে দিতে হবে।

আবদারটা অন্যায়। আমরা ঘনাদাকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কলতলা সারাচ্ছে বলেই হঠাৎ সমস্ত বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তেতলার একটা কুঠুরি মেরামত করতে বাড়িওয়ালা রাজি হবে কেন? তাছাড়া সেটা কি ভালো দেখাবে! কিছুদিন বাদেই সমস্ত বাড়িটা চূণকামের সময় তাঁর ঘরটার যা করবার করা হবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ঘনাদা সেদিন থেকে গুম্ হয়ে যা চেপে রেখেছিলেন, আজ এই ফুটো দিয়েই তা ফাটবার উপক্রম।

অবস্থা সঙ্গীন বুঝে আমাদের বাধ্য হয়েই চাল পাল্টাতে হয়।

রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বলি,—"আপনার ঘরের এ অবস্থা হয়েছে তাত' জানতাম না।"

গৌর সায় দিয়ে বলে,—"না, এ ঘর এখুনি মেরামতের ব্যবস্থা করা দরকার।"

"বাড়িওয়ালা যদি রাজি না হয়, আমরা চাঁদা তুলেই আপনার ঘর মেরামত করে দেব!"—শিশির দরাজ হয়ে ওঠে দরদে।

আগুনে জল পড়ে ঘনাদা যখন প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছেন তখন শিবুর একটি বেফাঁস কথায় আবার সব বুঝি মাটি হয়ে যায়।

"সত্যি! ফুটো বলে ফুটো!"—শিবু হঠাৎ ফোড়ন দিয়ে বসে—"ও ফুটো দিয়ে ঘনাদা কোন দিন গলে যান নি, এই আমাদের ভাগ্যি!"

ঘনাদা শিবুর দিকে ঘাড় ফেরান। সেই ঘাড় ফেরাবার ধরণ আর তাঁর মুখে আষাঢ়ের মেঘের মত ছায়া দেখেই আমরা সামলাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি।

কিন্তু সামলাব কি? হাসি চাপতে প্রায় দম ফাটার যোগাড়!

সব হাসির বেগ কিন্তু একটি কথায় ঠাণ্ডা।

"কি ফুটো জীবনে দেখেছ হে!"—ঘনাদার গলা নয় ত যেন মেঘের ডাক শোনা যায়।

আর মেঘের ডাকে চাতকের মত সব হাসি-ঠাট্টা ভুলে আমরা উৎসুক হয়ে উঠি।

"আপনি কি ফুটো দেখেছেন ঘনাদা?"

"পড়েছেন নাকি কখনো গলে!"

"হ্যাঁ পড়েছি!" ঘনাদা গম্ভীর মুখে আবার তাঁর বিছানায় এসে বসে বলেন, "পড়েছি চার কোটি মাইল!"

"চার কোটি মাইল একটা ফুটো!" —শিশির প্রায় উল্টে পড়ে যায় আর কি!

"পৃথিবীটা এফোঁড় ওফোঁড় করলেও ত আট হাজার মাইলের বেশী হয় না।"—গৌর হতভম্ব হয়ে নিবেদন করে।

"না তা হয় না"—নির্ব্বিকার ভাবে ঘনাদা জানান।

"তবে...?" বলার আগেই যে যেখানে পারি আমরা বসে পড়ি। ঘনাদা সুরু করেন...

"প্যারাসুটটা আর যেন খুলতেই চায় না। বিশ হাজার থেকে দশ হাজার ফুট, দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার। পাঁচ থেকে আড়াই, আড়াই থেকে এক হাজার ফুট! তখনো ঠিক যেন ইটের বস্তার মত পড়ছি ত পড়ছি-ই!

নিচের তুষার ঢাকা পৃথিবী বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ছুটে আসছে দেখতে পাচ্ছি। আর ক'টা সেকেণ্ড! তারপর বুঝি শরীরের গুঁড়োগুলোও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ঠিক পাঁচ শ ফুটের কাছে আসলটা না হলেও, এ রকম বিপদের জন্যে উপরি যে ছোট প্যারাসুটটা সঙ্গে থাকে সেটা খুলে গেল ভাগ্যক্রমে। কিন্তু তাতে কি আর পুরোপুরি সামলান যায়? ইটের বস্তার মত না হোক, বেশ সজোরেই নিচে গিয়ে পড়লাম।

কি ভাগ্যি শীতের শেষে তুষার একটু নরম হতে আরম্ভ করেছে। চোট্‌টা তাই তেমন বেশী হল না।

প্যারাসুট গুটিয়ে নিয়ে তারপর গা থেকে খুলে অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলাম। ধূ-ধূ করা তুষার ঢাকা তুন্দ্রা দিগন্ত পর্য্যন্ত বিছোন! কিন্তু মিখায়েলের দেখা নেই কেন?

প্যারাসুট নিয়ে সে ত আমার আগেই ঝাঁপ দিয়েছে প্লেন থেকে। এমন কিছু দূরে'ত সে নামতে

পারে না যে চোখেই দেখা যাবে না।

পর মুহূর্তেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মিখায়েলকে এখনো মাটির ওপর দেখব কি করে? এখনো সে'ত শূন্যলোকে।

প্যারাসুট না খোলার দরুণ আমি যেখানে বিদ্যুৎবেগে কয়েক মুহূর্তে নেমেছি সেখানে তার খোলা প্যারাসুট ধীরে সুস্থে ভাসতে ভাসতে এখনো নিশ্চয় নামছে।

আকাশে তাকিয়ে তার প্যারাসুটটা এবার দেখতে পেলাম। মিনিট খানেকের মধ্যে শ'খানেক গজ দূরে সে নামল।

প্যারাসুট ও সঙ্গের যৎসামান্য লট-বহর গুছিয়ে নিয়ে দূরবীণ দিয়ে চারিধার আর একবার ভালো করে দেখে অবাক হয়ে বল্লাম,—"কই হে, মেরুর একটা শেয়ালও ত দেখতে পাচ্ছি না। তোমার ডাঃ মিনোস্কি এই মহাশ্মশানে কোথায় লুকিয়ে থাকবেন?"

"আছেন নিশ্চয়ই কোথাও এখানে। এবং আমাদের তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

"আহা সে কথা ত অনেকবারই শুনিয়েছ। কিন্তু জায়গাটা ভুল করোনি ত? এই চেল্যুস্কিন অন্তরীপ হল উত্তর মেরুর দিকে রাশিয়ার শেষ স্থলবিন্দু। তার পর শুধু অনন্ত মেরু-সমুদ্র। ঠিক এই জায়গাটিই ডাঃ মিনোস্কি তাঁর যুগান্তকারী পরীক্ষার জন্যে বেছে নিয়েছেন এ খবরটার কোন ভুল নেইত।

"না তাতে ভুল নেই।" মিখায়েল খুব জোর গলায় ঘোষণা করলেও মনে হ'ল তার মনেও একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সন্দেহ কিন্তু সত্যিই অমূলক। তুষার ঢাকা সেই তুন্দ্রার মধ্যে ডাঃ মিনোস্কিকে আমরা শেষ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলাম। কিন্তু তার আগে তাঁকে খোঁজার মূলে কি ছিল একটু বলে দেওয়া বোধহয় দরকার।

অনেকেই বোধ হয় জানে না যে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর দুটি প্রধান শক্তি নিজেদের অজেয় করে তোলবার জন্যে মহাশূন্যে পর্য্যন্ত ঘাঁটি বানাবার কথা ভাবতে সুরু করেছে। একজন বৈজ্ঞানিক ত তাঁর পরিকল্পনা কাগজে কতকটা প্রকাশও করে দিয়েছেন। পৃথিবী থেকে মাইল পঞ্চাশ উঁচুতে ক্ষুদে চাঁদের মত একটা শূন্যে ভাসমান বন্দর বসান হবে। সে বন্দর চাঁদের মতই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তার চারিধারে ঘুরপাক খাবে। আর সেই বন্দর যে প্রথম মহাশূন্যে ভাসাতে পারবে, পৃথিবী বলতে গেলে তারই হাতের মুঠোয়। মহাশূন্যে এই বন্দর ভাসান শুধু 'রকেট' অর্থাৎ হাউই-বিমানের দ্বারাই সম্ভব। দুটি মহাশক্তি তাই হাউই-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরস্পরের কাজের ওপর কড়া নজর রেখেছে। এ বিজ্ঞানে কে কোন্ দিকে কতখানি এগিয়ে গেল সোজাসুজি জানবার উপায় যে নেই তা বলাই বাহুল্য, তাই দুই রাজ্যেই কল্পনাতীত পুরস্কারের লোভে প্রাণ হাতে নিয়ে বহু গুপ্তচর এই বিষয়ে যথাসম্ভব খবর সংগ্রহ করবার আশায় ঘুরছে।

অবশ্য ডাঃ মিনোস্কির ওপর এই গুপ্তচরদের নজর না পড়াই উচিত। হাউই-বিজ্ঞান তাঁর গবেষণার বিষয় নয়। আগের যুগে যেমন আইনস্টাইন, এ যুগের তেমনি তিনি অসাধারণ একজন গণিত-বিশারদ। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে যে অসীম অঙ্কের রহস্য রয়েছে—তার জট্ খোলায় তিনি আর সকলের চেয়ে অনেকদূরে এগিয়ে গেছেন।

এই মিনোস্কিও গুপ্তচরদের লক্ষ্য হতে পারেন একথা ভাবতে পারলে বিশ হাজার ফুট থেকে এই চেল্যুস্কিন অন্তরীপের ওপর আমি ঝাঁপ দিতে রাজী অবশ্য হতাম না। কিন্তু সে কথা যথাসময়ে

বলা যাবে।

দূরবীণ চোখে দিয়ে—মিখায়েলের সঙ্গে সেই তুষার-ঢাকা তুন্দ্রা যখন আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছি তখনও আমি জানি যে মিনোস্কিরই গোপন নিমন্ত্রণে তাঁর আশ্চর্য্য রেডিও-টেলিস্কোপ দেখতে আমি এসেছি। তাঁর নিজের ফরমাসমত এই আশ্চর্য্য টেলিস্কোপ যে রাশিয়ার এক জায়গায় বসান হয়েছে, এ গুজব দুনিয়াশুদ্ধ লোক তখন পেয়েছে। শুধু জায়গাটা যে কোথায়, দু'চারজন ওপরওয়ালা বাদে তা রাশিয়ারও কেউ জানে না। এ টেলিস্কোপ এই যুগের অসাধারণ এক কীর্ত্তি। আলো দিয়ে নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেতার তরঙ্গ দিয়ে সুদূর মহাশূন্যের খবর এ টেলিস্কোপে পাওয়া যায়। অ্যারিজোনার লাওয়েল-অবজারভেটারির কি দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্লুমফন্‌টেনের টেলিস্কোপের চেয়ে এই বেতার দূরবীক্ষণ-যন্ত্র অনেকগুণ শক্তিশালী। তাছাড়া এ টেলিস্কোপের সুবিধা হল এই যে, মেঘ, কুয়াশা বা ধোঁয়া কিছুতেই অচল হয় না। আলোর উপর যার নির্ভর সে টেলিস্কোপ অ্যারিজোনা বা দক্ষিণ-আফ্রিকার মরুর মত নির্মেঘ নির্মল আকাশের দেশে বসাতে হয়, কিন্তু এ টেলিস্কোপের সেরকম কোন হাঙ্গামা নেই। এরকম একটি টেলিস্কোপ ইংলণ্ডেও কিছুদিন হ'ল বসান হয়েছে কিন্তু ডাঃ মিনোস্কির টেলিস্কোপ নাকি তার চেয়ে অনেক জোরালো। শুধু তাই নয়, এ টেলিস্কোপের সাহায্যে মিনোস্কি এমন এক আশ্চর্য্য পরীক্ষা নাকি করছেন বিজ্ঞানের যুগ যাতে পাল্টে যাবে।
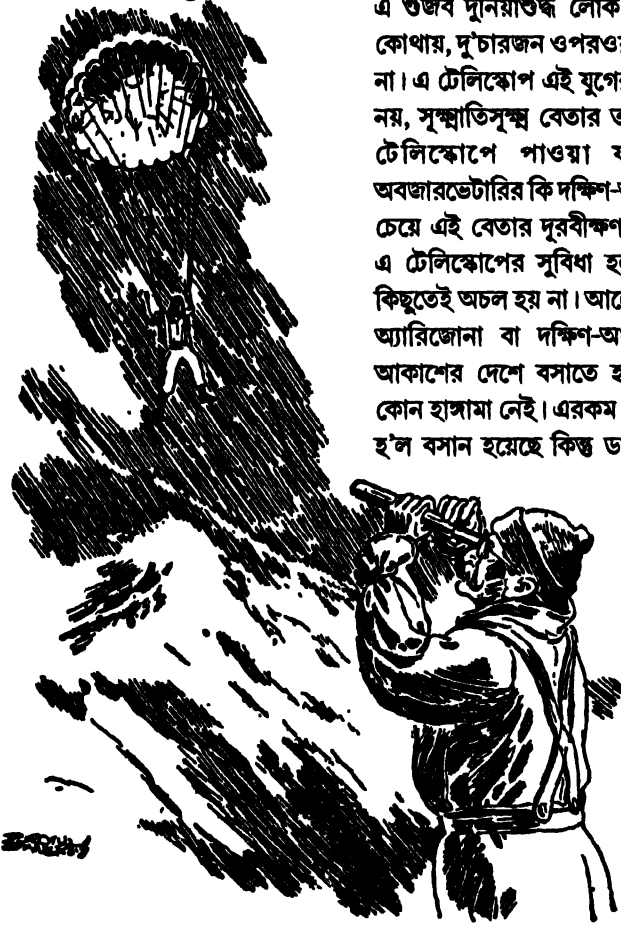
এহেন লোক আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন শুনে তেমন অবাক আমি হইনি। কারণ মিনোস্কির সঙ্গে অনেক আগেই আমার আলাপ হয়েছিল। তখন অবশ্য বিশ্ব-বিখ্যাত তিনি হন নি। নিমন্ত্রণটা বিশ্বাস করলেও এরকম লুকিয়ে সেটা করার কারণ আমি প্রথমটা বুঝতে পারি নি। মিখায়েলই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

দূরবীণ চোখে দিয়ে যখন আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজছি...

কোন শত্রুপক্ষের লোক না হলেও আমি বিদেশী'ত বটে। আর যত প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাক, বিদেশী একজন বন্ধুকে এসব গোপন জিনিষ দেখানো মিনোস্কির পক্ষেও শোভন নয়। নেহাৎ আমাকে ভালো

করে জানেন বলেই নিজের একান্ত বিশ্বাসী শিষ্য মিখায়েলের কাছে নিজের গোপন আস্তানার ঠিকানা জানিয়ে তারই মারফৎ এ নিমন্ত্রণ তিনি করে পাঠিয়েছেন। তাঁর গোপন ঠিকানা মিখায়েলেরও আগে জানা ছিল না।

এ নিমন্ত্রণের কথা যখন আমি শুনি তার কিছুদিন আগে মিখায়েলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। আলাপ সে কতকটা গায়ে পড়েই করেছিল, কিন্তু হাতীর মত বিরাট চেহারায় খরগোসের মত শান্তশিষ্ট লোকটাকে আমার খারাপ লাগে নি তার জন্যে। মিনোস্কির দূত হয়েই সে যে আসল কথা বলবার সুযোগের অপেক্ষায় আমার সঙ্গে এভাবে আলাপ জমিয়েছে, এটুকু জানবার পর তার ওপর যেটুকু বিরাগ ছিল তাও কেটে গেছে। নিমন্ত্রণের কথা জানবার পর মিখায়েলেরই পরামর্শ মত ওপরওয়ালাদের কাছে যেটুকু খাতির আছে তাই কাজে লাগিয়ে মিথ্যে অজুহাতে প্লেন জোগাড় করে তা থেকে প্যারাসুটে যথাস্থানে নামাবার ব্যবস্থা করি। পাছে কেউ সন্দেহ করে বলে মিখায়েল নিজে এসব জোগাড়-যন্ত্রের ব্যাপারে মাথা গলায় নি। মাথা গলান উচিত নয় বলেই আমায় বুঝিয়েছিল।

আসলে মিথ্যে সে যে কিছু বলে নি, সেই তুষার তুন্দ্রার রাজ্যে মিনোস্কির গোপন মান-মন্দির খুঁজে পাবার পর ভালো করেই বুঝলাম।

মান-মন্দিরটি এমনভাবে তৈরী যে নেহাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না দেখলে তা তুষার-ঢাকা তুন্দ্রার অংশ বলেই মনে হবে। খুঁজে বার করতে সেই জন্যেই আমাদের অত কষ্ট হয়েছিল।

মান-মন্দিরের ভেতর ঢুকে সমস্ত কষ্ট কিন্তু সার্থক মনে হল। এই চির তুষারের দেশে মাটির নিচে এমন স্বর্গপুরী যারা বানিয়েছে, মনে মনে তাদের তারিফ না করেও পারলাম না।

কিন্তু আরামে স্বর্গপুরী হলেও এ কি রকম মান-মন্দির? কোথায় আশ্চর্য্য যন্ত্রপাতি, কোথায় বা আর সব লোকজন?

বাইরে যেখানে পারা-জমানো শীত, মান-মন্দিরের ভেতরে সেখানে ঠাণ্ডার কোন বালাই নেই। বড়ো একটা জাহাজের মত পরম সুখে দিন কাটাবার সব রকম আয়োজন উপকরণই সেখানে প্রচুর। শুধু আসল জিনিষেরই কোন চিহ্ন নেই।

শেষ পর্য্যন্ত মিনোস্কির কাছে নিজের কৌতূহলটা প্রকাশ না করে পারলাম না।

বিরাট একটা চাকার মত প্যাঁচ-লাগান দরজা খুলে মিনোস্কি নিজেই আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমটা একটু অবাক হলেও আমায় চিনতে পেরে তাঁর আনন্দ যেন আর ধরে না।

"একি দাশ তুমি! তুমি এখানে আসবে আমি ভাবতেই পারি নি।" বলে আমার হাত ধরে সজোরে তিনি ঝাঁকানি দিয়েছিলেন।

আমিও একটু ঠাট্টা করে বলেছিলাম,—"আমিই কি পেরেছিলাম! হঠাৎ প্লেনটা বিগড়ে যাওয়ায় প্যারাসুটে নেমে পড়লাম!"

"ওঃ প্যারাসুটে নেমেছ!"

তাঁর বিস্ময়টুকু দেখে হেসে বলেছিলাম, "সাধে কি আর নেমেছি! আপনার শিষ্য এই মিখায়েলের কাছে শুনলাম, অন্য কোন রকমে নামা নাকি আপনার পছন্দ নয়। তবে প্যারাসুটের দড়ি যে ভাবে জড়িয়ে

গেছল, খুলতে আর একটু দেরী হলে আপনার নিমন্ত্রণ রাখা এ জন্মে আর হত না।"

"তাই নাকি! এত কাণ্ড করে তোমাকে নিমন্ত্রণ রাখতে হয়েছে!" বলে তিনি বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন।

মিখায়েল অবশ্য একান্ত অনুগত শিষ্যের মত এর মধ্যে একটি কথাও বলেনি।

মিনোস্কি এখন ঘুরে ঘুরে সমস্ত জায়গাটা আমাদের দেখাচ্ছিলেন। তারই মধ্যে এক সময় আমার মনের কথাটা বলে ফেললাম।—"এ সব দেখে কি হবে ডাঃ মিনোস্কি! এর বদলে 'কুইন মেরী' বা কোন বড় জাহাজ দেখলেই ত পারতাম।"

"জাহাজই'ত দেখছেন!" —মিনোস্কির মুখে অদ্ভুত একটু হাসি।

"জাহাজ দেখছি! ঠাট্টাটা বুঝতে পারলাম না।"—

মিখায়েলের গলা এতক্ষণে প্রথম শোনা গেল। সে গলার স্বর বেশ একটু আলাদা।

"ঠাট্টা নয়! সত্যিই এটা জাহাজ। এমন জাহাজ যা এপর্য্যন্ত কেউ কল্পনাও করেনি।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মিনোস্কি আবার বললেন, "কিন্তু ঠাট্টার বদলে একটু ঠাট্টা করলেই বা দোষ কি! গুপ্তচর মিচেল যে আমার শিষ্য মিখায়েল হয়ে উঠেছে এটা একটু বেয়াড়া ঠাট্টা বলেই ত আমার মনে হয়।"

দেখা গেল, একটা সোফার উপর ডিগ্‌বাজি খেয়ে সে কাৎরাচ্ছে। [পৃঃ ৫৭

অবাক্ হয়ে আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম তাতে বাধা দিয়ে মিনোস্কি বললেন, "তুমিও শেষে এই নীচ কাজে নামবে আমি ভাবি নি দাশ!"

ব্যাকুল ভাবে এবার জানালাম,—"বিশ্বাস করুন ডাঃ মিনোস্কি, আমি এসবের কিছুই জানি না। মিখায়েলকে সত্যিই আপনার শিষ্য ভেবে ওর কথায় বিশ্বাস করেছিলাম।"

ছদ্মবেশী মিচেল এবার নির্লজ্জ ভাবে হেসে উঠে বললে,—"তোমার মত আহম্মককে তা না বিশ্বাস করাতে পারলে এখানে আসবার প্লেন, নামবার প্যারাসুট জোগাড় হত কি করে! আমার কার্য্যোদ্ধারই যে নইলে হত না।"

"কার্য্যোদ্ধার সত্যি হয়েছে ভাবছো?" মিনোস্কি বজ্রস্বরে বলে উঠলেন,—"আমাদের পুলিশ এতই কাঁচা মনে করো? তোমরা এখানে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সব কথা আমায় বেতারে জানিয়ে দিয়েছে। আমায় সাহায্য করবার প্রহরীও তারা পাঠাচ্ছিল। আমিই বারণ করে দিয়েছি।"

"বারণ করে ভালো করেন নি ডাঃ মিনোস্কি।"—মিচেলের আসল চরিত্র তার গলার স্বরেই এবার বোঝা গেল,—"কি পরীক্ষা আপনি এখানে করছেন এখনো জানতে পারি নি কিন্তু এখানকার যা কিছু দরকারী জিনিষ সব সমেত আপনাকেও এখান থেকে পাচার করবার ব্যবস্থা করতেই আমি এসেছি। আমার নির্দ্দেশ পেয়ে আমাদের দুটি প্লেন শীগ্‌গিরই এখানে নামবে।"

অবিচলিত ভাবে মিনোস্কি একটু হেসে বললেন, "কিন্তু নেমে কিছু পাবে কি?"

"হ্যাঁ পাবে!" মিচেল দাঁত খিচিয়ে উঠল, "কোন চালাকী যাতে তার আগে আপনি না করতে পারেন সে জন্যে আপনাকে এখন একটু বাঁধব। এই সুঁটকো কালা আদমীটা অবশ্য ধর্ত্তব্যই নয়।"

যেমন চেহারা তেমনি মত্ত হাতীর মতই পদভরে ঘর কাঁপিয়ে মিচেল এবার এগিয়ে এল। পর-মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, ঘরের এক কোণের একটা সোফার ওপর ডিগবাজি খেয়ে পড়ে সে কাৎরাচ্ছে।

জামাটা যেটুকু নাট্ হয়েছিল ঠিক করে' নিয়ে বল্লাম, "আর কিছু দরকার হবে ডাঃ মিনোস্কি?"

"ধন্যবাদ দাশ। আর কিছুর দরকার নেই। তুমি না সাহায্য করলেও অবশ্য কিছু ক্ষতি হত না। আমি তৈরীই ছিলাম।"

কাৎরাতে কাৎরাতেও মিচেল গর্জ্জে উঠল—"তৈরী থাকা বার করে দিচ্ছি! আমাদের লোকেরা এখানে নামলো বলে!"

"তার আগে তোমাকে যে অনেক নামতে হবে।" বলে মিনোস্কি আমার দিকে ফিরলেন—"শোন দাশ, বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য্য পরীক্ষা এবার আমি করতে যাচ্ছি। এ পরীক্ষায় বাঁচব কি মরব জানি না। তাই এই শয়তানকেই শুধু আমার সঙ্গী করতে চাই। তুমি ইচ্ছে করলে এখন চলে যেতে পারো।"

"এতবড় সৌভাগ্য শুধু ওই শয়তানই পাবে? আমি কি অপরাধ করলাম!"

হেসে আমার পিঠ চাপড়ে মিনোস্কি বললেন,—"এই জবাবই তুমি দেবে জানতাম। যাও, ঐ সোফাটায় আরাম করে বোসগে, যাও।"

সোফায় বসতে না বসতেই মিনোস্কি দেয়ালের একটা কি বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের একটা জায়গা ফাঁক হয়ে যেন ভোজবাজিতে অদ্ভুত একটা যন্ত্র বেরিয়ে এল। সে যন্ত্রের একটা কি হাতল টেনে ধরতেই কি যে হল কিছুই আর জানতে পারলাম না।

জ্ঞান যখন হল তখন দেখি, ঠিক সেই ঘরেই সেই সোফাতেই বসে আছি। মিচেল তখনও অসাড়

হয়ে তার জায়গায় পড়ে আছে। আর মিনোস্কি ঘরের একদিকের কাঁচের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে কি দেখছেন।

তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বল্লাম,—"কি, হল কি, বলুন ত! কি দেখছেন আপনি!"

"নিজেই দেখো না।" বলে তিনি হাসলেন।

দেখে সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মেরুর তুষার-ঢাকা তুন্দ্রার বদলে এ যে টকটকে লাল বালির মরুভূমি! "একি সাহারা নাকি!" সবিস্ময়ে বলে ফেল্লাম।

মিনোস্কি এবার সশব্দে হেসে উঠে বললেন,—"না, তার চেয়ে আর একটু দূর,—এ হল মঙ্গল গ্রহের লাল বালির মরুভূমি। মঙ্গল গ্রহকে যার জন্য লাল দেখায়।"

মঙ্গল গ্রহ!—আমার না মিনোস্কির, কার মাথা খারাপ হয়েছে তখন ভাবছি। কিন্তু তুষার-ঢাকা তুন্দ্রার বদলে লাল মরুভূমি ত সত্যিই দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর কোন মরুভূমির সঙ্গে তার মিলও নেই।

আমায় আবার সোফায় নিয়ে এসে বসিয়ে মিনোস্কি বললেন,—"সত্যিই মঙ্গল গ্রহে আমরা নেমেছি। আমার পরীক্ষা সফল।"

আমার বিমূঢ়তায় একটু হেসে তিনি আবার বললেন,—"মঙ্গল গ্রহ এবার পৃথিবীর কত কাছে এসেছে খবরের কাগজেও তা বোধ হয় পড়েছ। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব এখন চার কোটি তিন লক্ষ মাইলের কাছাকাছি। কিন্তু এত কাছে এলেও, কোন হাউই যন্ত্র দিয়ে ঘণ্টায় চার হাজার মাইল ছুটেও বছর দেড়েকের আগে আমরা পৌঁছোতে পারতাম না। সে জায়গায় প্রায় চক্ষের নিমিষে আমরা এসেছি বলা যায়!"

"কিন্তু এলাম কি করে!"—আমি আগের মতই বিমূঢ়।

"এসেছি ফুটো দিয়ে গলে!" আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "হ্যাঁ সত্যিই ফুটো! মহাশূন্যের ফোর্থ ডাইমেনসন মানে চতুর্থ মাপের ফুটো! লম্বা, চওড়া, উঁচু—এই তিন মাপ দিয়েই সৃষ্টির সব কিছু আমরা দেখতে জানি। গণিত-বিজ্ঞান এ ছাড়া আরও মাপের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু তা কাজে লাগাতে কেউ পারে নি এ পর্য্যন্ত আমার এই পরীক্ষায় প্রথম সেই চতুর্থ মাপের জগৎ মানুষের আয়ত্তে এল।

ব্যাপারটা তোমায় আর একটু ভাল করে বোঝাই। খুব লম্বা একটা চিমটে মনে করো। এক দিকের ডগা থেকে আর এক দিকের ডগায় পৌঁছুতে হলে একটা পিঁপড়েকে সমস্ত চিমটেটা মাড়িয়ে যেতে হবে। তাতে তাকে হাঁটতে হবে ধরো তিন গজ। কিন্তু চিমটের একটা ফলা থেকে আর একটা ফলা মাত্র এক ইঞ্চি দূরে যদি থাকে, আর ওপরের ফলা থেকে নিচের ফলায় যাবার একটা ফুটো যদি পিঁপড়েটা পায় তা হলে এক ইঞ্চি নেমেই তিন গজ হাঁটার কাজ তার সারা হয়ে যাবে। লম্বা, চওড়া ও উঁচু—এই তিন মাপের জগতে যা অনেক দূর, চতুর্থ মাপ দিয়ে সেখানে অতি সহজে পৌঁছোবার এমন অনেক ফুটো মহাশূন্যে আছে। তেমনি একটা ফুটোই আমি খুঁজে পেয়েছি।"

এবার উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম,—"মঙ্গল গ্রহটা তাহলে ত ঘুরে দেখতে হয়।"

হেসে আমায় নিরস্ত করে মিনোস্কি বললেন, "না, না, এবার সেজন্য তৈরী হয়ে আসিনি। তাছাড়া

এ ফুটো ঠিক থাকতে থাকতেই পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। অন্ততঃ ওই শয়তান মিচেলটার জ্ঞান হবার আগে।"

মিচেলের জ্ঞান পৃথিবীতে ফিরেই হয়েছিল। তখন তার হাতে হাতকড়া। প্লেনে করে মিনোস্কিকে চুরি করতে যারা নেমেছিল, তাদের অবস্থাও তথৈব চ।"

ঘনাদার কথা শেষ হতে না হতেই শিবু বলে উঠল, "এই বছরেই ত জুন থেকে জুলাই-এর মাঝামাঝি মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অত্যন্ত কাছে এসেছিল শুনেছি। কিন্তু সশরীরে তখন আপনি এই মেসেই ছিলেন মনে হচ্ছে।"

কোন উত্তর না দিয়ে শিশিরের হাত থেকে সিগারেটের টিনটা অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়ে ঘনাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তর্কে বহু দূর

তপঃশক্তির প্রভাব

হংসবাবা অবধূত বারো বছর ধরে এই ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজক ব্রত নিয়ে ঘুরে বেড়ান। একবস্ত্র, হাতে মাত্র একটা কমণ্ডলু। এইভাবে অরণ্য, পর্ব্বত, প্রান্তর পায়ে হেঁটে তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। এই বারো বছরের মধ্যে বহুবার নির্জন গভীর অরণ্যে তাঁকে বহু হিংস্র জন্তুর সামনে পড়তে হয়েছিল। নির্ভীক সন্ন্যাসী প্রত্যেকবারই অদ্ভুত উপায়ে তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। একবার বিন্ধ্য-পর্ব্বতের জঙ্গলে হঠাৎ দেখেন এক ভীষণ বাঘ সামনে তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়ে। তিনি শান্তভাবে বাঘের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাঘকে সম্বোধন করে বল্লেন, আমি বিশ্বাস করি, আমার মধ্যে যিনি আছেন, তোমার মধ্যেও তিনি আছেন। আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। হংসবাবা দেখলেন, বাঘ ঘাড় ফিরিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পথের পাঁচালীর দেশে •

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বাংলাদেশের আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে, আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে একজনের নাম সকলের চেয়ে প্রিয়। তিনি হলেন 'পথের পাঁচালী'র অমর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালীর ঘরের শৈশব আর কৈশোর নিয়ে তিনি যে উপন্যাস লিখে রেখে গিয়েছেন, যে সব গল্প লিখে গিয়েছেন, বাংলা ভাষায় তার জোড়া নেই। তাঁর অপু বাংলার কৈশোরের প্রতীক।

বাংলাদেশকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। গুটিকতক শহরের বাইরে পল্লী-প্রাণ এই যে বাংলাদেশ, যেখানে আজও বেঁচে আছে বাঙালীর প্রাণ, বিভূতিভূষণ তীর্থ-যাত্রীর মতন সেই বাংলার গেঁয়ো পথে, নদীর ধারে, বনে জঙ্গলে, ভাঙা মন্দিরে মন্দিরে সারাজীবন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর অপরূপ লেখার মধ্যে তাই বাংলার বুনো ফুলের গন্ধ ধূপের ধোঁয়ার মতন উঠছে, নিত্য ডাকছে সেখানে বাংলার দোয়েল-পাপিয়া! অম্লান শতদলের মতন ফুটে আছে সেখানে বাংলার সবুজ প্রাণ!

তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের উপাসক, যে সৌন্দর্য্য ঝরে পড়ে আকাশ থেকে চাঁদের আলোয়, যে সৌন্দর্য্য কেঁপে ওঠে ভোরের আলোয় ঝরে-পড়া শিশিরে শিশিরে, যে সৌর্ন্দয্যে বনের বুকে ফুটে ওঠে মধু-গন্ধী

ফুলের দল। সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন চির-সুন্দরেব সন্ধান এবং তাঁর সাহিত্যে তিনি রেখে গিয়েছেন তার অমর চিহ্ন। তিনি জন্মেছিলেন বাংলার পল্লীর বুকে, চব্বিশ পরগণার বনগ্রাম সব-ডিভিশনে ইছামতী নদীর তীরে বারাকপুরে। এই বারাকপুরই হলো 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দিপুর, যেখানে কেটেছে বিভূতিভূষণের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি।

নীচে তাঁর যে চিঠিটি ছাপানো হলো, তার মধ্যে বিভূতিভূষণের সাহিত্যের ও মনের আসল পরিচয়টি পাওয়া যাবে। এই চিঠির ভাষার মতন তাঁর সাহিত্যের ভাষাও হলো সহজ, সবল, অনাড়ম্বর এবং সেই সহজ সাবল্যেব পেছনে ঝরে পড়ছে একটা মধুর রসের ধাবা......]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম—বারাকপুর
পোঃ—গোপালনগর
২৪ পরগণা
২রা জুলাই, ১৯৪৯

কল্যাণবরেষু,
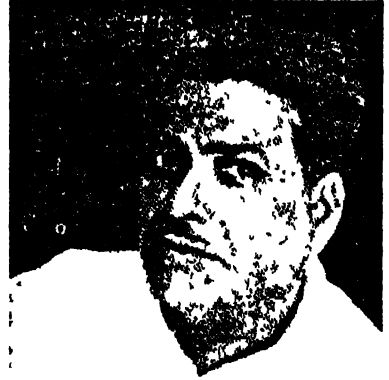
শ্যামল জলজ ঘাসের ফুল ফুটে আছে ইছামতীর ধারে। তীরের বাবলা গাছটা থেকে টুপটাপ করে বাবলার ফুল খসে পড়চে নদীজলে—যেন প্রকৃতিরাণীর কাণের সোনালী দুল। মাকাল লতা দুলচে জলের ওপরে, লতার গাঁটে গাঁটে ঘন সবুজ মাকাল ফল ঝুলচে, ডাকপাখী ডাকচে ঘন জলজ ঘাসের বনে। ওপারের পাটক্ষেতের পেছনে প্রভাত-সূর্য্য মেঘের আবরণ ভেদ করে উঁকি মারবার চেষ্টা করচে—কি সুন্দর স্নিগ্ধ বর্ষার সকালটি! এই মাত্র ইছামতীতে স্নান করে এলাম, কাল রাত্রে পশ্চিম দিকের ছোট ঘরটাতে শুয়েছিলাম, বড় গুমট ও-ঘরটাতে।

বড় চারা আমতলায় সোঁদালি গাছটাতে এখনো ফুল যথেষ্ট, গোয়ালে-লতা নেমেচে ডাল থেকে, সরু গুলঞ্চের লতা ঝুলচে, কত কি পাখী ডাকচে, বনকুঞ্জ নিবিড় সৌন্দর্য্যে ভরপুর। ভগবান মহাশিল্পী, স্বয়ম্প্রভ নীহারিকারাজি ছিল আদিম শূন্যে একদিন, সেই প্রজ্বলন্ত অগ্নিবাষ্পের মধ্যে এই অপরূপ সৃষ্টি বীজরূপে নিহিত ছিল না কি? অতবড় বিরাট শিল্পীকে কেউ বুঝতে পারে না। এক-আধজন রবীন্দ্রনাথ, এক-আধজন শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, দু-চারজন উপনিষদের ঋষি—বাস্, হয়ে গেল। বহু শতাব্দীর মধ্যে ঐ দু-চারজন। তাঁরাই বলে গিয়েচেন—'দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্য্যতি'

অথবা—'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি?'

কিন্তু ওঁদের কথা শুনবাব মানুষ কম। মানুষে টাকা নিয়ে উন্মত্ত, পদ নিয়ে উন্মত্ত, যশ নিয়ে

উন্মত্ত। বিমানযোগে আমেরিকা গিয়ে কন্‌ফারেন্স করবার গৌরবে আত্মহারা। ঘরের পাশের যে সুচারু তেলাকুচো লতাটি ঝোপের ওপরে চমৎকার সুনীল ভঙ্গিতে বেড়ে উঠচে বর্ষার জল পেয়ে, পানকলস শেওলার যে কুচো কুচো সাদা ফুল জলের ওপর ফুটে আছে, সন্ধ্যায় অস্ত-দিগন্তের যে মায়ারূপ— ও সব কে দেখচে? সময়ই বা কার?

জীবনে যাই কর, এই মহাকবিকে বুঝবার ও জানবার চেষ্টা কোরো। তাতে জীবন সত্যিই সার্থক হবে। না বুঝে পৃথিবী থেকে চলে গেলে যতই টাকার দিক থেকে জীবন কেন সফল হোক না, আসলে যে ব্যর্থই থেকে যাবে। কেউ তার ব্যর্থতা রোধ করতে পারবে না।

আমরা ঘাটশিলা থেকে গত চৈত্র মাসে দেশে এসেছি। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি আবার ঘাটশিলাতে ফিরবো—কারণ ওর পর এখানে ম্যালেরিয়া সুরু হবে। আমার 'দেবযান' পড়েচ কিনা? লিখো কেমন পড়লে।

এ চিঠির উত্তর দিও এখানকার ঠিকানাতেই। তারপর ঘাটশিলার ঠিকানায় দিও এর পরে।

তোমাদের আসামের বন-জঙ্গলের বিবরণ দিয়ে একখানা পত্র লেখো না কেন? আমি আসামের বনভূমির সঙ্গে তত পরিচিত নই।

লিখবে (১) কি কি বনফুল ফোটে (২) কি কি পাখী ডাকে (৩) কি কি লতা আছে (৪) কি কি বড় গাছ আছে (৫) কি কি জন্তু আছে বনে ও পাহাড়ে (৬) কি কি মাছ আছে জলে।

আমার আশীর্ব্বাদ নিও। শ্রাবণের 'মৌচাকে' খোকার ফটো বেরুবে। তোমায় পাঠিয়ে দেবো। তোমার বাবা-মাকে আমার নমস্কার দিও—কেমন তো?

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তর্কে বহু দূর

দেবীর স্বহস্তে পায়স খাওয়া

মহাতান্ত্রিক শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সাধনার অপূর্ব্ব সব কাহিনী শুনে কৃষ্ণনগরের মহারাজা গোপনে দেখতে আসেন। যে ঘরের ভেতর আগমবাগীশ মাতৃ-পূজা করছিলেন, মহারাজা এক জানলা দিয়ে তার ভেতরে দেখছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। মহারাজা দাঁড়িয়ে থাকেন। ধ্যান সেরে আগমবাগীশ মাকে পায়স নিবেদন করলেন। মহারাজা বিস্মিত হয়ে দেখলেন, সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমার ভেতর থেকে একটী স্বর্ণ-কমলের মত হাত বেরিয়ে এলো এবং ভক্তের দেওয়া পরমান্ন গ্রহণ করলেন। বাটী খালি হয়ে গেলে, আগমবাগীশ আচমনের জল দিলেন। আচমন-অন্তে দেবীর হাত অদৃশ্য হয়ে গেল। মহারাজা স্বচক্ষে সেই মহাদৃশ্য দেখে আগমবাগীশের পায়ের তলায় নিজেকে সমর্পণ করলেন।

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এক
—তৈমুরের রক্ত—

বিশ্বজিৎ তৈমুর লং!!!

হ্যাঁ, 'বিশ্বজিৎ' উপাধি তাঁরই প্রাপ্য। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে দেশে সগর্ব্বে উড়েছিল তাঁর রক্তাক্ত জয়পতাকা এবং সমগ্র ইউরোপের রাজারাজড়ারা সর্ব্বদাই সভয়ে তাঁকে খোসামোদ ক'রে তুষ্ট রাখতে চাইতেন। তাঁর কীর্ত্তিকাহিনী অন্যত্র আমি তোমাদের জন্যে ভালো ক'রেই বর্ণনা করেছি, সুতরাং এখানে আর কিছু বলবার দরকার নেই।*

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন ঐ তৈমুরেরই ষষ্ঠ বংশধর। তারপর একে একে সিংহাসনে বসেন হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান।

সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন দারা সুকো। আজ আমরা এই দারারই করুণ জীবন-কাহিনী বর্ণনা করব।

দারার কথা বলতে তৈমুরের কথা মনে পড়ল বিশেষ এক কারণে। তৈমুরের রক্তে কি বিশেষত্ব ছিল জানি না, কিন্তু তাঁর বংশধররা গৃহবিপ্লব, পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃ-বিরোধ প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের নিয়মিত ভাবে কলঙ্কিত করেছিলেন যেন বংশানুক্রমেই!

তৈমুরের মৃত্যুর পরেই তাঁর পুত্রগণ সিংহাসনের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে করেছিলেন অস্ত্রধারণ। ফলে তৈমুরের সৃষ্ট অমন বিশাল সাম্রাজ্য কেবল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েনি, তার অধিকাংশই তাঁর বংশধরদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

বাবর প্রথমে ছিলেন ক্ষুদ্র এক নরপতি। কেবল ব্যক্তিগত শক্তি ও প্রতিভার প্রসাদেই তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন দিল্লীর সিংহাসন। তাঁর পুত্র ও পৌত্র হচ্ছেন হুমায়ুন ও আকবর। সিংহাসনের কোন ভাগীদার ছিল না ব'লেই তাঁদের আর ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করতে বা গৃহ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে হয়নি।

কিন্তু তারপরেই দেখা গেল, আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর হয়েছেন পিতৃদ্রোহী এবং জাহাঙ্গীরের পুত্র

---

* দেব-সাহিত্য-কুটীর থেকে প্রকাশিত "ভগবানের চাবুক" দ্রষ্টব্য।

সাজাহানও করেছেন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। তারপর ঔরংজীবও বংশের ধারা বজায় রাখতে ছাড়লেন না, সম্রাটের আসন অধিকার করলেন তিনি পিতৃদ্রোহ এবং ভ্রাতৃহত্যার দ্বারাই।

এবং নিয়তির ঐ অভিশাপ থেকে ঔরংজীব নিজেও অব্যাহতি লাভ করেননি। ঔরংজীবের জীবনকালেই তাঁর পুত্র আকবর বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই অন্যান্য পুত্ররা সিংহাসনলাভের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পিতারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তারপরও মোগল রাজবংশ ঐ অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেনি। ভ্রাতৃহত্যার দ্বারা তা কলুষিত হয়েছিল আরো কয়েকবার।

এমন সব অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত এবং একই মারাত্মক দৃশ্যের পৌনঃপুনিক অভিনয় পৃথিবীর আর কোন রাজবংশের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

দুই

—বিষবৃক্ষের বীজ—

সম্রাট সাজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যা—তাঁদের নাম যথাক্রমে দারা সুকো, মহম্মদ সুজা, মহিউদ্দীন মহম্মদ ঔরংজীব ও মহম্মদ মুরাদ বক্স এবং জাহানারা ও রোশেনারা। সাজাহান যাঁর নাম স্থাপত্য-শিল্পে অমর ক'রে রেখে গিয়েছেন, সেই মমতাজমহলই হচ্ছেন এই ছয় সন্তানের জননী।

দারা সুকো ছিলেন জ্যেষ্ঠ। পৃথিবীর সব দেশেই একটা সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রই হন সিংহাসনের অধিকারী। সুতরাং সম্রাট সাজাহান যে দারাকেই নিজের উত্তরাধিকারিরূপে নির্ব্বাচন করবেন, এটা কিছুমাত্র অন্যায় বা অভাবিত কথা নয়।

কিন্তু তার উপরে একটা বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সম্রাট সাজাহানের হাব-ভাবে সর্ব্বদাই জাহির হয়ে পড়ত যে তিনি ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকেই। এই পক্ষপাতিতা অন্যান্য রাজপুত্রদের ভালো লাগত না।

তবে এ ব্যাপারটাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মধ্যেও দেখা যায়, একাধিক পুত্রের পিতারা নিজের কোন একটি ছেলেকে অন্য সন্তানের চেয়ে বেশী ভালো না বেসে পারেন না।

এমন কি পিতার পক্ষপাতিতার জন্যে যে-ঔরংজীব তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সবচেয়ে বিষ-দৃষ্টিতে দেখতেন, তিনিও তাঁর অতি অক্ষম কনিষ্ঠ পুত্র কামবক্সকে তাঁর অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে করতেন বেশী আদর।

সাধারণ গৃহস্থ পিতার সম্বল তো হয় নগণ্য কিংবা যৎসামান্য। সেক্ষেত্রে পিতার একদেশদর্শিতার ফলে পুত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা গেলেও তা আর বেশীদূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে না। কিন্তু যেখানে ভারতবর্ষের মত বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে কথা, সেখানে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল না থাকলে গুরুতর অনর্থপাতের সম্ভাবনাই বেশী। দেখা গেছে, মুকুটের লোভ পারিবারিক স্নেহের বন্ধন মানে না—পিতা-পুত্রও হতে পারে পরস্পরের শত্রু। এক্ষেত্রে তাইই হয়েছিল।

দারা ছিলেন সাজাহানের নয়নের মণি। দারাকে তিনি নিজের কাছে কাছে রাখতে চাইতেন অহরহ। এবং দারার প্রতি তাঁর এই অতিরিক্ত স্নেহটা বিশেষভাবে জাহির হয়ে পড়ায় অন্যান্য পুত্রের মন হয়ে উঠেছিল হিংসায় পরিপূর্ণ। একটা দৃষ্টান্ত দি।

সাজাহান তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে বালক-বয়স থেকেই উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে রেখে নানা বিদ্যায় পারদর্শী ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর ছেলেদের রাজকার্য্যে হাতে-নাতে অভিজ্ঞ করবার জন্যে প্রেরণ করতেন সাম্রাজ্যের এক এক প্রদেশে রাজপ্রতিনিধিরূপে।

দাক্ষিণাত্য ছিল অশান্তিপূর্ণ এবং রাজধানী দিল্লী থেকে বহুদূরে। সাজাহানের নির্দ্দেশে ঔরংজীবকে রাজপ্রতিনিধিরূপে যেতে হয়েছিল সেইখানে।

মুরাদকেও পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণের আর এক প্রদেশে।

মোগল সম্রাটরা নরকের মত ঘৃণা করতেন সুদূর বাংলাদেশকে, কারণ সেখানকার আবহাওয়া পশ্চিমাদের ধাতে সইত না। দ্বিতীয় রাজপুত্র সুজা প্রেরিত হয়েছিলেন ঐ বঙ্গদেশেই।

পাঞ্জাব, এলাহাবাদ ও মুলতান প্রভৃতি প্রদেশ ছিল না অশান্তিকর ও আপত্তিকের, বরং অর্থকর বলেই ছিল তাদের খ্যাতি। সেই সব প্রদেশেই দারাকে রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা হ'ত। উপরন্তু, দারাকে স্বয়ং অত দূর পর্য্যন্তও যেতে হ'ত না, তিনি নিজে থাকতেন পিতার আশেপাশেই, প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কোন প্রতিভূ।

সাজাহান যখন সসম্মানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন থেকেই দারা হয়ে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি,—তাঁর আসন ছিল সম্রাটের পরেই। তাঁকে "শাহী-বুলন্দ-ইক্‌বাল্" (বা মহৎ সৌভাগ্যের রাজা) নামে সুদুর্লভ ও মহাসম্মানকর উপাধিতে ভূষিত এবং চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের নায়কের পদ প্রদান করা হয়েছিল। যে প্রভূত অর্থ তাঁর জন্যে বৃত্তি ব'লে বরাদ্দ করা হয়েছিল তা বহু নৃপতিরও হিংসার উদ্রেক করতে পারত। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতানুসারে, দারার বাৎসরিক বৃত্তির পরিমাণ ছিল দেড় কোটি থেকে দুই কোটি টাকা! আজকের হিসাবে ঐ টাকার পরিমাণ হবে কত গুণ বেশী, সকলে তা ক'ষে দেখতে পারেন।

রাজসভায় সম্রাটের কাছেই থাকত যুবরাজ দারার জন্যে নির্দ্দিষ্ট সোনার সিংহাসন—ময়ূর-সিংহাসনের চেয়ে তার উচ্চতা খুব কম ছিল না। এমন কি, সামরিক পদমর্য্যাদায় দারার পুত্ররাও ছিলেন সম্রাটের অন্যান্য পুত্রদের সমকক্ষ।

মুখাপেক্ষী কিংবা সামন্ত রাজারা, উপাধি বা পদপ্রার্থীরা এবং সম্রাটের বিরক্তিভাজন কৃপাপ্রার্থীরা সাজাহানের কাছে যাবার আগে দারার কাছে গিয়ে ধর্‌না দিতেন। পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং নূতন উপাধিধারিগণ যুবরাজের কাছে নতি স্বীকার করবার জন্যে স্বয়ং সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হতেন।

শেষের দিকে সম্রাটের সামনে ব'সে বা তাঁর অনুপস্থিতিকালেও শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন দারাই স্বয়ং। এমন কি, তিনি স্বাধীনভাবে সম্রাটের নাম ও শীলমোহর পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে পারতেন।

ব্যাপার দেখে অন্যান্য রাজপুত্রদের মনে হিংসা ও ক্রোধের সীমা ছিল না। এই ভাবে দিল্লীর রাজপরিবারের মধ্যে গোড়া থেকেই বোনা হয়েছিল বিষবৃক্ষের বীজ।

তিন

—মানুষ দারা—

শত্রুরা দারার চরিত্রকে কালো রঙে এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য দেখে বোঝা যায়, সেটা হয়েছে অপচেষ্টা মাত্র।

দারা ছিলেন ভদ্র ও বিনয়ী এবং বন্ধু ও দুর্গতদের সাহায্য করবার জন্যে সতত প্রস্তুত। পত্নী ও পুত্রদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। এবং পিতাকেও করতেন রীতিমত শ্রদ্ধা।

কিন্তু তিনি আজন্ম লালিত-পালিত হয়েছিলেন অসামান্য সৌভাগ্যের কোলে, যখন যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন অনায়াসেই এবং কখনো কিছুমাত্র দুঃখভোগ করেননি। তাই ছিল না তাঁর দূরদৃষ্টি ও মানুষ চেনার ক্ষমতা। মনের ও বুদ্ধির জোরে প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

সাজাহানের কন্যা জাহানারার আত্মজীবনীতে প্রকাশ, প্রপিতামহ আকবর যে স্বপ্ন দেখতেন, প্রপৌত্র দারা নিজের জীবনে তাকেই সম্ভবপর ক'রে তোলবার চেষ্টা করতেন। আকবর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর এবং এক নূতন ও উদার ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন। দারারও কাম্য ছিল তাই।

কিন্তু কেবল স্বপ্ন দেখেই রাজদণ্ড পরিচালনা করা যায় না। সর্ব্বত্র উদারতার সাধনা করাও রাজধর্ম্মের বিরোধী। আকবর ছিলেন কূট-কচালে রাজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ—দারা যা ছিলেন না। আকবরের ছিল প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধপ্রতিভা। দারাও যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু সেনাপতির কর্ত্তব্যপালন করতে পারতেন না।

একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক দারার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই ঃ

দারা ছিলেন সর্ব্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তাই তিনি ইহুদীদের ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানদের সূফীধর্ম্ম (যার সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্মের মিল দেখা যায়) এবং হিন্দুদের বেদান্তধর্ম্ম অনুশীলন করেছিলেন।

তাঁর দ্বারা একদল হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে পার্সী ভাষায় উপনিষদ্ অনূদিত হয়েছিল। তাঁর আর একখানি পুস্তকের নাম হচ্ছে, "মাজমুয়া-উল্-বাহারিন" বা "দুই সাগরের সম্মিলনী"। তা পাঠ করলে বোঝা যায়, তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন এক মিলনক্ষেত্র আবিষ্কার করা, যেখানে এসে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তে পারে।

তিনি হিন্দু যোগী লালদাস ও মুসলমান ফকির সারমাদের পদতলে ব'সে শিষ্যের মত মনোযোগ দিয়ে উভয়ের উপদেশবাণী শ্রবণ করতেন।

তা ব'লে তিনি স্বধর্ম্মবিরোধী ছিলেন না। তিনি মুসলমান সাধুদের একখানি জীবন-চরিত সঙ্কলন করেছিলেন। শিষ্যরূপে তাঁর দীক্ষা হয়েছিল সুবিখ্যাত মুসলমান সাধু মিয়ান মীরের কাছে—কোন কাফেরের পক্ষে যা ছিল অসম্ভব। দারার নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি ইসলামের মূল ধর্ম্মমতে অবিশ্বাসী ছিলেন না।

কিন্তু তিনি ছিলেন হিন্দুদের বন্ধু। অন্যান্য গোঁড়া মুসলমানের মত তিনি কোনদিনই হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন না। এই সব কারণে বিশেষ ক'রে হিন্দুদের কাছে দারা ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়।

চার

—ঔরঙ্গজীব বা শ্বেতসর্প—

আলোচ্য নাটকীয় কাহিনীর প্রধান ও প্রথম নায়ক দারা এবং দ্বিতীয় নায়ক হচ্ছেন ঔরংজীব। এইবার তাঁরও একটু পরিচয়ের দরকার।

ঔরংজীব ছিলেন দারার চেয়ে কিছু কম চার বৎসরের ছোট। সম্রাট সাজাহানের অন্যান্য পুত্রের

মত বাল্যে ও যৌবনে উপযুক্ত শিক্ষকদের অধীনে তিনিও বিদ্যালাভের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন।

আরবী, পার্সী, হিন্দী ও তুর্কী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। কাব্যের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকলেও তিনি কয়েকজন কবির উপদেশপূর্ণ রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং দরকার হ'লেই মুখে মুখে তাঁদের বচন উদ্ধার করতে পারতেন। তিনি ইতিহাসের ভক্ত ছিলেন না, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করতে ভালোবাসতেন। নাচ-গান-ছবি তিনি পছন্দ করতেন না।

বল্লম তুলে নিক্ষেপ করলেন [পৃঃ ৬৮

জাহানারার আত্ম-কাহিনীতে বালক ঔরংজীব সম্বন্ধে একটি কাহিনী পাঠ করা যায়। তাঁর পিতামহ জাহাঙ্গীর ও পিতা সাজাহান দুজনেই প্রথম বয়সে হয়েছিলেন পিতৃদ্রোহী। সাজাহানেরও তাই ভয় ছিল যে, তাঁর পুত্ররাও হয়তো কোনদিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। সেইজন্যে এক ভবিষ্যদ্‌বক্তা সন্ন্যাসীকে তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার কোন ছেলে কি আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে সাম্রাজ্য নষ্ট করবে?"

সন্ন্যাসী বলেছিলেন, "হ্যাঁ।"

—"কে সে?"

—"যে সবচেয়ে ফরসা।"

ঔরংজীবের গায়ের রং ছিল অতিশয় শুভ্র। ভবিষ্যদ্বাণীর সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বৎসর মাত্র। সাজাহান কিন্তু সেইদিন থেকেই তাঁকে আর ভালো চোখে দেখতেন না এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন, "শ্বেতসর্প"।

বালক-বয়স থেকেই ঔরংজীব ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বীর। এখানে তাঁর সাহস ও বীরত্বের একটি গল্প দেওয়া গেল।

কিন্তু তার আগে আর একটি কথা বলা উচিত। মোগল সম্রাট ও রাজপুত্ররা—অর্থাৎ তৈমুরের বংশধররা চিরদিনই ছিলেন বীরত্ব ও সাহসের জন্যে বিখ্যাত, তৈমুরের রক্তে কাপুরুষের জন্ম হয়নি বললেও চলে। মোগল রাজবংশের উৎপত্তি যে তৈমুরের রক্ত থেকেই, এর জন্যে তাঁরা ছিলেন মনে মনে গর্ব্বিত।

ঔরংজীবের ছোট ছেলে কামবক্স ছিলেন নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও প্রমোদপ্রিয়—তাঁকে অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলেও অন্যায় হবে না।

মেজো ভাই সম্রাট বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অনায়াসেই পলায়ন করতে পারতেন। কিন্তু পালাবার নাম মুখেও না এনে লড়তে লড়তে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং মরবার আগে ব'লে যান—"আমি হচ্ছি তৈমুরের বংশধর; পাছে কেউ আমাকে কাপুরুষ ভাবে, সেই ভয়েই স্বেচ্ছায় আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।"

এইবার গল্পটি বলি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন ঔরংজীবের বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর।

সম্রাট সাজাহানকে হাতীর লড়াই দেখানো হচ্ছে। আশে পাশে দর্শকরূপে রাজপুত্র ও আমীর-ওমরাওদের সঙ্গে উপস্থিত আছে সৈন্যসামন্ত ও এক বৃহতী জনতা।

আচম্বিতে হাতী ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এল অশ্বারোহী ঔরংজীবের দিকে। তখনও পালাবার পথ খোলা ছিল, কিন্তু ঔরংজীব সে কথা মনেও আনলেন না। পাছে ঘোড়া ভয় পেয়ে স'রে পড়ে, তাই তিনি তার বল্গা টেনে রেখে স্থির ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হাতীটা আরো কাছে এগিয়ে এল, ঔরংজীব বল্লম তুলে সজোরে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন।

হৈ হৈ রব উঠল চারিদিকে। আমীর-ওমরাও এবং অন্যান্য লোকজনেরা ছুটোছুটি ও চেঁচামেচি করতে লাগল—হাতীকে ভয় পাওয়াবার জন্যে অনেক আতসবাজি ছোঁড়া হ'ল—কিন্তু বৃথা!

মত্ত মাতঙ্গ ছুটে এসে শুঁড়ের এক আঘাতে ঘোড়াটাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে—আর রক্ষা নেই!

ঔরংজীব এক লাফে মাটির উপরে লাফিয়ে প'ড়ে, খাপ থেকে তরোয়াল খুলে অটল পদে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন হাতীর সামনে।

হঠাৎ দৈবগতিকে হ'ল দৃশ্য-পরিবর্ত্তন। একে তো ভীষণ হট্টগোলে, বল্লমের খোঁচায় ও আতসবাজির সশব্দ অগ্নিকাণ্ডে হাতীটা চমকে ও ভেবড়ে গিয়েছিল, তার উপরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাতীটাও আবার রুখে উঠে তাকে আক্রমণ করতে আসছে দেখে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে কালবিলম্ব করলে না।

ফাঁড়া উৎরে গেল ভালোয় ভালোয়, সকলে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সাজাহান তাঁর বীর সন্তানকে সাদরে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বুঝলেন, একদিক দিয়ে ঔরংজীব হচ্ছেন তাঁরই যোগ্য পুত্র, কারণ তিনিও যৌবনে পিতা জাহাঙ্গীরের চোখের সামনে তরবারি হাতে নিয়ে নির্ভয়ে আক্রমণ করেছিলেন এক বন্য ও দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রকে।

ঔরংজীব লাভ করলেন 'বাহাদুর' উপাধি এবং পুরস্কার-স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা দামের উপহার

ও নগদ পাঁচহাজার মোহর।

ছেলের গোঁয়ারতুমির জন্যে সম্রাট যখন মৌখিক ভর্ৎসনা করলেন, ঔরংজীব উত্তরে বললেন, "পলায়নই ছিল লজ্জাকর। আমি মরলেও সেটা লজ্জার বিষয় হ'ত না। মৃত্যু সম্রাটকেও ছেড়ে দেয় না, তাতে সম্মান-হানি হয় না।"

দারা বাপের আদুরে ছেলে ব'লে রাজপুত্ররা সবাই অসন্তুষ্ট ছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু দারার প্রতি ঔরংজীবের অসন্তোষ, ক্রোধ ও আক্রোশ ছিল আর সকলেরই চেয়ে বেশী। এ বিদ্বেষ তাঁর বাল্যকাল থেকেই এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিদ্বেষও বেড়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে। একটা দৃষ্টান্ত ঃ

ঔরংজীব তখন দাক্ষিণাত্যের রাজ-প্রতিনিধি এবং তাঁর বয়স ছাব্বিশ বৎসর। জ্যেষ্ঠ দারা পিতার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ব'লে মন তাঁর তিক্ত-বিরক্ত। তাঁর তখনকার মৌখিক ভাষায় এবং চিঠিপত্রে দারার প্রতি এই বিষম আক্রোশটা সর্ব্বদাই প্রকাশ পেত। তার উপরে সেই সময়ে এমন এক ঘটনা ঘটল যার ফলে সেই বিরাগটা হয়ে উঠল দস্তুরমত বিজাতীয়।

ঔরংজীব ও জাহানারা

দৈবগতিকে আগুনে পুড়ে সহোদরা জাহানারার জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে। বোনকে দেখবার জন্যে ঔরংজীব এলেন আগ্রা সহরে।

সেই সময়ে সেখানে যমুনাতীরে দারা নিজের জন্যে তৈরি করিয়েছিলেন এক নতুন প্রাসাদ। একদিন তিনি পিতা ও তিন ভ্রাতাকে প্রাসাদ দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন।

গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সেখানে ভূগর্ভে নির্ম্মাণ করা হয়েছিল একটি কক্ষ এবং তার মধ্যে আনাগোনা করবার জন্যে ছিল একটিমাত্র দ্বার।

দারার সঙ্গে সঙ্গে সাজাহান, সুজা ও মুরাদ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন, কিন্তু ঔরংজীব একা

ব'সে রইলেন দ্বারের কাছে।

সাজাহান বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তাঁর ঐ আশ্চর্য্য ও অশোভন ব্যবহারের কারণ কি? তিনি কিন্তু চুপ ক'রে গোঁ ধ'রে ব'সে রইলেন সেইখানেই, কোন জবাব দিলেন না।

তাঁর এই অবাধ্যতার শাস্তি হ'ল গুরুতর। কেবল তাঁর বৃত্তিই বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল না, দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্ব ও রাজসভায় প্রবেশাধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন।

সুদীর্ঘ সাত মাসকাল অলস ভাবে ব'সে থাকবার ও অপমানকর জীবন যাপন করবার পর অবশেষে জাহানারার কাছে তিনি নিজের অবাধ্যতার কারণের কথা খুলে বললেন ঃ

—"ঘরের একটিমাত্র দরজা, বাইরে যাবার দ্বিতীয় পথ নেই। আমি ভেবেছিলুম সেখানে সুযোগ পেয়ে দারা আমাদের সকলকে হত্যা ক'রে সিংহাসনের পথ সুগম ক'রে ফেলবেন। তাই পাহারা দেবার জন্যে আমি দরজার কাছেই বসেছিলুম।"

দেখা যাচ্ছে, যৌবন বয়সেই ঔরংজীবের মনে ধারণা জন্মেছিল, দারাই হচ্ছেন তাঁর প্রধান শত্রু এবং সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃহত্যা—এমন কি পিতৃহত্যা করাও অত্যন্ত স্বাভাবিক!

এই ঘটনার মধ্যে ঔরংজীব-চরিত্রের সমস্ত রহস্যের হদিস পাওয়া যাবে। বীজ থেকে বিষবৃক্ষের জন্ম হয়েছে তখনই, বাকি কেবল ফল ধরা।

সাত মাস পরে ভগ্নী জাহানারা ভ্রাতা ঔরংজীবের জন্যে পিতার কাছে ধরনা দিলেন। মেয়েদের মধ্যে জাহানারাই ছিলেন পিতার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী। তাঁর অনুরোধ সাজাহান ঠেলতে পারলেন না, ঔরংজীবের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে রাজপ্রতিনিধিরূপে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন গুজরাট প্রদেশে।

পাঁচ

—রোগশয্যায় সাজাহান—

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ। পরিপূর্ণ সুখ, সমৃদ্ধি ও গৌরবের মাঝখানে ভারতসম্রাট সাজাহান অকস্মাৎ সাংঘাতিক ব্যাধির আক্রমণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

সম্রাট বাইরে আর দেখা দেন না, দরবারও আর বসে না। রোগীর গৃহে রাজসভাসদদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রোগশয্যার পাশে যেতে পারেন একমাত্র দারাই।

হপ্তাখানেক ধ'রে চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টার পর সম্রাটের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত হ'ল বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তিনি শয্যা ছাড়তে পারলেন না। চিকিৎসকরা উপদেশ দিলেন বায়ুপরিবর্ত্তন করতে। দিল্লী থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল আগ্রায়। তবু অসুখ সারল না।

ইতিমধ্যে নিজের আসন্নকাল উপস্থিত হয়েছে ভেবে সম্রাট আমীর-ওমরাওদের আহ্বান ক'রে সকলের সামনে ঘোষণা করেছেন, তাঁর অবর্ত্তমানে সিংহাসনের মালিক হবেন যুবরাজ দারাই।

আগ্রায় এসে সম্রাট আশ্রয় গ্রহণ করেছেন দারার নিজস্ব প্রাসাদেই। দারা সেখানে আর কারুকে ঢুকতে দেন না, একাই সেবাশুশ্রূষা ক'রে পিতাকে নিরাময় ক'রে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন এবং সম্রাটের নামে নিজেই রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।

ওদিকে বাইরে গুজবের অন্ত নেই। দিকে দিকে জনরব উঠল,—সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দারা সে খবর গোপন রাখতে চান।

সুজা, মুরাদ ও ঔরংজীব এই সুযোগই খুঁজছিলেন, স্বরূপ প্রকাশ করতে তাঁরা আর বিলম্ব করলেন না।

বাংলাদেশের রাজপ্রতিনিধি সুজা সেইখানে ব'সেই নিজেকে ভারত-সম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেন।

গুজরাটের তখনকার রাজপ্রতিনিধি মুরাদও পিছনে প'ড়ে থাকবার পাত্র নন—তিনিও ধারণ করলেন ভারতসম্রাটের পদবী।

দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন ঔরংজীব। ভ্রাতাদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে ধূর্ত্ত ও সাবধানী। তিনি সহজে একেবারেই মুখোস খুললেন না। তিনিও সৈন্যাদি সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের তোড়জোড় করতে লাগলেন বটে, কিন্তু গাছে কাঁঠাল দেখেই গোঁফে তেল মাখতে চাইলেন না। অর্থাৎ প্রথমেই ধারণ করলেন না সম্রাট উপাধি।

মুরাদ ছিলেন তাঁর কাছেই এবং তিনি জানতেন ভাইদের মধ্যে মুরাদই হচ্ছে সব চেয়ে নির্ব্বোধ। তার উপরে তিনি উগ্র এবং গোঁয়ার-গোবিন্দ। কিন্তু তিনি ছিলেন রীতিমত যোদ্ধা, একবার রণক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ালেই তাঁর ধমনীর মধ্যে তৈমুরের রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটে উঠত। এমন লোককে সহজেই দলে টানা যায় এবং এমন লোককে দলে টানতে পারলে যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হবারও সম্ভাবনা।

অতএব ঔরংজীব মিষ্ট কথায় মুরাদকে বোঝালেন যে, দারা হচ্ছে অধার্ম্মিক, নমাজ পড়ে না, রমজানের উপবাস করে না, তার বন্ধু হচ্ছে হিন্দু যোগী, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ। সর্ত্ত হ'ল যে, আগে দুইজনে মিলে এমন নাস্তিক লোককে পথ থেকে সরাতে হবে, তারপর যুদ্ধে জয়লাভ করলে মুরাদ হবেন পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশের মুকুটধারী স্বাধীন নরপতি এবং সাম্রাজ্যের বাকি অংশ লাভ করবেন ঔরংজীব। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সর্ত্তের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন ব'লে ঔরংজীব পবিত্র কোরাণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে ভোলেননি। সরল বিশ্বাসী মুরাদও এই সর্ত্তে রাজি হয়ে গেলেন।

সবাই মিলে একজোট হয়ে দারাকে আক্রমণ করবার জন্যে সুজাকেও ফুসলে দলে ভেড়াবার ইচ্ছা ছিল ঔরংজীব ও মুরাদের, কিন্তু বাংলা অত্যন্ত দূরদেশ ব'লে ইচ্ছাটা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয়নি।

ইতিমধ্যে সাজাহান রোগমুক্ত হয়ে সমস্ত খবর শুনলেন। তাড়াতাড়ি স্বহস্তে পত্র লিখে সিংহাসনপ্রার্থী তিন পুত্রকে জানালেন যে, তিনি ইহলোকেই বর্ত্তমান এবং সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত। কিন্তু তাতেও ফল হ'ল না। পুত্ররা সন্দেহ করলেন, জাল পত্র পাঠিয়ে দারা তাঁদের ঠকাবার চেষ্টা করছে।

সম্রাটের সম্মতি নিয়ে দারা তখন সুজা, ঔরংজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক বৃহৎ ফৌজ প্রেরণ করলেন। তিন ফৌজের সঙ্গে গেলেন সাজাহানের প্রধান প্রধান খ্যাতিমান সেনাপতিরা। ফলে দারার কাছে আগ্রায় যে সেনাদল রইল, তাদের চালনা করবার মত যোগ্য সেনাপতির অভাব হ'ল অত্যন্ত।

এই গৃহযুদ্ধের সময়ে রোগদুর্ব্বল, জরাজর্জ্জর সাজাহানের অবস্থা হয়েছিল অতিশয় মর্ম্মান্তিক।

যারা এখন পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করতে উদ্যত, তারা প্রত্যেকেই তাঁর নিজের রক্তে গড়া পুত্র, কত আদরের ও স্নেহের নিধি। তাদের যে কোন একজনকে আঘাত করলে সে আঘাত বাজবে তাঁর নিজেরই বুকে।

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ভারতসম্রাট সাজাহান সাধারণ পিতার মতই কাতর ভাবে তাঁর সেনাপতিদের কাছে মিনতি জানালেন, যেন তাঁর পুত্রদের কোন অনিষ্ট না হয়, বিনা যুদ্ধেই মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের যেন যথাস্থানে ফিরে যেতে বলা হয়।

যুদ্ধ যখন বাধে, তখন সাজাহানের বয়স আটষট্টি। তাঁর প্রত্যেক পুত্রও তখন যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছেন—দারার বয়স হয়েছিল তেতাল্লিশ, সুজার বয়স একচল্লিশ, ঔরংজীবের উনচল্লিশ এবং মুরাদের তেত্রিশ।

ছয়

—ধরমাট ও সামুগড়—

ঔরংজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল প্রেরিত হয়েছিল তার সেনাপতি ছিলেন মহারাজা যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খাঁ ছিলেন তাঁর সহযোগী। উজ্জয়িনী নগরের নিকটস্থ ধরমাট নামক স্থানে দুই পক্ষের প্রথম শক্তিপরীক্ষা হয়। উভয় পক্ষেই সৈন্যসংখ্যা ছিল কিছু বেশী পঁয়ত্রিশ হাজার।

রাজপুত ও মুসলমান নিয়ে দারার সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র একতা। রাজপুতরা বীরের মত লড়তে ও মরতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং মনে মনে ঔরংজীবের পক্ষপাতী। তাই যুদ্ধ শেষ হ'লে দেখা গিয়েছিল, চব্বিশজন রাজপুত সর্দ্দার নিহত এবং মুসলমানদের মধ্যে মারা পড়েছেন একজনমাত্র সেনাপতি। মুসলমানারা কেবল যে ভালো ক'রে লড়েনি, তা নয়; লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চার-চারজন মুসলমান সেনাপতি শত্রুপক্ষে যোগদান করেছিল।

উপরন্তু ঔরংজীবের ফৌজে ছিল সুনিপুণ ফরাসী ও ইংরেজ গোলন্দাজরা, দারার বা সম্রাটের ফৌজে ছিল না আগ্নেয়াস্ত্র। কাজেই ধরতে গেলে একেলে কামানের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল সেকেলে তরবারিকে।

এমন যুদ্ধের ফল যা হওয়া উচিত, তাই হ'ল। হাজার হাজার রাজপুত সৈন্য প্রাণদান করলে বটে, কিন্তু জয়লাভ করতে পারলে না। যশোবন্ত সিংহকে রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করতে হ'ল।

জাহানারা বলেন, "আগ্রায় যখন খবর এল ধরমাটের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ঔরংজীব সদলবলে রাজধানীর দিকে ছুটে আসছেন, তখন বিপুল সম্পদের মধ্যেও হতভাগ্য সম্রাট সাজাহান আকাশের দিকে হাত তুলে আর্ত্ত কণ্ঠে ব'লে উঠেছিলেন—'হে ঈশ্বর, তোমারি ইচ্ছা!' "

তারপর তিনি নিজেই যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সেনাপতিদের আহ্বান ক'রে আদেশ দিলেন, "অবিলম্বে সৈন্য সমাবেশ কর!"

কিন্তু সম্রাটের পরামর্শদাতাদের মধ্যেও ঔরংজীবের চরের অভাব ছিল না। তারা বেশ জানত, সাজাহান স্বয়ং সেনাদলের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ালে বিলুপ্ত হবে বিদ্রোহী পুত্রদের সমস্ত আশা-ভরসা। অতএব তারা নানা মিথ্যা কারণ বা ভয় দেখিয়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে সম্রাটকে নিরস্ত করে।

দারা তাড়াতাড়ি ষাট হাজার নূতন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে ঔরংজীব ও মুরাদকে বাধা দেবার জন্যে অগ্রসর হ'লেন। এই নূতন সৈন্যরা দলে ভারি হ'ল বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল শিক্ষিত যোদ্ধার অভাব।

এবারও ফৌজের মধ্যে মুসলমান সেনানী ও সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই ছিল শত্রুপক্ষের চর বা ঔরংজীবের পক্ষপাতী। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের উনত্রিশ মে তারিখে সামুগড়ের প্রান্তরে যে যুদ্ধ হ'ল, তাতেও প্রধান অংশ গ্রহণ করলে রাজপুত যোদ্ধারাই—তারাই হিন্দুদের প্রিয় দারার স্বার্থরক্ষার জন্যে দলে দলে লড়তে ও মরতে লাগল এবং ফৌজের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান সৈন্য ছিল বিশ্বাসঘাতক, তারা মুখরক্ষার জন্যে করলে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় মাত্র।

ফলে এবারেও হ'ল যুবরাজ দারার শোচনীয় পরাজয়।

সাত

—যুদ্ধের পর—

সামুগড়ের যুদ্ধে সম্রাটের ফৌজ পরাজিত এবং ঔরংজীব ও মুরাদ সসৈন্যে আগ্রার দিকে ধাবমান, এই দুঃসংবাদ বহন ক'রে নিয়ে এল এক ফিরিঙ্গী ভগ্নদূত।

রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে পরাজিত, পরিশ্রান্ত ও দুঃখে মুহ্যমান দারা কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে আগ্রায় ফিরে এলেন বটে, কিন্তু দুর্গের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে নিজের প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

দুর্গের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহান—গভীর নিরাশার প্রস্তরীভূত মূর্ত্তির মত। প্রিয়পুত্র দারাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু উত্তরে দারা লিখে জানালেন,—"এই শোচনীয় দুর্দ্দশার দিনে সম্রাটের কাছে মুখ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার সামনে রয়েছে যে সুদীর্ঘ পথ, আপনার আশীর্ব্বাদ ও আদেশ পেলে আমি এখন সেই পথেরই পথিক হব।"

মর্ম্মাহত সাজাহানের মনে হ'ল, তাঁর আত্মা যেন দেহপিঞ্জর ত্যাগ ক'রে নিঃশেষ শূন্যতার মধ্যে বেরিয়ে যেতে চাইছে! কিন্তু শত্রুরা এখন হিংস্র শার্দ্দূলের মত অসহায় দারার বিরুদ্ধে বেগে ছুটে আসছে, তাঁর আর দুঃখপ্রকাশ করবারও অবসর নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্গ-প্রাসাদের ধনভাণ্ডার খুলে পুঞ্জ পুঞ্জ ধনরত্ন স্নেহাস্পদ দারার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আগ্রা থেকে দারা যাবেন দিল্লীতে। সেখানকার শাসনকর্ত্তার কাছেও সম্রাটের আদেশ গেল—দিল্লীর ধনভাণ্ডারের চাবি যেন দারার হাতে সমর্পণ করা হয়।

জন বারো অনুচর ও রক্ষী নিয়ে পলাতক দারা সহধর্ম্মিণী নাদিরা বানু ও সন্তানদের সঙ্গে বিপজ্জনক আগ্রা নগরী ত্যাগ করলেন। বিজয়ী সৈন্যদলের সঙ্গে নিষ্ঠুর ঔরংজীব আগ্রা অধিকার করতে আসছে, একবার তার কবলে গিয়ে পড়লে যে তাঁর মুক্তিলাভের কোন উপায়ই থাকবে না, এ কথা দারা ভালো

ক'রেই জানতেন।

তারপর আগ্রায় যে অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হ'ল, তার কথা এখানে বর্ণনা করবার দরকার নেই; কারণ আমাদের এখন যেতে হবে এই কাহিনীর নায়ক দারার পিছনে পিছনে।

তবে দু-চারটে কথা উল্লেখযোগ্য। ঔরংজীব আগ্রা অধিকার ও দুর্গ অবরোধ করলেন। তাঁকে বোঝাবার জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে ঔরংজীবের সঙ্গে সম্রাট দেখা করতে চাইলেন।

কিন্তু ঔরংজীব নারাজ।

তখন সম্রাট-কন্যা জাহানারা নূতন এক প্রস্তাব নিয়ে ভ্রাতা ঔরংজীবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। প্রস্তাবটি হচ্ছে এই ঃ

সম্রাটের ইচ্ছা যে, সাম্রাজ্য চার রাজপুত্রের জন্যে চার ভাগে বিভক্ত করা হোক্।

দারাকে দেওয়া হোক পাঞ্জাব ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলি।

মুরাদের জন্যে গুজরাট, সুজার জন্যে বঙ্গদেশ এবং ঔরংজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতানের জন্যে দাক্ষিণত্য।

সাম্রাজ্যের বাকি অংশ এবং সাজাহানের অবর্ত্তমানে সিংহাসনের অধিকারী হবেন দারার বদলে ঔরংজীব।

ঔরংজীব কিন্তু নিজের সংকল্পে অটল। জবাবে জানালেন, "দারা হচ্ছে ইসলামে অবিশ্বাসী ও হিন্দুদের বন্ধু। সত্য ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্যের শান্তির জন্যে দারাকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে আমি ছাড়ব না।"

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং সুদীর্ঘ সাত বৎসকাল আগ্রা দুর্গে বন্দীজীবন যাপন করবার পর তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স পূর্ণ চুয়াত্তর বৎসর।

মুরাদের সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলবার নেই। নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে ঔরংজীব যে তাঁকে স্বহস্তচালিত যন্ত্রের মত ব্যবহার করেছেন, নির্ব্বোধ মুরাদ প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে পারেননি। যেদিন তাঁর চটকা ভাঙল, সেদিন তিনি বন্দী। সে হচ্ছে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের পঁচিশে জুন তারিখের কথা। তিন বৎসর পরে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে পলায়নের চেষ্টা করেছিলেন বলে ঔরংজীবের ইচ্ছানুসারে কাজীর বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সুজাও করেছিলেন সিংহাসনের লোভে অস্ত্রধারণ। প্রথম যুদ্ধে তিনি দারার পুত্র সুলেমান সুকোর কাছে পরাজিত হন, কিন্তু তারপর তাঁর সঙ্গে দারার কাহিনীর আর কোন সম্পর্ক নেই। তারপর তিনি ঔরংজীবের কাছে হার মেনে ভারত ছেড়ে আরাকানে গিয়ে মগদের হাত মারা পড়েন, কিন্তু সে সব কথা হচ্ছে এখানে অবান্তর।

আট

—পলাতক ও বন্দী দারা—

অতঃপর দারার জীবনের কথা বলতে গেলে বলতে হবে কেবল দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনার কাহিনী। এতদিন জীবন ছিল তাঁর সুদীর্ঘ এক সুখস্বপ্নের মত, কিন্তু সামুগড়ের যুদ্ধের পর তিনি এ-জীবনে আর

এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সুখ-শান্তির ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দেখতে পাননি। সুখ আর দুঃখ, দুয়েরই দান পেয়েছিলেন তিনি অপরিমিত মাত্রায়।

দিল্লীতে এসে দারা আবার নূতন ফৌজ গঠনের জন্যে তোড়জোড় করতে লাগলেন। কতক সৈন্য সংগৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা হ'ল না সন্তোষজনক।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান সুকোকে বাইশ হাজার সৈন্য দিয়ে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত দুই সেনাপতি—মির্জ্জা রাজা জয়সিংহ ও দিলির খাঁ। দারা তাঁদের দিল্লীতে এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে বললেন।

নাদিরার মৃত্যু [পৃঃ ৭৬

কিন্তু তাঁদের আগে আগেই বিপুল এক বাহিনী নিয়ে দিল্লীর দিকে আসতে লাগলেন স্বয়ং ঔরংজীব। উপায়ান্তর না দেখে দারা প্রস্থান করলেন লাহোরের দিকে, সঙ্গে রইল তাঁর মাত্র দশ হাজার সৈন্য।

দিল্লীতে পৌছে ঔরংজীব প্রথমে নিজেকে ভারত-সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। তারপর যাত্রা করলেন লাহোরের দিকে।

দারা হতাশ ভাবে বললেন, "আমি ঔরংজীবকে বাধা দিতে পারব না। আর কেউ হ'লে এইখানে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতুম।"

দারা আবার পলায়ন করলেন মুলতানের দিকে। সেখানেও পিছনে পিছনে এলেন সদলবলে ঔরংজীব। দারা মুলতান থেকে পালালেন সক্কর সহরের দিকে এবং তারপর কান্দাহারের পথে এবং তারপর আবার স্থান থেকে স্থানান্তরে।

এমন সময়ে খবর এল সুজা সসৈন্যে আগ্রার নিকটবর্ত্তী হয়েছেন। দারার অবস্থা তখন একান্ত অসহায়, কারণ তাঁর অধিকাংশ সৈন্য হতাশ হয়ে তাঁর পক্ষ পরিত্যাগ করেছে। আপাততঃ কিছুকাল তিনি আর মাথা তুলতে পারবেন না বুঝে ঔরংজীব সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে সুজার বিরুদ্ধে করলেন যুদ্ধযাত্রা। কিছুদিনের জন্যে দারা পেলেন রেহাই।

পর বৎসর—অর্থাৎ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ। খাজোয়ার ক্ষেত্রে সুজাকে পরাজিত ও বিহারের দিকে বিতাড়িত ক'রে ঔরংজীব খবর পেলেন যে, দারা রাজস্থানে গিয়ে বাইশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ ক'রে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনিও যাত্রা করলেন দারার উদ্দেশে।

আজমীরের চার মাইল দক্ষিণে দেওরাই গিরিসঙ্কটের কাছে আবার দুই ভ্রাতার শক্তিপরীক্ষা হ'ল। এবারে দারা চারিদিক সামলে প্রাণপণে যুঝে প্রথমটা ঔরংজীবকে বেশ কাবু করেও শেষ পর্যন্ত আবার হার মানতে বাধ্য হলেন। এই হ'ল তাঁর শেষ প্রচেষ্টা। এরপর তিনি হয়ে পড়লেন একেবারেই নিঃস্ব ও শক্তিহারা।

তারপর দারা বাস্তুহারার মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে দিকে দিকে। কিন্তু তিনি যেখানেই যান, পিছনে লেগে থাকে শত্রুচর। প্রথমে তাঁর সঙ্গে ছিল দুই হাজার সৈনিক, কিন্তু ক্রমেই তারা দলে দলে বা একে একে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও পথকষ্ট সইতে না পেরে তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে গেল।

নির্জ্জল মরুপ্রদেশ—তৃষ্ণায় সর্ব্বদাই প্রাণ টা-টা করে, খাদ্য মেলাও দুষ্কর। হিন্দুস্থানের যুবরাজ চলেছেন দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদে ধুঁকতে ধুঁকতে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। তাঁর পরণে ময়লা সূতীর পোষাক, পায়ে আট আনা দামের জুতো, সঙ্গে আছে মাত্র একটি ঘোড়া, নারীদের ও মালপত্তর বহনের জন্যে গুটিকয় উট এবং মাত্র কয়েকজন বিশ্বাসী অনু [illegible]

তারপর দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য। তাঁর রুগ্না সহধর্ম্মিণী ও বিশ্ববিখ্যাত আকবর বাদসাহের প্রপৌত্রী নাদিরা বানু আর কষ্ট সইতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন। সে আঘাতে দারা একেবারেই ভেঙে পড়লেন। জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি বোলান গিরিসঙ্কটের নিকটস্থ দাদার নামক স্থানের আফগান জমিদারের কাছে পেলেন শেষ আশ্রয়। সে হচ্ছে ভয়াবহ আশ্রয়!

জমিদারের নাম মালিক জিওয়ান। কয়েক বৎসর আগে সম্রাট সাজাহান আদেশ দিয়েছিলেন, তাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু যুবরাজ দারার প্রার্থনায় প্রাণদণ্ড থেকে সে অব্যাহতি লাভ করে।

বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ মালিক জিওয়ান প্রচুর পুরস্কারের লোভে তার প্রাণরক্ষক দারাকেই আজ নিঃসহায় অবস্থায় পেয়ে গ্রেপ্তার ক'রে সমর্পণ করলে শত্রুপক্ষের হস্তে।

নয়

—দারার নগর-ভ্রমণ—

সম্রাট ঔরংজীব আদেশ দিয়েছিলেন, দিল্লীর রাজপথে আবালবৃদ্ধবনিতার সামনে মিছিল করে দারাকে দেখিয়ে আনতে হবে!

একটা কর্দ্দমাক্ত ছোট মাদী হাতী, তার পিঠের উপরে খোলা হাওদায় উপবিষ্ট পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং সম্রাট সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারা সুকো! ঠিক পাশেই ব'সে তাঁর চতুর্দ্দশবর্ষীয় দ্বিতীয় পুত্র সিপির সুকো।

দারার পরণে ধূলিধূসরিত কর্কশ ও নিকৃষ্ট পোষাক, মাথায় অতি দীনদরিদ্রের উপযোগী ময়লা পাগড়ী, কণ্ঠে নেই আজ আর রত্নহার, হস্তযুগল মুক্ত বটে, কিন্তু পদযুগল শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পিছনে ব'সে আছে নগ্ন কৃপাণ হস্তে কারারক্ষক নজর বেগ।

প্রতপ্ত সূর্য্য মাথার উপরে করছে প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ। দিল্লীর এই রাজপথই একদিন দেখেছে যুবরাজ দারার সুখসৌভাগ্য ও বদান্যতা। অপমানে মাথা নুইয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে দারা নিশ্চেষ্ট ভাবে ব'সে আছেন স্তম্ভিতের মত।

পথের ধার থেকে জনৈক ভিখারী কাতর কণ্ঠে ফুকরে উঠল, "হে দারা, যখন তুমি প্রভু ছিলে, তখন সর্ব্বদাই আমাকে ভিক্ষা দান করতে। কিন্তু আজ আর তোমার দান করবার কিছুই নেই।"

সেই সময়ে মাত্র একবার মুখ তুলে ভিখারীকে দেখে দারা নিজের কাঁধ থেকে আলোয়ানখানা খুলে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন।

আলোয়ান খুলে নিক্ষেপ করলেন।

দারাকে হাস্যাস্পদ করবার জন্যেই জনসাধারণের সামনে বার করা হয়েছিল। কিন্তু ফল হ'ল

উল্টো। সেই বিপুল জনতার পুরুষ, নারী ও শিশুরা এমন তারস্বরে সম্মিলিত কণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগল, যেন তারা নিজেরাই পড়েছে কোন ভীষণ দুর্ভাগ্যের কবলে! দানশীলতার জন্যে দারা ছিলেন জনতার মানসপুত্রের মত!

কলম-কাটা ছুরি নিয়ে... [পৃঃ ৭৯

মিছিলের ভিতরে ক্রুদ্ধ জনতা বিশ্বাসঘাতক মালিক জিওয়ানকেও লক্ষ্য করেছিল। চরম অকৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ সে এখন লাভ করেছে পরম সম্মানজনক 'বক্তিয়ার খাঁ' উপাধি এবং একহাজার

অশ্বারোহী সৈন্যের নায়কত্ব। কিন্তু মনে মনে গুমরেও কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস করেনি, কারণ মিছিলের সঙ্গে ছিল অসংখ্য সশস্ত্র সৈনিক।

কিন্তু পরদিন নূতন খাঁ-সাহেব যখন নিজের দলবল নিয়ে ঔরংজীবের রাজসভায় হাজিরা দিতে যাচ্ছিল, ক্ষিপ্ত জনসাধারণ চারিদিক থেকে ছুটে এসে তখন তাকে আক্রমণ করলে, তার কয়েকজন অনুচরকে একেবারে মেরে ফেললে এবং তাকেও যে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই; কেবল সদলবলে কোতোয়াল এসে পড়ায় কোনক্রমে সে প্রাণে বেঁচে গেল।

দশ

—শেষ দৃশ্য—

আবার হ'ল বিচার-প্রহসন। বড় ভাই দারার উপরে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন সেজো ভাই ঔরংজীব।

রাত্রিবেলা। পুত্র সিপির সুকোর সঙ্গে কারাগৃহে বসে ছিলেন দারা, এমন সময়ে সেখানে এসে দাঁড়াল সশস্ত্র নজর বেগ ও তার যমদূতের মত অনুচররা।

তাদের মুখ দেখেই দারা ব'লে উঠলেন, "বুঝেছি, তোমরা আমাকে হত্যা করতে এসেছ!"

নজর বেগ বললে, "না, আমরা সিপির সুকোকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

কিন্তু বালক সিপির বাবাকে ছেড়ে কিছুতেই যাবে না, সে কাঁদতে কাঁদতে দারার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। দারাও সক্রন্দনে পুত্রকে বদ্ধ করলেন প্রাণপণ আলিঙ্গনের মধ্যে, কিন্তু নির্ম্মম ঘাতকরা সিপিরকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে চ'লে গেল।

দারা তখন একখানা কলম-কাটা ছুরি নিয়ে আততায়ীদের একজনকে আহত করলেন এবং অন্যান্য সকলের উপরেও করতে লাগলেন ঘন ঘন মুষ্টির আঘাত—ভেড়ার মত তিনি প্রাণ দিতে নারাজ।

কিন্তু একদল সশস্ত্রের সঙ্গে একজন নিরস্ত্রের যুদ্ধ কতক্ষণ আর চলতে পারে? দারার দেহের উপরে হ'তে লাগল বারবার শাণিত ছোরার আঘাত।

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছিল সিপিরের যন্ত্রণাপূর্ণ তীব্র ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু তার মধ্যেই দারার কারাকক্ষ হয়ে পড়ল একেবারে নিস্তব্ধ। সেখানে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের লেখন, মেঝের উপরে রক্তগঙ্গার ঢেউ, দিকে দিকে কেবল রক্ত আর রক্ত আর রক্ত! এবং এই বীভৎস ও ভয়াল রক্তোৎসবের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে প'ড়ে আছে সম্রাটপুত্রের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ!

সিপিরের বুকফাটা কান্না থামল না। আজও পাষাণ-কারাগারের অন্দরে বন্দী হয়ে আছে সেই মৌন ক্রন্দনরব। প্রাণের কাণে শোনা যায় সেই নীরব রোদন!

ওদিকে দারার ছিন্নমুণ্ড স্বচক্ষে না দেখে ঔরংজীব নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। তাঁর কাছে প্রেরিত হ'ল দারার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মুণ্ড।

সেই কাটা মুণ্ড দেখে ছোট ভাই ঔরংজীব কি বলেছিলেন, ইতিহাসে তা লেখা নেই। তবে তিনি যে কিছুমাত্র অনুতপ্ত হননি, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

ডাকের মূল্য

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ধরণীর মাঝে কি আশ্চর্য্য আছে বা অতঃপর,
গুহামুখ হতে বাহিরায় ধবনি, "আকবর, আকবর!"
দুরধিগম্য মরু-পর্ব্বত, জনহীন, নিরালায়
রাখাল বালক সেই শব্দেতে চমকিয়া উঠে চায়!
রটিল বারতা—যত নরনারী দূরগ্রাম নগরীর
জমায় গুহার মুখেতে নিত্য একটা মেলার ভিড়।
করিতে পারে না নির্ণয় কিছু পায়নাক সন্ধান,
পাহাড়ের মুখে হেন ভাষা দিল কোন্ সে শক্তিমান?

(২)

পল্লী হইতে সংবাদ গেল দিল্লীর দরবারে,
হোমরা-চোমরা আমীর-ওমরা হাসিয়া উড়ায় তারে।

বাদশাহ এই জবর খবর শুনিয়া কহেন হাসি—
"বান্দার ডাক কেন যে পড়িল চল সবে দেখে আসি!"

সুদূরের সেই অদ্ভুত ডাক পশিতেছে যেন কানে,
রওনা হলেন বাদশাহ সেই কৌতুকী আহ্বানে।
দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রেতে আর পাহাড়ের গায়ে,
শ্রান্ত ক্লান্ত দাঁড়ালেন গিয়া 'ফণি-মনসার' ছায়ে!

(৩)

উঠিতেছে ধ্বনি ক্ষীণ কর্কশ শ্রুতিকটু অতিশয়,
"একি প্রহেলিকা? নরের কণ্ঠ শুনি যেন মনে হয়!"

কত কুতূহলী বাদশা তখন দাঁড়ায়ে গুহার আগে,
বলেন, "হুজুর, কি লাগি তলব? নফর আদেশ মাগে!"
পশ্চাৎ হতে সন্ন্যাসী আসি চাহি তাঁর মুখপানে—
বলেন, "ডাকের মূল্য বুঝেছ, বুঝিতে পেরেছ মানে?
ডাকে ভগবান আসে বলেছিনু করনিকো বিশ্বাস,
মনে পড়ে তব অহমিকা ভরা সে কুটিল পরিহাস?"

(৪)

"উপেক্ষার এই ডাকে ছুটে যদি আসেন সাহানশাহা,
নিখিলের নাথ ডাকে যে আসিবে অসম্ভব কি তাহা?
জেনো মানুষের জ্ঞানের বাহিরে এমন জিনিষ আছে,—
যাহার প্রবল আকর্ষণেতে ভগবান আসে কাছে।
প্রবল-প্রতাপ বাদশাহ তুমি, কতই অহঙ্কার,
তবু এই ডাকে গুহার দুয়ারে আসিয়াছ এইবার।
'আসে ভগবান, নিশ্চয় আসে, নিশ্চয় আসে ডাকে',
যে বলে এ কথা, সত্যই বলে, বিশ্বাস করো তাকে।"

ছোড়দি

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শেষ পর্য্যন্ত মাধবকে আসতে হল দাদা বউদির কাছেই।

পৌছে দিয়ে গেল ঘোষপুরের ছিদাম ঘোষ। তার মুখে শোনা গেল, মাধবের মা আজ কয়দিন দেহ রক্ষা করেছেন। খবরটা তারা একটা পোষ্টোকার্ডে লিখে পাঠিয়েছিল, সে খবর সোমেন পায় নি। শুনে অবাক হয়ে যায় পাড়াগাঁয়ের মানুষ ছিদাম ঘোষ। পোষ্টাপিসের নাকি আর কাজে ভুল হয় না! গাঁয়ের লোকে বলে—স্বরাজ হয়ে আমাদের আর যা হোক, তা হোক, ডাকের ব্যবস্থা খুব ভালো হয়েছে, চিঠি-পত্তর আর মারা যায় না।

কিন্তু তা নিয়ে আক্ষেপ করে তো ফল নেই, তাই শেষ পর্য্যন্ত ছিদাম ঘোষ বলে, "যাক, তোমার ভাইকে তোমার কাছেই দিয়ে গেলুম ছোটকত্তা! আমাদের গাঁয়ে কেই বা দেখবে, কেই বা শুনবে! তবু এ কয়দিন ভশ্চাচ মশাইরা ছিলেন, যা হোক করে ছেলেটার হবিষ্যিপত্তর হয়েছে। আমরা যে যা পেয়েছি, দু-চার পয়সা করে তুলে কোন রকমে নমো নমো করে ছেরাদ্দোটা সেরে দিয়েছি। ছেরাদ্দোর ভাবনা তোমায় আর করতে হবে না—সে দায় চুকেছে। রইলো তোমার কাছে, আমাদের দায় হতে আমরা খালাস।"

দায় খালাস হয়ে ছিদাম ঘোষ ফিরলো তার গাঁয়ে, কিন্তু যে দায় সে চাপিয়ে গেল সোমেনের মাথায় তাতেই সে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে।

দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে রয়েছে সুলেখা স্বামীপুত্র নিয়ে, এর মধ্যে এলো ধূমকেতুর মতই মাধব।

আট-নয় বছরের ছেলে—অজ পাড়াগেঁয়ে ভূত। মাধবের মা ছিলেন সোমেনের বিমাতা। মাতৃহারা এক বছরের ছেলে সোমেনকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন সোমেনের পিতা, বাধ্য হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে হয়। বিমাতা এসেই মাতৃহীন শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, ছেলের জন্য পিতাকে আর

ভাবতে হয় নি।

এই মাকে সৎমা বলে কোনদিন ভাবতে পারে নি সোমেন,—ভাবলো সুলেখাকে বিবাহ করার পরে। কলকাতার মেয়ে সুলেখা পনের বৎসর আগে বধূ হয়ে গিয়েছিল ঘোষপুরে, প্রথম বিভেদ জাগিয়ে তুললো সে।

কথা আছে—হাজার টাকা শিখানে
কান ভাঙ্গানি পিছনে।

অনবরত চুকলি শুনতে শুনতে সোমেন বেঁকে বসলো এবং একদিন মাকে বেশ দশকথা শুনিয়ে দিয়ে স্ত্রী ও ছয় মাসের পুত্রসহ কলকাতায় চলে এলো। কোন একটা অফিসে আগেই কাজে লেগেছিল। একটা বাসা করে স্ত্রীপুত্রসহ সে রইলো, বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখলো না।

সে আজ সাত বৎসর আগেকার কথা।

মা প্রথমে কিছুকাল তিন-চারখানা পত্র দিয়েছিলেন, উত্তর না পেয়ে আর পত্র দেন নি। গাঁয়ের কেউ কলকাতায় এলে মায়ের অনুনয়-বিনয়ে বাধ্য হয়েই সোমেনের খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়ে দিতো। সোমেন মা-ভাইয়ের খোঁজ না নিক, মা গোপনে তার খোঁজ নিতেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন—"আমার যত দুঃখ-কষ্টই হোক ঠাকুর, সোমা যেন ভালো থাকে, সুখে থাকে! তার উন্নতি হোক—আমার মাথার যত চুল, তত বছর তার পরমায়ু হোক!"

সেই মা মৃত্যুবরণ করেছেন, গাঁয়ের প্রত্যেকটি লোককে অনুরোধ করে গেছেন—তাঁর মরণের পরে তাঁর খোকনকে যেন তার দাদার কাছে কেউ পৌঁছে দিয়ে আসে—কারণ, দাদা ছাড়া তার আর কেউ নেই।

সোমেন একটু অন্যমনস্ক হয় বই কি! হয়তো পূর্ব্বাপর সব কথাগুলো তার মনে পড়ে!

(২)

ছোট্ট একখানা আধময়লা ধুতি, গায়ে একটা জামা নেই, ছেঁড়া একটা গেঞ্জি—এতখানি ধুলোমাখা ফাটা-ফাটা পা; তার উপর নেড়া মাথা, সারা গায়ে এক ইঞ্চি করে পুরু ময়লা,—এম্‌নি ভাবেই এসেছে মাধব।

আট-নয় বছরের ছেলে, না জানে সভ্যতা, না জানে লেখাপড়া! 'ক' বলতে 'ব' চেনে না, নিজের নামটা কোন রকমে বলে যায়।

সুলেখা অধীর হয়ে ওঠে, বলে, "বিদেয় কর—বিদেয় কর এ পাপ। লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? পরিচয় দেবে কি? ওই পাড়াগেঁয়ে গাড়োল ভূতকে নিজের ভাই বলে লোকের কাছে পরিচয় দিতে পারবে তুমি?"

সোমেন মুখে শুধু বলে, "বিদেয় করব কোথায়? ওর যে কেউ নেই যেখানে পাঠাতে পারি।"

মাধব বুঝতে পারে—সে এ সংসারে এসে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। এদের শান্ত জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হতো, সে এসে পড়ায় ঝড় উঠেছে!

দাদা বউদির নিত্য ঝগড়া চলছেই।—দাদার আট বছরের ছেলে পরাণ পর্য্যন্ত তাকে এড়িয়ে চলে। বউদির বোন-সম্পর্কীয়া বিধবা শান্তি যদি এ সংসারে না থাকতো—মাধব হয়তো খেতে না পেয়ে

মরে যেতো।

ঠিক তারই মত দুর্ভাগা শান্তি! বিধবা হওয়ার পর গাঁয়ের বাড়ীতে বড় দুঃখেই দিন কাটছিল তার। রাঁধুনীর দায় এড়াবার জন্যই সুলেখা তাকে নিয়ে এসেছে। বিধবা মানুষ, খাওয়া-পরার কোন বালাই ছিল না,—সুলেখা সংসারের দিক দিয়ে ছিল পরম নিশ্চিন্ত। সুলেখার পুত্র পরাণ সবেধন নীলমণি, অত্যন্ত শান্ত। দুষ্টামি থাকলেও প্রকাশ্যে সে রেখে ঢেকে চলে। হাসে কম, কথা বলে কম,—তবু এ ছেলের পরিচয় শান্তি যেমন পেয়েছে, এমন আর কেউ পায় নি।

নেহাৎ বাড়ীতে এসে রয়ে গেল আর লোকজন আসা-যাওয়া করে, নোংরা মাধবকে বার করতে লজ্জা করে, তাই সুলেখা সোমেনকে দিয়ে একটা হাফ-প্যান্ট ও একটা শার্ট আনিয়ে দিয়েছে।

পরাণের জামার উপর জামা, প্যান্টের উপর প্যান্ট! জুতার উপর জুতা রাখবার একটা র‍্যাক আছে, অন্ততঃ পক্ষে আট-দশ জোড়া জুতা সেখানে সাজানোই থাকে।

মাষ্টারের কাছে পড়ে সে—দরজার বাইরে বসে মাধব নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। হয় তো ইচ্ছা করে—অমনি করে সেও পড়ে। কিন্তু সে ইচ্ছা তার অপূর্ণই থেকে যায়। মনে পড়ে, মায়ের বড় ঝোঁক ছিল তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে গড়বেন। সেই আশা নিয়ে ছোট ছেলেটির হাত ধরে একদিন তিনি ভবানী মাষ্টারের বাড়ী গিয়ে উঠেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর অনুনয়ে বাধ্য হয়েই মাষ্টার ছেলেটিকে পড়াবার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের আশা পূরলো না, মাস তিনেক পরেই মা যে হঠাৎ মারা যাবেন তাই বা কে জানতো?

মরণ যে কি জিনিষ, মাধব তাই জানতো না। আট-নয় বৎসর বয়স হলেও মা তাকে কিছু জানতে দেন নি, সযত্নে বুকের আড়ালে তাকে লুকিয়ে রেখেছেন।

এখনও মাধব ভাবে, মরলে মানুষ কি ফিরতে পারে না? মাকে সে কতবার ডাকে, কই মা তো আসে না একবারও! মাকে সে একবার জিজ্ঞাসা করতে চায়—কেন মা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল তাকে ফেলে? মুখ বুজে সে ফাই-ফরমাস খাটে। দোকান-বাজার করা হতে বড়দা ও পরাণের জুতায় পালিস করা পর্য্যন্ত সে করে।

কিন্তু তাতেও তো কেউ খুসি হয় না। এতটুকু এদিক ওদিক হলে দাদা চুল ধরে টানে, কান মলে দেয়;—অবশ্য চড়-চাপড়টা আজও খেতে হয় নি। সেটা খেতে হয় প্রায় সমবয়সী পরাণের কাছে। মায়ের সমান বউদি তার, কিন্তু কোনদিন সে হাসিমুখে একটা কথা বলে না! তার উপর এতটুকু কাজের গাফিলতি হলে কি গালাগালিই না শুনতে হয় তাকে।

সেই ঘোষপুর গাঁখানার জন্যই মনটা কাঁদে।

সেই পুকুর ডোবা, আঁকাবাঁকা সরু পথ, গাছ লতাপাতা।—তাদের সেই ভেঙ্গে-পড়া ঘরখানা—

মাধবের ঠোঁট দুখানা থর্ থর্ করে কাঁপে, অকস্মাৎ কখন চোখ ছাপিয়ে ঝর্ ঝর্ করে চোখের জল ঝরে পড়ে।

কদাচিৎ পরাণের চোখে পড়লে সে হাততালি দিয়ে হাসে—"বুড়ো ছেলে কাঁদছে মা, বুড়ো ছেলে কাঁদছে দেখ!"

বক্রমুখে সুলেখা বলে, "তা কাঁদবে না কেন? এখানে যে আমরা বড্ড অযত্ন করছি, খেতে দিচ্ছিনে, পরতে দিচ্ছিনে। লোকের কাছে বলা তো চাই! লোকে আমাদের নিন্দে না করলে চলবে কেন? তা

অতয় দরকার কি বাপু? গলায় একখানা ক্যানেস্তারা বেঁধে বাজাতে বাজাতে পাড়া ঘুরে আয়, লোকে শতকান দিয়ে শুনুক!"

তারপর যেন স্বগতোক্তিই করে, "হবে না কেন, হাজার হোক সৎভাই তো! ওর মা, চিরকাল জ্বালিয়ে খেয়েছে, ওই বা খাবে না কেন? এখনও হয়েছে কি, সবে তো ড্যাম, এর পর জাতসাপ যখন ফণা তুলবে—তখন হাতে হাতে ফল পাবে তোর.বাবা, আমার আর কি?"

ক্ষুদ্র মাধব এসব কথা বুঝতে না পারলেও বোঝে, বউদি তার মাকে নিন্দা করছে। লজ্জায় ও অপমানে তার চোখের জল কখন শুকিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সে সরে যায়।

(৩)

ছোট ছেলেটার লাঞ্ছনা-নির্য্যাতন শান্তি সইতে পারে না।

সেদিন ক্ষুধার তাড়নায় খেতে বসে চোখের জলে থালা ভিজিয়ে উঠে গেছে মাধব। শান্তির একাদশী, হেঁশেলের ভার সুলেখার হাতে। সেদিন ভুল করে মাধবের চাল নেয় নি সে। কাজেই মাধব যেমন সকলের খাওয়ার পরে খেতে এসেছে, তেমনই বুঝুক এখন মজা!

সহ্য করতে পারে নি মাধব; আর্দ্র অথচ রুক্ষ কণ্ঠেই বলেছিল, "বা রে, আমি কি ইচ্ছে করে আসি নি? দাদা যে আমাকে তার জুতো সেলাই করিয়ে আনতে পাঠিয়েছিল। আমি কি জানি এর মধ্যেই তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে?"

অসহ্য বেদনায় সে বলে ফেলে চরম দুঃসাহসীর মত, "প্রায়ই তো এই কয়টা করে ভাত দাও, ভাত চাইলে বল—ভাত নেই।"

বলতে বলতে তার চোখ উপছে জল পড়ে!

সুলেখা যেন আকাশ হতে পড়লো! কতক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর গালে হাত দিয়ে পরম বিস্ময়ে বলে, "তুই একেবারে অবাক্ করলি যে মাধব! আমি তোকে আধপেটা খেতে দেই এই কথা তুই বলছিস? ওমা মা, আমি কোথায় যাব! এ যে দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি আমি, এখন কালবিষ ঢালছে। আসুক তোর দাদা, আমি সব কথা বলব এখন,—যা হয় সে বিচার করুক! হয় তোকে বিদেয় করুক, নয় আমিই ছেলে নিয়ে কোথাও চলে যাই। খাল কেটে কুমীর এনেছি, আমার সর্ব্বোনাশ করে তবে ছাড়বে। তবু এমন সর্ব্বনেশে ছেলেরও আবার দালাল জোটে!"

গোপনে থাকলেও শান্তি বোঝে সুলেখা তাকেই কটাক্ষপাত করে কথাটা বললে। ইদানীং মাধবকে নিয়েই হয়েছে শান্তির জ্বালা, দিদির সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাধছে যার ফলে রান্নাঘরের কর্ত্তৃত্ব সুলেখা আবার নিজের হাতে নিতে বসেছে।

অভিমানে ও দুঃখে শান্তির চোখে জল আসে।

মাধব তার কে? বরং দিদিরই দেওর, সোমেনের সহোদর না হোক—ভাই তো বটে। আর কতটুকুই বা ছেলে,—তার ওপর এই নির্য্যাতন কেন? ভালো-মন্দ দূরে থাক্,—পেট ভরে দুটো ভাত দিতেও দিদি চায় না! স্পষ্টই বলে—"এ বাপু রেশনের চাল, ছিদেম ঘোষের ক্ষেতের ধানের চাল নয়। পয়সা ফেল তবু দুটো চাল মাপ ছাড়িয়ে উঠবে না, কড়ি ফেলেও তেল মেলে না, কাজেই পেটের এক কোণ খালি করে রাখতেই হবে।"

কিন্তু স্বামী, পুত্র এবং নিজের বেলায় এক কোণ খালি থাকে না, শান্তি সেটুকু লক্ষ্য করে; মনের ক্ষোভে সে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরে, তবু দিদি বা দাদামণিকে একটি কথা বলবার ক্ষমতা তার নেই। নিজেই সে তাদের অন্নধ্বংস করে যে!

নিজের একবেলার খাওয়াও সে কমায়। সেই ভাত কয়টি বাটিতে করে লুকিয়ে রাখে, দুপুরে সোমেন যায় অফিসে,—সুলেখা পুত্রকে স্কুলে পাঠিয়ে ঘুমোয়, সেই ফাঁকে সে মাধবকে রান্নাঘরে ডেকে এনে খাইয়ে দেয়। ধরা পড়ে যায় একদিন।

অকস্মাৎ সুলেখা রান্নাঘরে এসে মাধবের খাওয়া দেখতে পায়, একেবারে নির্ব্বাক হয়ে যায় সে।

তারপরই হয় বিস্ফোরণ—"ছি ছি ছি! এমনি করে তুমি আমার হাতে ভিক্ষের মালা দিচ্ছো শান্তি, তা তো আগে জানতাম না! তাই তো বলি আমার রেশনের বাঁধা-ধরা চাল এত শীগ্‌গির ফুরোয় কেন? আবার আমায় চাল কিনতে হয় কেন? বিকেলের তরকারী রোজ কমে যায়, মাছে টানাটানি পড়ে! তুমি যে রোজ আদুরে দুলালকে একপ্রস্থ করে খাওয়াও দুপুরে—তা তো জানা নেই! তাই তো বলি আমার পরাণ দিন দিন শুকিয়ে কাঠিপানা হয়ে যায় আর আদুরে দুলাল আমার কি খেয়ে 'গত্তি' বাগাচ্ছে! ঘেন্নার কথা—লজ্জার কথা—আমার সম্পর্কে বোন তুই, দুঃখে কষ্টে না-খেয়ে মরছিলি; তোর ভালোর জন্যে এনে রাখলাম—শেষে তোরই কিনা এই কাণ্ড? কোন্ লজ্জায় তোর ভগ্নীপতিকে এ কথা আমি বলব বল্ দেখি?"

একেবারে নির্ব্বাক্ হয়ে যায় সে।

সুলেখা দুপ্ দুপ্ করে চলে যায়। মেদিনী কেঁপে ওঠে, কেঁপে ওঠে দুটো অসহায় বুক।

শান্তি ভাতমাখা হাতে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে থাকে, মুখখানা তার একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে! আর মাধব বাটির উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে! ঘৃণায় লজ্জায় সে আর ছোড়দির পানে তাকাতেও পারছে না!

পৃথিবী যে কি, সে পরিচয় পায় নি মাধব। গ্রামের সবাই ছিল তার আত্মপরিজন—এক বাড়ীতে কিছু হলে গাঁয়ের ছেলের হতো সে বাড়ী নিমন্ত্রণ। মানুষের যে পেট ভরে খেতে নেই, সেটা মাধব জেনেছে বারাকপুরে দাদা-বউদির কাছে এসে!

কিন্তু এতেই কি নিস্তার আছে? পরাণ হা হা করে হাসে, পাড়ার আর ছেলেদের ডেকে জানায়—"হাঁড়িখেকো কুকুর তোরা দেখেছিস তো? ওই দেখ, রোজ দুপুরে লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁড়ির ভাত-তরকারী নিয়ে খায়!"

মাধব দাঁতের উপর দাঁত রেখে বিড় বিড় করে তার নিজের ঘাড়েই দোষ নেয়! সে কাউকে বলে না যে, তার ছোড়দি তাকে খেতে দেয়। ছোড়দিকে সে প্রাণপণে বাঁচিয়ে চলে।

(৪)

সেই ছোড়দিও বিদায় নিলো একদিন, বোন-ভগ্নীপতির বাড়ীর অপমান সইতে পারলে না শান্তি।—এর চেয়ে সেই পাড়াগাঁয়ে ঘর নিকিয়ে, বাসন মেজেও একবেলা খেয়ে থাকা, তাই তার কত ভালো!

নিঃশব্দে মাধব চোখের জল ফেলে।

যাত্রার আগে শান্তি তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল, তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "আমি যাচ্ছি মাধু! তোকে এখানে থাকতেই হবে—আমার তো সে বাধ্য-বাধকতা নেই। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, এদের কথার অবাধ্য হলে অনর্থক দুঃখ-কষ্ট পাবি।—যে যা বলবে সব সয়ে যাবি, একটা উত্তর করবিনে,—আমার গায়ে হাত দিয়ে এই কথা বল্ ভাই!"

মাধব তার কোলের ওপর একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, ফুলে ফুলে শুধু কাঁদে। মনে মনে ভাবে, যাকেই সে ভালোবাসে সেই চলে যায়? ভালোবাসতো মাকে—মা কেমন চলে গেল! ভালোবাসলো ছোড়দিকে—সেই মায়ের মত ছোড়দিও তাকে আজ ছেড়ে চললো! তাকে দেখবার মত আর কেউ রইল না।

স্নেহময়ী ছোড়দির চোখও শুষ্ক ছিল না। তবু সে নিজেকে সামলে নিলে, আর্দ্রকণ্ঠে বললে, "তুই বড় হয়েছিস মাধু, অমন করে কাঁদিসনে। কেউ দেখলে, ঠাট্টা করবে।"

মাধব চোখ মোছে, আর্দ্রকণ্ঠে বললে, "আমি তোমার সঙ্গে যাব ছোড়দি, আমায় নিয়ে চল।"

বড় দুঃখেই শান্তি হাসে, বললে, "কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে চাইলে তোর দাদা বউদি যেতে দেবেন কেন? আমার সঙ্গে তোর সম্পর্ক তো ওদেরই নিয়ে। পাগলামি করিসনে মাধু,—যাবি কোথায়? শত হলেও এরাই তোর আপন জন।"

মাধব নিঃশব্দে শুধু চোখের জল ফেলে। শান্তি বিদায় নেয়।

সুলেখা একটা নিঃশ্বাস ফেলে, তারপর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললে, "শুনছো—ওই যে কথা আছে না—'মার পোড়ে না পোড়ে মাসী, ঝাল খেয়ে মরে পাড়াপিরত্তিবাসী', আমার হয়েছে তাই! নইলে

ওই ছেলের দাদা-বউদি আমরা—আমরা গেলুম ভেসে, শান্তি এলো ওপর টপকে মোড়লী করতে! ছেলেটা হতো ভালো, ওই শান্তির আদরেই ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল!"

পরাণ খবর দেয়—"মাধুকাকা কিন্তু খুব কেঁদেছে।"

"কাঁদবে না? অমন করে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াবে কে, এক কেঁড়ে ভাত ও বড় বড় মাছের পেটী!"

দেখেশুনে মাধব কতকটা সচেতন হয়েছে বইকি! ভুলে গেছে সে খেলাধুলা।—সেদিন পরাণের জুতোজোড়াটা কালি দিয়ে ব্রাশ করতে গিয়ে নিঃশব্দে খানিকটা কেঁদে নিয়েছিল।

মনের মত সুন্দর জুতোজোড়া; মনে পড়ে ঘোষপুর থাকতে রাম ভশ্চাযের ছেলে টুনুর পায়ে এমনই জুতো দেখে সে মায়ের কাছে আবদার করেছিল, আর কিছু না হোক—একজোড়া ওই রকম জুতো তার চাই। মা তাকে কোলের মধ্যে নিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছিলেন। মায়ের ব্যথা বুঝতে পেরে তারপর সে আর জুতোর কথা মুখে আনতে পারে নি।

চুপি চুপি পরাণের জুতোজোড়াটা সে একবার পায়ে দিলে, তারপর আস্তে আস্তে জুতো পায়ে ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করে।

ঠিক এমনই সময় ঘরে এসে পড়ল সুলেখা! ব্যাপার দেখে প্রথমে একটু স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর বলে, "কুঁজোর ইচ্ছা করে চিৎ হয়ে শুতে!" ললাটে করাঘাত করে সুলেখা।

সেদিন মাধবের অদৃষ্টে পর্য্যাপ্ত প্রহার তো জুটলোই, তা ছাড়া জুটলো না কপালে একটু অন্ন। বাগানে বসে ফুলে ফুলে কাঁদে মাধব। আজ ছোড়দি নেই, চুপি চুপি কে এসে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবে, তাকে সান্ত্বনা দেবে?

একখানা পত্র যদি কোন রকমে ছোড়দিকে দেওয়া যায়! ছোড়দি তার কষ্ট শুনে নিশ্চয়ই আসবে—কিন্তু সেই পত্রই বা সে লিখবে কেমন করে? কোথায় পাবে সে পোষ্টকার্ড, কোথায় পাবে সে কালি-কলম?

এই একটি মাত্র মানুষ—ছোড়দিকেই সে পেয়েছিল যে তার মায়ের অভাব ঘুচিয়েছে!

অবশেষে সুযোগ আসে—একখানা পোষ্টকার্ড খুঁজে বেড়াতে মিলে যায়, সোমেনের জামার পকেটে পায় সে পোষ্টকার্ড। কিন্তু লেখা নিয়েই হয় মুস্কিল। তার বিদ্যায় পত্র লেখা চলে না।

ছোড়দির ঠিকানাটা সে পরাণের কাছ হতে যোগাড় করেছে, শেষ পর্য্যন্ত পরাণেরই হাতে পায়ে ধরে তাকে দিয়েই সে পত্রখানা লেখালে। বানান করে করে নিজের কারদানি দেখাবার জন্য বড় বড় অক্ষরে সে লিখলে—"তুমি কবে আসবে ছোড়দি? আমার বড় কান্না পায়, তুমি তাড়াতাড়ি এসো!"

পত্র ডাকে দিয়ে ফিরতেই ধরা পড়লো মাধব। পরাণ এর মধ্যে বাড়ীতে জানিয়ে দিয়েছে—সে পত্র লিখতে পারে, এই তো মাধুকাকার পত্র লিখে দিলে!

সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টকার্ডের খোঁজ পড়ে।

সেদিন প্রথম সোমেন মাধবের গায়ে হাত দিলে—দুই কান মলে, কষে চারটি চড় বসিয়ে সোমেন তাকে ঘড়ি ধরে দুই ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলে।

(৫)

ছোড়দির পত্র আসে, সে লিখেছে, সামনের মাসে মহালয়ার দিনে এখানে সে গঙ্গাস্নান করতে আসবে।

সুলেখা চেঁচিয়ে ওঠে, "তা আসবে না কেন? এমন খাসা জায়গা—থাকা-খাওয়ার কষ্ট নেই তো! না না, তুমি এখনি পত্র লিখে দাও—এসে কাজ নেই, ওখানেই থাক্।"

মাধব মুখ তুলে তাকায় সুলেখার পানে—তারপর আর্দ্রকণ্ঠে বললে, "না বউদি, ছোড়দি আসুক, ও তো থাকবে না।"

"ওরে আমার মিটমিটে ডান,—তুমি বড় আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছো! ওকালতি করতে শিখেছো ছোড়দির পক্ষে! বেরো, বেরো,—দূর হ সুমুখ থেকে, ক্ষুদে শত্তুর কোথাকার!"

সঙ্গে সঙ্গে সে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়।

অভিমানে দুঃখে বেদনায় মাধব অধীর হয়ে ওঠে, মনে মনে ঠিক করে ফেলে—আর এখানে নয়, সে চলে যাবে ঘোষপুর—নয় তো ছোড়দির কাছে।

ঘোষণা করলো সে, "আমি ঘোষপুর যাব।"

বালকের কণ্ঠের দৃঢ়তায় আশ্চর্য্য হয়ে যায় সুলেখা! স্বামীকে ডেকে বলে—"শুনছো, তোমার ভাই যে ঘোষপুর যেতে চায়!"

সোমেন গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, শুধু ঘোষপুর নয়—একেবারে যমপুরেই পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।"

দাদার বিদ্রূপ নিঃশব্দে শুনে যায় মাধব।

দুপুরে খেতে দিতে মাধবকে পাওয়া যায় না। খাওয়ার সময় সে যেখানেই থাকে, উপস্থিত হয়; কিন্তু এই হল তার প্রথম ব্যতিক্রম।

ভাত তুলে রেখে সগর্জ্জনে সুলেখা বলে, "থাক, নবাবের যখন সময় হবে—এসে খাবে, না হয় খাবে না।"

ঘণ্টার পর ঘণ্টাও কাটে, মাধব আর এলো না।

দুপুর বেলার প্রাত্যহিক ঘুম দিয়ে উঠে সুলেখা জানতে পারে, মাধব আসে নি। স্কুল হতে পরাণ ফেরে, পাঁচটার পরে সোমেন ফিরে আসে, ফিরলো না মাধব। উৎকণ্ঠিত সোমেন বললে, "কোথাও বিপদ-টিপদ ঘটলো না তো?"

বিকৃত মুখে সুলেখা বললে, "যমের অরুচি—ওর নাকি কোন বিপদ ঘটতে পারে! কোথাও লুকিয়ে আছে আমাদের জব্দ করবার জন্যে! ওই যে সকালেই বলেছিলাম না—পরাণের প্যান্ট-জামাগুলো সাবান দিয়ে কাচ্‌তে—তাই লুকিয়েছে।"

পরাণ ইতিমধ্যে মাধবের ক্ষুদ্র ভাণ্ডার আতিপাতি করেছে। দেখা গেলো—যে প্যাণ্টটি সে পরে ছিল, কেবল সেইটিই তার পরণে আছে; আর যা কিছু, মনের ঘেন্নায় সব সে ফেলে গেছে। নিয়ে গেছে শুধু ছোড়দির দেওয়া মারবেল, একখানা ছোট জগন্নাথের ছবি, কাঁচের দু' একটা খেলার জিনিস।

সোমেন পাড়ায় পাড়ায় অনুসন্ধান করে।

পরাশের বন্ধু গোবিন্দ বললে, সে মাধবকে বড় রাস্তা ধরে ওই দিকে যেতে দেখেছে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় মাধব উত্তর দিয়েছে সে ছোড়দির কাছে যাচ্ছে।

সুলেখা ঠোঁট উল্টে বললে—"মরুক গে,—যেতে দাও—"

কিন্তু অত সহজে যেতে দিতে পারলে না সোমেন। একটা—চক্ষুলজ্জা আছে তো!—পাড়ার লোকে এখনই যে হাততালি দেবে!

তা ছাড়া, স্ত্রীকে সমীহ করার কারণ থাকলেও অন্তরে যে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল সেইটিই অত্যন্ত সত্য কথা।

কোন্ এক অনন্ত লোকের অধিবাসিনীর কথাও তার মনে পড়ছিল। কার যেন গচ্ছিত ধন সে নিজের গাফিলতিতেই হারিয়েছে! তাকেই তার জবাবদিহি দিতে হবে—নিজেকে তার অপরাধী বলেই মনে হচ্ছিল।

সুলেখাকে না জানিয়ে সে চুপচাপ পুলিশে ডাইরী করে দিয়ে এলো।

(৬)

তিনদিন পরে পুলিশের গাড়ীতে ফিরলো মাধব—জ্বরে বেহুঁস অবস্থা,—

পুলিশের লোক ক্ষুদ্র শিশুর জ্বরতপ্ত দেহখানা বুকে তুলে এনে বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপর শুইয়ে দিলে।

এখান হতে বহু দূরে বারাসাতের একটা গ্রামে পাওয়া গেছে মাধবকে। জ্বরাবস্থায় একটা গাছের তলায় পড়ে ছিল সে। কাছে ছিল এই পুঁটলিটা—এতে আছে কয়েকটি খেলার জিনিস মাত্র। সে একটি মাত্র কথা বলেছে—'ছোড়দির কাছে যাচ্ছি।' কে তার ছোড়দি এবং কোথায় তিনি থাকেন পুলিশের লোকেরা সে কথা জানে না, তাই তাকে এখানে এনেছে।

"মাধু,...একবার চোখ মেলে দেখ—" [পৃঃ ৯২

মা—পরলোকবাসিনী মা। সোমেনের মনে পড়ে সব কথা। তার মুখখানা বেদনায় বিকৃত হয়ে ওঠে—সে ডাক্তার ডাকতে পাঠায়।

সুলেখা বললে, "ডাক্তার কি হবে গো? সামান্য জ্বর বই তো নয়, জল-বাতাস করলেই ছেড়ে যাবে, তার জন্যে এত বাড়াবাড়ি করা কেন?"

সোমেন তপ্ত চোখে স্ত্রীর পানে তাকায় মাত্র।

ডাক্তার আসেন, পরীক্ষা করে ঔষধ দেন।

"মাধু—মাধু ভাই, ওষুধটা খেয়ে নে—হাঁ কর্—" আর্দ্র কণ্ঠে সোমেন ডাকে—

মাধবের যেন চেতনা আসে! জড়িত কণ্ঠে বললে, "আমায় ডাকছো? কিন্তু আমি যে ছোড়দির কাছে যাচ্ছি দাদা! ছোড়দি আমাকে ডাকছে!"

ঔষধ মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে—

এসে দাঁড়ালো শান্তি—

স্নেহের ছোড়দিকে তার চাই-ই, মাধবের এই প্রলাপ সোমেনকে বড় বেশী রকম বিচলিত করেছিল, তাই সে লোক পাঠিয়েছিল শান্তিকে খবর দিতে।

ঘুমিয়ে পড়েছে মাধব—

তার এ ঘুম আর কোনদিনই ভাঙ্গবে না। সে স্বপ্ন দেখেছিল, ছোড়দি এসেছে, তার মাথা কোলে করে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলছে, "ভয় কি ভাই! এই যে আমি এসেছি, এবার আর তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না।"

সেই ছোড়দি এলো, মাধবের মাথা কোলে নিয়ে বসে অজস্র চোখের জলে ভেসে ডাকতে লাগলো—"মাধব—মাধু, আমি এসেছি। একবার চোখ মেলে দেখ—"

আর তাকালো না মাধব। সকলের ঘৃণা-বিদ্বেষ কুড়াতে সে এসেছিল, কুড়িয়ে নিয়ে সে চলে গেছে।

কাউকে যদি বাঘে পায়?

—শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বাঘ যদি কাউকে পায় তো কী হয় সে কথা হয়ত না বললেও চলে। বাগে পেলেই সে আগে খায়, একথা কার অজানা? কিন্তু না, সে-পাওয়া বলছিনে, কাউকে যদি বাঘে পায়—মানে, যেমন ফুটবলে পায়, সিনেমায় পায়, ডাক-টিকিট যোগাড়ের বাতিকে ধরে, তেম্‌নি যদি কেউ বাঘের প্রতি স্নেহাসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে...

তাহলে তেমন বাঘা মানুষের ত্রিসীমানায় যেতে নেই!

আর তেম্‌নি ধারার মানুষ ছিলো আমাদের সিধু।

সুদুর আসামে তাদের চা-বাগান। সোজাসুজি না এলেও, ঘুরে ফিরেও সিধুর যে সব খবর আমাদের কানে এসে উঠতো তাতে আমাদের মাথার চুল সিধে হয়ে যেতো। সে নাকি জংলী জানোয়ারদের পোষ মানাবার মন্তর জানে, বাঘ ভালুকদের বশ করতে ওস্তাদ্‌, তারা নাকি তার হাত থেকে খায়, পায়ের কাছে পাপোষের মতন পড়ে থাকে! একটা বাঘ ন্যাওটার মতই ওর পেছনে পেছনে ঘোরে নাকি!

কুকুরকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে ঘোরে, কিম্বা কুকুরের ল্যাজে বাঁধা পড়ে থাকে এমন বিস্তর লোক (এমন কি, বালকও) আমি দেখেছি, কিন্তু বেঘোরে মারা পড়তে বনের বাঘকে নিজের লেজুড় কেউ করেছে এমন কথা ভাবতেই পারা যায় না! ভাবলেই পিলে চম্‌কায়!

এবং তা চমকালো আরো ভালো করেই—সিধুর আমন্ত্রণে তার বাগানে গিয়ে।

'আমার নন্দিনীকে দেখবে এসো।' বলে সে বাড়ির মধ্যে ডাকলো আমায়।

অবাক্‌ হবার কথাই বইকি! খবর না দিয়ে এর মধ্যে কবে সিধু বিয়ে করলো, কবেই বা তার মেয়ে হোলো! বিয়ের প্রথম ভাগে যে মিষ্টিমুখের ব্যাপারে বাদ পড়েছি, নন্দিনীর দ্বিতীয় ভাগে এসে তার মেয়ের মিষ্টিমুখ দেখে তার ক্ষতিপূরণ হবে কিনা সেই কথাই ভাবছি—ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভেতর পা দিতেই দেখি উঠোনের এক কোণে প্রকাণ্ড এক বাঘ! আঁৎকে তিন পা পিছিয়ে এলাম!

'আরে, কী বাজে ভয় খাচ্ছো! ওতো একটা বাচ্ছা।' সিধু আমায় আশ্বস্ত করে।

'বাচ্‌—ছা?' বলতে আমায় দুবার দম নিতে হয়।

'বাঃ, বাঘের বুঝি বাচ্ছা হয় না? বাঘ তো প্রথমে বাচ্ছাই হয়। মানুষের মতন বাঘেরও দুগ্ধপোষ্য অবস্থা আছে, তাদেরো শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য হয়ে থাকে, তাদেরো নাবালক সাবালক অবস্থা আছে, তাদেরো পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে—ঠিক আমাদের মতই। ওকে বাঘ বলে বিবেচনা কেরোনা, নেহাৎ ছেলেমানুষ!'

নেহাৎ ছেলেমানুষ! কথাটা সে বাঘকে না আমাকে কাকে লক্ষ্য করে বলল, সেই জানে! আমি আর বেশি জানার চেষ্টা করলাম না। তার কথায় একটি পাও আগালাম না আর।

'আরে ভয় কি! এসো এসো। যদিও একে নিতান্ত নাবালক আর বলা যায় না, সঠিক বললে কিশোরীই বলতে হয়, তবু এর থেকে তোমার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কিচ্ছুটি বলবে না তোমাকে। এই...এই আমার নন্দিনী।'

এই নন্দিনী! আমার পিলে আরেকবার চমকায়।

'না ভাই, এখেনেই থাকি। ওর থাবার নাগালে গেলে—কে জানে—না, নন্দিনী নন্দিনীই থাক্, ওকে আরো বেশি আনন্দিনী করার আমার সাধ্ নেই।' আমি বললাম।

'কিচ্ছু ভয় নেই। চলে এসো, চলে এসো! কিচ্ছু বলবে না তোমায়। কী মিষ্টি মেয়ে আমার নন্দিমী।' মুগ্ধকণ্ঠে সে বলে।

'না বলুক! নাই বললো। বলবার কী আছে আবার ওর? ওর তো একটি মাত্র কথা—হালুম! আর সেই একবাক্যে সকলের ঘাড় মট্‌কানোই ওর কাজ। আমার ঘাড় এম্‌নিতেই পল্‌কা। ঘাড়ের কোনো এক্‌সারসাইজ জীবনে তো করিনি। না ভাই ওর কোনো কথার মধ্যে যেতে আমি রাজি নই।'

আধ-ভেজানো দরজার একটা পাল্লা হাতে করে চৌকাঠ ধরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—কাঠ হয়ে। এক পাও এগুলাম না আর। হালুম্ দূরে থাক্, নন্দিনী যদি একটু হাঁ করে, তাহলে তক্ষুনি দরজার শেকল টেনে হাওয়া হবো। ঘাড়ের ওপর মালুম হবার আগেই।

তখন তার কিশোরী নন্দিনীর কাছে সিধু একলাই এগিয়ে গেল। গিয়ে তাকে কোলে পিঠে করে আদর করতে লাগলো। আদর করে অপরকে বাগাতে হয়, তা জানি, কিন্তু বাঘকে কেউ নিজের মেয়ের মত আদর করছে এমন কথা স্বপ্নে দূরে থাক্, সার্কাসেও ভাবা যায় না। কদাচিৎ মানুষ-শিশুকে নেকড়ে-মা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে নেকড়ে-শিশু বানিয়েছে এমন খবর অবশ্যি পেয়েছি, খবরকাগজের দৌলতেই পাওয়া; কিন্তু ব্যাঘ্র-শিশুকে নিয়ে (শিশু না হয়ে না-হয় কিশোরীই হোলো) এই নেকড়েপনা (বা মেয়ে-নেকড়ামো) মোটেই আমার ভালো লাগে না। এ বোধহয় কাগজওলাদেরও কল্পনার অতীত।

ওর এই ভালোবাসার ব্যাগ্রতা দেখে...দেখে দেখে আমি ভাবি, না, ভালোবাসা হচ্ছে সত্যিই অভাবিত। জিনিসটার আগাগোড়াই রহস্যময়।

'ও কি হচ্ছে? করছো কী? পালিয়ে এসো।' দোরগোড়ার থেকে আমি জোর গলায় হাঁকি : 'বাঘকে কি নাই দিতে আছে? নাই দিলে বাঘ মাথায় উঠবে। আর বাঘ যদি একবার মাথায় ওঠে তখন বাঘ আছে, তুমি নাই। আর, তুমি না থাকলে আমার কী হবে? আমায় কে দেখবে তখন এখানে? তোমা বিহনে এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমি কী আতান্তরে পড়বো তা কি তুমি ভেবে দেখেচো?'

'পাগল! নন্দিনী আমার সে রকমের মেয়ে নয়। এরকম মেয়ে—মানে, বাঘ প্রায় দেখা যায় না।'

'না যাক্! কিন্তু বাঘকে কি লোকালয়ে মানায়? বাঘের জায়গা হচ্ছে জঙ্গল। জঙ্গলে নিয়ে ওকে ছেড়ে দাও, নয়তো কোনো চিড়িয়াখানায়। মানুষের ঘরে—কিম্বা—মানুষের ঘাড়ে বাঘের কোনোই শোভা নেই। মানায়ও না।'

'তোমায় বলেছে!' বলে' নন্দিনীকে ও ঘাড় থেকে নামায়। ওর পিঠ চাপ্‌ড়ে মাথা থাব্‌ড়ে আদরের চূড়ান্ত করে' তারপরে ও বেরয়।—'বাবা, তুমি যা ভীতু! কী ভয়-কাতুরে! ছিঃ! চলো তোমাকে আমাদের বাগান দেখিয়ে আনি।'

ও বাঘ ছেড়ে বেরুলো, আমি হাঁপ ছেড়ে বেরুলাম। বললাম—'আদর দিয়ে ওর মাথা খাচ্ছো।

কিন্তু প্রতিদানে ও যেদিন তোমার মাথা খাবে সেদিন তুমি থাকবে কোথায়!'

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে ও বল্লে—'আমাদের বাগান দেখলে তুমি অবাক হবে।'

ওর মোটরে চড়ে চললাম ওদের চা-বাগান দেখতে। যেতে যেতে ওর মুখে নন্দিনীর গল্প শোনাও চললো।

আসামের জঙ্গল থেকে ক'মাসের শিশু নন্দিনীকে ও নিয়ে আসে। কোন্ এক শিকারীর গুলিতে ওর মা নাকি মারা পড়েছিল। দেখাশোনা করার কেউ ছিল না বেচারীর। আহা, দুধের বাছাটি! সেই থেকে নন্দিনী ওর কাছে আছে। ওর লালন-পালনে, যাকে বলে শশিকলার মতই, দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত একটা পোকামাকড়ের গায়েও তার হাত তোলেনি নন্দিনী। কী মধুর ওর স্বভাব, আর কী চমৎকার যে ওর চোখের চাউনি! আর তেমনই মিষ্টি কি ওর হাসি! হাসিটা অমন চমৎকার হোলো কি করে জানো? নিমের দাঁতন দিয়ে রোজ দাঁত মাজে বলে'।

'দাঁত মাজে?' বিস্ময়ে আমি হাঁ।

'মাজে কি? সহজে কি মাজতে চায়? মেজে দিতে হয়। আমিই মেজে দিই। ভাবছি এবার থেকে দাঁতনের বদলে টুথ পেইস্ট্ আর টুথ্‌ব্রাশ ব্যবহার করবো।'

'সাবাস্' বলতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে 'সাব্রাশ্' বেরোয়।

সিধু তাকে কোলে পিঠে করে আদর কতে লাগলো। [পৃঃ ১৪

'তবে হ্যাঁ, হাজার ঠাণ্ডা হলেও, মাঝে মাঝে ওর মেজাজ দেখা দ্যায় বটে! তখন ও ছুটে বেরিয়ে পড়ে—বনের ডাকেই বোধহয়। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এমন দৌড় মারে আর লাফ-ঝাঁপ লাগায় যে, তাই দেখে চারধারের লোক ভয়ে ভিরমি খায়। সবাই অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু তাও বলবো ভাই, কারু গায়ে কখনো আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেনি ও।'

কাজেই নন্দিনীর আঁচড়ন ভাল কি মন্দ তা ঠিক বলা যায় না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা বলে থাকে। ভারী ওরা 'সেপ্‌টিক্' নাকি। সিধু যতই আমায় অভয় দিক্ না, প্রাণ থাকতে ওর আঁচড়ের আওতায় আমি যাচ্ছিনে।

ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, সিধু বলে—'আরে, এধারটা এত ফর্সা দেখছি কেন আজ? এমন ফাঁকা ফাঁকা যে! লোকগুলো সব গেল কোথায়?'

'কোন্ লোকগুলো?'

'চাবাগানের কুলীদের বস্তি যে এই দিকটায়। কিন্তু তাদের কাউকে তো দেখছি না একদম্। ছুটির দিন আজ—!'

পাঁজাকোলা করে তুলে এনে... [পৃঃ ৯৭

'ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে বোধহয়!'

'আশ্চর্য! ছুটির দিনে এসব রাস্তা কুলীকামিনে ভরে থাকে যে! হাসিখুসি—খোসগল্পে জম্‌জমাট্! কিন্তু আজ এ কী? এটা কিরকম হোলো? মনে হচ্ছে কাছেপিঠে কোথাও কোনো ফুর্তি লেগেছে। সেইখানেই গেছে সবাই। কিন্তু আমি তো ওদের কোনো পরবের কথা শুনিনি।' সিধু যেন একটু ভাবনায় পড়ে!

কিন্তু তার দুর্ভাবনা দূর হতে বেশিক্ষণ লাগে না।

নন্দিনী!

আমাদের মোটর-পথের মোড়টা ঘুরতেই অদূরে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বাঁকের মুখটাতেই।

ওই দৃশ্য দেখবার পর আশ-পাশের লোকদের অদৃশ্য হবার কারণ বুঝতে বেশি দেরী লাগে না। পথের মাঝখানে কারো-পরোয়া-করিনে-ভঙ্গীতে নন্দিনী দাঁড়িয়ে। বেশ খাতির-নাদারং ভাব! হাতের থাবা দিয়ে রাস্তার মাটি আঁচড়াচ্ছে। আমাদের এগুতে দেখেও একটুও তার গেরাহ্যি নেই। নন্দিনীর ঐ ভাব দেখে তো প্রাণ আমার উড়ে গেছে! মনে হোলো এখনি বুঝি বা আমাদের

মোটরের ওপর ও লাফিয়ে পড়ে! ভয়ে আমি কাঁপতে থাকলাম।

সিধুর কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

'না, একদম্ গোল্লায় গেছে! পাড়া বেড়ানো স্বভাব হয়েছে মেয়েটার! কিন্তু বাড়ির থেকে ও বেরুলো কি করে' বলো তো? চেন্ খুললো কি করে!' এই বলে' নন্দিনীর কাছে গিয়ে সে মোটর থামালো।

ঘাড় বেঁকিয়ে আড় চোখে দেখতে চাইলাম। [পৃঃ ৯৭

আমি কিছু বলবার আগেই (বলবার ছিলোই বা কী? বাধা দিলেই কি সে মানতো?) সিধু মোটর থেকে নেমে গেছে—নন্দিনীর কাছেই সিধে। গিয়ে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে ফেলেছে আমাদের পেছনের সীটে। আর, নন্দিনী রাগে (এই আদরের অত্যাচারেই হয়ত বা) গরগর করতে করতে মোটরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

আমার এমন বিচ্ছিরি লাগে! ছেলে বাঘই হোক্ কি মেয়ে বাঘই হোক্, দুগ্ধপোষ্য কিম্বা বুড়ো বাঘই হোক্ না, বাঘ হচ্ছে বাঘ। তার কিশোরী যুবতী বালিকা বলে কোনো ভেদাভেদ নেই, অন্ততঃ মানুষের কাছে তো নয়। মানুষকেও নিশ্চয় তারা বিভিন্ন চোখে দ্যাখে না। পেলেই বাগায়। কোনো অপোগণ্ড বাঘের থাবা তার বাবার থাবানির চেয়ে বেশি মুখরোচক হবার কথা নয়, তার এক ঘা খেলে সাধ করে কেউ যে অপর গণ্ড বাড়িয়ে দেবে এমন আশা আমি করিনে। নন্দিনীই হোক্ কি নন্দনই হোক্, ব্যাঘ্রকুলের কেউ আমার কাছে একটুও আনন্দের নন।

মোটরের মুখ ঘুরিয়ে তখনি ফিরলো সিধু—নন্দিনীকে নিয়ে। নন্দিনী যে ঠিক লক্ষ্মী মেয়েটির মতন ঠাণ্ডা হয়ে মোটরে বসে থাকলো তা বলা যায় না। আঁচড়ে কামড়ে পেছনের সীটটা ছিঁড়ে তছনছ করলো—তারপরে তার ধ্বংসস্তূপের ওপর আদ্ধেক বসে আদ্ধেক দাঁড়িয়ে কেমন যেন জবুথবু হয়ে রইলো! বাঘের পক্ষে জবুথবু হওয়া সম্ভব নয়, বলতে হয় জবর থবর।

আমার সীটের মাথায় তার থাবা রেখে ঐ অবস্থায় সে খাড়া রইলো—আমার ঘাড়ের ঠিক ছ ইঞ্চি পেছনে। তার গর্‌গরানি, গরম নিশ্বাস, লালার ছিট্‌কার আমার ঘাড়ে এসে লাগতে লাগলো। আর আমি দুর্গা নাম জপতে লাগলাম।

আর, কী তার গায়ের গন্ধ রে বাবা! দুর্গানামকেও ভুলিয়ে দেয়! বাঘারা যে এমন গন্ধমাদন হয় তা কে জানতো?

স্টিয়ারিং হাতে বলতে লাগলো সিধু—'ভালোবাসায় বনের পশুও বশ মানে, শোনোনি তুমি? এই দ্যাখো তার প্রমাণ। আমার মধ্যেই তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। ঘরছাড়া দুষ্টু মেয়েকে কেমন করে ভুলিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে হয় তাও দ্যাখো! সত্যি বলতে, সম্মোহনী শক্তি আবার কী? ভালোবাসারই অপর নাম। গান্ধীজী যাকে অহিংসা বলতেন, তা কি ভালোবাসা ছাড়া আর-কিছু? তুমি বাঘকে যদি না হিংসা করো, তার প্রতি কোনো বিদ্বেষ ভাব না পোষণ করো যদি তো বাঘও তোমাকে...তুমি কি বাঘদের ঘৃণা করো ভাই?'

বেরিয়ে এলো সিধু—তীরের মতই ছিটকে [পৃঃ ৯৯

'ঘৃণা? না না! ঘৃণা করবো কেন?' কম্পিত কণ্ঠে বলি : 'বরং তাদের আমি শ্রদ্ধাই করে থাকি। (বলতে গিয়ে স্বরগ্রাম একটু বড়ো করার চেষ্টা করলাম, যাতে কথাটা বাঘটারো কানে যায়, তারপরে গলা একটু খাটো করে') কিন্তু ভাই, ঘৃণা নয়, ওদের আমি ঠিক বিশ্বাস করি নে।'

'ভুল, তোমার ভুল। বাঘরাও মানুষ। তাদেরো হাত পা আছে। তারাও খায়-দায় ঘুমোয়। পায়চারি করে। প্রাণ আছে তাদেরো। আমাদের মত তারাও ভালোবাসে, ভালোবাসতে জানে। আমাদের মতই তারা ভালোবাসার পিয়াসী। তারাও আদর চায়, আদর করতে চায়।'

আদরের কথায় আমার টনক নড়লো আবার। নন্দিনীর হাবভাব আদুরে আদুরে কিনা ঘাড় বেঁকিয়ে আড় চোখে দেখতে চাইলাম। যদি আদর করে পেছন থেকে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তাহলেই তো গেছি! তার সমাদর আমার পক্ষে যমাদর! তার স্নেহের টেক্‌সো দিতে পারে আমার এই দেহ এত টেকসই নয়। অন্ততঃ সিধুর মত নয়।

এক এক মুহূর্ত মনে হতে লাগলো যেন একেক যুগ। মোটর গাড়ী চড়ার সখ আমার চিরকালের—পরের মোটর হলে তো কথাই নেই। কিন্তু এমন নিদারুণ মোটরযাত্রা জীবনে কখনো আমার হয়নি।

যেন কখনো আর না হয়।

অনন্তকাল পরে যেন সিধুর আস্তানায় ফিরলাম। মোটর থামতেই সিধু লাফিয়ে নামলো। আর আগের মতই, নন্দিনীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে, ঢুকলো বাড়ির ভেতরে। আমি কিন্তু এক পাও নড়লাম না। বসে রইলাম ওর মোটরেই। ঐখেনে বসেই ওর অপেক্ষায় রইলাম।

বেশীক্ষণ বসতে হোলো না। দরজার আড়ালে নন্দিনীকে নিয়ে ও অদৃশ্য হতে না হতেই, বিরাট এক হল্লা কানে এলো।

তর্জনগর্জন, তারপর আরো তর্জন আরো গর্জন, ঘোরতর আর ঘোরালো হয়ে ঘরের ভেতর থেকে যে তেড়ে আসতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই তেড়ে বেরিয়ে এলো সিধু—তীরের মতই ছিট্‌কে।

সিধুর মাথার চুল খাড়া, দেহ ক্ষতবিক্ষত। কাপড় জামা টুক্‌রো টুক্‌রো। মুখের চেহারা আঁচড়ে কামড়ে এমন হয়েছে যে তাকে আর চেনাই যায় না।

সিধুর চোখের সেই সম্মোহনী চাউনি আর নেই। প্রীতির বদলে সেখানে ভীতি বিরাজ করছে। বিহ্বল হয়ে 'বাপ্‌রে'—বলে' চীৎকার ছেড়ে এক লাফে সে মোটরে উঠলো, উঠেই স্টার্ট্ দিলে। আর সে কী স্টার্ট্! মোটরকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চললো সে!

বাপ্‌রে বলে' মাইল দুয়েক গিয়ে সিধু বললে,—'বাপ্!' বলে' সে হাঁপ ছাড়লো। তার দু'মাইলব্যাপী 'বাপ্‌রে বাপ্' আমি শুনলাম। শুনে বললাম—'কী হয়েছে? নন্দিনী কি রেগে মেগে তোমায়—তোমাকেই...?'

'নন্দিনী না ছাই!' চেঁচিয়ে ওঠে সিধু: 'নন্দিনী তো আমার ঘরেই ছিলো, তেম্‌নি বাঁধাই ছিলো তো!'

'তবে? তবে এ বাঘটা আবার কে? কোনো ভৃঙ্গিনী নাকি?'

'কে জানে! আস্ত একটা জংলী জানোয়ার! ভূত!' বললো সিধু।

তর্কে বহু দূর

বিজ্ঞানের বাইরে

কাশীতে স্বামী ভাস্করানন্দেব সামনে বসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।

স্যার রমেশচন্দ্র বিনীত ভাবে বলেন, স্বামীজি, আপনি বলছেন সব অলীক, স্বপ্নের মত। কিন্তু কি করে বিশ্বাস করি? এই যে আপনি আমার সামনে বসে রয়েছেন, এটা কি অলীক হতে পারে?

ভাস্করানন্দ হেসে বলেন, কে বল্লে বেটা, যে আমি তোর সামনে বসে আছি?

রমেশচন্দ্র উত্তর দিতে যাবেন, দেখেন সামনে কেউ নেই। নিমেষের মধ্যে স্বামীজি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তিনি কাতর ভাবে ডেকে ওঠেন, স্বামীজি! স্বামীজি!

দেখেন, স্বামীজি তাঁর সামনে বসে তেমনি হাসছেন।

জগৎবিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন যখন ভারতভ্রমণে আসেন, তখন ষ্টেটসম্যান কাগজের সম্পাদক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভারতবর্ষে সব চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিস কি দেখলেন?

মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী।

—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রিং...রিং...রিং।...

শীতের মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো, একটানা টেলিফোনের রিং রিং শব্দে। সেই সঙ্গে কিরীটির শীত-রাত্রির সুখ-নিদ্রাটাও ভেঙ্গে গেল। শীতও পড়েছে যেন দুর্জ্জয় হাড়-কাঁপানো। নরম পাখীর পালকের লেপের তলায় গুটি-সুটি দিয়ে আরামের নিদ্রা।

বেজেই চলেছে টেলিফোনটা রিং রিং রিং। একটুর জন্য থামে, আবার একটানা বেজে চলে। কিছুতেই থামবে না যেন! কিরীটি একান্ত বিরক্ত চিত্তেই শেষ পর্য্যন্ত হাত বাড়িয়ে কোনমতে প্লাষ্টিকের ঠাণ্ডা রিসিভারটা টেনে নিল কানের কাছে ঃ 'হ্যালো!'

ওপাশ হতে ভেসে এলো একটি ব্যাকুল কণ্ঠ ঃ 'মি রায়!'

'হাঁ! কে আপনি?—' চেষ্টা করেও কিরীটি কণ্ঠের বিরক্তি চাপা রাখতে পারে না।

'আমি প্রতুল! প্রতুল সেন, কথা বলছি কালীঘাট থেকে...'

'প্রতুল! কি ব্যাপার?'

'বিশ্রী একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তোমাকে এখুনি একবার আসতে হবে ভাই!—'

'দুর্ঘটনা! হঠাৎ এত রাত্রে—ব্যাপারটা খুলে বলত!—'

'ফোনে সব কথা ত খুলে বলতে পারছি না। তুমি একটিবার এসো ভাই!—আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে!—'

'অত নার্ভাস হচ্ছো কেন! বল না কি ব্যাপার?—'

'শান্তা-দি সুইসাইড্ করেছে!—'

কথাটা আচমকা কিরীটির কর্ণপটহে এসে যেন একটা ধাক্কা দিল! কয়েকটা মুহূর্ত্ত সত্যি কিরীটি কথাও যেন বলতে পারে না!

প্রতুলের দিদি মিস্ শান্তা সেন সুইসাইড্ করেছে! মানে আত্মহত্যা!

'এসো ভাই একটিবার—শীগ্‌গিরি—'

'যাচ্ছি!—এখুনি যাচ্ছি!'—ঐ কথা কয়টি ছাড়া কিরীটি আর কিছুই যেন বলতে পারে না। ব্যাপারটা কেবল অবিশ্বাস্যই নয় যেন কল্পনাতীতও।

শান্তা সেন মানে হরতনের বিবি—আত্মহত্যা করেছে।

মিস্ শান্তা সেন প্রতুলের বর্ম্মা-ফেরতা দিদি। তাকে দেখেই প্রথম দিন প্রতুলের ওখান থেকে ফিরে এসে সুব্রতকে কিরীটি বলেছিল : 'প্রতুলের দিদিকে দেখে কি আজ মনে হলো জানিস সু?'

সুব্রত শুধিয়েছিল, 'কি?'

'ওর নাম শান্তা সেন না রেখে রাখা উচিত ছিল হরতনের বিবি!'

'সে আবার কি?'—বিস্মিত সুব্রত প্রশ্ন করেছিল।

'হ্যাঁ! তাসের হরতনের বিবির মত ঠিক দেখতে মুখখানা ভদ্রমহিলার!'

সেই হরতনের বিবি আত্মহত্যা করেছে!

কিরীটি শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লো। এবং তাড়াতাড়িতে বিশেষ কোন বেশ-ভূষা না করে, একটা গরম ট্রাউজারের উপরে গ্রেট্ কোটটা চাপিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে নিল। চাবি দিয়ে গ্যারাজ খুলে নিজেই গাড়ি বের করলে।

কিরীটি-বর্ণিত হরতনের বিবি, মিস্ শান্তা সেন, প্রতুলের বর্ম্মা-ফেরত দিদি।

সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে ও শোনা গিয়েছে, মামা, কাকা, পিসে, মেসো ইত্যাদিরাই বর্ম্মা-ফেরত হয়ে থাকেন। বর্ম্মা-ফেরত দিদি, বড় একটা দেখা যায় না।

শান্তা সেন যুদ্ধের হিড়িকে বর্ম্মার কোন এক মিশনারী গার্লস স্কুলের মোটা মাহিয়ানার চাকরীর মায়া ছেড়ে দীর্ঘ বিশ বৎসর বাদে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন, বয়স তখন তাঁর চল্লিশের উর্দ্ধেই গিয়েছে। কিন্তু বয়স চেহারাটাকে কাবু করতে পারে নি। অবশ্য সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মত চেহারাও নয় শান্তা সেনের।

প্রতুলদের গোষ্ঠিতে ছেলেমেয়ে লম্বায় সকলেই প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি। শান্তা সেনও বংশগত দৈহিক দৈর্ঘ্যটা পেয়েছিলেন। তাছাড়াও তাঁর দেহের গঠনে ছিল একটা যেন পুরুষ-ভাব! গায়ের রং টক্‌টকে গোরাদের মত। ছোট কপাল, চাপা নাক, পুরু ওষ্ঠ। মাথার দীর্ঘ কেশ সর্ব্বদা টাইট্ করে বার্ম্মিজ প্যাটার্ণ চূড়ার আকারে মাথার উপরে বাঁধা থাকত। এবং মুখের লালচে স্বাভাবিক রং সব-কিছু জড়িয়ে অনেকটা হরতনের আকারের যেন মনে হতো। কিরীটি নেহাৎ মিথ্যে বলে নি।

এক ভাই ও চার বোনের মধ্যে শান্তা সেনই ছিলেন প্রতুলদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এবং লেখাপড়াতেও প্রতুলের মুখেই শোনা ঐ দিদিই ছিলেন নাকি সবার চাইতে প্রখর। প্রতুলের বাবা ছিলেন সাধারণ মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী। শান্তাকে তিনি কখনো মেয়ে বলে মনে করতেন না। বলতেন, 'ও আমার ছেলে।'

সত্যিই তাই হয়েছিল। এম-এ পাশ করে শান্তা ভাল চাকরী নিয়ে সোজা বর্ম্মায় চলে গেলেন এবং বলতে গেলে সেই থেকেই সংসারের সচ্ছলতা ফিরে আসে।

শান্তা ও প্রতুল বিবাহ করেনি কিন্তু বাকী ছোট তিন বোনের বিবাহ হয়ে গিয়েছিল।

প্রতুলের ঠাকুর্দ্দার আমলের একটি ছোট দোতলা বাড়ী ছিল কলকাতায় এবং এইটাই ছিল তাদের একমাত্র সম্পদ।

প্রতুল লেখাপড়ায় তেমন কোন সুবিধে করতে পারে নি। সামান্য কেরাণী কোন এক মার্চেন্ট-অফিসে। নিরীহ গোবেচারা টাইপের মানুষ প্রতুল। পেট-রোগা নির্ভেজাল কেরাণী! কিরীটির সঙ্গে বি-এস-সি বছর দুই পড়েছিল প্রতুল; সেই সময়ই আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

প্রতুলের একটা মস্ত গুণ ছিল, চমৎকার বাঁশী বাজাতে পারত সে। ঐ বাঁশীই কিরীটিকে কলেজী ছাত্র-জীবনে সহপাঠী প্রতুলের প্রতি বেশী আকৃষ্ট করেছিল এবং সে আকর্ষণ পরবর্ত্তী জীবনেও নষ্ট হয় নি। চিরদিনই একটু নার্ভাস টাইপের লোক প্রতুল।

অমন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রতুল যে একটু বেশী রকমই নার্ভাস হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! বেশী দূরে নয় কিরীটির বাড়ী থেকে, কালীঘাট অঞ্চলেই একটা গলির মধ্যে প্রতুলের বাড়ী।

দুই

মিনিট পনের লাগে কিরীটির প্রতুলের ওখানে গাড়ি করে পৌছোতে।

ছোট গলি, কিরীটির প্রকাণ্ড ওল্ডস্ মবিল গাড়ি ঢুকবে না, তাই গলির মোড়েই গাড়িটা পার্ক করে, দরজায় লক্ করে কিরীটি এগিয়ে চলল।

ওপারে জেলের পেটা-ঘড়ি ঢং ঢং করে রাত্রি দুটো ঘোষণা করল। প্রচণ্ড কন্‌কনে শীত পড়েছে।

বাইরের ঘরে আলো জ্বলছিল। দরজায় কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে প্রতুল।

সমস্ত মুখে যেন তার এক ফোঁটা রক্তও নেই! ফ্যাকাসে বিবর্ণ! চোখে মুখে একটা অসহায় আতঙ্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'এসেছো?'

'হাঁ!—'

ঘরের মধ্যে প্রতুল ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ ছিল না। একটা সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিল, খান দুই বেতের চেয়ার ও গোটা দুই সোফা।

সমস্ত বাড়িটায় যেন একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা পাথরের মত ভারী হয়ে চেপে বসেছে! কোথাও সামান্য একটি শব্দ নেই। কেবল দেওয়ালে টাঙ্গানো ক্লকটার পেণ্ডুলামটা টক্ টক্ টক্ একঘেয়ে একটা শব্দ তুলে এদিক আর ওদিক করছে। স্তব্ধ নিশুতি রাতের হৃদপিণ্ডটা যেন ধক্ ধক্ করছে!

কিরীটি প্রতুলের বলবার অপেক্ষা না রেখে নিজেই একটা সোফার ওপরে উপবেশন করে।

'ব্যাপারটা যেমন আশ্চর্য্য তেমনি Surprising রায়! ঘণ্টা দেড়েক আগে—' প্রতুল ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলে চলে : 'হঠাৎ মাথার কাছে টেলিফোনটার ক্রিং ক্রিং শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। কে টেলিফোন করছে, কোথা থেকে করছে কিছুই বুঝলাম না। কেবল আমার নাম জিজ্ঞাসা করতে তখন বললাম, হাঁ আমি প্রতুলই কথা বলছি। তখন সে কেবল একটি মাত্র কথাই বলে কনেকশন্‌টা কেটে দিল।'

বলতে বলতে প্রতুল একটু থামে। কিরীটি ওর মুখের দিকে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিঃশব্দে চোখ তুলে।

'বললে, প্রতুলবাবু শীগ্‌গিরি উপরে গিয়ে দেখুন আপনার দিদি সুইসাইড্ করেছেন।'

'তারপর?—'

'বুঝতেই পারছো তখন আমার মনের কি অবস্থা! মাঝ রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে টেলিফোনে হঠাৎ ঐ কয়টি কথা বলেই কনেকশন্ কেটে দিলে। কিছুক্ষণ ত আমি হতভম্ব হয়ে বসেই রইলাম। মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত একটু সামলে নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলাম এবং তিন তলার একটি মাত্র ঘরে—যেখানে দিদি থাকে সেই ঘরের দিকে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে উঠে।'

আবার কিছুক্ষণ থেমে দম নিয়ে প্রতুল বলতে লাগল ঃ 'দেখলাম দিদির ঘরের দরজা ভেজান। এবং ভেজান দরজার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে, ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথমতঃ দিদি কক্ষণো দরজা খুলে তো শোয়ই না, ঘুমবার সময়ও আলো জ্বালা থাকে না। তাই একটু আশ্চর্য্যও হয়ে গেলাম ঘরে আলো জ্বলতে দেখে অত রাত্রে! দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম...and and I found her dead!'

প্রতুলের গলাটা আবার উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে এলো। কিরীটিও নির্ব্বাক্!

'টেবিলের উপরে মাথা রেখে দিদি পড়ে আছে...আর আর তার কপালে একটা রক্তাক্ত ক্ষত—সমস্ত মুখটা রক্তে লাল, টেবিলের ওপরেও রক্ত জমাট বেঁধে আছে এবং তার ডান হাতে ধরা দিদিরই ছোট পিস্তলটা!—উঃ! সে যে কী বীভৎস দৃশ্য! তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না রায়! It is ghastly, it is horrible!—' বলতে বলতে প্রতুল দু' হাতে মুখ ঢাকলে।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। দু'জনেই নির্ব্বাক্। কেবল ওয়াল-ক্লকটার পেণ্ডুলামের একঘেয়ে টক্ টক্ শব্দ অবিশ্রাম চলেছে।

'সমস্ত ব্যাপারটাই যেন এখনো আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে! এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না কিরীটি, যা দেখেছি! মনে হচ্ছে যা দেখেছি ভুল দেখেছি!—' তারপর একটু থেমে প্রতুল আবার বলতে সুরু করে ঃ 'হাত-পা আমার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, কি করবো কিছু ভেবে পাই না। হঠাৎ মনে পড়লো তোমার কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ফোন করেছি। কি হবে ভাই? একি হলো? দিদি! দিদি আমার হঠাৎ সুইসাইড্ করলো কেন? আজ রাত্রেও তো শোবার আগে তার সঙ্গে কথা হয়েছে! দেরাদুনে চাকরী পেয়েছে, সামনের শনিবার দেরাদুনে গিয়ে জয়েন্ করবে আমাকে বললে!—হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল ভাই!'

কিরীটি নিজেও ব্যাপারটা শুনে কম আশ্চর্য্য হয় নি। আগাগোড়া ঘটনাটা যেমন রহস্যপূর্ণ তেমনি অবিশ্বাস্য! শান্তা সেন সুইসাইড্ করেছেন কিন্তু বাইরে থেকে সেই সংবাদ অন্য একজন টেলিফোনে প্রতুলকে জানাচ্ছে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে!

শান্তা সেন যে সত্যি সত্যিই সুইসাইড্ করেছেন, সে কথা বাইরে কারো পক্ষে জানা সম্ভবই বা কেমন করে? আর বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তি জেনেই যদি থাকে, তার শীতের মধ্যরাতে শান্তা সেনের ভাইকে টেলিফোনে ডেকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে সে সংবাদটি দেবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এতে করে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখের সামনে যে, এই জানানোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। আর উদ্দেশ্যই যদি থাকে তো সেটা কি?

'কারো কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। ব্যাপারটা কেউ জানে না নাকি প্রতুল?—' কিরীটি প্রশ্ন করে।

'না। সকলেই ঘুমুচ্ছে। কাউকেই আমি জাগাই নি।—' মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় প্রতুল।

'চল একবার দেখে আসি ওপরে গিয়ে।'

'যাবে?'

'নিশ্চয়ই! দেখে আসা যাক্, চল—'

'আমারও যেতে হবে?'

'অত নার্ভাস হয়ে পড়লে তো চলবে না প্রতুল! ধৈর্য্য তোমাকে ধরতেই হবে! ওঠ! চল—'

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই প্রতুল জবাব দেয়, 'চল—'

সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে আছে! অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা!

নিঃশব্দে দু'জনে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে এক সময় কিরীটিই চাপা কণ্ঠে বলে, 'আমাকে খবর দেওয়ার আগে তোমার উচিত ছিল থানায় একটা সংবাদ দেওয়া—'

'থানায়?'

'হ্যাঁ। সুইসাইড্ বা হোমিসাইড্ যাই হোক্, থানায় একটা খবর ত দিতেই হবে ভাই! স্বাভাবিক মৃত্যু ত নয়, পুলিশের পারমিশন ছাড়া মৃতদেহের সৎকারই ত করতে পারবে না! সে যাক্, আগে চল ত দেখি ব্যাপারটা। থানায় আমিই ফোন করে দেবো'খন। এ এলাকার ইনচার্জ্জ এখন কল্যাণ সোম আছে—'

দোতলা বাড়িটা হলেও ছাতের উপর একটা ঘর আছে। ঘরটা বেশ মাঝারি আকারের ও চারিদিকে খোলামেলা বলে এ বাড়িতে শান্তা সেন আসা অবধি ছাতের ঐ ঘরটিতেই থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তা'ছাড়া শান্তা সেন চিরদিনই একটু নির্জ্জনতা-প্রিয়।

একতলা ও দো'তলায় সর্ব্বসমেত পাঁচখানা ঘর। খোলা ছাতের এক পাশে ঘরটি! ছাতের চারিদিকে ফুল ও অন্যান্য পাতাবাহারের টবে সাজান।

এদিকের খোলা জানালা-পথে দেখা যাচ্ছিল ঘরে আলো জ্বলছে।

দরজাটা ভেজানই ছিল। বারেকের জন্য কিরীটি ভেজান দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রতুলও তার পশ্চাতে দাঁড়ায়। প্রথমে অতঃপর কিরীটিই ভেজান দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরের মধ্যে পা দিতেই যে দৃশ্য কিরীটির চোখে পড়ল, সত্যিই তা ভয়াবহ।

চেয়ারের ওপর উপবিষ্ট শান্তা সেনের দেহের ঊর্দ্ধাংশ সামনের টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে। বাম ভ্রূর ঠিক মধ্যস্থলে একটা বীভৎস রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। মুখের দক্ষিণাংশ সমস্তটাই প্রায় জমাট-বাঁধা রক্তে ঢেকে আছে। বাম হাতটা চেয়ারের হাতলের পাশ দিয়ে ঝুলছে অসহায়ের মত। প্রসারিত দক্ষিণ হস্তটি টেবিলের ওপর ন্যস্ত এবং দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে ধৃত ছোট একটি পিস্তল। মাথার চুল একটু রুক্ষ এলোমেলো। বোধহয় ঐ দিন সন্ধ্যায় শান্তা সেন কোনরূপ কেশ-প্রসাধন করেন নি! গায়ে হাতকাটা সিল্কের ব্লাউজ। পরিধানে শাদা সিল্কের শাড়ী।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃতদেহ ও তার ভঙ্গীটা দেখে দরজার গোড়া থেকেই, এগিয়ে গেল আরো কাছে কিরীটি!

টেবিলের উপরে একটা রাইটিং প্যাড্ ও তার পাশে মুখখোলা সবুজ রংয়ের একটি পার্কার-৫১ ঝর্ণা কলম, গোল্ড ক্যাপ। প্যাডের উপরে কি যেন লেখা।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল কিরীটি লেখাটা পড়বার জন্য।

অর্দ্ধসমাপ্ত একটা চিঠি। লেখাটা একটু জড়ানো জড়ানো, অস্পষ্ট হলেও পড়তে কষ্ট হয় না কিরীটির। আর চিঠিটা লিখছিলেন বোঝা গেল শান্তা সেন প্রতুলকেই।

"প্রতুল,

আমি ভেবে দেখলাম এখানে তোমার সঙ্গে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই কালই আমি চলে যাচ্ছি। মাইকেল ব্রাড্‌লোর ব্যাপারটা যে তুমি অন্য ভাবে নেবে, বুঝতে পারি নি—"

ঐ পর্য্যন্তই চিঠিটা লেখা হয়েছিল। অসমাপ্ত চিঠি। চিঠির শেষাংশ নেই।

প্যাড্ থেকে ঐ পাতাটা ছিঁড়ে কিরীটি কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল।

পিস্তলটা হাতের মুঠোর মধ্যে বেশ শক্ত করেই ধরা। ঝোলান হাতটা তুলতে গিয়ে কিরীটি বুঝতে পারে ইতিমধ্যেই রাইগার মর্টিস সেট্ করেছে।

কিরীটি ঘরের চতুষ্পার্শ্বে আর একবার তাকাল। মাঝারি আকারের ঘর। সামান্য আসবাবপত্রের মধ্যেই একটা ছিমছাম ভাব। পরিচ্ছন্ন রুচির প্রকাশ।

একটি সিংগিল খাট। বিস্তৃত শয্যা। দেখলেই বোঝা যায় শয্যা ঐ রাত্রে আদৌ ব্যবহৃত হয় নি।

যে দৃশ্য চোখে পড়ল, সত্যিই তা ভয়াবহ [পৃঃ ১০৪

একটি আয়না বসান আলমারী। একটি ড্রেসিং টেবিল। তার পাশে একটি আলনায় কয়েকটি শাড়ী, ব্লাউজ ও গরম জামা। আলনার নীচে কয়েক পাটি লেডিজ সু—চপ্পল ইত্যাদি। আর একটি টেবিল

ও দুটি চেয়ার ও একটি চামড়া দিয়ে মোড়া বেতের মোড়া।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল কিরীটি, রাত দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়েছে।

একটি বাদে ঘরের বাকী সব জানালাই খোলা। উত্তরের জানালা-পথে মধ্য-শীতরাত্রির হিমশীতল বায়ুপ্রবাহ এসে প্রবেশ করে হাড় পর্য্যন্ত যেন কাঁপিয়ে যাচ্ছে!

'ক'টা আন্দাজ তুমি ফোনে জানতে পার প্রতুল ব্যাপারটা?'

'রাত তখন প্রায় একটা হবে!'

'হুঁ! এবারে পুলিশে তো একটা খবর দেওয়া দরকার—' বলতে বলতে হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দে ঘুরে খোলা দরজার দিকে তাকাতেই বিস্মিত হতচকিত কিরীটির কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হলো প্রশ্নবোধক একটি শব্দ ঃ 'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলেরও নজর পড়েছিল খোলা দরজার দিকে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতুল বলে ঃ 'একি! মাইকেল ব্রাড্‌লো?'

তিন

মাইকেল ব্রাড্‌লো!

দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ খোলা দরজার উপর দাঁড়িয়ে। দু' চোখে বিস্ময় ভরা সপ্রশ্ন দৃষ্টি!

চৌকো ছড়ানো মুখ। ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, ওষ্ঠের উপরে পাকানো এক জোড়া গোঁফ। ছোট কপাল। মাথার চুল বিস্রস্ত—এলোমেলো। পরিধানে স্লিপিং পায়জামা ও কালো রংয়ের উপর লাল সুতোয় তোলা ড্রাগনের মূর্ত্তি—কিমানো গায়ে।

'কি ব্যাপার, প্রতুলবাবু!...ইনি কে?'

পরিষ্কার শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলায় কথা বললেন আগন্তুক মাইকেল ব্রাড্‌লো! গলাটা একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও কর্কশ। কিন্তু কিরীটি বা প্রতুল কারো মুখ দিয়েই কোন কথা বের হলো না।

মাইকেল এবারে সোজা ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন এবং সামনেই রক্তাক্ত শান্তা সেনের মৃতদেহটা দেখে চম্‌কে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে যেন স্বগতোক্তি করলেন ঃ 'How horrible! এ কি... শান্তা!...'

প্রতুলই কথা বললে, 'দিদি সুইসাইড্ করেছে!'

'সুইসাইড্! শান্তা সুইসাইড্ করেছে?' মাইকেল আবার বললেন।

সংক্ষেপে প্রতুল সমস্ত ঘটনাটা আবার তাঁকে বললে।

'How impossible! এসব কি আপনি বলছেন প্রতুলবাবু!'

'Excuse me মিঃ ব্রাড্‌লো!'

কিরীটির কথায় ব্রাড্‌লো ফিরে তাকালেন।

'আপনি! আপনি হঠাৎ উপরে এলেন?'

'ঘুম কোন দিনই আমার খুব গাঢ় নয়! এই ঘরের ঠিক নিচের ঘরটাতেই আমি শুয়েছিলাম। আপনাদের পায়ের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে—এত রাত্রে এ ঘরে কে হেঁটে বেড়াচ্ছে দেখবার জন্য উপরে এসেছি—'

'হুঁ। আচ্ছা মি ব্রাড্‌লো। একটু আগে বলছিলেন আপনার ঘুম খুব গাঢ় নয়, এর আগে কোনরূপ শব্দ বা চীৎকার শুনতে পান নি?'

'না। তা ছাড়া রাত এগারটা পর্য্যন্ত তো এই ঘরেই বসে আমি আর শান্তা গল্প করেছি।'

'রাত এগারটা পর্য্যন্ত?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ কিরীটি প্রতুলের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি কোন্ ঘরে শুয়েছিলে প্রতুল?'

'বরাবর দো'তলার ঘরেই আমি শুই। গত পরশু মিঃ ব্রাড্‌লো আসার পর থেকে দো'তলায় আমার ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আমি নীচে বৈঠকখানার পাশের ঘরটাতে শুচ্ছিলাম।' জবাবে বলে প্রতুল।

'মিঃ ব্রাড্‌লো, আপনি কোন ফোনের রিং শুনেছেন?'

'ফোনের রিং! No! কই না!'

'হুঁ। আচ্ছা চল প্রতুল নীচে, তাহলে কল্যাণ সোমকে একটা ফোন করা দরকার! Let him come!'

'কল্যাণ সোম! Who is he?' প্রশ্নটা করেন মাইকেল।

'কালীঘাটের থানা-ইনচার্জ্জ।' জবাব দেয় কিরীটি।

কিরীটির মুখের দিকে চম্‌কে তাকাল [পৃঃ ১০৮

ফোন পেয়েই আধ ঘণ্টার মধ্যে কল্যাণ সোম এসে হাজির হলো।

কল্যাণ সোমও একটু আশ্চর্য্যই হয়ে গিয়েছিলেন এত রাত্রে এরকম জায়গা থেকে কিরীটির ফোন পেয়ে।

বাইরের ঘরেই কিরীটি, প্রতুল ও ব্রাড্‌লো কল্যাণের অপেক্ষা করছিল।

'কি ব্যাপার রায়? এখানে আপনি হঠাৎ—'

'আসুন কল্যাণবাবু, এই শীতের মধ্যরাত্রে আপনাকে টেনে আনতে হলো বলে দুঃখিত। একটা

বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গিয়েছে—'

কিরীটির কথায় কল্যাণ সোম বুঝতে পারেন ব্যাপার একটা কিছু বিশেষ রকম ঘটেছে। নচেৎ এত রাত্রে কিরীটি তাঁকে টেনে আনতো না। একটা খালি চেয়ারে বসতে বসতে সোম বললেন, 'বলুন।'

'আলাপ করিয়ে দিই—ইনি প্রতুল সেন, বি. এস-সি. ক্লাশে একসঙ্গে পড়েছিলাম। সেই থেকেই আলাপ। ইনি আমাকেই প্রথমে ফোন করায় আমি এসেছিলাম। ব্যাপারটা এর দিদিকে কেন্দ্র করেই। এর দিদি মিস্ শান্তা সেন **has been brutally murdered!** নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে—'

'**Brutally murdered!** নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।'

কথাটা শুনে মুহূর্ত্তে যুগপৎ ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই কিরীটির মুখের দিকে চমকে তাকাল। প্রতুলের কণ্ঠ হতে একটা অস্ফুট কাতর আর্ত্তনাদও বের হয়ে আসে।

'কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?...' প্রশ্ন করলেন মাইকেল ব্রাড্‌লো।

'হ্যাঁ! অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মিঃ ব্রাড্‌লো, মিস্ শান্তা সেন আত্মহত্যা করেন নি। তাঁকে কেউ হত্যা করেছে গুলি করে।—'

কিরীটিই এবারে সংক্ষেপে কল্যাণ সোমকে ঘটনাটা বলে গেল।

'বাড়িতে কে কে আছেন প্রতুলবাবু?—' প্রশ্ন করলেন কল্যাণ সোম।

'আমি, আমার এক প্রৌঢ়া পিসি, চাকর বলাই, আর বামুনদি বামার মা। উনি মিঃ ব্রাড্‌লো পরশু এখানে এসেছেন—'

'উনি মানে মিঃ ব্রাড্‌লো...!' কথাটা অসমাপ্ত রেখেই কল্যাণ সোম প্রতুলের মুখের দিকে তাকালেন।

মাইকেল ব্রাড্‌লো তখন নিজের পরিচয় নিজেই দিলেন।

মেজর মাইকেল ব্রাড্‌লো মিলিটারী অফিসার। পীস্ টাইমে বার্ম্মা-রাইফেলের সঙ্গে গত ছয় বৎসর রেঙ্গুণেই ছিলেন। মাস ছয়েক আগে ভারতে আসেন। বর্ত্তমানে ৬/৯ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের একজন কোম্পানী কমাণ্ডার।

জাতিতে ভারতীয় ক্রিশ্চান। আদি বাস লক্ষ্ণৌতে। রেঙ্গুণে থাকাকালীন সময়েই মিস্ শান্তা সেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। মাত্র পরশু দিন লাহোর থেকে দশ দিনের ক্যাজুয়াল লীভ্ নিয়ে শান্তা সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

চার

কল্যাণের সঙ্গেই সকলে আবার তিনতলার ঘরে গেল।

কল্যাণ মৃতদেহ ও ঘরটি পরীক্ষা করলেন। অতঃপর ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে সকলে নীচে নেমে এলো! কল্যাণের নির্দ্দেশ অনুযায়ীই তখন সকলকে ঘুম থেকে তোলা হলো।

প্রৌঢ়া পিসিমাও সব কথা শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ভৃত্য বলাই ও বামার মাও সব শুনে হতভম্ব!

শেষোক্ত, তিনজনকেই নানাভাবে প্রশ্ন ও জেরা করা হলো কিন্তু কারো কাছ থেকেই বিশেষ

কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল না।

তিনজনেই ঘুমুচ্ছিল কেউ কিছু জানে না। কেউই কোন শব্দ বা চীৎকার শুনতে পায় নি।

বাকী রইলো জেরা ও প্রশ্ন করা প্রতুল ও মাইকেল ব্রাড্‌লোকে।

প্রতুলের ব্যাপারও আগেই শোনা হয়েছিল। মাইকেলও বললেন, তিনিও কিছু টের পান নি।

কল্যাণ সোমের জবানবন্দী নেওয়া হয়ে গেলে কিরীটি তখন এক এক করে ডেকে প্রশ্ন সুরু করল। প্রথমেই ডাক পড়লো পিসিমা নিস্তারিণী দেবীর।

বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে নয়। মাথার চুল বেশীর ভাগই এখনো কালো। অটুট স্বাস্থ্য! বয়স যেন এখনো দাঁত বসাতে পারে নি!

বংশগত নিয়মেই লম্বা-চওড়া, নয় বৎসর বয়সের সময় বিবাহ হয়েছিল এবং এগার বৎসরে বিধবা হন। বালবিধবা নিঃসন্তান। পিতামহ আদর করে নয় বৎসর বয়সে নাতনীর বিবাহ দিয়েছিলেন।

'বসুন পিসিমা, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।—'

পিসিমা অনেকটা সামলে নিয়েছেন। কিরীটির নির্দ্দেশে খালি চেয়ারটায় উপবেশন করলেন। ঘরে কল্যাণ সোম ও কিরীটি ছাড়া তৃতীয় কেউ ছিল না।

একটু যেন ইতস্ততঃ করে কিরীটি তার জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে, 'আচ্ছা পিসিমা, গত রাত্রে শেষ কখন আপনার সঙ্গে মিস্ শান্তা সেনের দেখা হয়েছিল?—'

পিসিমা নিস্তারিণী মৃদু শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'দশটায় ওদের খাওয়া চুকে যাবার পর আমি নিজের ঘরে শুতে যাই!'—

'সাধারণতঃ রাত্রে আপনার ঘুম কি রকম?'—

'ঘুম আমার খুব পাতলাও নয় খুব গাঢ়ও নয়।'—

'আপনি কোন রকম শব্দ বা চীৎকার শোনেন নি?'

'না!—'

'একটা কথা কতকটা বাধ্য হয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে পিসিমা, মনে কিছু করবেন না।'—বলে একটু থেমে কিরীটি তার বক্তব্য শেষ করে, 'প্রতুলবাবু ও শান্তা দেবী ভাই-বোনের মধ্যে সদ্ভাব কেমন ছিল?—'

'এতদিন ত দূরে দূরেই ছিল। মাস দেড়েক এখানে এসেছে শান্তা, এর মধ্যে ওদের দু'জনার মধ্যে অসদ্ভাবের ত কিছু দেখি নি। তবে গত কাল সন্ধ্যের দিকে ভাই-বোনের মধ্যে কি নিয়ে যেন সামান্য বচসা হয়েছিল।—'

'কেন বচসা হয়েছিল জানেন না?—'

'না।—'

'মাইকেল সাহেবকে নিয়ে বচসা হয়েছিল বলে কি আপনার মনে হয়?—'

'মাইকেল, না—কেন তাকে নিয়ে হবে কেন? লোকটা ত খুব ভদ্র।—'

'হুঁ। আচ্ছা আর একটা কথা। এ বাড়ির মালিক কি ভাই-বোন দু'জনাই?—'

'দু'জনাই!—ওদের বাপ দু'জনাকেই বাড়িটা দিয়ে গিয়েছে!—'

'আচ্ছা পিসিমা, আপনার ভাইঝি শান্তা সেনকে আপনার কি রকম লাগত?—'

'এমনিতে ত ভালই ছিল, তবে একটু ম্লেচ্ছ প্রকৃতির ছিল।—'

ভৃত্য বলাই ও রাঁধুনী বামার মা দু'জনাই নীচের তলায় শুয়ে ছিল। তাদেরও ডেকে কিরীটি দু'টি প্রশ্ন করলে।

ভাই-বোনের মধ্যে তারা কোন বচসা বা রাগারাগি হতে শুনেছে কিনা? দু'জনেই জবাব দেয়, সে রকম কিছুই তারা কেউ শোনে নি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন করে, তারা কেউ কোন টেলিফোনের শব্দ বা চীৎকার কিছু শুনেছে কি না?

জবাব দিল তারা, 'না!'

কিরীটির আহ্বানে প্রতুল যখন ঘরে এলো, বাইরে তখন রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে।

'বসো প্রতুল! ঘটনার গুরুত্ব নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো?—'

'সত্যিই কি তোমার ধারণা, দিদির ব্যাপারটা সুইসাইড্ নয়, মার্ডার?—'

'হ্যাঁ! মৃতদেহ পরীক্ষা করেই সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ক্ষত পরীক্ষা করলে পুলিশ-সার্জ্জনও যে সেই অভিমতই প্রকাশ করবেন, সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত—'

'কেন?' প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে প্রতুল কিরীটির মুখের দিকে তাকায়।

'সুইসাইড্ হলে ক্লোজ রেঞ্জে ফায়ার করার দরুণ ক্ষতের চারপাশে কার্ব্বণের দাগ থাকত, আশপাশের চুলও ঝলসে পোড়া থাকত। এবং অত ক্লোজ রেঞ্জে ফায়ার হলে বুলেটটা স্কাল্‌কে ভেদ করে বাইরে বের হয়ে আসবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। সে ক্ষেত্রে একটা নয়, দুটো ক্ষতই থাক্‌তো অর্থাৎ বুলেটের প্রবেশ ও নির্গমনের পথ। পরীক্ষা করে দেখেছি সে রকম কিছু নেই, এবং একটি মাত্র পয়েন্টেই আমি definite হয়েছি যে she has been murdered! তাকে কেউ হত্যা করেছে—আত্মহত্যার কেস নয় এটা!' কিরীটি একটানা কথাগুলো বলে গেল।

'কিন্তু—' তবু যেন ইতস্ততঃ করে প্রতুল।

'না, এতে আর কোন কিন্তু বা সন্দেহ নেই প্রতুল! এবং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কতখানি serious—গুরুত্বপূর্ণ! এবং তাকে যখন হত্যাই করা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে।—'

'কিন্তু বুঝতে পারছি না কিছুতেই ভাই—দিদিকে এভাবে কে হত্যা করবে? আর কেনই বা করবে?—' প্রতুল বলে।

'কেন হত্যা করা হলো সেটা—মানে উদ্দেশ্য অর্থাৎ motive-টা জানতে পারলে ত সমস্যাটাই অনেকটা সোজা হ'য়ে আসত—সেটাই ত আপাতত আমাদের অনুসন্ধান করে জানতে হবে ভাই!' একটু থেমে কিরীটি আবার বললে, 'পিসিমার মুখে শুনলাম গতকাল সন্ধ্যার দিকে নাকি তোমার সঙ্গে তোমার দিদির কি নিয়ে বচসা হয়েছিল! কিছু মনে করো না ভাই! ব্যাপারটা যদি তুমি আমাকে খুলে বল—'

প্রতুল যেন একটু ইতস্ততঃ করলে কয়েকটা মুহূর্ত্ত। তারপর বললে, 'হাঁ হয়েছিল, মাইকেলকে নিয়ে।'

'মাইকেলকে নিয়ে?'—তারপর যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বললে, 'হুঁ অনুমান তাহলে আমার সত্য! Something with ইস্কাবনের সাহেব! হরতনের বিবি আর ইস্কাবনের সাহেব!'

'কি বললে?—'

'কিছু না!—কিন্তু বচসা হয়েছিল কেন?'—কিরীটি কথাটা ঘুরিয়ে দেয়।

'তুমি ত জান রায়, কি রকম গোঁড়া হিন্দু ছিলেন আমার বাবা।—'

'তাই কি।—'

'দিদি নাকি এখানে আসবার বৎসর খানেক আগেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিল।'

'ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিল?'

'হ্যাঁ, ক্রিশ্চান হয়েছিল।'

'কিন্তু হঠাৎ তিনি এতকাল পরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলেন কেন?'

'সেটাই ত আশ্চর্য্য।—'

কিরীটি একটু ভেবে বলে, 'আচ্ছা তোমার দিদির ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারটার সঙ্গে মাইকেল ব্রাড্‌লোর কোন যোগাযোগ আছে বলে তোমার মনে হয় কি প্রতুল?—'

'দিদিকে অবিশ্যি সে কথা বলতে সে সোজা অস্বীকার করেছিল; কিন্তু আমার মনে হয় তাই।—'

'কেন?—'

'মাইকেলের বাপ জোসেফ ব্রাড্‌লো নাকি একজন গোঁড়া ধর্ম্মযাজক পাদ্রী। রেঙ্গুণে থাকাকালীন সময়েই ব্রাড্‌লো-পরিবারের সঙ্গে দিদির খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়। এবং সেই পাদ্রী জোসেফ ও মাইকেলের চেষ্টায়ই দিদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। দিদি যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছে এটা আমার জানা ছিল না। মাইকেল আসবার পরই সেটা প্রকাশ পায়।—'

'এই ব্যাপার নিয়েই কি তোমাদের মধ্যে বচসা হয়েছিল প্রতুল?—'

'হ্যাঁ। দিদিকে আমি স্পষ্টই বলে দিয়েছিলাম ক্রিশ্চানের এ বাড়িতে স্থান হতে পারে না; কারণ এখনো আমাদের এ বাড়িতে কুলদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণ আছেন এবং নিয়মিত তাঁর পূজা হয়ে থাকে।—'

'তোমার দিদি তোমার সে কথার কি জবাব দিয়েছিলেন?—'

'সে বলেছিল আমার নাকি এ বাড়ি থেকে তাকে তাড়াবার কোন অধিকার নেই। বিশেষ করে তারও উপার্জ্জিত অর্থ নাকি এ বাড়ি তৈরী করবার সময় বাবা নিয়েছিলেন।—'

অতঃপর কিরীটি বললে, 'আচ্ছা তুমি এবারে মাইকেলকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও।—'

মাইকেল ব্রাড্‌লো এলেন।

'বসুন মিঃ ব্রাড্‌লো!'—কিরীটি বললে।

মাইকেল উপবেশন করার পর কিরীটি আবার প্রশ্ন সুরু করে, 'আচ্ছা মিঃ ব্রাড্‌লো, আপনার সঙ্গে ত মিস্ সেনের অনেক দিনের আলাপ। মিস্ সেন কোন্ প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন বলতে পারেন?—'

'একটু অসহিষ্ণু ও রগচটা ছিলেন বটে মিস্ সেন। Otherwise she had a perfect character! খুব সাহসী, উচিত-বক্তা ও reasonable ছিলেন।—'

'আপনার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কোন কথাবার্ত্তা কখনো হয়েছিল কি?—'

'না—কোন দিনই না। We were just like sister and brother! তাছাড়া আমি যতদূর তাকে জানতাম বিবাহের ব্যাপারটাকে তিনি বরাবর ঘৃণাই করেছেন!—'

'আচ্ছা—একটা কথা, বলতে পারেন হঠাৎ তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে গেলেন কেন?'

'সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার! আমি কেমন করে তার জবাব দেবো বলুন?—'

'Well মিঃ ব্রাড্লো! মিস্ সেনের এই হত্যার ব্যাপারটা আপনার কোনরকম কিছু মনে হয় কি?—'

'সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি যেন ব্যাপারটায় একেবারে যাকে বলে বজ্রাহত হয়ে গিয়েছি!'

'কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?—'

'ব্যাপারটা আগাগোড়াই আমার কাছে কল্পনাতীত বলে মনে হচ্ছে! সন্দেহ করবো কাকে বলুন? —প্রথমত প্রতুলের মুখে শান্তা আত্মহত্যা করেছে শুনে যেমন ব্যাপারটা কোনক্রমেই আমার বিশ্বাস বা বোধগম্যের মধ্যে ধরা দেয়নি, তেমনি দ্বিতীয়ত আপনার মুখে ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয় হত্যা শুনেও আমার সমস্ত বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কোন মীমাংসাতেই পৌঁছাতে পারছি না এখনো। শান্তার মত স্থিরবুদ্ধি মেয়ের যেমন কোন কারণেই আত্মহত্যার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা জাগতে পারে না, তেমনি তাকে হত্যা করবার কারো প্রয়োজন হতে পারে আমার ধারণাতেই আসছে না।—'

কিরীটি মাইকেলের কথার কোন জবাব দেয় না।

পাঁচ

ভোরের প্রসন্ন আলোয় চারিদিক ক্রমে ঝলমল করে ওঠে। কিরীটি আবার তিনতলায় ছাতের ঘরে যেখানে শান্তা সেনের মৃতদেহ এখনো রয়েছে, সেখানে গিয়ে প্রবেশ করে। আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করে। কোন কিছু যদি গত রাত্রে তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে গিয়ে থাকে! চিঠিটা পকেট থেকে বের করে আবার পড়ে। ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা নয়, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। তাহলে অন্ততঃ চিঠিটা লিখতে লিখতে অর্দ্ধপথে অসমাপ্ত চিঠিটা রেখে সে আত্মহত্যা করতো না। খুব সম্ভব কেউ শান্তা সেনকে গুলি করেছে ঘরের মধ্যে ঢুকে ক্লোজ রেঞ্জে দাঁড়িয়ে। সে নিশ্চয়ই শান্তা সেনের অপরিচিত ছিল না। অন্যথায় অত ক্লোজ রেঞ্জে দাঁড়িয়ে তার অজ্ঞাতে গুলি করা যায় না। হয়ত শান্তা সেন শুতে যাবার পূর্ব্বে চিঠি লিখছিল এমন সময় হত্যাকারী এসে ঘরে প্রবেশ করতে সে চিঠিটা শেষ করতে পারে নি। তারপর হত্যাকারী তাকে হয়ত কথা বলতে বলতেই আচমকা গুলি করেছে। এবং গুলি করবার পর মৃতের হাতে পিস্তলটা গুঁজে দিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু তাহ'লেও একটা কথা।

পিস্তলে গুলি ছোড়ার আওয়াজটা কেউ শুনতে পেল না কেন? তারপর প্রতুলকে টেলিফোনে সংবাদটা জানান। টেলিফোনের ব্যাপারটাও একটা রহস্য! হত্যাকারী কি সত্যি সত্যিই প্রতুলকে টেলিফোন করেছিল? যদি ধরে নেওয়া যায়, যে টেলিফোন করেছিল সে-ই হত্যাকারী! কিন্তু কেন? ব্যাপারটা ত এমনিতেই পরের দিন সকালে স্বাভাবিক উপায়েই সকলে জানতে পারত! এ ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে কোন কারণে সেই রাত্রেই হত্যাকারী চেয়েছিল হত্যার ব্যাপারটা সকলের গোচরীভূত হোক, তাই ফোন করে জানিয়েছিল প্রতুলকে।

এখন কথা হচ্ছে, হত্যাকারী কোন বাইরের তৃতীয় ব্যক্তি, না বাড়িতেই গত রাত্রে যারা উপস্থিত

ছিল তাদেরই মধ্যে কেউ?

মৃত শান্তার মুখের দিকে তাকাল কিরীটি। ঘষা কাচের মত চোখের মণি দুটো স্থির অপলক—যেন তাকিয়ে আছে। ভাষাহীন, বোবা! মুহূর্তের জন্যও যদি চোখের মণি দু'টো নড়ে উঠতো। কিন্তু তা আর হবে না। সমস্ত রহস্যকে নিয়ে যেন চিরদিনের মত স্থির হয়ে গিয়েছে! হঠাৎ কিরীটির দৃষ্টি টেবিলের নীচে আবদ্ধ হলো। টেবিলের পায়ার কাছে শান্তা সেনের একপাটি সাণ্ডেল যেখানে পড়ে ছিল, তারই গা ঘেঁষে চক্ চক্ করছে কি যেন একটা! কৌতূহলভরে নীচু হয়ে তুলে নিল কিরীটি। একটা সোনার আংটি। আংটির উপরিভাগটা একটা হরতনের মত এবং তার উপরে মীনা করা একটি অক্ষর 'পি'। আংটিটার সাইজ দেখে মনে হয় কোন পুরুষের আঙ্গুলের। আংটির ফাঁদটা প্রমাণ আকারের।

নামের আদ্যক্ষর 'পি'। কার আংটি? সহসা বিদ্যুৎ-চমকের মতই বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর পর পর মনের মধ্যে ভেসে ওঠে! ইংরাজী 'পি', বাংলা 'প'। কার—কার নামের আদ্যক্ষর? যার নামেরই আদ্যক্ষর হোক, তার হাতের আংটি এ ঘরে ঐ জায়গায় এলো কি করে? এক হতে পারে, যার আংটি তার হাতের আঙ্গুল থেকে কোন এক সময় খুলে ছিট্‌কে হয়ত গিয়ে ওখানে পড়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে কি যার আংটি সে টের পায়নি? নিশ্চয়ই পায়নি, নচেৎ সে কি আংটিটা তুলে নিত না? আর হতে পারে সে এখনো জানে না। কিন্তু কার, কার হ'তে পারে এ বাড়িতে এ আংটিটা? প্রথমেই কিরীটি শান্তার হাতের আঙ্গুলগুলো পরীক্ষা করলে, এবং দেখতে গিয়েই তার নজর পড়ল, পিস্তলধৃত ডান হাতের আঙ্গুলে স্পষ্ট আংটির দাগ রয়েছে।

পকেট হ'তে একটা রুমাল বরে করে তার সাহায্যে বদ্ধমুষ্টি থেকে ধীরে ধীরে পিস্তলটা বের করে নিয়ে মধ্যমায় আংটিটা পরাতেই চমৎকার করে আঙ্গুলে সেটা ফিট্ করে গেল।

তাহলে আংটিটা শান্তা সেনেরই? কিন্তু আংটিটা খুলে গেল কি করে? সঙ্গে সঙ্গে চকিতে অন্য একটি সম্ভাবনা উঁকি দেয় কিরীটির মনে। এবং সেই সঙ্গে আরো একটা চিন্তা মনোমধ্যে এসে উদয় হয়। শান্তা সেনের হাতের আঙ্গুলে 'পি' আদ্যক্ষর লেখা আংটি কেন? নিশ্চয়ই কারো অভিজ্ঞান বা প্রীতি-'চিহ্ন'।

অন্যমনস্ক ভাবে ভাবতে ভাবতে কিরীটি টেবিলের উপর থেকে ঝর্ণা কলমটা তুলে নিল। একি! আশ্চর্য্য! গত রাত্রে কিরীটির নজর পড়ে নি। কলমের নিবটা ভাঙ্গা!

ঐ দিনই সন্ধ্যার দিকে। থানা-অফিসার ও কিরীটি প্রতুলদের ওখানে গিয়েছে। প্রত্যেককেই নাকি আরো কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিরীটির।

প্রথমেই এলেন পিসিমা নিস্তারিণী দেবী! কোনরূপ ভণিতা বা সময়ক্ষেপ না করে সোজাসুজিই কিরীটি তার বক্তব্য পেশ করে, 'কাল রাত্রে এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে শান্তা দেবীর ঘরে আপনি গিয়েছিলেন পিসিমা?—'

চম্‌কে উঠ্‌লেন যেন নিস্তারিণী স্পষ্ট প্রশ্নে! বললেন : 'কই না!'

'মনে করে দেখুন!—'

'না!—'

'ঐ সময় যখন শান্তা দেবীর ঘরে গোলমাল হচ্ছিল?'

'কে? কে বললে এ কথা?'

'মিথ্যে ঢাকবার চেষ্টা করছেন নিস্তারিণী দেবী! খুলে বলুন।'

'আমি কিছুই জানি না!' হঠাৎ নিস্তারিণী দেবীর গলার স্বর অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেল।

'শুধু আপনিই নন পিসিমা। প্রতুল ও মাইকেল সাহেব আপনারা প্রত্যেকেই সব ব্যাপারটা জানেন। টেলিফোন-অফিসে সংবাদ নিয়ে আমি জেনেছি, গত কাল দিনে ও রাত্রে মাত্র একটি কলই হয়েছিল, প্রতুলের আমাকে ফোন করা। আপনারা তিনজনে মিলে যে ব্যাপারটা ঢাকতে চাইছেন, সেটা স্পষ্টই আমি বুঝতে পারছি। এখনো সব কথা আমাকে খুলে বলুন। নইলে উনি—থানা-অফিসার আপনাদের প্রত্যেককেই শান্তা দেবীকে হত্যা করার অভিযোগে এ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হবেন। আর বুঝতেই পারছেন, এ্যারেষ্ট হলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে!'

হঠাৎ পিস্তল থেকে গুলি ছোটে [পৃঃ ১১৫

তথাপি নিস্তারিণী দেবীর কাছ হতে কোন কথা আদায় করা গেল না।

প্রতুল এলো ঘরে। এবং সেও নিস্তারিণী দেবীর মতই কোন কিছু স্বীকার করলো না। তখন ডাকা হলো মাইকেলকে। তিনি যখন সব কিছু অস্বীকার করলেন তখন কিরীটি বললে: 'শুনুন মিঃ মাইকেল, শোন প্রতুল! গত রাত্রের সমস্ত ঘটনাটা মাত্র একটি দিকেই ইঙ্গিত জানাচ্ছে, বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তি শান্তা দেবীর হত্যাকারী নয়। তুমি, মিঃ মাইকেল বা নিস্তারিণী দেবী অর্থাৎ তোমার পিসিমা, এই তিনজনের একজনই হত্যাকারী শান্তা সেনের।'

'কি বলছো তুমি কিরীটি?'

'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই জানাতে বাধ্য হচ্ছি—ঠিক তাই! কিন্তু কেন আমার এ ধারণা হলো তাই জানতে চাও ত?'

প্রতুল যেন বোবা হয়ে গিয়েছে! কিরীটির প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে না। কেবল নিঃশব্দে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

কিরীটির কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর মনে হয়! কিরীটি বলে, 'শোন প্রতুল! সর্ব্ব ক্ষেত্রেই হত্যার একটা মোটিভ্ থাকে। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই একটা আছে যদিচ এখন পর্য্যন্ত সেখানে আমি পৌঁছাতে পারি নি। এবং সেটা জানতে পারলে এতক্ষণ সোজা আমি তোমাদের তিনজনের মধ্যে আসল হত্যাকারীকে Spot out করতে পারতাম। কিন্তু থাক সে কথা। শোন! যে মুহূর্ত্তে আমি বুঝতে পেরেছি যে ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয়, হত্যা, তক্ষুণিই তোমার টেলিফোনে সংবাদ পাওয়ার ব্যাপারটার সঙ্গে যোগ-বিয়োগ করে আমি বুঝতে পারি যে, ব্যাপারটা তোমার ত অজানা নয়ই—দ্বিতীয়তঃ পিস্তলের আওয়াজটা যখন তোমরা কেউ শোন নি বলছো তখন আসল ব্যাপারটা অন্ততঃ তোমাদের তিনজনের মধ্যে কারই অজানা থাকা সম্ভব নয়। তোমরা তিনজনই সব কিছু জান! শুধু তাই নয়, তোমাদের ঐ গোপনতা আর একটা সত্যকে আমার কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে যে, বাইরে থেকে কেউ এসে শান্তা সেনকে হত্যা করে নি। হত্যা করেছো তোমাদেরই মধ্যে কেউ একজন। সত্যকে বেশী দিন চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না প্রতুল, প্রকাশ পাবেই। তবে মিথ্যে কেন কেলেঙ্কারী বাড়াবে? এখনো আসল ব্যাপার সব খুলে বল! পিসিমা অবিশ্যি কিছু কিছু বলেছেন,—'

কিরীটির কথা শেষ হলো না প্রতুল চীৎকার করে ওঠে : 'কি! কি বলেছে পিসি?'

কিরীটি বুঝতে পারে তার চাল ব্যর্থ হয় নি। পিসিমা কিছু প্রকাশ করেছেন জেনেই সে বিচলিত হয়ে উঠেছে।

'ব্যস্ত হয়ো না শোন! কাল রাত এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে কি নিয়ে তোমার দিদির ঘরে গোলমাল হয়েছিল বল?'

মাইকেল সাহেব এবার মুখ খুললেন, 'আমি সব কথা বলছি শুনুন মিঃ রায়!—'

মাইকেলের কণ্ঠস্বরে সকলেই তার মুখের দিকে ফিরে তাকাল।

'এই বাড়ির নিজের অংশ শান্তা বিক্রি করে মিশনে দিতে চায়। সেই ব্যাপার নিয়েই ভাই বোনে ঝগড়া হয় পরশু সন্ধ্যায়। শেষ পর্য্যন্ত শান্তা এবাড়ি হতে চলে যাবে ঠিক করে। আমাকে সে কথা সে বলে গত সন্ধ্যায়। গত রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি যখন শান্তার ঘরে যাই, শান্তা তখন চিঠি লিখছিল। শান্তাকে আমি বোঝাতে গিয়েছিলাম। ভাই-বোনের ঝগড়াটা মিটিয়ে নেবার জন্য। এমন সময় প্রতুলবাবু সেই ঘরে গিয়ে হাজির হন। তখনও বুঝতে পারি নি প্রতুলবাবু আমার পিস্তলটা নিয়ে গিয়েছেন তাঁর দিদিকে হত্যা করবার জন্য। তাঁর হাতে আমার পিস্তল। আমি হঠাৎ প্রতুলবাবুর হাতে পিস্তলটা দেখতে পেয়ে কেড়ে নিতে যাই। ফলে দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। শান্তা দেবীও আমাদের ছাড়াবার চেষ্টা করেন। টানাটানি করতে করতে হঠাৎ পিস্তল থেকে গুলি ছোটে। এবং শান্তা দেবী খুব কাছে থাকায় গুলি তাঁর কপাল ভেদ করে যায়। এই হচ্ছে ব্যাপার।—'

কিরীটি প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, দু'হাতে মুখ ঢেকে তখন সে বসে আছে।

মাইকেল সাহেব তখন বলেন, 'দুর্ঘটনাটা এমন আকস্মিক ঘটে গেল যে আমরা সকলেই একেবারে বোবা হয়ে গেলাম যেন! গোলমাল ও পিস্তলের শব্দে পিসিমাও তখন ছুটে এসেছেন—'

হঠাৎ প্রতুলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমি! হাঁ আমিই হত্যা করেছি দিদিকে! আমাকে গ্রেপ্তার

কর কিরীটি! আমায় গ্রেপ্তার কর।'

একটু থেমে মাইকেল সাহেব আবার বলতে লাগলেন, 'কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কেউ ত সত্য কথা বিশ্বাস করবে না। তখন ভেবে চিন্তে আমারই পরামর্শ মত ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা এই ভাবে সাজান হলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হঠাৎ প্রতুল যে কেন আপনাকে ফোনে ডেকে আজগুবী গল্প ফাঁদল, বুঝতে পারলাম না। তবে এখন বুঝতে পারছি যে ঈশ্বর যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন। ঈশ্বর-চালিত হয়েই প্রতুলবাবু আপনাকে ফোন করেছিলেন। নচেৎ এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটা বলবারই হয়ত অবকাশ পেতাম না। কারণ আপনি না এলে এইভাবে সত্যকে হয়ত পুলিশের লোক খুঁচিয়ে বের করতে পারত না।'

ব্যাপারটার মধ্যে এবং মাইকেল-বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে সত্য-মিথ্যা যাই থাক্, শেষ পর্য্যন্ত accidental death হিসাবেই থানা-অফিসার কিরীটির পরামর্শ মত ডাইরী দিলেন।

আরো দিন তিনেক বাদে ফোন পেয়ে কিরীটি হাওড়া ষ্টেশনে মাইকেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মাইকেল সাহেব কর্ম্মস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। গাড়ি ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়বার পর হঠাৎ এক সময় মাইকেল সাহেব বললেন, 'একটা কথা আপনাকে সত্য বলি নি মিঃ রায়, শান্তা ও আমার পরস্পরের সম্পর্কটা!—'

কিরীটি মৃদু হেসে বললে, 'জানি!'

'জানেন! কি জানেন?—'

'আপনারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতেন!—'

'সে কি! কেমন করে জানলেন?—'

'প্রতুলের মুখেই আপনার পুরো নামটা জানি—মাইকেল পিটার ব্রাড্‌লো! তাই না?—'

'হ্যাঁ! কিন্তু—'

'সম্ভবতঃ পিটারের আদ্যক্ষর 'পি' মীনাঙ্কিত করা শান্তা দেবীর হাতের আঙ্গুলের আংটিটাই তার সাক্ষ্য দিয়েছিল!—'

মাইকেল পিটার ব্রাড্‌লো চুপ করে রইলেন।

গাড়ি ছাড়বার শেষ ঘণ্টা পড়লো। ষ্টেশনের আলোয় কিরীটি স্পষ্ট দেখলে, পিটারের চোখের কোল দু'টি জলে ছল ছল করছে।

ইস্কাবনের সাহেব!—কিরীটি মনে মনে বলে : 'তোমায় সেলাম!'

শ্রীর মানে কি?

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আমাদের ছেলেবেলার বাংলাদেশকে আজকে আর খুঁজে পাই না। তখন আমাদের গ্রামের চারপাশে যে বিস্তীর্ণ মাঠ তার ওপারে, আমাদের চোখের দৃষ্টির বাইরে, ছিল রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানা, বুড়ো আঙুলের মতো ছোট ছোট বামন, জলপরী আর স্থলপরীদের দেশ। তখন কচুবনের নিচে যে প্রকাণ্ড কোলা ব্যাঙ মক্ মক্ করত, তার সঙ্গে যক্ষপুরীর রাজকন্যার যে আলাপ ছিল, এ নিয়ে আমাদের মনে কোনো সংশয় ছিল না। বর্ষার অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টিধারার তালে তালে ব্যাঙের ছাতার নিচে পরীদের নাচ—মায়ের কোলের কাছে শুয়ে আমরা স্পষ্ট শুনতে পেতাম। ঝড়ের হাওয়ায় বাঁশবনে যখন ঠকাঠক শব্দ হতো, তখন ঘুম যেত ভেঙে,—স্পষ্ট বুঝতে পারতাম একানড়ে তার তালগাছের বাসা থেকে নেমে একটা পায়ে ঠক ঠক ক'রে কি যেন খুঁজে বেড়াত। তেঁতুল-অশ্বত্থের ডালে ডালে যে সব ছেঁড়া নেকড়া ঝুলত, সেগুলো যে ভূত-পেত্নী-শাঁকচুন্নীদের পরিধেয় বস্ত্র, এ বিষয়েও আমরা সুনিশ্চিত ছিলাম। আর চাঁদিনী রাত্রের আলো-ছায়ায় কতদিন যে জটা-ত্রিশূলধারী ব্রহ্মদৈত্যকে প্রায় প্রত্যক্ষ করেছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

বড় হয়ে তাদের কাউকেই আর কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার জগৎ থেকে তারা আজ একেবারে নির্ব্বাসিত। জানতে কৌতূহল হয়, তোমাদের জগতে আজও তারা আছে কি না! হাওয়ায় যখন তালের পাতা দুলে ওঠে, তোমরা তখন একানড়ের হাততালি শুনতে পাও? শুনতে পাও তারায় ভরা আকাশের নিচে শুয়ে রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার উড়ে যাওয়ার শব্দ?

জানি না। কিন্তু এমনিতর ছোটবেলায় নিজের চোখে যে ঘটনা একদিন দেখেছিলাম, আজ সেই গল্প শোনাব। বিশ্বাস করতে পার কোরো, না পার কোরো না।

আমার বয়স তখন নয়-দশের বেশি নয়। কত রাত্রি জানি না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ন'কাকার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল : খোকা, শিগগির ওঠ। তাঁতিবাড়িতে ভূত তাড়ানো হচ্ছে!

তাঁতিবাড়ি! ভূত! আমার সমস্ত শরীর কি একটা উত্তেজনায় ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো। এক হাতে কোমরের কাপড়ের কসি ধ'রে এবং অন্য হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এসে ন'কাকার আঙুল ধরলাম।

বললাম, চল!

বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। নদীর ধারের তেঁতুল-বন থেকে শন্ শন্ আওয়াজ আসছে। থেকে থেকে শুকনো পাতা নড়ছে খড়বড় ক'রে। দূরের বাঁশবনে জোনাকীরা যেন আলোর মেলা বসিয়েছে! তাতে যেন এদিকের অন্ধকার আরও বেড়ে গেছে। আর আকাশ-ভরা তারা, শুধু তারা, লক্ষ লক্ষ তারা।

তাঁতিবাড়ি দূরে নয়। রামহরি তন্তুবায়কে আমরা জ্যাঠা বলতাম। হাড়-বের-করা লিকলিকে লম্বা দেহ। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কালো চেহারার লোকেরা যেমন তেল মেখে চুকচুকে হয়ে থাকে, মনে হয় গায়ে মাছি বসলে পিছলে যাবে, রাম জ্যাঠা তেমন থাকতো না। সমস্ত সময়েই তার গায়ে যেন খড়ি উঠতো, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সামনের দুটো দাঁত ছিল ভাঙা। কর্কশ ভাঙা গলায় হাঁ ক'রে যখন সে হাসতো, আমরা দিনের বেলাতেও ভয় পেয়ে যেতাম।

সেই রাম জ্যাঠার বাড়িতে ভূত!

ন'কাকা বললেন, বাড়িতে নয়, সেই রামকেই ভূতে পেয়েছে। ভূতে ঠিক নয়, ডাইনীতে।

একটু থেমে বললেন, ওর দশ-বারো দিন থেকে জ্বর হয়েছিল। ডাক্তার বললেন, নিউমোনিয়া। কিন্তু সেটা নাকি জ্বরও নয়, নিউমোনিয়াও নয়। আসলে তাকে ডাইনীতে পেয়েছে। ওঝা এসেছে সেই ডাইনীটাকে ছাড়াতে।

ডাইনী সম্বন্ধে আমার মনে ধারণা ছিল, জীর্ণ দেহ নিরানব্বুই বছরের একটা থুরথুরে বুড়ি। মাথায় বিঘৎ পরিমাণ শণের নুড়ির মতো শাদা চুল। কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ভয়ে তখন আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছে কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতূহল হচ্ছে প্রবল।

ন'কাকার আঙুলটা আরও জোরে চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলাম, তাকে দেখা যাচ্ছে?

—কাকে?

—সেই ডাইনীটাকে?

ন'কাকা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ঃ দূর পাগল! ডাইনী কখনও দেখা যায়?

ভয় আমার যত বেশিই হোক, ডাইনীটাকে দেখতে পাওয়া যাবে না শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহ'লে কি ক'রে বোঝা গেল, ওটা ডাইনী?

গম্ভীর কণ্ঠে ন'কাকা বললেন, ওদের দেখা যায় না। কিন্তু যারা ওঝা, তারা বুঝতে পারে। মন্তর জানে কিনা।

তা হবে।

কিন্তু তখন আমরা এসে পড়েছি দু'পাশের দুই এঁদো ডোবার মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথটার কাছে। এতই সঙ্কীর্ণ যে দুজনে পাশাপাশি যাওয়া যায় না। এইখানটায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। চিন্তার কারণ ছিল ঃ একজনকে আগে, একজনকে পিছনে যেতে হবে। তাঁতিবাড়ি থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসছিল। যদি আমি আগে যাই, ওঝার তাড়া খেয়ে ডাইনীটা ছুটে এসে আমার নাকটা টেনে ধরে, তা হ'লেই গেছি! আবার পিছনে একলা ছেলেমানুষ পেয়ে ডাইনীর জ্ঞাতি-গোষ্ঠী,—তারাও নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও রয়েছে,—যদি আমার ঘাড়ে শণের নুড়ি দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়, তাহ'লে এই শীতে,

ডোবার জলে ডুবে মরা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না

ন'কাকাকে বললাম, কোলে কর।

তিনি নিশ্চয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিছুই না-বলে,—কিংবা সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে হেসে থাকলেও টের পাইনি,—কোলে ক'রে জায়গাটা পার ক'রে দিলেন।

অন্ধকারে দুটি লোক বাঘের মতো থাবা গেড়ে... [পৃঃ ১২০

ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি, বহু লোক জড় হয়েছে। প্রকাণ্ড বড় উঠান অন্ধকারে থমথম করছে। তার মাঝখানটা খালি, বোধ করি ভয়ে,—কিন্তু চারিধারে বহু লোক গুচ্ছে গুচ্ছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা ভয়ঙ্কর কিছুর প্রতীক্ষা করছে! অন্ধকারে তাদের চেনা যাচ্ছে না, তাদের ঘেঁসাঘেঁসি দাঁড়ানো, ফিসফাস কথা সেইরকমই একটা আভাস দিচ্ছিল।

নিজের এক কুঠুরী উঁচু দাওয়া-ওলা ঘরের দাওয়ায় রাম জ্যেঠা একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর ব'সে। কিন্তু এ যেন হাসিখুশি রঙ্গপরায়ণ রাম জ্যেঠাই নয়। দূরে এক কোণে একটা বাঁশের খুঁটির কাছে একটা কুপী জ্বলছিল। তার থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই উদ্‌গীর্ণ হচ্ছিল বেশি। মধ্যরাত্রের হাওয়ায় সেই কম্পিত স্বল্পালোক রাম জ্যেঠার ঘনকৃষ্ণ শীর্ণ দেহ এবং মুখের স্থানে স্থানে এসে পড়েছিল। জবাফুলের মতো লাল দুটো চোখ যেন গভীর কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল! থেকে থেকে অশ্রাব্য ভাষায় রাম জ্যেঠা কাকে যে গালি-গালাজ করছিল, বুঝতে পারছিলাম না। তখন

তার মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছিল। পরক্ষণেই ক্লান্তিতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ছিল। ওঝাকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু গালাগালি নিঃসন্দেহে তাকেই দিচ্ছিল। যাই হোক, সব শুদ্ধ মিলিয়ে রাম জ্যেঠাকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

রাগে তার দাঁত কড়মড় করতে লাগলো।

আমি আর ন'কাকা গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ওদিকের কোণের ছোট কুল গাছটার অদূরে। এদিকটা একেবারে নির্জ্জন বললেই হয়। তখন বুঝিনি কেন। পরক্ষণেই কার চাপা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম।

ঠাহর ক'রে দেখি, কুল গাছটার নিচে অন্ধকারে দুটি লোক বাঘের মতো থাবা গেড়ে যেন শিকারের প্রতীক্ষায় ব'সে!

আমি ভয়ে কাকাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। মনে হোল, তিনিও যেন চমকে উঠেছিলেন। চাপা গলায় কিছুটা আমাকে সাহস দেবার জন্যে, কিছুটা যেন নিজেকে সাহস দেবার জন্যেও বললেন, ওরাই ওঝা বোধ হয়।

সঙ্গে সঙ্গে কুল গাছের নিচে মন্ত্রের অস্ফুট গুঞ্জন উঠলো। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপরে আরও স্পষ্ট এবং দ্রুতবেগে। এবং প্রায় তখনই সাকরেদ ওঝা যেন অন্ধকার থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে মাঝ উঠানে দাঁড়িয়ে উঠানময় ছটফট করতে লাগলো। তাকে দেখামাত্র বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো রাম জ্যেঠাও সোজা হয়ে বসলো। রাগে তার দাঁত কড়মড় করতে লাগলো এবং ফোকলা দাঁত বের ক'রে যখন হাঁফাতে লাগলো, মনে হোল এখনই লাফিয়ে নেমে সে বোধ করি সাকরেদ ওঝাকে গিলেই খেয়ে নেবে।

তখনই আরম্ভ হোল গালি-গালাজ, উভয় পক্ষেই। রাম জ্যেঠা যে গালি দেয় সে তো আমাদের

অতি পরিচিত গ্রাম্য গালি, সাকরেদ ওঝা যে মন্ত্র পড়ে, ছন্দ থাকলেও, তাও তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আধ ঘণ্টা, কি কতক্ষণ হবে কে জানে, উভয় পক্ষে এই যে কটূক্তির কুস্তি চললো, যদিও তা শারীরিক কুস্তি নয় তবুও আমরাও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, রাম জ্যেঠার কাছে এই সাকরেদ ওঝা নিতান্তই দুর্ব্বল। সে বিষয়ে আমরা আরও নিঃসংশয় হোলাম যখন এই রকম বাক্-যুদ্ধ চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় সাকরেদ ওঝা থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো এবং রাম জ্যেঠারও তড়্পানি যেন বেড়ে গেল।

ভয়ে আমাদের সকলেই তখন কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। সকলেই আরও পিছিয়ে গেল। ন'কাকাও পিছনের ভাঙা পাঁচিলটার দিকে চেয়ে দেখলেন, তেমন-তেমন কিছু ঘটলে আমাকে কোলে নিয়ে ওই পথে লাফ দিয়ে পালাতে পারবেন কি-না।

আমার তো তখন কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কারণ আমি নিশ্চয় বুঝছিলাম, শুধু ন'কাকা কেন, এখানে যারা সমবেত হয়েছে তাদের কারও সাধ্যি নেই পালায়।

সকলেরই পা মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে। নিশ্চয় বুঝেছিলাম, এখনই রাম জ্যেঠার দেহে যে ডাইনী আশ্রয় নিয়েছে, সে এসে সমবেত প্রত্যেকটি লোকের ঘাড় ধীরে ধীরে মট্‌কে ভেঙে আবার ওই ছেঁড়া মাদুরে ব'সে বিজয়োল্লাসে হাঁফাতে থাকবে। সেটা অবশ্য আমরা দেখতে পাব না।

এই রকম যখন অবস্থা তখন দেখলাম, কুলগাছের নিচে থেকে আরেকজন শান্ত গম্ভীর পদক্ষেপে সাকরেদের পিছনে এসে দাঁড়ালো।

তার কাঁধে হাত রেখে গম্ভীর গলায় বললে, ভয় কি!

সঙ্গে সঙ্গে সাকরেদটি ঠাণ্ডা হোল, রাম জ্যেঠাও যেন থমকে চুপ ক'রে গেল। শুধু বড় বড় চোখে নিঃশব্দে লোকটির দিকে চেয়ে রইল।

আমরাও তখন যেন পাথর হয়ে গেছি। শরীরে রক্ত চলাচল বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

লোকটিকে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কুপীর আলোয় এইটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে, লোকটি দীর্ঘচ্ছন্দ ঋজু দেহ। মাথার বড় বড় চুল চূড়া ক'রে বাঁধা। মুখের পাকা দাড়ি বুক পর্য্যন্ত ঝুলছে। গায়ে একটা আলখাল্লা।

বাঁ-হাতে একটা হাতল-ওলা ধুনুচিতে গণগণ করছে কাঠের আগুন। আলখাল্লার ওপরে কোমরে একটা গামছা বাঁধা, তার কোঁচড়টা কিসে যেন ফুলে রয়েছে।

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে রাম জ্যেঠার দিকে চেয়ে রইল, রাম জ্যেঠাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ লোকটা তার মোটা গলায় এমন বিকট হেসে উঠলো যে, শুধু আমরা নই রাম জ্যেঠা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো।

—আমাকে চিনিস?—রাম জ্যেঠাকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটা।

—না। চিনি না, যা।—রাম জ্যেঠা যেন মরিয়া।

—এইবারে চিনবি।

ব'লেই লোকটা সাকরেদকে বাঁ-হাতে ঠেলে কুলগাছের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত

শব্দ ক'রে ধুনুচিটা উঁচু ক'রে রায়বেঁশের মতো চক্রাকারে নৃত্য করতে লাগলো। মনে হোল না লোকটি বুড়োমানুষ।

ঘোরে আর মন্ত্র পড়ে। ঘোরে আর মন্ত্র পড়ে।

হঠাৎ এক সময় মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে লোকটি হুঙ্কার দিলে ঃ সামলা এইবারে।

ব'লেই গামছার কোঁচড় থেকে এক মুঠো ধূপ নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ধুনুচির গণগণে আগুনের দিকে। এক ঝলক আগুনের ফুলকির মতো সেই ধূপ ছুটলো রাম জ্যেঠার দিকে।

অট্টহাস্য ক'রে রাম জ্যেঠাও সেই আগুনের বাণ গিলতে লাগলো হাঁ ক'রে। আগুনের স্ফুলিঙ্গের আভায় তার মুখবিবরটা সদ্য কাটা ছাগলের গর্দ্দানের মতো লাল দেখাচ্ছিল। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম।

একবার... .দু'বার.....এবং বোধ হয় আরও একবার.....

তারপর বেত-খাওয়া কুকুরের মতো রাম জ্যেঠা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো। সেই আর্ত্তনাদ অন্ধকার নিশীথ রাত্রের বুক চিরে যেন আকাশে উঠলো এবং সেখান থেকে ফিরে আমাদের শিরা-উপশিরায় যেন বরফের প্রবাহের মতো বয়ে গেল।

রাম জ্যেঠা চিৎকার ক'রে উঠলো ঃ আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।

রাম জ্যেঠা চিৎকার ক'রে উঠলো ঃ আমাকে বাঁচাও, বাচাও।

—তুই কে বল।

—রঙ্গিণী।

—কোথায় থাকিস?

—ন্যাড়া বটগাছের ডালে।

—যাবি? না, আরও বাণ ছুঁড়ব?

রাম জ্যেঠা আবার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো : যাব, যাব।

—তাহ'লে এই চটিটা মুখে ক'রে নিয়ে যা।

তাই হোল। ওঝার চটিটা মুখে নিয়ে হামা দিয়ে রাম জ্যেঠা সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়েই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

তারপরে?

তারপরে কি হোল তা আমার পক্ষে বলা কঠিন। কারণ আমি নিজেও সেই সঙ্গে বোধ করি সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম। জ্ঞান যখন হোল, তখন বাড়িতে মায়ের কোলে শুয়ে। তখন ভোর হ'তে আর বেশি দেরি নেই।

কিন্তু আজও যে প্রশ্ন আমার মনে ওঠে সে হচ্ছে এই যে, এর কিছুদিন পরে রাম জ্যেঠা সত্যই ভালো হয়ে উঠলো। কিন্তু এই ঘটনার কিছুই তার মনে নেই। কি যে হয়েছিল কিছুই বলতে পারে না।

স্বীকার করলাম, এর সমস্তই বুজরুকি। কিন্তু রাম জ্যেঠা সেরে উঠলো কি ক'রে?

বিজ্ঞানে হয়তো এর অর্থ পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি জানি না।

তর্কে বহু দূর

ভক্তের ডাকে

ভারত-খ্যাত তান্ত্রিকসাধক সর্ব্বানন্দের ঘরে আজ উৎসব। পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে আজ বৌ-ভাত। সমাজের গণ্যমান্য সকলেই খেতে বসেছেন। নিয়ম অনুযায়ী নববধূ প্রথমে পরিবেশন করছেন। সর্ব্বানন্দ দাঁড়িয়ে দেখছেন।

হঠাৎ পুত্রবধূর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তিনি দেখতে পেলেন, দুই হাত দিয়ে নয়, চার হাত দিয়ে পরিবেশন করছেন। সেই দৃশ্য আর কেউ দেখতে পেলো না, দেখলেন শুধু মাতৃ-সাধক সর্ব্বানন্দ। তাঁর দুই চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো, তিনি বুঝলেন, তাঁর ডাকে বিশ্ব-জননী তাঁর ঘরে তাঁর পুত্রবধূ হয়ে ধরা দিয়েছেন।

সিপাহি-যুদ্ধে বাঙ্গালী বীর
প্যারীমোহন

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এক

আগুন জ্বলিয়াছে।

সে আগুন সিপাহী বিদ্রোহের।

বিদ্রোহী সিপাহীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে মত্ত। মুক্তিকামী তারা,—চায় তারা দেশের স্বাধীনতা।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ইংরাজেরা আপনাদের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত। এ সময়ে কলিকাতার মন্ত্রণাসভার ইংরাজ-রাজপুরুষেরা হুকুম-জারি করিলেন—যেভাবে পার, বিদ্রোহী সেনাদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর।

এ আদেশ প্রচারের পরে বিচারকেরা নিরীহ নির্লিপ্ত ব্যক্তিদের অমূল্য জীবন ধ্বংসের পর ধ্বংস করিতেছিল। সৈন্যাধ্যক্ষই শুধু নয়, বিচার-বিভাগের যে কোন ব্যক্তি, নিরীহ লোকদেরও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে লাগিল। ইংরাজ যেখানে জয়ী হয়, সেখানেই নেয় সে প্রতিহিংসা! এইরূপ অন্যায় বিচারে শত্রুতার প্রতি শোধ লইবার জন্য নির্ম্মম দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার ফলে চারিদিকে বিদ্রোহী দল দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ কারল—ইংরাজদের।

সেই সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ইংরাজের ছিল না। ঝড়ের মত বেগে আসিয়া বিদ্রোহী সৈনিকদল চিকিৎসালয়, পল্লী প্রভৃতি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি, উত্তেজনা বশে তাহারা ইউরোপীয় মহিলা ও শিশু-সন্তানদেরও তরবারির আঘাতে বিনাশ করিয়া হাতে কলঙ্কের কালিমা মাখিয়াছিল।

এলাহাবাদের চারিদিকে বিদ্রোহীরা আরম্ভ করিয়াছে—ভীষণতম অত্যাচার। ইংরাজেরা যেমন কৃষ্ণকায় হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি নিপীড়ন করিয়া সগৌরবে বলিয়াছিলেন, "ইহাদের মেরে ফেল", আদেশ দিয়াছিলেন সৈন্যদের—"ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে—যুবক, বৃদ্ধ ও শিশু সকলকেই নিহত কর," এই আদেশের ফলে পথে, বাজারে, যাহাদের ফাঁসী দেওয়া হইত তাহাদের সব গাদায় ফেলিয়া দেওয়া হইত।

এইরূপ বীভৎস আচরণে সিপাহীদের মনে প্রতিহিংসার ভাব জাগিয়াছিল। এলাহাবাদ ছিল সিপাহী-বিদ্রোহের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। ১৮৫৭ সাল। এলাহাবাদের ভীষণ দুর্দ্দিন। ইংরাজ হীনবল। প্রাণভয়ে ভীত। আশেপাশে দেখা যায় জ্বলিতেছে প্রলয়ের আগুন—শোনা যায় হাহাকার। চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে "হর হর বম্ বম্" "আল্লাহো আক্‌বর" রবে!

সহরের বিদেশী ইংরাজ অধিবাসী, পুরুষ ও নারী নিরুপায় হইয়া হাহাকার করিতেছে। স্ত্রীলোকের ও শিশুদের করুণ ক্রন্দনে পুরুষেরাও ভীত চকিত এবং বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া সিপাহীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে? মৃত্যু যে অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! কতজনই বা সৈন্য আছে, তাহাদের মনের অবস্থাই বা কে জানে? ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমন সময় এক বাঙ্গালী বীর ভীত ও চকিত পুরুষ ও নারীদের উদ্ধারের জন্য কৃপাণ হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"মা ভৈঃ!"

দুই

এই বীর বাঙ্গালীর নাম প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালে অনেক বাঙ্গালী যেমন নানা কার্য্যোপলক্ষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও অন্যান্য অঞ্চলে বিবিধ ব্যবসায়-বাণিজ্য বা রাজকার্য্য বা ওকালতি করিতে আসিতেন এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেন—প্যারীমোহনও ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন। হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার জন্ম। সেকালের প্রথামত প্রথমতঃ উত্তরপাড়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যুক্ত-প্রদেশে আসেন, এবং এলাহাবাদের মুন্সেফ হইয়াছিলেন। সিপাহী-যুদ্ধের সময় তিনি এলাহাবাদেই মুন্সেফী করিতেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের দারুণ দুঃসময়ে যখন চারিদিক হইতে সিপাহীরা এলাহাবাদ সহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং ধ্বংসের পর ধ্বংস করিয়া বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, সে সময়ে বিপন্ন ইংরাজদের তিনি শুনাইলেন অভয়-বাণী!

লেখনী ছাড়িয়া ধরিলেন তরবারি। নিজে সৈনিকের বেশে সজ্জিত হইয়া এক সৈনিকদল গঠিত করিলেন। এবং বীর বিক্রমে এলাহাবাদ নগরোপান্তে বিদ্রোহী সৈনিকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

কামান ছুটিতেছে। অশ্বারোহী সৈনিকদল ঘোড়া ছুটাইয়া বাঙ্গালী বীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে—কিন্তু নির্ভীক প্যারীমোহন আপনার অপূর্ব্ব রণনৈপুণ্য ও ক্ষমতা-বলে বীরদর্পে তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে লাগিলেন। এলাহাবাদের চারিদিকের এক সামান্য অংশ দখল করিতেও পারিল না বিদ্রোহী সিপাহীরা।

প্রলোভন আসিল বিদ্রোহী দল হইতে—"তোমাকে আমরা করবো এ অঞ্চলের সুবাদার। মিলে যাও আমাদের সঙ্গে।"

প্যারীমোহন বলিলেন—"আমি যুদ্ধ করছি—অসহায় নারী ও শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়, জায়গীরদার বা মনসবদার হইবার সাধ আমার নাই। আমি পুরুষের বাচ্চা—পুরুষের মত লড়াই করবো।"

একদিন একজন বিদ্রোহী সিপাহী যুদ্ধের সময় তীরবেগে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল এক ভীষণ বর্শা। বিদ্রূপ করিয়া সে কহিল, "মজা দেখ্ লেও বাঙ্গালী বাবু! মজা দেখো বেইমান্!"

বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন প্যারীমোহন সেই দিকে—আক্রমণকারীর শিরশ্ছেদ করিলেন তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে। একদিন নয় প্রায় এক পক্ষ কাল তাঁহাকে এইভাবে নানারূপ ক্লেশ সহিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছিল।

যুদ্ধের নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন—প্যারীমোহন। তাঁহার আক্রমণের রীতিও ছিল অভিনব। শুধু তাই নয়—তিনি বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের পল্লী-সহর জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ বীরের অসামান্য সাহস ও রণ-নৈপুণ্যে এলাহাবাদ রক্ষা পাইল, রক্ষা পাইল ইউরোপীয় অসহায় পুরুষ ও নারী, শিশু ও বৃদ্ধ।

যুদ্ধে বিজয়ী, বীর বাঙ্গালীকে ইংরাজ পুরুষ ও নারী অভিনন্দিত করিলেন। সকলে ধন্যবাদ দিলেন তাঁহাকে—যুদ্ধজয়ী মুন্সেফ বলে।

সেনাপতি নীল পরে যখন এলাহাবাদ আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সহস্র বার ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

দেশে যখন শান্তি স্থাপিত হইল, সে সময়ে ইংরাজ সরকার প্যারীমোহনকে জায়গীর দান করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বীরত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

আক্রমণকারীর শিরশ্ছেদ করিলেন....

একজন ইংরাজ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"এই লড়াইয়ে মুন্সেফ দেওয়ানী আদালতের একজন দক্ষ বিচারক বাঙ্গালীবাবু আপনার অসাধারণ বীরত্ব ও নির্ভীকতার দ্বারা বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন। তিনি যে শুধু এলাহাবাদ সহর রক্ষা করিয়াছেন তাহাই নহে, তিনি আক্রমণের নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহীদের অধ্যুষিত পল্লী ধ্বংস করিয়াছেন এবং ইংরাজী ভাষায় প্রতিদিনের ঘটনা, নিজ মন্তব্য এবং তাঁহার অধীনে যে সমুদয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যেরা যুদ্ধে তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন—তাঁহাদেরও ধন্যবাদ দিয়াছেন। এই বীর বাঙ্গালী যেমন ছিলেন শাসন-কার্য্যে দক্ষ তেমনি তিনি বুদ্ধির প্রখরতা এবং বীরত্বের যে মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন—ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব বোধ করা উচিত।"

তর্কে বহু দূর

জন্মান্তরের ডাক

আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর আগে। হিমালয়ের কোলে রাণীখেতে একটা নতুন সেনা-বাস তৈরী হচ্ছে। সেই কাজ তদারক করবার জন্যে সামরিক বিভাগের এক বাঙালী কর্ম্মচারী এসেছেন। কর্ম্মচারীটির নাম শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

কাজের অবসরে একদিন শ্যামাচরণ বেড়াতে বেড়াতে কিছুদূরে এক পাহাড়ের মধ্যে এসে পড়লেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ তাঁর কাণে এলো কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকছে। শ্যামাচরণ ভাবলেন, হয়ত তাঁর শোনার ভুল হয়েছে। তিনি এগিয়ে চলেন। এবার সেই শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যেন খুব কাছ থেকে কেউ তাঁকে ডাকছে। এবং তাঁর নাম ধরে ডাকছে তাতে আর কোন সন্দেহই রইলো না। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, সামনে একটা উঁচু পাথরের ওপর একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে, হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছেন। কাছে যেতেই সন্ন্যাসী বলে উঠলেন, আ শ্যামাচরণ, অব্ তুম আগয়া।

শ্যামাচরণ অবাক। এই নির্জ্জন হিমালয়ের বুকে এই সন্ন্যাসী তাঁর নাম জানলেন কি করে?

শ্যামাচরণের অবস্থা বুঝে সন্ন্যাসী তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে এলেন। গুহার ভেতর থেকে একটা বাঘছাল, ধুনী, দণ্ড আর কমণ্ডলু নিয়ে এসে বল্লেন, এগুলো চিনতে পারছো?

শ্যামাচরণ কিছুই বুঝতে পারেন না। তখন সন্ন্যাসী দুই আঙুল দিয়ে শ্যামাচরণের চোখ স্পর্শ করলেন। সেই স্পর্শে শ্যামাচরণের দেহ দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত কি যেন বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি জেগে উঠলো। সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলেন, হাঁ, গুরুদেব, মনে পড়েছে, এই গুহাতেই সাধনা করতে করতে আমি দেহত্যাগ করি।

সন্ন্যাসী বলেন, সেই দিন থেকে আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আর জন্মে যা অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলে, এ জন্মে তা সম্পূর্ণ করবে।

সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী শ্যামাচরণ লাহিড়ী আর রাণীখেতে ফিরলেন না। যেদিন তিনি গুরুর আদেশে আবার লোকালয়ে ফিরলেন, সেদিন তিনি কঠোর যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর স্পর্শে, তাঁর উপদেশে শত শত লোক শান্তির সন্ধান পেয়েছে।

এমনটি শুনেছ?

—ইন্দিরা দেবী

নৌকা যারা চালায় তাদের আমরা মাঝি বলি, কেমন? নাবিকও বলি, আর সে কথাটা বেশ ভাল লাগে শুনতে। এই রকম একটা নাবিক-পুতুলের গল্প বলি।

দোকানে তোমরা নিশ্চয় দেখেছ; কারুর কারুর খেলাঘরেও এই পুতুল আছে। পোষাকটা কি সুন্দর লাগে! কালো বর্ডারে সাদা পোষাক, টুপিটাও কী চমৎকার!

অনেকগুলো পুতুলের সঙ্গে ঐ পুতুলটা মনুর খেলাঘরে ছিল। বেশ মোটা-সোটা চেহারা বলে মনু ওর নাম দিয়েছিল ভোম্বল সর্দ্দার।

সেদিন খেলাঘরে যখন কেউ ছিল না—তখন অন্য পুতুলগুলো বলাবলি করছিল, এমন সময় একটা নিঃশ্বাসের শব্দ হলো। ওরা দেখলো ভোম্বল বিষণ্ণ মুখে জোরে নিঃশ্বাস ফেললে।

পুতুলদের ভিতর গিন্নি-বান্নি হলো, মাটীর ধেবড়া চেহারা—নাকে-কানে পুঁতির মাকড়ী-দেওয়া বেনে-বৌ পুতুল। সে জিজ্ঞাসা করলো—কে অমন নিঃশ্বাস ফেলল রে? ভোম্বল সর্দ্দার বুঝি? কেন ওর কি হয়েছে?

—বল কি মাসী কি হয়েছে! কি হয়নি তাই বলো!

অন্য সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো—কেন? কেন?

—আমার দুঃখ কেন, জানো না? কতদিন এখানে এসেছি বল ত? মাঝে মাঝে মনু এক-আধবার নামিয়ে খেলা করে, তা না হলে ঘরের মধ্যে ঠায় বসে আছি। অথচ আমি কোথায় সমুদ্রে যাবো, গঙ্গায় নামবো, বড় বড় নৌকো-জাহাজ তদারক করবো—তা না জলের মুখ দেখলাম না, ঘরেই বসে রইলাম! আমার টুপির লেখাটা পড়েছ, কি লেখা আছে? আর আমার কি না জাহাজ তো নেই-ই, একখানা নৌকো পর্য্যন্ত নেই!

খরগোস পুতুল বল্লে—সত্যি কথাই, তাছাড়া আজকাল মনুও আমাদের বেশী ভালোবাসে না; নতুন একটা পুতুল পেয়েছে, কেবল বলে এই পুতুলটা খুব সুন্দর। বুঝতে পাচ্ছি তোমার সময় খুব খারাপ।

ভোম্বল সর্দ্দার আবার নিঃশ্বাস ফেললে।

—সত্যি তোমার সময়টা খুব খারাপ। সমবেদনার সুরে হাতীও বলে উঠলো। হঠাৎ খরগোস বল্লে—দেখ দেখ ভোম্বল সর্দ্দার, কি যেন আসছে!

খরগোসের কথা শেষ হওয়া মাত্র জানালা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকলো এক রাশ ফুলঝুরির মত নানা রং-এর ফুল ছড়িয়ে!

—আরে এ কি?

সকলে চেয়ে দেখলো—ঝকঝকে সুন্দর পোষাক পরা একটা ফুটফুটে পরী, নীল পাখা দু'টো তখনও কাঁপছে!

—তোমরা কেউ আমায় একটু সাহায্য করতে পারো?—গোলাপের পাপড়ির মত লাল ঠোঁট দু'টি নড়ে উঠলো, পরী বল্লে।

—কি সাহায্য বল? তার আগে বল তুমি কে?—পুতুলরা জিজ্ঞাসা করলো।

—আমি ভাই পরী, বোনকে সঙ্গে করে আসছিলাম উড়তে উড়তে, একটা বড় গাছে বোনের জামাটা আটকে গেল। নীচেই নদী ছিল—ঝপাৎ করে পড়ে গেল সেই নদীর জলে! হাবুডুবু খাচ্ছে, উঠতে পাচ্ছে না! কিছু করতে পারলাম না আমি, তাই তোমাদের কাছে এলুম—পারবে কেউ সাহায্য করতে?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে—কে সাঁতার জানে?

হঠাৎ ভোম্বল সর্দ্দার দুই লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পারবো। কোথায় তোমার বোন? চল চল।

খরগোস বল্লে—তাইতো আমাদের ভোম্বল সর্দ্দার থাকতে এত ভাবনার কি আছে? যাও হে ভোম্বল সর্দ্দার!

—আচ্ছা ক'দিন আগে মনু যে একখানা নৌকো কিনে এনেছিল খেলাঘরে, কই বলো তো সেটা?

ভোম্বল সর্দ্দার একথা বলার পর সকলেরই মনে হলো তাই তো, সেদিন মনু যে এনেছিল একখানা টিনেব নৌকো!

এদিক-ওদিক তোলপাড় করে পাওয়া গেল সেখানা, আর সবাই মিলে ধরাধরি করে জানালা গলিয়ে নৌকোটা নীচে ফেলে দেওয়া মাত্রই ভোম্বল লাফিয়ে পড়লো নীচে। এদিকে পরীও আগে আগে চলেছে পথ দেখিয়ে, কাজেই নদীর কাছে এসে পৌছুতে একটুও দেরী হলো না।

নীলপরী ভোম্বল সর্দ্দারকে বল্লে—ঐ দেখো আমার বোন জোনাকী হাবুডুবু খাচ্ছে, এখ্‌খুনি ডুবে যাবে! তুমি শীগ্‌গির নৌকো বেয়ে চলো।

ভোম্বল সর্দ্দার এর আগে নৌকো বেয়ে চলেনি—তাই খুব তাড়াতাড়ি চালাতে পারছিল না, যাই হোক কোন বকমে ঠেলে ঠুলে গিয়ে জোনাকীর কাছে পৌছল।

জোনাকীকে নৌকোয় উঠিয়ে ভোম্বল সর্দ্দার ভাবলে, আমি খুব ভাল নাবিক তা বোঝা যাচ্ছে। না হলে একে কেমন করে উদ্ধার করলাম এই জল থেকে!

কিন্তু ভোম্বল সর্দ্দারও ভিজে টুপটুপে হয়ে গেছে আর হাঁফিয়ে উঠেছে। বাড়ী থেকে আসা পর্য্যন্ত কম কসরৎ করতে হয়েছে তাকে!

দু'জনেই তখন চুপ করে বিশ্রাম নিতে লাগল।

কিন্তু জোনাকীর দিদি কোথায় গেল? কোথাও সে নেই দেখে ভোম্বল সর্দ্দার বল্লে—তোমায় এখন কোন্ দিকে নিয়ে যাবো বলো, পৌঁছে দিচ্ছি।

কোন রকমে ঠেলে-ঠুলে গিয়ে জোনাকীর কাছে পৌছল।

ভোম্বল কথাটা বল্লে বটে কিন্তু এতক্ষণ এত লাফালাফি করে ওর গায়ে যেন আর শক্তি নেই! হাল যেন সে আর টানতে পাচ্ছে না, অথচ বাতাসে আর স্রোতে নৌকো বেশ চলতে সুরু করেছে।

জোনাকী এতক্ষণে একটু শান্ত হয়েছে ; বল্লে ঃ দেখছো তো নৌকো আপনিই চলেছে, চলুক—যদি দরকার হয় পরে বলবো।

ভোম্বল বললে ঃ তোমার বাড়ী যেখানে, সেখানে তো তুমি যাবে, না নৌকো যেদিকে যাবে সেদিকে যাবে? আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুমি? তোমার দিদিটিই বা কোথায় গেলেন?

—দিদির তো আর আমার মত জামা-কাপড় ভিজে যায়নি, আর জলে পড়ে হাবুডুবুও খায়নি—তাই দিদি আকাশে উড়ে সোজা বাড়ী চলে গেছে।

—আমাদেরও তো যেতে হবে?

—তুমি চুপ করে বসো না, তুমিও তো আমার মত জামা-কাঁপড়ের পদার্থ রাখনি।

ভোম্বল একবার তার ভিজে পোষাকের দিকে তাকালো, তার পর নৌকোর ভিতর চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আকাশে দু' চারটে তারা ফুটেছে, ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে, এক ফালি চাঁদও দেখা যায় মেঘের ফাঁকে।

বেশ লাগছে ভোম্বল সর্দ্দারের—কেমন শান্ত নির্জ্জন পরিবেশ! তবে বন্ধুদের জন্য মন কেমন

করে বৈ কি! এতদিন এক সঙ্গে থেকে হঠাৎ চলে আসা! বৌ-পুতুল তাকে খুব ভালবাসতো, বাচ্চা খরগোসটা রোজ গল্প শুনতে আসতো। হাতী ভায়া কতদিন যে খোস মেজাজে গল্প করেছে—সকলে যেন সকলের কত আপনার লোক! সন্ধ্যা হলো এখন সব নিজেদের ঘরে গল্প করছে, ভোম্বলের কথাও ভাবছে নিশ্চয়। একটা যদি খবর দেওয়া যেতে পারতো!

এই সব একমনে ভেবে চলেছে ভোম্বল সর্দ্দার। হঠাৎ জোনাকী ডাকলো ঃ দেখ, দেখ, ঐ যে আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, আমরা এসে পড়েছি আর কি!

ভোম্বল তাকিয়ে দেখলো কী সুন্দর জায়গাতেই না এসে পড়েছে তারা! চাঁদের আলো আকাশ-মাটি ভরিয়ে দিয়েছে! নদীর পাড় ঝকমক করছে আর নদীর ওপারেই জোনাকীদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন হীরা, মুক্তা, চুণি, পান্না দিয়ে গাঁথা বাড়ীটা যেমন উজ্জ্বল তেমনি চমৎকার! বাড়ীর মাথার লম্বা চূড়াটি দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

অবাক হয়ে দেখতে দেখতে ভোম্বল বল্লে ঃ এ দেশের নাম কি? এমন সুন্দর দেশ!

—এর নাম হলো পরীদের রাজ্য।

—আমি কখনও ভাবতেই পারিনি—এমন ভালো জায়গা আছে, এত সুন্দর বাড়ীঘর আছে!

জোনাকী হেসে বল্লে ঃ তুমি ভাববে কি করে, নাবিক হয়েছ্ অথচ নৌকো বা জাহাজে ওঠোনি! কবে দোকানে এসেছিলে তারপর মনুর খেলাঘরে বন্দী হয়ে আছ! দেখছো তো মনুর খেলাঘরের চাইতে কত ভালো আর সুন্দর জায়গা আছে?

—হ্যাঁ দেখলাম, তাই ধন্যবাদ তোমায়। তোমরা এরকম জায়গায় থাক—কত যে আনন্দে আছ বুঝতে পাচ্ছি।

জোনাকী বল্লে ঃ নেমে এসো, তীরে এসে গেছি। ঐ দেখো বাড়ী, কিন্তু বড্ড রাত হয়ে গেল যে ভোম্বল! কত বড় চাঁদ উঠেছে দেখ না আকাশের মাঝখানে! আমাদের তো ঘড়ি নেই, আমরা চাঁদ দেখেই সময় ঠিক করি। এসো আমার সঙ্গে।

নৌকোটিকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধ্লো ভোম্বল—তীরে উঠে। তারপর দু'জনে হলদে রং-এর বাড়ীটায় গিয়ে ঢুকলো। সামনের ঘরে ঢুকে ভোম্বলের কিন্তু মনে হচ্ছিল ঘর আর বাইরে কোনও তফাৎ নেই। বাইরে যেমন স্নিগ্ধ নরম আলো ছিল তেমনই ঘরের আলো! জানালা-দরজায় সব নীল পর্দ্দা ঝোলান।

একটা কৌচের উপর বসে পড়লো দু'জনে—তারপর জোনাকী বল্লে ঃ তোমার খেলাঘরের জন্য মন-কেমন করছে না তো?

—না, না, মোটেই না। মন-কেমন করা সেটা মেয়েদের জন্য—পুরুষ মানুষের আবার মন-কেমন কি?

জোনাকী তার মুক্তোর মত সাদা আর ছোট ছোট দাঁতগুলি দিয়ে ঝিকমিক করে হেসে উঠলো।

—আচ্ছা তোমার শীত করছে নাকি ভিজে কাপড়ে? এক কাজ করো—জামা-কাপড়গুলো বদলে বসো, আমি আসছি। ঐ দেখ এই আলমারীতে অনেক কাপড়-জামা আছে।

জোনাকী চলে গেল আর ভোম্বল চট করে তার পোষাক বদলে সেগুলো নিঙড়ে মেলে দিয়ে চুল আঁচড়ে মুখ মুছে ভালো করে বসলো।

জোনাকীও পোষাক বদলে এসেছে, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তাকে! পিছনের নীল পাখা দু'টোয়

যেন ওকে আরো সুন্দর দেখায়!

—এসো ভোম্বল, একটু কফি খাও। তুমি আবার সায়েব মানুষ। এই নাও চকোলেট আর বিস্কুট।

ভোম্বল বললে ঃ আর তুমি?

জোনাকী হেসে উত্তর দিল ঃ আমরা ফুলের গন্ধ খেয়ে বেঁচে থাকি। কফি, বিস্কুট তো চলবে না ভাই!

অগত্যা ভোম্বল খেতে লাগলো আর গল্প করতে লাগলো।

কতক্ষণ বাদে ভোম্বল বল্লে ঃ ঘুম আসছে, কত রাত হলো বলতো!

—ও হো অনেক রাত হয়েছে, তুমি ঘুমোও, আবার কাল সকালে দেখা হবে। জোনাকী একথা বলে চলে গেল, আর ভোম্বল গায়ে চাপা দিয়ে খুব ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে উঠেই ভোম্বল তার নিজের জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিল। একটু পরেই জোনাকী এলো, সকালে চা-খাবার বেশ করে খেয়েদেয়ে ভোম্বল বললে ঃ আমি ভাবছিলাম এবার আমি বাড়ী ফিরবো, কিন্তু কি করে ফিরবো বলতো?

—না, না, তা মোটেই হবে না, ফিরে যেতে দেবো না। তুমি তো আমাদের বন্ধু ভাই ভোম্বল! তুমি এখানেই থাকবে, মাকে বলে তোমার দু'টো পাখা করে দেওয়াবো, তুমি আমাদের এই নদীর নাবিক হয়ে তোমার নৌকো নিয়ে এপার-ওপার করাবে—কেমন?

নৌকোটিকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধ্‌লো। [পৃঃ ১৩১

—আমার নৌকোয় উঠবে কে?

—সব্বাই উঠবে। জানো, আমার মা হলো এ রাজ্যের রাণী। মা কাল আমায় একথা বলেছে! মা যা বলবে তাই হবে কিনা এখানে। কেন তুমি এখানে থাকতে চাও না? আর এই নাবিকের কাজ পছন্দ করো না?

—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! চেঁচিয়ে উঠলো ভোম্বল সর্দ্দার।

*   *   *   *

ভোম্বল সর্দ্দার এই তো চেয়েছিল। তাই সে খুশী মনে ভাল পোষাক পরে নতুন ছোট্ট নৌকোখানা নিয়ে রোজ নদীর এপার-ওপার করে। তার এখন চমৎকার দু'টো নীল পাখা হয়েছে।

জোনাকী তার খুব বন্ধু। রোজ বিকেলে জোনাকীকে নিয়ে সে নদীতে বেড়িয়ে আসে। জোনাকী বলে ঃ তুমি যখন ভয় পাবে আমাকে ডেকো। অন্ধকার রাতে আমার চেহারা দেখতে না পেলেও দেখবে ছোট ছোট পোকার মত আলো জ্বলছে আর নিভছে। তখন মনে করবে আমি তোমার কাছেই আছি, ভয় পেয়ো না!—অন্ধকার রাতে আমরা ফুলের গন্ধ খেতে বার হই কি না!

ভোম্বল সর্দ্দারকে দেখলে আর চেনাই যায় না—এমনি সুন্দর চেহারা হয়েছে তার! মাঝে মাঝে তার খেলাঘরের কথা মনে পড়ে—কিন্তু সে তো একদিন এই রকমই চেয়েছিল! তাই মনটা তার খুব খুশী আছে।

মনু মাঝে মাঝে ভাবে, আচ্ছা! পুতুলটা গেল কোথায়? কেউ চুরি করে নিল নাকি?

তর্কে বহু দূর

মিলনের শতদল

মহাত্মা কবীর যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি প্রচার করে গিয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। তাঁর হিন্দু শিষ্যরা বল্লেন, কবীর-গুরুর দেহ আমরা হিন্দুধর্ম্ম-অনুযায়ী আগুনে পোড়াব। মুসলমান শিষ্যরা দল বেঁধে বল্লো, তা হবে না, আমরা মুসলমান ধর্ম্ম অনুযায়ী তাঁর দেহকে কবরে দেবো। গুরুর মৃতদেহের সামনেই লেগে গেল ঝগড়া। ঝগড়ার মাঝখানে হঠাৎ ঝড়ে মৃতের আবরণ মৃতদেহ থেকে সরে গেল। হিন্দু আর মুসলমান দু'দল শিষ্যই দেখলো, কোথায় মৃতদেহ, যা নিয়ে তারা ঝগড়া করছে? তার বদলে পড়ে আছে শুধু কতকগুলো পদ্মফুল। লজ্জার দু'দল শিষ্যেরই মাথা হেঁট হলো।

সেই পদ্মফুল আজও তেমনি ফুটে আছে কবীরের অমর দোঁহায়, যাতে তিনি গেয়ে গিয়েছেন মানুষের মিলন-গান।

ভয়াবহ দুর্য্যোগ

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতালপুরীর শেকল ছিঁড়ে বন্দী দানব যেন আজ উঠে দাঁড়িয়েছে! তাই কেঁপে উঠেছে পৃথিবী, আর সুন্দর সাজানো বাগান মুহূর্ত্তে ভূমিকম্পের মরণ-দোলায় আর্ত্তনাদ করে উঠলো!

অনিমেষ দেখ্‌লো, বিজয় দেখ্‌লো! দু'জনেরই চোখে পড়ে পৃথিবীর এক সংহার-মূর্ত্তি! এমন চেহারা, এমন রূপ, জীবনে আর কোনদিন তারা দেখেনি তো!

উঃ, কি প্রচণ্ড ভূমিকম্প! আর কি তার ধ্বংসকাণ্ড! এখানে-সেখানে কি ভয়ঙ্কর শব্দ! আর সঙ্গে সঙ্গে—তাদের চোখের সাম্‌নে ভেঙে গুঁড়িয়ে তচ্‌নচ্‌ হয়ে যায় ছোট-বড় সব-কিছু!

অনিমেষ ছোটে, বিজয়ও ছোটে। মানুষের সহজাত স্বাভাবিক সংস্কার-বশেই মানুষ যেভাবে পালিয়ে যায়, প্রাণের ভয়ে ছুটে পালায় দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে, তেম্‌নি ভাবে তারা ছুটে পালায়!

কিন্তু তারও মাঝে বাধা এসে যায়। একটা প্রকাণ্ড শালগাছ হঠাৎ চড়্‌চড়্‌ করে সমূলে উৎপাটিত হয়ে, মড়্‌মড়্‌ করে ভেঙে পড়ে! পথ তাদের বন্ধ হয়ে গেলো, বেঁচে গেলো বুঝি ভাগ্যের ফলেই!

—"বিজয়!"

অনিমেষ একবার পেছনে তাকিয়ে বিজয়কে ডাকে। সাথেই সে আছে, না রয়ে গেলো কোথাও?

—"ঠিক্‌ আছি ভাই! চলো!"

বিজয় সাড়া দেয় সংক্ষেপে। কিন্তু হঠাৎ সে চীৎকার করে ওঠে, "কি সর্ব্বনাশ! অনিমেষ, ঐ দেখো!"

একতলার একটা ছাদ সেই মুহূর্ত্তে ধ্বসে পড়েছে! তার কড়ি-বরগার শব্দ ও একরাশ ধুলো-বালি ধ্বংসের ভীষণতা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ!

ঠিক্‌ সেই মুহূর্ত্তে এক হিংস্র গর্জ্জন! ক্ষুধিত দানব বুঝি পৃথিবী গিলে খেতে চায়!

আবার একটা চীৎকার—হিংস্র দানবের আনন্দের ধ্বনি! আর তারই সঙ্গে যুগপৎ বেজে ওঠে কোন্‌ এক হতভাগ্য পশুর কাতর আর্ত্তনাদ! শিকারী ও শিকার, দু'জনাই আজ ভূমিকম্পের নিষ্করুণ পরিবেশে মেতে উঠেছে! শিকার পালাতে চায়, শিকারী তাকে চেপে ধরে! গৃহপালিত নিরীহ মোষ প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাতে চায়, তার অসহায় বিপন্ন কণ্ঠে সাহায্যের আকুতি ফুটে ওঠে। কিন্তু ক্ষুধিত হিংস্র ব্যাঘ্র বিজয়-গর্ব্বে তাকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছে!

মুক্তির আনন্দে ও শিকারের লোভে তার হিংস্র কণ্ঠে আজ বেজে উঠেছে বজ্রের ঝঙ্কার।

—"বিজয়! বাঘের ঘর ভেঙে পড়েছে! আর ঐ দেখো, ছাড়া পেয়ে বাঘ এখনই এক মোষের

ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো।"

সহসা একসঙ্গে নারী ও শিশুকণ্ঠের চীৎকার!

তারা দু'জনেই তাকিয়ে দেখে, একদল মেয়ে ও শিশু পাগলের মত ছুটে পালায়, আর তাদের পিছু নিয়েছে কয়েকটি বানর!

চিড়িয়াখানা নানা জীব-জন্তুর বাসস্থল। বাঘ, সিংহ, হাতী-ঘোড়া থেকে হরিণ, বানর, সাপ, কুমীর ইত্যাদি কত প্রাণী এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছিল! ভূমিকম্পের আলোড়নে আজ তাদের সকলের বুকেই জেগে উঠেছে এক পরম চাঞ্চল্য ও মুক্তির আনন্দ!

—"অনিমেষ! শীগ্‌গির!—" বলেই বিজয় চোখের পলকে সেই দিকে ছুটলো। পথে সে কুড়িয়ে নিলে দু'খানা বাঁশ—মজবুত লাঠির মত। তারই একখানা সে অনিমেষকে দিয়ে বললো, "নাও ভাই, লাঠি নাও। দরকার হতে পারে। আগে ঐ বানরগুলোকে তাড়াতে হবে।"

ঠিক চরম মুহূর্ত্তেই তারা লাঠি হাতে বানরদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল! কাজেই বানরদের উৎপাত হতে রক্ষা পেয়ে গেলো নারী ও শিশুর দল!

•

প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা—সহরের শেষ প্রান্তে, লোকালয় থেকে বহু দূরে। আজ প্রবল ভূমিকম্পে সারা সহর কেঁপে উঠেছে, কেঁপে উঠেছে চিড়িয়াখানার বনভূমি!—

ছোট-বড় অগণিত দর্শক রোজই চিড়িয়াখানায় আসে, আজও তেম্‌নি তারা এসেছিল। কিন্তু ভূমিকম্পের আন্দোলন সারা বনভূমিতে এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করেছে!

গাছপালা উপড়ে পড়ে, ভেঙে পড়ে ঘর-বাড়ী। বাঘ-সিংহের ঘর, সাপের ঘর, পাখীদের ঘর—একে একে সবই হয়তো ভেঙে পড়বে! আর হিংস্র জীব-জন্তু সকলেই হয়তো মুক্তির আনন্দে শিকারের কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

বিজয় ও অনিমেষের মনে হলো, আজ আর কারো বাঁচোয়া নেই,—চিড়িয়াখানার জীব-জন্তু ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ পৃথিবীর বুকে আজ নিয়ে এসেছে মরণের বিভীষিকা! এখন কি তারা করবে? কি তাদের কর্ত্তব্য?

এই কিছুক্ষণ আগেই যারা বেছে নিয়েছিল পলায়নের পথ, আত্মরক্ষার সহজ পন্থা,—এখন সেই বাঙালী তরুণদেরই আত্মমর্য্যাদা-বোধ প্রখর হয়ে উঠলো! ভাবলো তারা, সুদূর সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানায় তারা আজ বাঙালীর মান-মর্য্যাদা অন্যান্য পলায়মান ব্যক্তিদের সঙ্গে একই ভাবে ধূলায় মিশিয়ে দেবে,—না বাঙালীর বৈশিষ্ট্য আজ উজ্জ্বলভাবে জগতের সম্মুখে তুলে ধরবে?

চিড়িয়াখানায় ভূমিকম্প! আর সেই ভূমিকম্পের ফলে ধ্বসে পড়ছে হিংস্র পশুদের ঘর! ঐ যে কোথায় একটা বাঘ গর্জ্জন করে উঠলো হিংসার আনন্দে!

বিজয় বললো, "অনিমেষ, ছুটে এসো। ঐ যে চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট! দেখি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি!—"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আয়ার ভীত-পাংশুমুখে তাঁর অফিসের বারান্দায় বেরিয়ে সিপাই-শাস্ত্রী ও মালীদের হাঁকডাক করছিলেন। কিন্তু তখন মরণের ডামাডোল সুরু হয়ে গেছে! সবাই তখন পলায়নে ব্যস্ত। কে দিবে সাড়া? কেউ নেই!

হঠাৎ তাঁর সম্মুখে প্রায় লাফিয়ে পড়ে বিজয় বললো, "মিঃ আয়ার! তোমার পাহারা কই? গার্ড কই? বাঘ-সিংহ ছুটে বেরিয়েছে—"

—"সব জানি বাবু, সব জানি। কিন্তু কি করবো? সব ক'টা লোক পালিয়ে গেছে! আছে শুধু নিরীহ দর্শকের দল! হিংস্র প্রাণীদের মুখে তাদের আজ শিকার হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই বাবু!"—

মিঃ আয়ার আর কথা বলতে পারলেন না, আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এলো।

—"তাহলে শোনো সাহেব, শোনো। আমরা সৈনিক, রেজিমেণ্টের লোক! রাইফেল দিতে পারো? তাহলে দেখি একবার।"

—"স্বচ্ছন্দে! তিন-তিনটি রাইফেল ফেলে গার্ডগুলো কোথায় পালিয়ে গেছে বাবু! এসো, এসো আমার সঙ্গে।"

মিঃ আয়ার তাদের দু'জনকে পাশের এক কুঠুরীতে নিয়ে গেলেন, বিজয় ও অনিমেষ শেল্ফ্ থেকে দুটি রাইফেল তুলে নিল।

বাঘের ভয়ঙ্কর মুখখানি ঝিলিক খেলে গেলো

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাইরে কোথায় একটা বজ্রপাত হলো। থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো সারা বনভূমি।

—"এ কি? বিনা মেঘে বজ্রপাত?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

—"না, না, ও বজ্রপাত নয়, ও হচ্ছে বাঘের ডাক! ওঃ, কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেলো বাবু! না জানি এদের হাতে আজ কত নিরীহ লোকের প্রাণ চলে যায়!—"

—"বাঘ? বটে!" বিজয় বিদ্যুদ্বেগে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো। অনিমেষ তার পেছনে।

বাপ্স্! বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার আবার একটা গর্জ্জন করে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো! অনিমেষ বা বিজয়ই বুঝি তার লক্ষ্য!

মুহূর্ত্তমধ্যে বাঘের ভয়ঙ্কর মুখখানি বিজয়ের চোখে ঝিলিক খেলে গেলো, সে দেখলো তা পরিপূর্ণভাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের বশেই রাইফেলের ট্রিগার তার আঙুলের চাপে নড়ে উঠলো, বেজে উঠলো বজ্রধ্বনি!

রাইফেলের গুলি বাঘের বিস্তৃত মুখের মধ্যে মারাত্মক ভাবে বসে গেলো, আর অনিমেষের গুলি বিঁধলো বাঘের বুকের মধ্যে। প্রচণ্ড হুঙ্কারের সঙ্গে বাঘের বিশাল বপু ধপাস্ করে মাটিতে পড়লো,— আর উঠলো না।

রাইফেলের গুলির শব্দ চিড়িয়াখানার সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বা জেগে উঠেছে হিংস্র উল্লাস।

একদল দর্শনার্থী—ছেলেমেয়ে নিয়ে সংখ্যায় তারা পনেরো-ষোল জন, আর্ত্ত চীৎকার করে পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। অনিমেষ তাদের দেখে হাত তুলে ডেকে বললো, "এসো, এই দিকে এসো!"

এলো তারা। পরিশ্রম ও আতঙ্কে তারা সবাই তখন ভেঙে পড়েছিল। বারান্দায় উঠতে না উঠতেই তারা শুয়ে পড়লো নির্জ্জীবের মত!

ভূমিকম্প তখন আর নেই। কিন্তু মাত্র দশ-পনেরো মিনিটের ভূমিকম্পে সারা চিড়িয়াখানার যে চেহারা হয়েছিল, তা হয়তো কেবল প্রলয়ের সময়ই সম্ভব। গাছপালা প্রায় একটিও সোজা দাঁড়িয়ে নেই; দালান-কোঠা ভেঙে-চুরে লণ্ডভণ্ড; পথ-ঘাট বন্ধ; ধুলোর পাহাড়। কোথায়ও বা জল-কাদা উৎক্ষিপ্ত হয়ে এক নরকের দৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

একখানি লোমশ মুখ বজ্র-হুঙ্কারে...

বিজয়ের রাইফেল তখনো মাঝে মাঝে গর্জ্জন করে যায়—হিংস্র প্রাণীদের মাঝে ত্রাস সঞ্চারের ব্যর্থ আশায়! 'ব্যর্থ' এই জন্য যে তাতে ফল হলো বুঝি উল্টো!

পরিশ্রান্ত বিজয় মুহূর্ত্তের বিশ্রাম-লোভে তার রাইফেলটি দেয়ালে একটু হেলান দিয়ে রেখে হাল্‌কা হয়ে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ একটা পাহাড় যেন তার ওপর লাফিয়ে পড়লো! সঙ্গে সঙ্গে একখানি লোমশ মুখ বজ্র-হুঙ্কারে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে দিলে!

ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জ্জন ও আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছোট-বড় সকলেই বুঝি তাদের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল! কিন্তু অনিমেষের সন্ধানী চোখ একটা জমাট অন্ধকারের দ্রুত আগমন যেন কেমন একটু সন্দেহের চোখেই লক্ষ্য করেছিল! কাজেই আচম্বিতে সিংহের আবির্ভাব সে একেবারেই বিস্ময়ের চোখে দেখেনি!

তবু—এত কাছে—এমন ভীষণ একটা কাণ্ড! বিজয়—বন্ধু তার—সিংহের খপ্পরে! দুঃস্বপ্নের মত একটা বাস্তব ভয়ঙ্কর স্বপ্ন তার সর্ব্বদেহে যেন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে দিলে। মুহূর্ত্তমধ্যে তার হাতের রাইফেল উপর্য্যুপরি কয়েকবার সশব্দে অগ্নিবৃষ্টি করে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা বাজ-পড়ার শব্দে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে আফ্রিকার হিংস্র সিংহ চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেলো!

—"জ ল্‌ দি, বা বু! জল্‌দি!" বলেই মিঃ আয়ার সেই মরা সিংহের বিশাল দেহটাকে বিজয়ের দেহের ওপর থেকে টেনে নামাতে সুরু করলেন।

ততক্ষণে এগিয়ে এসেছিল অনিমেষ, এগিয়ে এসেছিল আরো অনেকে। সবাই মিলে টানাটানি করে বিজয়ের বুকের ওপর থেকে সিংহটাকে টেনে নামিয়ে দিলে।

মিঃ আয়ার বললেন, "আর দু'মিনিট দেরী হলে সিংহের ভারেই এঁর প্রাণ বেরিয়ে যেতো!"

বিজয়কে একটু পরীক্ষা করে তিনি বললেন, "বোধ হয় কোন আশঙ্কার কারণ নেই। প্রচণ্ড ভারে তিনি আঘাত পেয়েছেন বটে কিন্তু হাড়গোড় কিছু ভাঙেনি!"

কিন্তু আশঙ্কার কারণ কিছু থাক্ বা না থাক্, বিজয় তখনও অজ্ঞান! কাজেই এমন একটি অমূল্য জীবনের জন্য কারও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না! সকলেই যথাসাধ্য তার সেবা-শুশ্রূষা সুরু করে দিলে।

হঠাৎ বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা আট-ন' বছরের ছেলে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো, "রাক্ষস! রাক্ষস!"

ভয়ে সে উন্মাদের মত লাফিয়ে পড়লো সকলের মাঝখানে!

মুহূর্ত্তে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আয়ার চীৎকার করে উঠলেন, "গুলি! গুলি করুন বাবু, গুলি!"—

অনিমেষ রাইফেল হাতে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেলো! কিন্তু যা তার চোখে পড়লো, তাতে তার দেহের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেলো!—

বেশ মোটাসোটা একটি গলা—কুমীরের গলার মত। তেম্‌নি একটি গলা মাটি হতে প্রায় আড়াই ফুট উঁচু হয়ে দুলছে আর এদিক্-ওদিক্ দেখছে! চোখ দুটো আগুনের গোলার মত লাল আর মাঝে মাঝে জিভ্ যা বেরোয়, তা সাপের জিভের মত চেরা!

—"গুলি করুন, জল্‌দি—চোখে, বুকে! ড্রাগন, ভয়ঙ্কর ড্রাগন!—"

হিশ্ করে একটা আওয়াজ হলো, সাপের আওয়াজের দশগুণ! পরক্ষণেই সহসা মাথা নীচু করে—ড্রাগন শোঁ করে এগিয়ে এলো একটি মেয়ের দিকে।

কিন্তু অনিমেষের রাইফেল ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করে উঠলো, পর-পর দু'বার!

বোধহয় দুটো চোখই সে বিঁধে ফেলেছিল! আহত ড্রাগন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে তার লেজের ঝাপ্‌টা সুরু করে দিলে! চোখে তার অন্ধকার, তবু গলা বাড়িয়ে সে কেমন করে একটা লোহার শিক পেয়ে গেলো তার মুখের কাছে!

বেচারা কড়্‌মড়্ করে তাইই চেপে ধরলো তার দাঁত দিয়ে, আর দেখতে দেখতে সেই লোহার শিকটা সে চিবুনো আখের মত প্রায় ছাতু ছাতু করে ফেললো!

অনিমেষ খুঁজছিল শুধু তার বুকের নিশানা! হঠাৎ পেয়ে গেলো সে! পর-মুহূর্ত্তে আবার গর্জ্জে উঠলো তার রাইফেল! জ্বলন্ত দু-দুটো গুলি এবার তার বক্ষভেদ করে বেরিয়ে গেলো। আর তৎক্ষণাৎ একট প্রচণ্ড ঝট্‌পটানির শেষে রাক্ষুসে ড্রাগনের লৌহ-কঠিন দেহ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে গেলো!

সহসা দেখা গেলো, চিড়িয়াখানার একপ্রান্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে! মনে হলো অসংখ্য মশাল হাতে কারা যেন আসছে! সেই সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ বন্দুকের শব্দ!

—"কি এ? মিঃ আয়ার, এ আবার কি?" জিজ্ঞেস্ করলো অনিমেষ।

মিঃ আয়ার বললেন, "সম্ভবতঃ সহর থেকে সশস্ত্র সৈন্যদল আসছে! আমি পঞ্চাশবার টেলিফোন করে তাদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছি, কিন্তু একবারও কানেক্‌শন্ পাইনি। বোধহয় সমস্ত লাইন

বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছিল! তাহলেও কর্ত্তৃপক্ষের একটা সাধারণ বুদ্ধি আছে তো! ভূমিকম্পের ফলে চিড়িয়াখানার হিংস্র জীবজন্তু যদি বেরিয়ে পড়ে, তাহলে যে কি সর্ব্বনাশা কাণ্ড হতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই সে জ্ঞান আছে। আমার মনে হয়, তাঁরা তা অনুমান করে নিজেরাই সৈন্যদল পাঠিয়েছেন।"

—"কিন্তু অত আগুন!—"

—"ও আগুন নয় বাবু! ঐ দেখুন, এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ওগুলো সবই হচ্ছে হাতের মশাল। হিংস্র প্রাণীরাও আগুনকে ভয় করে, কাজেই মশাল হাতে এই অভিযান!"

এতক্ষণে সকলেরই যেন ধড়ে প্রাণ এলো। সৈন্যরা আসছে—তাদের উদ্ধারের জন্য! আনন্দে সকলেই জয়ধ্বনি করে ওঠে!

জয়ধ্বনি থেমে গেলো আচম্বিতে কাছেই একটা ঝট্‌পটানি লক্ষ্য করে।

একটা প্রচণ্ড ঝট্‌পটানি লতা-গুল্ম-ঝোপের মধ্যে! সঙ্গে সঙ্গে কিসের ফোঁস-ফোঁসানি ও ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস!

কুমীর ও ময়াল সাপ লৌহ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

পড়ন্ত দিনের তখন নিভন্ত আলো। এখানে-সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠছিল। কাজেই লতা-গুল্মের অন্তরালে কিসের ঝট্‌পটানি, তা ভালো করে দেখবার জন্য টর্চ্চের প্রয়োজন হলো।

টর্চ্চের সুতীব্র আলোয় যা চোখে পড়লো পৃথিবীতে সেরকম জিনিষ খুব কমই দেখা যায়! দেখা গেলো, চিড়িয়াখানার প্রকাণ্ড এক কুমীরকে বিশাল এক ময়াল সাপ এমন লৌহ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে যে, কুমীর বেচারার প্রায় নাভিশ্বাসের উপক্রম!

মিঃ আয়ার তাঁর হাতের টর্চ্চ অপর এক ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বিজয়ের রাইফেলটি তুলে নিলেন। আর সেই দিক্ লক্ষ্য করতে করতে বললেন, "বাবু! তুমি কুমীর—আর আমি সাপ! একই সঙ্গে বাবু!—ফায়ার!"

চকিতে দুটি রাইফেল হতেই গুলি বেরিয়ে গেলো। গুলি খেয়ে আহত বন্ধুযুগল বুঝি নিজেদের হিংসা ভুলে আক্রমণকারীদের দিকেই হানা দিতে মনস্থ করেছিল ; কিন্তু তাদের সে অভিপ্রায় আর সফল হলো না। কারণ, সৈন্যরা ততক্ষণে এসে গিয়েছিল ; আর মিঃ আয়ার ও অনিমেষের অসম্পূর্ণ কাজ তারাই করলো সম্পূর্ণ।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলি খেয়ে সাপ ও কুমীর—দু'জনাই তাদের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ
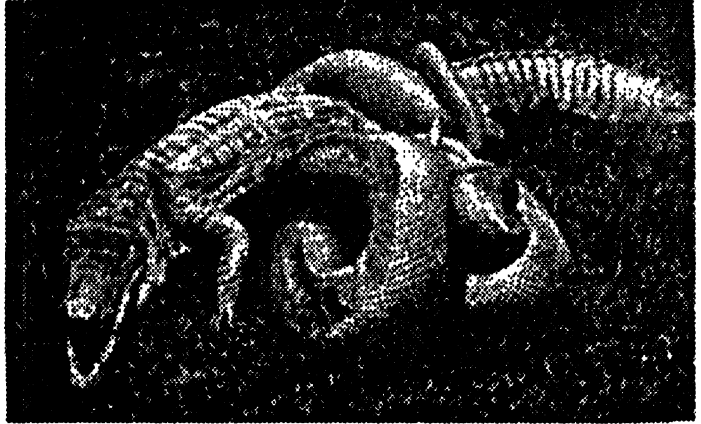
করলো।—আনন্দে সকলেই আবার জয়ধ্বনি করে ওঠে।

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত ও আনন্দের। সিংহের আক্রমণে বিজয়ের মাথায় যে আঘাত লেগেছিল, হাসপাতালে সুচিকিৎসার গুণে তা দিন-পনেরোর মধ্যেই ভাল হয়ে গেলো। আর চিড়িয়াখানার হিংস্র জীব-জন্তুদের ঘায়েল করা বা বন্দী করা খুবই কষ্টসাধ্য হলেও সৈন্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সে দুরূহ কাজও অবশেষে সম্ভব হয়েছিল।
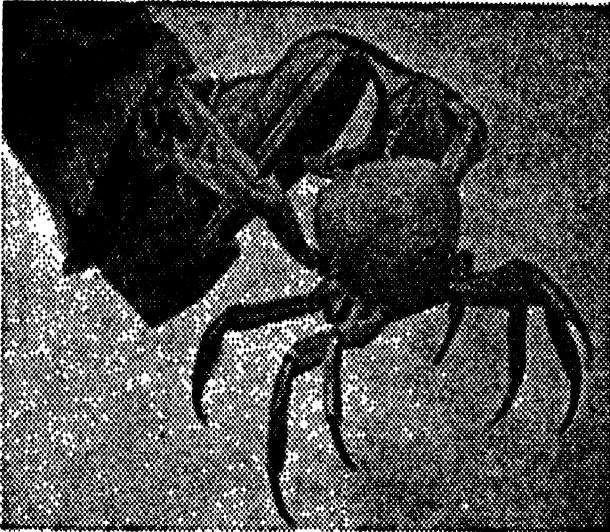
মাংসভুক্ কাঁকড়া

গোটা-কয়েক লোক সেদিন হতাহত হলেও একথা সকলেই বললে, হতাহতের সংখ্যা সেদিন আরো অনেক বেশী হতো নিশ্চয়ই, ভাগ্যক্রমে দুটি বাঙালী যুবক—বিজয় ও অনিমেষ যদি সেখানে না থাকতো!

একটা আকস্মিক ভূমিকম্পের ফলে চিড়িয়াখানা হয়ে উঠবে আফ্রিকার বন-জঙ্গলের মত ভয়াবহ, আর দুটি নগণ্য বাঙালী দর্শকই নেবে উদ্ধারের ভার, একথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল?

এই অভাবনীয় ঘটনাটির একটি অদ্ভুত স্মৃতিচিহ্ন বিজয় ও অনিমেষ আজও পরম আগ্রহে রক্ষা করে এসেছে। স্মৃতিচিহ্নটি ক্ষুদ্র হলেও উপেক্ষার জিনিষ নয়। সে হচ্ছে একটি বড় আকারের কাঁকড়া—মাংসভুক্ কাঁকড়া।

সেদিনের সেই ভয়াবহ ঘটনার পর সকলের সঙ্গে অনিমেষও যখন বেরিয়ে আসছিল, সেই সময় কোথা হতে এই কাঁকড়াটি এসে অনিমেষের পায়ে' বুটজুতো কামড়ে ধরে! এক গোরা সৈনিক তা দেখতে পেয়ে সর্ব্বপ্রথম চীৎকার করে ওঠে। অনেক চেষ্টার পর, তাকে ছাড়ানো হলো বটে, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁকড়াটি জুতোর খানিকটা চামড়া খুব্‌লে খেয়ে ফেলেছিল!

অনিমেষ ও বিজয় আজও সেই কাঁকড়াটি পরম যত্নে একটি কাঁচের আধারে আবদ্ধ করে রেখেছে। কাঁকড়াটি চিড়িয়াখানার একটি স্মৃতিচিহ্ন, আর স্মৃতিচিহ্ন সেই ভয়াবহ দুর্য্যোগের!

নহে সামান্যা

-শ্রীনীলরতন দাশ

গঙ্গার ঘাটে মহা ধুমধাম পুণ্য-স্নানের যোগ,
সমবেত সেথা স্নানার্থী ও ধনি-দরিদ্র লোক।
নদীয়া রাজার প্রধানা মহিষী নামিলেন ঘাটে আসি',
সঙ্গে তাঁহার লোক-লস্কর শান্ত্রী ও দাস-দাসী।
অন্ন-বস্ত্র, সোনা-রূপা কত করিছেন রাণী দান,
দু'হাত তুলিয়া গ্রহীতারা করে রাণীমা'র জয়-গান!
রাজার মহিষী সহসা তাকায়ে, দেখেন অদূরে ভীড়ে,
ব্রাহ্মণী এক কলসী-কক্ষে দাঁড়ায়ে নদীর তীরে!
দুই হাতে তার লাল সুতো বাঁধা—সধবার লক্ষণ,
মহিষীর দান-খয়রাত দেখে দাঁড়ায়ে কিছুক্ষণ।
গরীব বলিয়া মনে হয়ে তারে বেশ-ভূষা দেখি' তার,
ভাবিলেন রাণী, তাঁর কাছে ভিখ্ মাগিবে সে এইবার!
কিন্তু সে ধীরে চলে যায় দেখি' মহারাণী কন রাগি',—
"শাঁখার অভাবে লাল সুতো হাতে বাঁধে যেই হতভাগী,

এ হেন দম্ভ সাজে কি তাহার? নিঃস্ব, উদ্ধত!
গা-ভরা গয়না থাকিলে না-জানি দেমাক হইত কত!"

শুনিল সে নারী, শোনাবারই তরে কথাগুলি কন তিনি,
শুনিল সে কথা রাজ-মহিষীর দাস-দাসী সঙ্গিনী।
বিস্মিত তারা হেরি' সে নারীর এ হেন অহঙ্কার,
কেহ বা তাহারে কয় কটু কথা, কেহ দেয় ধিক্কার!
দীন-দরিদ্র! ব্রাহ্মণী তবে সহসা দাঁড়াল ফিরে,
উত্তর দিল সহজ গলায় সবিনয়ে ধীরে ধীরে,—
"রাণী মা! তোমার গায়ের গহনা খসে পড়ে যদি কভু,
নবদ্বীপের কেহ জানিবে না, কেহ কাঁদিবে না তবু।
আমার হাতের এই লাল সুতো যদি কভু খসে যায়,
বিধবা হইবে সারাটি নদীয়া, করিবে যে হায় হায়!"
এই কথা ক'টি বলে ব্রাহ্মণী চলে যায় গৃহ পানে,
গর্ব্বিতা রাণী ফুলিতে লাগেন অপমানে অভিমানে!

প্রাসাদে ফিরিয়া জানালেন রাণী রাজারে সকল কথা,
কহিলেন, "এক তুচ্ছ রমণী দিল আজ প্রাণে ব্যথা।
করিল না মোরে গ্রাহ্য মোটেই, নিল না আমার দান,
সত্বর এর কর প্রতিকার, নতুবা ত্যজিব প্রাণ।"
সন্ধান লয়ে অন্দরে ফিরে রাজা কন মহিষীরে,
"সেই রমণীর সংবাদ লয়ে আসিয়াছে লোক ফিরে।
ব্রাহ্মণী অই নহে সামান্যা, তিনিও স্বামীর মত
শতেক অভাব-দৈন্যের মাঝে করে নাকো মাথা নত!

ঐ রমণীর স্বামী পণ্ডিত, বুনো রামনাথ নাম,
যাঁহারে বক্ষে ধরিয়া ধন্য সারাটা নদীয়া ধাম!

গোটা দেশ জুড়ে তাঁর জোড়া নাই, তাঁহার অভাবে তাই
সারাটা নদীয়া বিধবা যে হবে সন্দেহ তাতে নাই!
বনের মাঝারে ছোট কুঁড়ে ঘরে শান্তিতে তাঁর বাস,
ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়া নাহি কোন অভিলাষ!
গৃহিণী তাঁহার তেঁতুল পাতার অম্বল শুধু রাঁধে,
আত্মভোলা সে রামনাথ তাই খান অতি আহ্লাদে!
অভাব তাঁদের নাই যে কিছুই অতীব শুদ্ধ মন,
ভেবে দেখো রাণী! কি পরম সুখে আছে এঁরা দুইজন!
এঁদের মাঝারে আজো বেঁচে আছে ভারতীয় ভাবধারা,
আর্য্য-ঋষির মহা আদর্শ এখনো হয়নি হারা।

গর্ব্বের কথা, হেন ব্রাহ্মণ আজো বাংলায় আছে,
দৈন্যের দায়ে নোয়ায় না মাথা রাজশক্তির কাছে!
তাঁহার ঘরণী, সতী-শিরোমণি, সারা নদীয়ার মান,
যোগ্য আমরা নহি তো কখনো তাঁহাকে করিতে দান!
তাই বলি রাণী, বৃথা অভিমান কভু না তোমার সাজে,
'দেবতা-সমান বুনো রামনাথ,' সারা নদীয়ায় রাজে!"

তর্কে বহু দূর

ডাক থুয়ে যাওয়া

খেতরীর যুবরাজ নরোত্তম দত্ত রূপোর পাল্কী করে যাচ্ছেন। যেতে যেতে পথে দুপুর হয়ে গেল। পাল্কী থামাতে আদেশ করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার জন্যে পাল্কী থেকে নামলেন।

সামনেই দেখলেন একটা বৃহৎ.কদম্ব গাছ। সেই কদম্ব গাছের ছায়া যেন তাঁকে ডাকছে। তিনি বিশ্রামের জন্যে সেই গাছতলায় গিয়ে বসলেন। হঠাৎ তিনি যেন শুনতে পেলেন, মধুর কণ্ঠে কে তাঁকে ডাকছে। মনের ভুল হতে পারে মনে করে, তিনি ধীরভাবে কান পেতে রইলেন। তেমনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে আকুলভাবে ডাকছে। যুবরাজ নরোত্তমের অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সেই গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ গাছের তলায় একদা বিশ্রাম করেছিলেন। সেই দিন রাত্রিতে যুবরাজ স্বপ্নে দেখলেন, স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁকে বলছেন, "নরোত্তম, তোমার জন্যেই ঐ কদমগাছের তলায় আমি ডাক থুয়ে গিয়েছিলাম।" প্রভাতে উঠে যুবরাজ সংসার, সমাজ, রাজ্য ত্যাগ করে বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবন চল্লেন। এই যুবরাজ নরোত্তম ঠাকুর হয়ে বাংলাদেশে কীর্ত্তনের ভেতর দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নতুন জোয়ার এনেছিলেন।

গুপ্তধন

—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের গাঁয়ের নাম কুমীরডাঙা। কিন্তু এর এক ক্রোশের মধ্যে নদী নেই; আধক্রোশটাক দূরে এক সময়ে নাকি একটা বিল ছিল। সেখানেও এখন মস্ত জঙ্গল। জঙ্গলটার নামও বিচিত্র—হাতীডোবা। শোনা যায়, বিলের নামানুসারেই জঙ্গলের নাম। সেই বিলের কাদায় সত্যিই একবার রানীহাটের জমিদারদের একটা হাতী বসে যায়। তবে এসব অনেককাল আগের কথা। এ নিয়ে অল্পবয়স্করা কেউ মাথা ঘামায় না। পল্লীর যে দু'-একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আছেন, তাঁরাই নাতি-নাতনীদের কাছে সেই পুরোনো দিনের সে-সব গল্প বলেন। বলে আরামও পান! কেউ তা অবিশ্বাস বা তা নিয়ে পরিহাস করলে তাঁরা রুষ্ট ও ব্যথিত হন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, সুকুমারমতি যারা, তারা বৃদ্ধদের হৃদয় বোঝে না, তাঁরাও বোঝাতে পারেন না। ফলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই যায় বেড়ে!

ঠাকুরদার মুখে শুনেচি—একবার শীতকালে যেন কোথা থেকে কি করে ছোট একটি হরিণের পাল ঐ হাতীডোবার জঙ্গলে এসে আশ্রয় নেয়! কেউ বলে বাঘের তাড়া খেয়ে, কেউ বলে ইছামতীর ধারে ধারে যে জঙ্গল আছে সেখানে কুমীরের অত্যাচারে তারা খানিক ভেতর দিকে সরে আসে। তখন হাতীডোবার জঙ্গল আর ইছামতীর তীরস্থ জঙ্গলের একটু পাতলা যোগও ছিল। এটা আমরাও কিছু বড় হয়ে যেন দেখেচি, মনে পড়চে। এখন অবশ্য নদী ও জঙ্গলে অনেকটা ছাড়াছাড়ি। দুয়ের মাঝে একখানা মাঠ। খেয়াঘাট থেকে মাঠের ওপর দিয়ে, জঙ্গলের মাঝ দিয়ে, একটি পথ এসে গাঁয়ের বটতলার পুরোনো শিবমন্দিরটির সামনের সড়কে মিশেচে।

গাঁয়ের পুরোনো দিনের কথায় ঠাকুরদা আর একদিন বলেন, "সেবার তখনও ভাল করে বর্ষা নামে নি। আকাশে মেঘ আছে কিন্তু বৃষ্টি নেই; গাঁয়ের ওপর দিয়ে সচল মেঘের ছায়া চলে যায়, একটানা হাওয়ায় নারিকেল, তাল ও খেজুর-বন সারা দিনরাত সর্ সর্ শব্দে দোলে, বাগানভরা পাকা আমের মিঠে গন্ধে গা মেতে উঠেচে। তবু গরম যায় না। সবাই আশা করচে, যে কোন একদিন আকাশ-ভেঙে বৃষ্টি পড়বে। এমন সময়ে একদিন বৃষ্টির বদলে কোথা হতে এল একপাল বেদে। তারা এসে ঐ হাতীডোবার জঙ্গলে আস্তানা গাড়লো। অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের সাবধান করতে লাগলেন, চিররুগ্নরা ওষধির আশায় তাদের আস্তানায় যাওয়া-আসা করতে লাগলো ; আর, যারা ছিল দুর্বৃত্ত তাদের সেদিকে আনাগোনা

চলতে লাগলো গোপনে। বেদেরা কিন্তু প্রথম প্রথম গাঁয়ের ত্রিসীমায় এল না। শোনা গেল, তারা ঘোরাফেরা করচে, হাট-বাজারের দিকে, খেয়াঘাটেও তাদের হামেসাই দেখা যায়।

"গাঁয়ের পূব দিকে পুকুর পাড়ে ছিল ব্রজদাসের ঘর—ছোট একটু বাগানের মধ্যে একখানি মাত্র কুঁড়ে। গাঁয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ ছিল সে; বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি। গায়ের রঙ কালো, গলায় তুলসীকাঠের মালা, মাথায় ছিল কাশ-ফুলের মতো শাদা চুল, মুখে তেমনি শাদা পাতলা দাড়ি, কিন্তু একটি দাঁতও ছিল না। তার চোখের দৃষ্টি ও গলার স্বর ছিল বড় কোমল। কিসে যে তার দিন চলতো জানি নে, কোনদিন তাকে ভিক্ষে করতে দেখেচি বলে তো মনে পড়ে না।

"কিন্তু হাতীডোবায় বেদের পাল আসবার কয়েকদিন পরে একদিন ভোরে দত্তদের বাগানে আম কুড়োতে গিয়ে দেখি, বুড়ো লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে শিবমন্দির ছাড়িয়ে হাতীডোবার জঙ্গলের দিকে চলেচে। দেখে কৌতূহল হোল, কিন্তু পিছু নিতে সাহস হোল না। বরং গা একটু ছম্ ছম্ করতে লাগলো। কারণ, তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি; গাছের ডালে, পাতার তলায়, গাছের গোড়ায়, মন্দিরের কোলে একটু একটু অন্ধকার লেগে ছিল। এদিকে-ওদিকে দু'-একটি জোনাকি পিট্ পিট্ করছিল, আকাশের গায়ে দু'-একটি তারা ফ্যাকাশে হয়ে জ্বলছিল। তবুও যথাসম্ভব সাহসে ভর করে, খুব ভাল করে নজর করে দেখলাম, বুড়ো ব্রজদাসই বটে! সে ছাড়া আর কেউ, বা আর কিছু নয়। কিন্তু খবরটা কাউকেই দিলাম না, নিজের মনেই চেপে রাখলাম। আম কুড়োতেও আর উৎসাহ হোল না, বাগান থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরের ধারে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। ক্রমে আলো ফুটলো, লোকজনের চলাফেরা শুরু হোল। একটু পরেই দেখি, বুড়ো ফিরে আসচে, সঙ্গে এক বুড়ো বেদে। তার পাশে একটা কালো রঙের কুকুর। কুকুরটার চেহারা অনেকটা নেকড়ের মতো। চোখে সবুজ আলো, লেজে প্রচুর লোম।

"সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে খবর রটে গেল 'ব্রজদাস একটা বুড়ো বেদেকে সঙ্গে করে গাঁয়ে এনেচে। তার সঙ্গে একটা নেকড়ে বাঘ।'

"অমনি তাদের পিছু নিল ছেলে-বুড়োর এক কৌতূহলী জনতা। মেয়েরাও বাড়ির উঠোনে, ঘরের কানাচে ও বাগানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগ্‌লো। কুকুরটা ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক-একবার জিভ ও শাদা দাঁত বার করলেও ব্রজ বা বেদে কেউ কোনদিকে তাকালো না, দুজনে নীরবে চল্‌তে লাগ্‌লো। শেষে তারা গিয়ে পৌঁছলো পুকুর ধারে। অনেককালের পুকুর। তার পশ্চিম দিকে শালুক আর কলমীর বন, পূব দিকটা পরিষ্কার। সেইদিকে ছিল পুরোনো শান-ভাঙা ঘাট। ঘাট থেকে হাত তিরিশেক তফাতে একটি অশ্বত্থ গাছ। তার গোড়ায় থাকতো একজোড়া গোখরো সাপ। পুকুরটা ব্রজদাসের ছিল নিজস্ব। শোনা যায়, ব্রজ যৌবনে ডাকাতি করে ধনদৌলত এনে ঐ পুকুরে লুকিয়ে রাখতো। একবার নাকি কার একটা ছেলেকে ধরে এনে ঐ পুকুরে ডুবিয়ে মারে। যার ছেলেকে এনে মেরে ছিল, সে নাকি ব্রজর বড় ভাইকে হাতীডোবার বিলে ডুবিয়ে মারে। সেই শোকে ব্রজর বাবা যায় পাগল হয়ে। বুড়ো শেষে অশ্বত্থগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। তাই ব্রজ তার শোধ নেয় তার একমাত্র ছেলেকে অশ্বত্থগাছের সামনে পুকুরে ডুবিয়ে মেরে। তারপর সে লোকটাও যায় নিরুদ্দেশ হয়ে। যাবার আগে সেও নাকি বলে যায়, 'বেজা, এর শাস্তি ভগবান দেবেন।'

"ব্রজ বলে, 'আমার বাপের বুক যখন ভেঙেছিলি তখন মনে ছিল না? ভগবান কাণা নয়। বাপের ঋণ আজ শুধলাম।'

"এরপর থেকেই ব্রজদাসের বাড়ির দিকে সাপের উৎপাত হয়। ব্রজর স্ত্রীকে একদিন সন্ধ্যেবেলা সাপে কামড়ে মেরে ফেলে। তার দিন-কয়েক আগে হাতীডোবার বিলের ধারে একপাল বেদে এসে আস্তানা গেড়েছিল। তারা গাঁয়ে আসতো। সেখানে দিন-কয়েক থেকেই তারা ব্রজর স্ত্রীকে সাপে কাটবার পরদিন ভোরে চলে যায়! যেদিন যায় সেদিন থেকেই ব্রজর একমাত্র ছেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। এ হলো প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগের ঘটনা। কৃষ্ণের বয়স তখন ছিল চার বছর। ব্রজ ছেলের খোঁজে কত জায়গায় যে ঘুরেচে! তবুও ছেলে বা সেই বেদের পালের সন্ধান পায় নি। যে বেদেদের দেখা সে পেয়েছিল তাদের মধ্যে তার ছেলে ছিল না। শেষে হতাশ হয়ে গাঁয়ে ফিরে আসে! তারপর থেকে ঐ কুঁড়েতেই বাস করছিল। আবার বহুকাল পরে গাঁয়ের ধারে সেদিন একপাল বেদে এল। কিন্তু তখন সে হাতীডোবার বিলও নেই, ব্রজর ছেলেও নিরুদ্দেশ। এ-সব কাহিনী লোকমুখে শোনা। তাই এর মধ্যে কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা আছে জানি নে। কিন্তু সেদিন দেখলাম ঐ দৃশ্য। কেবল আমি নয়, গাঁয়ের প্রায় সকলেই দেখলো।

"হরি দত্ত ছিলেন গাঁয়ের মাতব্বর; তাঁরও বয়স নব্বই না হলেও সত্তরের ওপর হবে। ব্রজ তাঁরই সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতো। আর সবাই তফাতে দাঁড়িয়ে রইলো। কেবল তিনিই হুঁকোটি হাতে করে খড়ম পায়ে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ও খুড়ো, কাকে সঙ্গে আনলে?'

"ব্রজর শুক্‌নো গাল বেয়ে জল পড়ছিল; বললে, 'আমার কেষ্টকে।'

'কি রকম? ও তো বেদে।'

'বেদে নয়—বেদে নয়—ও আমার কেষ্ট।'

'প্রমাণ কি?'

'ওই তো ওর ডান কানের লতি কাটা, কপালের বাঁ দিকে কাটা দাগ। ছেলেবেলায় ওর মা কান বিঁধিয়ে দুটো রুপোর মাকড়ি পরিয়ে দিয়েছিল। ও ঘুমের ঘোরে মাকড়ি ধরে এমন টান দেয় যে, লতি ছিঁড়ে মাকড়ি বেরিয়ে আসে। আর একদিন কাটারি দিয়ে ডাব কাটতে গিয়ে নিজেই নিজের কপালে বসায় কোপ।'

'ও নিজের পরিচয় কিছু দিয়েচে?'

'এখনও ভাল করে কথা হয়নি। অনেক কাকুতি-মিনতি করে ওকে এনেচি।'

'তবে ঘরে বসাচ্চো না কেন?'

'গেল না। বললে, দম আটকে যাবে। তুমি ওদের ওখান থেকে যেতে বল—' ব্রজ আমাদের হাত দিয়ে দেখালে।

"হরি দত্ত দু'-একটা ধমক দিতেই সকলে একে একে সরে এল। তবুও দু-এক-জন 'যাই যাই' করতে করতে রয়ে গেল। দত্তমশাই আবার বললেন, 'এখনও গেলে না? লোকটা মন্তর-তন্তর জানে। কার ওপর কি করে বসবে! সেইটেই ভাল হবে?'

"এরপর আর কেউ থাকতে সাহস পেলে না; সেখানে রইলো কেবল ব্রজ, বেদে, হরি দত্ত আর সেই কুকুরটা। কুকুরটা অশ্বত্থ তলায় গিয়েই একবার 'ঘেউ' করে ডেকে উঠলো। বুড়ো বেদের অমনি গাছের গোড়াটার দিকে তাকিয়ে দেখে এক পাশে সরে এসে বসলো।

"ব্রজ তার গায়ে হাত দিয়ে ছল ছল চোখে বললে, 'বাবা, তোর জন্যেই আমার প্রাণটা এতদিন

আছে। তোকে কত দেশে খুঁজেচি! পাহাড় দেখেচি, সমুদ্দুর দেখেচি, মরুভূমিতেও বেদের পালের পিছু নিয়েচি। বাবা কেষ্ট, কতকাল পরে তোর দেখা পেলাম! আর তোকে ছাড়বো না।'

"লোকটি এক দৃষ্টিতে ব্রজর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগলো।

"মাতব্বর জিগ্যেস করলেন, 'তোমার বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ে?'

"লোকটা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে বললে, 'কিছু।'

'তোমার বাপকে চিন্‌তে পারচো না?'

"লোকটা ব্রজর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে, 'না।'

"ব্রজ বলে উঠলো, 'হাঁরে, এতবড় কথা বললি? আমি যে তোকে দেখেই চিনেচি!'

"মাতব্বর বললে, 'একে কবে দেখেচো খুড়ো?'

"ব্রজ বললে, 'ক'দিন ধরেই ওদের আস্তানায় আনাগোনা করচি। ও হলো দলের সর্দার। ওর বউ আর আমার নাতি-নাতনীদেরও দেখলাম। তারা সব বড় বড়। নাতিটা দশাসই জোয়ান। কি বুকের ছাতি! ওকে কত সাধ্য-সাধনা করে আজ এখানে এনেচি।'

"বেদে হঠাৎ বলে উঠলো, 'এই তালাও—হাঁ—এই তালাও। কিন্তু তুমি—'

"ব্রজ বললে, 'তোর বাপ-মায়ের কথা কি কিছুই মনে পড়চে না রে, কেষ্ট? আমি যে—' বলে বৃদ্ধ কাঁদতে লাগলো।

"বাবা, তোর জন্যেই আমার প্রাণটা এতদিন আছে।" [পৃঃ ১৪৭

"বেদে আস্তে আস্তে বললে, 'সর্দারের কাছে শুনেচি একজন আমাকে তার কাছে বেচে দিয়েছিল। দাম নিয়েছিল দু'মোহর। সর্দার মরবার আগে আমাকে এসব কথা বলে। আমার মতো আরও একটা মেয়ে সে কিনেছিল। তার নিজেরও মেয়ে ছিল। সর্দার তারই সঙ্গে তার ছেলের সাদী দেয়। আর আমার সাদী দেয় নিজের মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু ছেলেটা বাঁচে না, মরে যায়। তার বউটা চলে যায় আর একদলের একজনকে বিয়ে করে। তারা এখন আছে ইরানে। আমরাও ইরান, তুরান, কাবুল ঘুরেচি। তামাম হিন্দুস্তান দেখেচি—পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্দুর, সুখাডাঙা এসব আমাদের এলাকা।'

"ব্রজ বললে, 'তোর বাপ-মায়ের মুখ মনে পড়ে না রে?'

"বেদে বললে, 'অল্প অল্প।'

"দত্তমশাই বললেন, 'খুড়ো, তোমার হিসাবে এর বয়স এখন কত হবে?'

'তিন কুড়ি চার বছর। চার বছর বয়সে ওর মা মরে। ও-ও হারিয়ে যায়। ও যেদিন হারিয়ে যায় তার আগের দিনই ওর মাকে সাপে কাটে। একথা তো তোমরাও জানো। তাই নয় রে কেষ্ট?' লোকটি কোন জবাব দিলে না।

"মাতব্বর বললেন, 'তখন আমার বয়স বছর আট-নয়। সে সব কথা ভুলেই গেচি। তোমায় রোজ যদি না দেখতাম, তা হলে তোমাকেও প্রথম দেখায় চিনতেই পারতাম না।'

"বেদে বললে, 'আমি এখন যাই।'

"ব্রজ আকুলভাবে বললে, 'বাবা কেন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, সবাইকে নিয়ে এসে এখানে থাক্! তোকে যা দিয়ে যাবো তা দিয়ে দু-পুরুষ বসে বসে খাবি। বুড়োর মুখে মরবার আগে একটু জল দিস্।'

"দত্তমশাই বললেন, 'খুড়ো, ওর কি জাত-ধর্ম আছে যে ওর হাতের জল খেয়ে মরবে?'

"ব্রজ বললে, 'বাপের কাছে ছেলের আবার জাত-ধর্ম কি? থাক্ বাবা—থেকে যা। তোকে এক ঘড়া মোহর দেবো—মোগল-বাদশার আমলের আশরফি—'

"দত্তমশাই চমকে উঠলেন, বললেন, 'বল কি খুড়ো? কোথায় রেখেচো?'

"বেদেও চঞ্চল হয়ে উঠলো।

"ব্রজ বললে,—'যক্ষের মতো তোরই জন্যে আগলে রেখেচি।'

"বেদে বললে, 'তুমি আমার বাপ। এসব ছেড়ে আমার সঙ্গে চল। তোমার কিছু কষ্ট হবে না।'

"ব্রজ বললে, 'বুড়ো বয়সে এই ভিটে ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে কোথায় পথে পথে ঘুরবো? ঘরের বাঁধন কাটাতে পারবো না, বাপ। তুই-ই ছেলে-পুলে নিয়ে এসে বুড়ো বাপের কাছে থাক্, ঘরে সংসার পাত। তোর কোন কষ্ট হবে না।'

"বেদে বললে, 'ঘরে থাকতে পারবো না। দম আটকে মরে যাবো।'

"তবুও ব্রজ তাকে ঘরে বেঁধে রাখবার কত চেষ্টা করলে। বাপের চোখের জল, ঘড়াভরা মোহরের লোভ সেই ঘরছাড়াকে আটকাতে পারলে না। সে চলে গেল। যাবার সময়ে বললে, 'তুমি চল। তোমাকে আরামে রাখবো। তোমার নাতি শিকার করে আনবে। বউ তোমার যত্ন করবে। কত দেশ দেখবে, চল—চল।' কিন্তু ছেলেও বুড়ো বাপকে ঘরছাড়া করতে পারলে না। বুড়োর শুকনো গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

"বেদে বললে, 'কাল আবার আসবো। তুমি আমাদের আস্তানায় আর যেও না।'

"বেদে চলে গেলে হরি দত্ত বললে, 'খুড়ো, মোহরগুলো কোথায় রেখেচো? ঘরে, মাটির তলায়, না, পুকুরে?'

"ব্রজ উত্তর দিলে না, উঠে ঘরের দিকে এগোতে লাগলো!

"দত্তও ছাড়েন না; বললেন, 'বল খুড়ো। সেও তো তোমার পাপের ধন! তোমার ছেলে তো আর নিতে আসবে না। তুমি মলে আমরা পাঁচজনে সৎকাজে ব্যয় করবো। বল—'

'পাপের ধন ভগবান ছোঁয় না।'

'আমরা শোধন করে নেবো।'

'আমি মলে ঐ অশথগাছের দক্ষিণদিকের গোড়া খুঁড়ে দেখো।"

"দত্তমশাই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বাড়ি এলেন। তার একটু পরেই আকাশ ভেঙে হুড়মুড় করে নামলো বর্ষা। তারপর তিনদিন তিনরাত কখন প্রবলধারায়, কখন ক্ষীণধারায় বৃষ্টি হলো। সেই সঙ্গে বাতাসের দমকা। গাছপালা ভেঙে পড়লো। গাঁয়ের খানা-ডোবা-পুকুর ভরে উঠলো, মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে হাতীডোবার জঙ্গলে জমলো এক হাঁটু জল; ইছামতী লক্ষ লক্ষ হাতে করতালি দিয়ে মহোল্লাসে ছুটে চলতে লাগলো, দিন-রাত হয়ে গেল একাকার! তেমন বর্ষণ কেউ কখন দেখেনি; দেখলেও ভুলে গিয়েছিল।

"তিনদিন পরে বৃষ্টি থামলে মাতব্বর দত্ত কয়েকজনকে নিয়ে গাঁয়ের অবস্থা দেখতে বেরোলেন। সেই সজল, সকরুণ দৃশ্য সত্যই হৃদয়-বিদারক। তাঁরা জল ভেঙে অতিকষ্টে ব্রজদাসের কুঁড়েতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, তার জীর্ণ পুরোনো দেহপিঞ্জরটি জলসিক্ত মেঝেয় পড়ে আছে, তা থেকে প্রাণপাখী গেছে উড়ে।

'বল কি খুড়ো? কোথায় রেখেচো?' [পৃঃ ১৪৯

"সে অবস্থায় থানায় খবর দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এক ক্রোশ পথ সেই জলকাদা ভেঙে যাবার মতো উৎসাহী লোকও পাওয়া গেল না, তার ওপর শূন্যহৃদয়,

ব্যথিত বৃদ্ধের ওপর কতকটা অনুকম্পা বশেই গাঁয়ের বোষ্টম ডেকে ইছামতীর ধারে তার সৎকারের ব্যবস্থা করা হলো।

তার কুঁড়ে খুঁজে পাওয়া গেল একটি মাটির ভাঁড়ে গুটি তিনেক চাঁদীর টাকা, কয়েক আনা পয়সা ও একখানি চকচকে আশরফি। মাতব্বর দত্তর হেফাজতে তা রইলো। তিনিই সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। এবং আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় অর্ধদগ্ধ শবটি ইছামতীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। শবটি ভাসতে ভাসতে চললো দক্ষিণে।

"খেয়াঘাটে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বেদেরাও বর্ষার প্রথম দিনে খেয়াপার হয়ে চলে গেছে দক্ষিণদিকেই।

"তারপর ব্রজদাসের গুপ্তধনের সন্ধানে কত লোক যে তার ঘরের মেঝে, উঠোন, বাগান ও অশথগাছের গোড়া খুঁড়েচে! পুকুরেও ডুব দিয়ে দেখেচে কেউ কেউ। কিন্তু কেউ তার সন্ধান পায়নি। তার হৃদয়ে পুত্রস্নেহের মতোই তা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেল।"

পুরোনো দিনের এই কাহিনীটি শুনে বালক বয়সে আমরাও অনেক সন্ধান করেচি। কিন্তু সে ধন আবিষ্কারের সামর্থ্য কারো হয়নি। ব্রজদাসের হৃদয়ের মতোই জায়গাটি যেন শূন্য!

● মণি ও মুক্তো

জগতে সব জিনিস মলিন হতে পারে, শুধু একটি জিনিস হবে না। যেদিন তা মলিন হবে, সেদিন এই মানুষের পৃথিবীরও অস্তিত্ব থাকবে না, সে জিনিস হলো মা ও ছেলের সম্পর্ক।

—জর্জ ওয়াশিংটন

বনভোজনের ব্যাপার

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হাবুল সেন বলে যাচ্ছিল, পোলাও, ডিমের ডালনা, রুই মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা—

উস্-আস্ শব্দে নোলায় জল টানল টেনিদা : বলে যা—থামলি কেন? মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানী পোলাও, মশলা দোসে, চাউ চাউ, সামা কাবাব, টিকিয়া কাবাব—

এবার আমাকেও কিছু বলতে হয়। আমি জুড়ে দিলাম : আলু ভাজা, শুক্তো, বাটি-চচ্চড়ি, কুমড়োর ছোকা—

টেনিদা আর বলতে দিলে না। গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল : থাম প্যালা, থাম বলছি! শুক্তো—বাটি-চচ্চড়ি !—দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তার চেয়ে বল্ না হিঞ্চে সেদ্ধ, গাঁদাল আর সিঙি মাছের ঝোল! পালা-জ্বরে ভুগিস আর বাসক-পাতার রস খাস, এর চাইতে বেশি বুদ্ধি আর কী হবে তোর! দিব্যি অ্যায়সা অ্যায়সা মোগলাই খানার কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে ধাঁ করে নিয়ে এল বাটি-চচ্চড়ি আর বিউলির ডাল! ধ্যাত্তোর!

ক্যাবলা বললে, পশ্চিমে কুঁদরুর তরকারী দিয়ে ঠেকুয়া খায়। বেশ লাগে।

—বেশ লাগে?—টেনিদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা লঙ্কা আর ছোলার ছাতু আরো ভালো লাগে, না? তবে তাই খে গে যা। তোদের মতো উল্লুকের সঙ্গে পিক্‌নিকের আলোচনাও ঝকমারী।

হাবুল সেন বললে, আহা-হা, চেইত্যা যাইত্যাছ ক্যান্? পোলাপানে কয়—

—পোলাপান! এই গাড়োলগুলোকে জলপান করলে তবে রাগ যায়। তাও কি খাওয়া যাবে এ-গুলোকে? নিম-নিসিন্দের চেয়েও অখাদ্য। এই রইল তোদের পিক্‌নিক্—আমি চললাম। তোরা ছোলার ছাতু আর কাঁচা লঙ্কার পিণ্ডি গেল্ গে—আমি ও-সবের মধ্যে নেই।

সত্যিই যে চলে যায় দেখছি! আর দলপতি চলে যাওয়া মানেই আমরা একেবারে অনাথ! আমি টেনিদার হাত চেপে ধরলাম : আহা—বোসোনা। একটা প্ল্যান-ট্যান হোক। ঠাট্টাও বোঝো না?

টেনিদা গজগজ করতে লাগল : ঠাট্টা! কুমড়োর ছোকা আর কুঁদরুর তরকারী নিয়ে ও-সব বিচ্ছিরি-ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

—না—না, ওসব কথার কথা।—হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বোঝাতে লাগল : মোগলাই খানা না হইলে আর পিকনিক হইল কী?

—তবে লিষ্টি কর,—টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।

প্রথম যে লিষ্টিটা হল তা এই রকম :

বিরিয়ানী পোলাও

কোর্মা

কোপ্তা

কাবাব (দু রকম)

মাছের চপ—

মাঝখানে বেরসিকের মতো বাধা দিলে ক্যাবলা : তা হলে দুজন বাবুর্চি চাই, একটা চাকর, একটা মোটরলরী—দুশো টাকা—

—দ্যাখ্ ক্যাবলা—টেনিদা ঘুষি বাগাতে চাইল।

আমি বললাম, চটলে কী হবে? চারজনে মিলে চাঁদা উঠেছে দশ টাকা ছ' আনা।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, তা হলে একটু কম-সম করেই করা যাক। ট্যাক-খালির জমিদার সব—তোদের নিয়ে ভদ্দরলোকে পিক্‌নিক্ করে।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি দিয়েছ ছ' আনা—বাকী দশ টাকা গেছে আমাদের তিন জনের পকেট থেকে। কিন্তু বললেই গাঁট্টা! আর সে গাঁট্টা ঠাট্টার জিনিস নয়—জুৎসই লাগলে স্রেফ্ গালপাট্টা উড়ে যাবে!

রফা করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত লিষ্টিটা যা দাঁড়াল তা এই :

খিচুড়ি

ডিমের ডাল্‌না (প্যালা রাজহাঁসের ডিম আনিবে বলিয়াছে)

আলু ভাজা (ক্যাবলা ভাজিবে)
পোনা মাছের কালিয়া (প্যালা রাঁধিবে)
আমের আচার (হাবুল দিদিমার ঘর হইতে হাত-সাফাই করিবে)
রসগোল্লা, লেডিকেনি (ধারে 'ম্যানেজ' করিতে হইবে)

লিষ্টি শুনে আমি হাঁড়িমুখ করে বললাম, ওর সঙ্গে আর একটা আইটেম জুড়ে দে হাবুল! টেনিদা খাবে।

—হে—হে—প্যালার মগজে শুধু গোবর নেই, ছটাক খানিক ঘিলুও আছে দেখছি!— বলেই টেনিদা আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। 'গেছি গেছি' বলে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

আমরা পটলডাঙার ছেলে—কিছুতেই ঘাবড়াই না। চাটুয্যেদের রোয়াকে বসে রোজ দুবেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতী-গণ্ডার সাবাড় করে থাকি। তাই বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছিলাম, দু-স্দূর, হাঁসের ডিম খায় ভদ্দরলোকে! খেতে হলে রাজহাঁসের ডিম! রীতিমতো রাজকীয় খাওয়া!

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে শুনি?—খুব যে চালিয়াতী করছিস, তুই ডিম পাড়বি নাকি?—টেনিদা জানতে চেয়েছিল।

—আমি পাড়তে যাব কোন দুঃখে? কী দায় আমার?—আমি মুখ ব্যাজার করে বলেছিলাম : হাঁসে পাড়বে।

—তাহলে সেই হাঁসের কাছ থেকে ডিম তোকেই আনতে হবে। যদি না আনিস, তা হলে—

তা হলে কী হবে বলবার দরকার ছিল না। কিন্তু কী গেরো বলো দেখি! কাল রবিবার—ভোরের গাড়িতেই আমরা বেরুব পিক্‌নিকে। আজকের মধ্যেই রাজহাঁসের ডিম জোগাড় করতে না পারলে আমি তো গেছি! পাড়ায় ভণ্টাদের বাড়ি রাজহাঁস আছে গোটাকয়েক। ডিম-টিমও তারা নিশ্চয় পাড়ে। আমি ভণ্টাকেই পাকড়ালাম। কিন্তু কী খলিফা ছেলে ভণ্টা। দু আনার পাঁঠার ঘুগনি আর ডজনখানেক ফুলুরী সাবড়ে তবে মুখ খুলল।

—ডিম দিতে পারি, তবে নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্‌সো থেকে।

—তুই দেনা ভাই এনে। একটা আইস্‌ক্রীম খাওয়াব।

ভণ্টা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, নিজেরা পোলাও-মাংস সাঁটাবেন আর আমার বেলায় আইস্‌ক্রীম! ওতে চলবে না। ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও—আমি বাবা ময়লা ঘাঁটতে পারব না।

কী করি, রাজী হতে হল।

ভণ্টা বললে, দুপুরবেলা আসিস। বাবা আর মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। মা তখন ওপরে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমোয়। সেই সময় ডিম বের করে দেব।

গেলাম দুপুরে। উঠোনের একপাশে কাঠের বাক্স—তার ভেতরে সার সার খুপরি। গোটা দুই হাঁস ভেতরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে।

ভণ্টা বললে, যা—নিয়ে আয়।

কিন্তু কাছে যেতেই বিদিকিচ্ছিভাবে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে উঠল হাঁস দুটো।

—ফোঁস ফোঁস্ করছে যে!

ভন্টা উৎসাহ দিলে, ডিম নিতে এসেছিস—একটু আপত্তি করবে না? তোর কোনো ভয় নেই প্যালা—দে হাত ঢুকিয়ে।

—হাত ঢুকিয়ে দেব? কিন্তু কী বিচ্ছিরি ময়লা—আর কী বদ্‌খৎ গন্ধ! একেবারে নাড়ী উল্‌টে আসে। তার ওপরে যে-রকম ঠোঁট বের করে ভয় দেখাচ্ছে—

ভন্টা বললে, চিয়ার আপ্ প্যালা! লেগে যা!

যা থাকে কপালে বলে যেই হাত ঢুকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে—ওরে বাপ্‌রে! খটাং করে হাঁসটা হাত কামড়ে ধরলে। সে কি কামড়! হাঁই হাঁই করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

—কী হয়েছে রে ভন্টা, নিচে এত গোলমাল কিসের?—ভন্টার মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমি আর নেই! হ্যাঁচকা টানে হাঁসের ঠোঁট থেকে হাত ছাড়িয়ে চোঁচাঁ দৌড় লাগালাম। দরদর করে রক্ত পড়ছে তখন!

রাজহাঁস এমন রাজকীয় কামড় বসাতে পারে কে জানত! কিন্তু কী ফেরেববাজ ভন্টা! জেনে-শুনে ব্রাহ্মণের রক্তপাত ঘটালো! আচ্ছা—পিক্‌নিক্‌টা চুকে যাক— দেখে নেব তারপর। ওই পাঁঠার ঘুগনি আর ফুলুরীর শোধ তুলে ছাড়ব।

কী করা যায়—গাঁটের পয়সা দিয়ে মাদ্রাজী ডিমই কিনতে হল গোটাকয়েক।

ওরে বাপ্‌রে! হাঁসটা হাত কামড়ে ধরলে।

পরদিন সকালে শ্যামবাজার ইষ্টিশানে পৌঁছে দেখি, টেনিদা, ক্যাবলা আর হাবুল এর মধ্যেই মার্টিনের রেলগাড়িতে চেপে বসে আছে। সঙ্গে একরাশ হাঁড়ি কলসি, চালের পুঁটলি, তেলের ভাঁড়। গাড়িতে গিয়ে উঠতেই টেনিদা হাঁক ছাড়ল : এনেছিস রাজহাঁসের ডিম?

দুর্গা-নাম করতে করতে পুঁটলি খুলে দেখালাম।

—এর নাম রাজহাঁসের ডিম! ইয়ার্কি পেয়েছিস?—টেনিদা গাঁট্টা বাগালো।
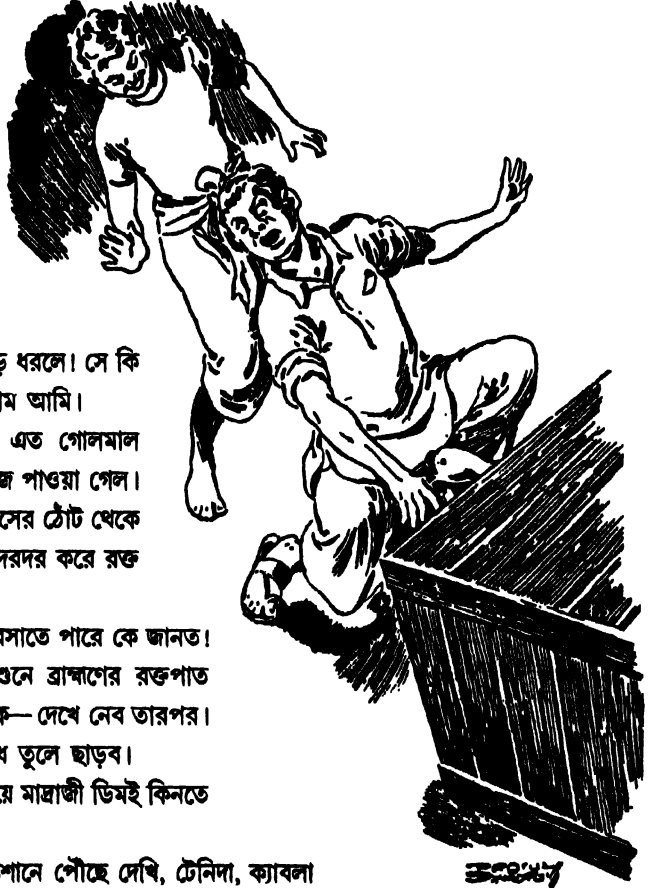
আমি গাড়ির খোলা দরজার দিকে সরে গেলাম ঃ মানে ইয়ে, ছোট রাজহাঁস কিনা—

—ছোট রাজহাঁস। কী পেয়েছিস আমাকে শুনি? পাগল না পেট খারাপ?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। ডিম্ তো আনছে।

টেনিদা গর্জন করে বললে, ডিম এনেছে না কচু। এই তোকে বলে রাখছি প্যালা—ডিমের ডালনা থেকে তোর নাম কেটে দিলাম। এক টুকরো আলু পর্যন্ত নয়। একটু ঝোলও না।

মন খারাপ করে আমি বসে রইলাম। ডিমের ডালনা আমি ভীষণ ভালোবাসি। তাই থেকেই আমাকে বাদ দেওয়া! আচ্ছা বেশ, খেয়ো তোমরা। এমন নজর দেব যে পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে তোমাদের।

পিঁ করে বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল মার্টিনের রেল। তারপর ধ্বস্-ধ্বস্ ভোঁস্-ভোঁস্ করে এর রান্নাঘর, ওর ভাঁড়ার ঘরের পাশ দিয়ে গাড়ি চলল।

টেনিদা বললে, বাগুইআটি ছাড়িয়ে আরো চারটে ইষ্টিশন। তার মানে প্রায় একঘণ্টার মামলা। লেডিকেনির হাঁড়িটা বের কর্ ক্যাবলা।

ক্যাবলা বললে, এখুনি? তা হলে পৌঁছুবার আগেই যে সাফ্ হয়ে যাবে।

টেনিদা বললে, সাফ্ হবে কেন? দুটো একটা চেখে দেখব শুধু। আমার বাবা ট্রেনে চাপলেই খিদে পায়। এই একঘণ্টা ধরে শুধু শুধু বসে থাকতে পারব না। বের কর্ হাঁড়ি—চট্‌পট্—

হাঁড়ি চট্‌পট্‌ই বেরুল—মানে, বেরুতেই হল তাকে। তারপর মার্টিনের রেলের চলার তালে তালে ঝট্‌পট্ করে সাবাড় হয়ে চলল। আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন জুল্ জুল্ করে শুধু তাকিয়েই রইলাম। দু'একটা লেডিকেনি চোখে দেখতে আমরাও যে ভালোবাসি, সে-কথা আর মুখ ফুটে বলাই গেল না।

ষ্টেশন থেকে নেমে প্রায় মাইলটাক হাঁটবার পরে ক্যাবলার মামার বাড়ি। কাঁচা রাস্তা, এঁটেল মাটি, তার ওপর কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে আবার। আগে থেকেই রসগোল্লার হাঁড়িটা বাগিয়ে নিলে টেনিদা।

—এটা আমি নিচ্ছি। বাকী মোটঘাটগুলো তোরা নে।

—রসগোল্লা বরং আমি নিচ্ছি, তুমি চালের পোঁটলাটা নাও টেনিদা।—লেডিকেনির পরিণামটা ভেবে আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

টেনিদা চোখ পাকালো ঃ খবর্দার প্যালা, ও সব মতলব ছেড়ে দে। টুপ্‌টাপ্ করে দু-চারটে গালে ফেলবার বুদ্ধি, তাই নয়? হুঁ হুঁ বাবা—চালাকি না চলিষ্যতি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঁটরি বোঁচকা কাঁধে ফেলে আমরা তিনজনে এগোলাম।

কিন্তু তিন পাও যেতে হল না। তার আগেই ধাঁই—ধপাস্। টেনে একখানা রাম-আছাড় খেল হাবুল।

—এই খেয়েছে কচুপোড়া। টেনিদা চেঁচিয়ে উঠলো।

সারা গায়ে কাদা মেখে হাবুল দাঁড়ালো। হাতের ডিমের পুঁটলিটা তখন কুঁকড়ে এতটুকু—হল্‌দে রস গড়াচ্ছে তা থেকে।

ক্যাবলা বললে, ডিমের ডালনার বারোটা বেজে গেল।

তা গেল। করুণ চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। ইস্—এত কষ্টের ডিম। ওরই জন্যে

রাজহাঁসের কামড় পর্যন্ত খেতে হয়েছে।

টেনিদা হুঙ্কার করে উঠল : দিলে সব পণ্ড করে। এই ঢাকাই বাঙালটাকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে। পিটিয়ে ঢাকাই পরোটা করলে তবে রাগ যায়।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, হাবুল চার টাকা চাঁদা দিয়েছে—তার আগেই কী যেন একটা হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল আমার পা দুটো মাটি ছেড়ে শোঁ করে শূন্যে উড়ে গেল, আর তারপরেই—

কাদা থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমার মাথা-মুখ বেয়ে আচারের তেল গড়াচ্ছে। ওই অবস্থাতেই চেটে দেখলাম একটুখানি। বেশ ঝাল-ঝাল টক-টক— বেড়ে আচারটা করেছিল হাবুলের দিদিমা।

ক্যাবলা আবার ঘোষণা করলে, আমের আচারের একটা বেজে গেল!

টেনিদা ক্ষেপে বললে, চুপ কর বলছি ক্যাবলা—এক চড়ে গালের পোস্তা উড়িয়ে দেব।

কিন্তু তার আগেই টেনিদার বোম্বা উড়ল— মানে স্রেফ লম্বা হল কাদায়। সাত হাত দূরে ছিটকে গেল রসগোল্লার হাঁড়ি—ধব্‌ধবে শাদা রসগোল্লাগুলো পাশের কাদাভরা খানায় গিয়ে পড়ে একেবারে নেবুর আচার।

ক্যাবলা বললে, রসগোল্লার দুটো বেজে গেল।

এবার আর টেনিদা একটা কথাও বললে না। বলবার ছিলই বা কী। রসগোল্লার শোকে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চারজনে পথ চলতে লাগলাম আমরা। টেনিদা তবু লেডিকেনিগুলো সাবাড় করেছে, কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কোথায়। অমন স্পঞ্জ রসগোল্লাগুলো।

পাঁচ মিনিট পরে টেনিদাই কথা কইল।

সাত হাত দূরে ছিটকে গেল রসগোল্লার হাঁড়ি।

—তবু পোনা মাছগুলো আছে—কী বলিস? খিচুড়ির সঙ্গে মাছের কালিয়া আর আলুভাজা—নেহাৎ মন্দ হবে না—অ্যাঁ?
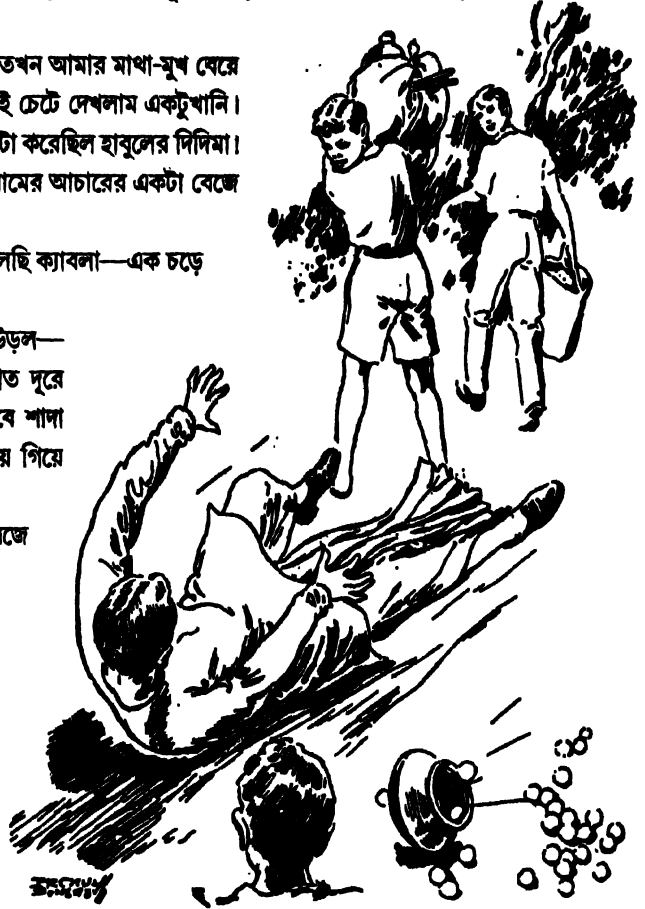
হাবুল বললে, হ-হ, সেই ভালো। বেশি খাইলে প্যাট গরম হইবো। গুরুপাক না খাওনই ভালো।

ক্যাবলা মিট্‌মিট্ করে হাসল : শেয়াল বলেছিল দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা!—ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে ছিল, তাই দু-একটা হিন্দী শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে।

টেনিদা বললে, খাট্টা! বেশি পাঁঠামি করবি তো চাঁট্টা বসিয়ে দেব!

ক্যাবলা ভয়ে স্পীকটি নট্! আমি তখনও নাকের পাশ দিয়ে ঝাল-ঝাল টক-টক আচারের তেল চাটছি। হঠাৎ বুক-পকেটটা কেমন ভিজে ভিজে মনে হল! হাত দিয়ে দেখি বেশ বড়-সড়ো একটুকরো আমের আচার তার ভেতর কায়েমী হয়ে আছে।

জয়গুরু! এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে সেটা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলাম। সত্যি—হাবুলের দিদিমা বেড়ে আচার করেছিল! আরো গোটাকয়েক যদি ঢুকতো।

বাগান-বাড়িতে পৌঁছুলাম আরো পনেরো মিনিট পরে।

চারদিকে সুপুরী আর নারকেলের বাগান—একটা পানা-ভর্তি পুকুর, মাঝখানে একতলা বাড়িটা। কিন্তু ঘরে চাবিবন্ধ। মালীটা কোথায় কেটে পড়েছে, কে জানে।

টেনিদা বললে, কুছ্ পরোয়া নেই। চুলোয় যাক মালী। বলং বলং বাহুবলং! নিজেরা উনুন খুঁড়ব—খড়ি কুড়ুব, রান্না করব, তারপরে ভক্ষণ করব। মালী ব্যাটা থাকলেই তো ভাগ দিতে হত। যা হাবুল—ইট কুড়িয়ে আন—উনুন করতে হবে। প্যালা কাঠ-খড়ি কুড়িয়ে নিয়ে আয়,—ক্যাবলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যা।

—আর তুমি?—আমি ফস্ করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

—আমি?—একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে টেনিদা হাই তুলল : আমি এগুলো সব পাহারা দিচ্ছি। সব চাইতে কঠিন কাজটাই নিলাম আমি। শেয়াল কুকুর এলে তাড়াতে হবে তো! যা—তোরা হাতে হাতে বাকী কাজগুলো চট্‌পট্ সেরে আয়।

কঠিন কাজই বটে! ইস্কুলের পরীক্ষায় গার্ডদের অমনি কঠিন কাজ করতে হয়। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষতে গিয়ে যখন 'ঘোড়া-ঘোড়া ঘাস-ঘাস' নিয়ে আমাদের দম আটকাবার জো, তখন গার্ড মোহিনীবাবুকে টেবিলে পা তুলে দিয়ে 'ফোঁর্‌র্-ফোঁ' শব্দে নাক ডাকাতে দেখেছি !

টেনিদা বললে, যা-যা সব—দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঝাঁ করে রান্নাটা করে ফ্যাল্—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

তা পেয়েছে বইকি! পুরো এক হাঁড়ি লেডিকেনি এখনো গজ গজ করছে পেটের ভেতর। আমাদের বরাতেই শুধু অষ্টরম্ভা! প্যাঁচার মতো মুখ করে আমরা কাঠখড়ি সব কুড়িয়ে আনলাম।

টেনিদা লিষ্টি বের করে বললে, মাছের কালিয়া! প্যালা রাঁধিবে।

আমাকে দিয়েই শুরু! আমি মাথা চুলকে বললাম, খিচুড়ি-টিচুড়ি আগে হয়ে যাক—তবে তো?

—খিচুড়ি লাষ্ট আইটেম—গরমা-গরম খেতে হবে। কালিয়া সকলের আগে। নে—প্যালা—লেগে যা—

ক্যাবলার মা মাছ কেটে নুন-টুন মাখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষা! কড়াইতে তেল চাপিয়ে আমি মাছ ঢেলে দিলাম তাতে!

আরে—এ কি কাণ্ড! মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কড়াই-ভর্তি ফেনা! তারপরেই আর কথা নেই—অতগুলো মাছ তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। মাছের কালিয়া নয়—মাছের হালুয়া।

ক্যাবলা আদালতের পেয়াদার মতো ঘোষণা করল :

মাছের কালিয়ার তিনটে বেজে গেল!

—তবে রে ইস্টুপিড্!—টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা তেলে মাছ দিয়ে তুই কালিয়া রাঁধছিস্? এবার তোর পালা-জ্বরের পিলেরই একদিন কি আমারই একদিন!

এ তো মার্টিনের রেল নয়—সোজা মাঠের রাস্তা। আমার কান পাকড়বার জন্যে টেনিদার হাতটা এগিয়ে আসবার আগেই আমি হাওয়া! একেবারে পাঞ্জাব মেলের স্পীড!

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, খিচুড়ির লিষ্ট থেকে প্যালার নাম কাটা গেল।

তা যাক! কপালে আজ হরি-মটর আছে সে তো গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি। গোমড়া মুখে একটা আমড়া-গাছতলায় এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম!

বসে বসে কাঠ-পিঁপড়ে দেখছি, হঠাৎ গুটি গুটি হাবুল আর ক্যাবলা এসে হাজির।

—কি রে তোরাও?

ক্যাবলা ব্যাজার মুখে বললে, খিচুড়ি টেনিদা নিজেই রাঁধবে। আমাদের আরো খড়ি আনতে পাঠাল।

সেই মুহূর্তেই হাবুল সেনের আবিষ্কার! একেবারে কলম্বাসের আবিষ্কার যাকে বলে!

—এই প্যালা—দেখছস্? ওই গাছটায় কিরকম জলপাই পাকছে?

টেনিদা হাঁ করে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার! [পৃঃ ১৬০

আর বলতে হল না। আমাদের তিনজনের পেটেই তখন খিদেয় ইঁদুর লাফাচ্ছে। জলপাই—জলপাইই

সই! সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে উঠে পড়লাম। আহা—টক-টক—মিঠে-মিঠে জলপাই—যেন অমৃত!

হাবুলের খেয়াল হল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

—এই টেনিদার খিচুড়ি কী হইল?

ঠিক কথা—খিচুড়ি তো এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত! তড়াক করে গাছ থেকে নেমে পড়ল ওরা। হাতের কাছে পাতা-টাতা যা পেল, তাই নিয়ে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে।

মুখে যাই বলুক—এক হাতা খিচুড়িও কি আমায় দেবে না? প্রাণ কি এতই পাষাণ হবে টেনিদার?

কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে আমরা তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ!

টেনিদা সেই নারকেল গাছটা হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে বলছে, দে-দে ক্যাবলা, পিঠটা আর একটু ভালো করে চুলকে দে।

পিঠ চুলকে দিচ্ছে—সন্দেহ কী! কিন্তু সে ক্যাবলা নয়—একটা গোদা হনুমান। আর চার-পাঁচটা গোল হয়ে বসেছে টেনিদার চারদিকে। কয়েকটাতে মুঠো মুঠো চাল-ডাল মুখে পুরছে, একটা আলুগুলো সাবাড় করছে আর আস্তে আস্তে টেনিদার পিঠ চুলকে দিচ্ছে! আরামে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে টেনিদা, থেকে থেকে বলছে, দে ক্যাবলা, আর একটু ভালো করে চুলকে দে!

এবার আমরা তিনজনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম : টেনিদা—বাঁদর—বাঁদর।

—কী, আমি বাঁদর! বলেই টেনিদা হাঁ করে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্ বাপ্ বলে চীৎকার!

—হুঁ-হুঁ—ক্রিচ্-ক্রিচ্! কিচ্-কিচ্!

চোখের পলকে বানরগুলো কাঁঠাল গাছের মাথায়! চাল-ডাল-আলুর পুঁটুলিও সেই সঙ্গে! আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে তরিবৎ করে খেতে লাগল—সেই সঙ্গে কী বিচ্ছিরি ভেংচি! ওই ভেংচি দেখেই না লঙ্কার রাক্ষসগুলো ভয় পেয়ে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল।

পুকুরের ঘাটলায় চারজনে আমরা পাশাপাশি চুপ করে বসে রইলাম। যেন শোকসভা! খানিক পরে ক্যাবলাই স্তব্ধতা ভাঙল।

—বন-ভোজনের চারটে বাজল।

—তা বাজল!—টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : কিন্তু কী করা যায় বল্‌তো প্যালা! সেই লেডিকেনিগুলো কখন হজম হয়ে গেছে—পেট চুঁই-চুঁই করছে ক্ষিদেয়।

অগত্যা আমি বললাম, বাগানে একটা গাছে জলপাই পেকেছে টেনিদা—

—জলপাই! ইউরেকা! বনে ফল-ভোজন—সেইটেই তো আসল বন-ভোজন! চল্-চল্—শীগ্‌গির চল্!

লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল।

শিশু-শিক্ষা সোজা নয়!

—শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার পর সময় যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না!

মা ডেকে বল্লেন, হ্যাঁ রে ন্যাপ্‌লা, শুয়ে বসে ঘুমিয়ে তোর শরীরে যে বাত ধরে যাবে!

পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটলেন, তার চাইতে বলি কি সকাল-বিকেলে দু কলসী করে গঙ্গাজল এনে দে, তোরও হাঁটাহাঁটি হবে, আর আমার পূজো-আর্চ্চাটাও ভালো করেই চলবে!

এখানে চুপি চুপি একটা কথা বলে রাখি—আমার পিসিমার ভয়ানক ছুঁচিবাই! তাই কলসী-কলসী গঙ্গাজল চাই! পিসেমশাইও কম যান না! তিনি নার্শারীর ব্যবসা করেন। উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন, তার চাইতে আজ থেকেই আমার সঙ্গে বেরুতে সুরু কর্। কোথায় ফুলের গাছ পাওয়া যায়, কোন্ অঞ্চলে ভালো বীজ মেলে, কোন্ মাটি ফুলের পক্ষে আর কোন্ মাটি ফসলের পক্ষে সরেস, সব হাতে করে শিখিয়ে দেবো আমি! তা ছাড়া আমারও ত' একজন সহকারী দরকার। কাজ শিখে রাখ্‌লে এ ফার্ম্ম ত' শেষ পর্য্যন্ত তোরই!

না পিসিমা, না পিসেমশাই, কারো প্রলোভনেই আমার মন গললো না!

মনে মনে ঠিক করে ফেল্লাম,—এই ছুটিটায় দেশের ছেলেদের শিক্ষাদান করবো।

প্রথমে পরিকল্পনা করলাম, পাড়াতেই একটি নৈশ-বিদ্যালয় খুলে ফেলবো। কিন্তু তাতে অনেক ঝামেলা। মনোমত ঘর মেলে না। ছেলেদের বসবার বেঞ্চ চাই, আলোর একটা খরচ আছে! এত হ্যাঙ্গামা পোয়াবে কে? নিজে ত' আর উপার্জ্জন করিনে! বাড়ীতে টাকা চাইলে সবাই বলবে,—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো!

তবু লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে পিসেমশাইকে একদিন বলেই ফেল্লাম কথাটা!

তিনি তামাক টানতে টানতে উত্তর দিলেন, শেষ পর্য্যন্ত এই বুদ্ধি গজালো তোর মগজে? তারপর মাকে ডেকে বল্লেন, শুনুন আপনার ছেলের মতিগতির কথা!

মা এবার সত্যি রেগে উঠলেন।

—হেসে খেলে বেড়ালেই ত' আর দিন যাবে না! তার চাইতে সকাল-বিকেল ছেলে পড়া না কেন? দুটো পয়সা ঘরে এলেও ত' সংসারের সাশ্রয় হয়।

শেষ পর্য্যন্ত তাই ঠিক করে ফেল্লাম।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে-ওখানে দেখা করতে সুরু করবো। এত বড় দেশ আমাদের!

একটি ছেলেকেও কি পড়াবার ভার পাবো না? বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় একটি ছেলেকেও যদি গড়ে তুলতে পারি, সেটা হবে কাজের মতো কাজ!

রোজ সকালবেলা চা-পানের সঙ্গে চল্‌ল আমার কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখা।

কিন্তু কোনো বিজ্ঞাপনই আমার মনের মতো হয় না। আমি চাই ছোট্ট একটি ছেলে। কাদার মতো নরম যার মন। তাকে আমি গড়ে তুলবো—নিজের আদর্শের অনুসরণে। এম্‌নি বড়-বড় কথা আমি রোজই ভাবি, আর বাড়ীর লোঁকে আমার হাব-ভাব দেখে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে!

কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হই না। ছোটদের শিক্ষা দেওয়া কি সহজ কাজ? কত বড় তপস্যা আর নিষ্ঠার কথা লুকিয়ে রয়েছে এর পেছনে! সাধারণ মানুষ এর সুদূরপ্রসারী ফলের কথা ভালো করে অনুধাবনই করতে পারে না!

এমনিভাবে একটির পর একটি দিন ঝরা-পাতার মতো খসে পড়ে।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটি বিজ্ঞাপন।

গৃহ-শিক্ষক চাই

আপন জনের মতো মনে করিয়া একটি ছোট ছেলেকে শিক্ষাদান করিবেন—এমন একজন দরদী গৃহ-শিক্ষক চাই। যিনি ছোট ছেলেকে ভালোবাসেন—এরূপ ব্যক্তির আবেদন সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইবে। সাক্ষাৎ মত আলোচনা করুন।

জীমূতবাহন জোয়ারদার
৩১/৫/৭ বি, কালিদাস পতিতুণ্ডী লেন
কলিকাতা

বিজ্ঞাপনটি পড়ে বুঝতে পারলাম,—আমি যেমনটি চেয়েছিলাম—এ ঠিক সেইরকম ঘর। শাস্ত্রে বলেছে—শুভস্য শীঘ্রম্!

কাউকে কিছু না জানিয়ে খবরের কাগজ থেকে বিজ্ঞাপনের অংশটি কেটে নিয়ে দুর্গা-দুর্গা বলে রওনা হয়ে পড়লাম—সেইদিন সকালবেলাতেই।

গলিটা খুঁজে বের করতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। ইতিমধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছি। একটা জায়গায় বসে একটু নিরিবিলি বিশ্রাম করে নিতে প্রাণ চাইছে।

তাই ইতস্ততঃ না করে ঘন-ঘন কড়া নাড়তে লাগলাম! খানিক বাদে ঝাঁটা হাতে একটি ঝি এসে সদর দরজা খুলে দিলে। তারপর চীৎকার করে উঠে বল্লে, ও মা! এ যে অচেনা লোক গো! বাড়ী ভুল করনি তো বাছা!

ঝির আস্ফালন দেখে প্রথমটা হক্‌চকিয়েই গিয়েছিলাম। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বিজ্ঞাপনটা আর একবার পড়লাম। নাঃ, ভুল হবে কেন?

উত্তর দিলাম, বাড়ীর কর্ত্তাকে খবর দাও। বলো, ছেলে পড়াবার জন্যে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন!

—ও! ম্যাষ্টর!

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ঝি চলে গেল ওপরে খবর পৌঁছে দিতে। দাঁড়িয়ে আছি ত' দাঁড়িয়েই আছি! কোনো সাড়া-শব্দ নেই!

হঠাৎ দেখি, দোতলায় একটি ভাঙা জানালার ফোকর দিয়ে একটি শীর্ণ মাথা বেরিয়ে এলো।

—ওপরে চলে এসো মাষ্টার,—ভেতরে ঢুকেই বাঁ-হাতে সিঁড়ি।

ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ততক্ষণে করিৎকর্ম্মা ঝি নীচে নেমে এসেছে। ঝাঁটা দিয়ে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে গজ-গজ করতে করতে ঝি চলে গেল।

দোতলায় উঠে সামনে যে ঘরখানি, সেখান থেকেই আহ্বান ভেসে এলো।

—এসো মাষ্টার, এসো, লজ্জা করবার কিছু নেই। আমি এইখানেই আছি। জুতোটা খুলে সটান চলে এসো।

আহ্বানে আন্তরিকতার সুর শুনে মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলাম। তা হলে এঁরা সত্যি গৃহ-শিক্ষককে আপনার করে পেতে চান! এইখানেই আমি আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা দেবো। একটি ছোট ছেলেকে অতি প্রথম থেকে তিলে-তিলে গড়ে তুলবো। সেই হবে আমার সত্যিকারের গর্ব্ব।

এবার বেশ খুশী মনে ঘরে ঢুকলাম।

একজন শীর্ণদেহ ভদ্রলোক—ঘরের এককোণে একটি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। খোঁচা-খোঁচা এক মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, গোলগাল মাথাটা টাকে ভরতি।

"আরে! তুমি নিজেই যে দুগ্ধপোষ্য শিশু!"

বললাম—"নমস্কার!" কোন উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন, তারপর চোখের চশমাটা কপালের ওপর তুলে ফেল্লেন। একটু বাঁকা হাসি হেসে বল্লেন, আরে! তুমি নিজেই যে দুগ্ধপোষ্য শিশু! আমাদের ঝণ্টুকে সাম্‌লাতে পারবে?

আমি আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দিলাম, আজ্ঞে, ছোট ছেলে ত' আমার খুব ভালোই লাগে। ডাকুন না ঝণ্টুকে।

বৃদ্ধের ফোক্‌লা-দাঁতে এইবার আসল হাসি ফিরে এলো। বল্লেন, ঝণ্টু আমার একমাত্র ভাইপো। অল্প বয়সে বাপ মারা যায়। আমিই ওকে মানুষ করছি মাষ্টার! শিশুকে শিক্ষা দেয়া কি সহজ কথা?

সঙ্গে সঙ্গে গলাটাকে একটু চড়িয়ে ডাকলেন, ওরে ঝণ্টু, তোর মাষ্টারমশাই এসেছে যে!

সাত-আট বছরের একটি ছেলে লাফাতে লাফাতে এসে ঘরে ঢুকলো। তারপর কোনোরকম ইতস্ততঃ না করে সোজা ছুটে এসে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বল্লে, তুমিই আমার মাষ্টার বুঝি?

এইবার ঝণ্টুর জ্যাঠামশাই খবরের কাগজ থেকে একটু মুখ তুল্লেন। খানিকটা আদর আর খানিকটা শাসন মিশিয়ে বল্লেন, ও কি রে ঝণ্টু! মাষ্টারকে তুমি বলে বুঝি? আমরা বুড়ো-হাবড়া হয়েছি—যা খুশী বলতে পারি!

আমি একটু ব্যাপারটাকে সহজ আর সরল করবার জন্যে উত্তর দিলাম, না না, তাতে কি হয়েছে? ছোট ছেলের মুখে তুমি ত' বেশ মিষ্টিই শোনায়!

তারপর একটা ছোট-খাটো ঢোক গিলে জিজ্ঞেস্ করলাম, আচ্ছা ঝণ্টু, তুমি কি কি বই পড়ো বলো ত'?

ঝণ্টু অবলীলা-ক্রমে জবাব দিলে, বইত' নেই!

—অ্যাঁ! নেই! আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ি।

—ও! তোমার কোনো বন্ধুকে পড়তে দিয়েছ বুঝি?

ঝণ্টু এইবার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বল্লে, আগের মাষ্টারটা খালি পড়া জিজ্ঞেস্ করত, তাই বইয়ের পাতাগুলো সব ছিঁড়ে ফেলেছি। শুধু মলাটটা রেখে দিয়েছি—নিয়ে আসবো?

এই বলে আমার গায়ে ঠেস্ দিয়ে এলিয়ে পড়ল!

আমি আতঙ্কিত হয়ে উত্তর দিই, না-না, তোমায় মলাট আনতে হবে না। তার চাইতে আমি বরং তোমার সঙ্গে গল্প করি।

কিন্তু ঝণ্টু সে কথা শুনলো না—একদৌড়ে ছুটে গিয়ে একটা ফাটা শ্লেট ও বই-এর মলাটখানা আমার পায়ের কাছে দুম্ করে ফেলে দিয়ে আবার আমার গায়ে ঠেস্ দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

জ্যাঠামশাই খবরের কাগজ থেকে আর একবার মুখ তুল্লেন, তারপর চোখ দুটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, বুঝতেই ত' পারছ মাষ্টার, শিশুদের শিক্ষা দেয়া কত শক্ত কাজ! সহনশীল না হলে হবেই না। ওদের মনে কত কৌতূহল! হয়ত জানতে চায় কাগজ কেমন করে তৈরী হয়েছে। তাই ওদের মনে বইয়ের পাতা ছেঁড়ার বাসনা জাগে! ছিঁড়ুক না, কটা বই-ই বা ছিঁড়বে? তুমি ওর মনকে বিকশিত হবার সুযোগ নিশ্চয়ই দেবে।

জ্যাঠামশায়ের কথাটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে ঘন-ঘন মাথা দোলাতে থাকি। আর একটু হলে ঝণ্টু আমার পাখানা খোঁড়া করেছিল! ভাগ্যের জোর আছে বলতে হবে!

জ্যাঠামশাইও এবার বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। চেয়ারের ওপর দুটি পা তুলে দিয়ে ঘন-ঘন নাড়তে থাকেন। হঠাৎ এক সময় আমার দিকে চোখ দুটো ফিরিয়ে বলেন, তুমি প্রশ্ন করো মাষ্টার, ঝণ্টু আমার বোকা নয়। আমি অনেক কষ্ট করে ওকে সব শিখিয়েছি। সাধারণ জ্ঞানই কি ওর কিছু কম নাকি?

জ্যাঠামশায়ের উৎসাহ দেখে আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠি। ঝণ্টুকে কাছে টেনে নিয়ে শুধোই, আচ্ছা, বলত, বারোটা আম, আর তেরোটা জাম জমে কটা ফল হয়?

আমার প্রশ্ন শুনে ঝণ্টু একবার মুখ চট্‌কে নিলে। তারপর দেয়ালের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যে, এক্ষুণি ওখানে যোগফলটা ফুটে উঠবে আর সেও সেইটা একবার দেখে নিয়ে আমায় উত্তরটা জানিয়ে দেবে।

এক মিনিট, দু' মিনিট চলে যায়—শ্রীমান ঝণ্টুর মুখে আর কোন বাক্যি নেই!

ওদিক থেকে জ্যাঠামশাই পা দোলাতে দোলাতে উৎসাহ দিতে লাগলেন,—বল্ না রে ঝণ্টু, একেবারে জলের মতো সোজা!

ঝণ্টু মাথা চুল্‌কে, ঠোঁট কামড়ে অসহিষ্ণু হয়ে উত্তর দিলে, আমের রস ত' জলের মতো, তা কি আমি জানিনে? তবে হাতের কাছে আমগুলি না পেলে কি করে বলব?

আমি কেড়ে নিতে যেতেই জ্যাঠামশাই আমায় থামিয়ে দিলেন। [পৃঃ ১৬৬

জ্যাঠামশাই ঝণ্টুর জবাব শুনে কিছুমাত্র দম্‌লেন না। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, সত্যি কথাই ত'! ছোটদের সব জিনিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার। তা হলেই চট্‌পট্‌ শিখে নিতে পারে। তাহলে এক কাজ করো মাষ্টার, এবার থেকে যখন পড়াতে আসবে, ঝণ্টুর জন্যে পঁচিশটে আম, কি চার কুড়ি জাম, নিদেন পক্ষে গোটা-আষ্টেক কমলালেবু হাতে করে নিয়ে এসো। দেখবে কেমন অঙ্কটা শিখে নিতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাই হে মাষ্টার! তবে ত' শিক্ষা।

তারপর আপন মনেই মাথা নেড়ে বল্লেন, শিশুদের শিক্ষাদান বড়ো সোজা কাজ নয়। অনেক অভিজ্ঞতার দরকার।

ইতিমধ্যে ঝণ্টু আমার বুক-পকেট থেকে দামী ফাউণ্টেনপেনটা টেনে নিয়েছে।

আমি হাঁ-হাঁ করে কেড়ে নিতে যেতেই জ্যাঠামশাই উল্টে আমাকে থামিয়ে দিলেন। বল্লেন, দেখুক না ওটা খুলে। ছোটদের মনে কৌতূহল থাকা ভালো। বুঝলে হে মাষ্টার, এটা বিজ্ঞানের যুগ। খুঁটিনাটি সব-কিছু শিশুদের জানতে দিতে হবে। তবে ত' ওদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ হবে।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, ইতিমধ্যে মেঝেয় ঠুকে শ্রীমান ঝণ্টু পার্কার কলমের নিবটা বেঁকিয়ে ফেলেছে! তবু কোনো আপত্তি আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না। কেননা ছোটদের মনে আছে কৌতূহল— আর যুগটা হচ্ছে বিজ্ঞানের!

ঝণ্টু আবার ফিরে এসেছে আমার কাছে। কলমটা থেকে যে কালি ওর হাতে লেগেছিল, তা বেমালুম আমার জামায় মুছে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, তুমি আমাকে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, হাওড়ার পুল, এসব দেখিয়ে আনবে না?—আর ফিরবার পথে নিউ-মার্কেট থেকে—সেই যে চকলেট বিস্কুট! তাও দিতে হবে কিন্তু।

জ্যাঠামশাই ওর কথাটা একরকম লুফে নিয়েই বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখাবে, নিশ্চয়ই দেখাবে। বুঝলে মাষ্টার, দেশভ্রমণ আর নানা জায়গা দেখে বেড়ানোতে ছোটদের মনের প্রসার হয়। সব সময় বই না মুখস্ত করিয়ে তুমি যদি রোববার রোববার ওকে নানা জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে এসো তবে কিছুমাত্র আপত্তি করবো না। ওর মা—মানে আমার বৌমাও এসব ভারী পছন্দ করে। এ ব্যাপারে আমার অনুমতি দেওয়াই রইল। বাড়ীর ছেলের মতো আসবে, ওকে নিয়ে যেখানে খুশী ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।

ঝণ্টু বল্লে, আর জেঠু, আমার ক্ষিদে পেলে?

হাসতে হাসতে জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন, আরে বোকা ছেলে, তোর ক্ষিদে পেলে কি মাষ্টার খাবার কিনে তোকে খাওয়াবে না? শিশুদের ওপর ওর দরদ কতো! সে আমি একটু আলাপ করেই বুঝে নিয়েছি।

জ্যাঠামশাই কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিয়ে বল্লেন, এইবার কাজের কথায় এসো মাষ্টার! ছোটদের শিক্ষার ব্যাপারে দরদটাই আসল বস্তু। সে তোমার আছে ভগবানের আশীর্ব্বাদে। ভালবেসে মানুষ করে তোলো আমাদের ঝণ্টুকে। দশটা করে টাকা তুমি পাবে মাষ্টার প্রতিমাসে।

আমি মুখ তুলে কি বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, আরে আমি জানি মাষ্টার, ঝণ্টুর যেরকম তোমায় মনে ধরেছে তাতে কিছু না নিয়েও তুমি পড়াশুনার দায়িত্ব হাতে তুলে নিতে পারো! কিন্তু আমার একটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে ত'? তুমি আর অমত করো না মাষ্টার! হাত-খরচ হিসাবে প্রতিমাসে দশটা করে টাকা আমি গুনে গুনে তোমার হাতে তুলে দেবো।

ইতিমধ্যে শ্রীমান ঝণ্টু কখন বাড়ীর ভেতর চলে গিয়েছিল লক্ষ্য করিনি। হয়ত তার মা-ই তাকে ইসারা করে ডেকে নিয়েছিলেন!

এইবার শ্রীমানের প্রবেশ হলো লাফাতে লাফাতে। চীৎকার করে ডাকতে লাগলো, মামাবাবু, মামাবাবু—

আমি ভাবলাম ওর মামাবাবু বোধকরি এইমাত্র এই ঘরে ঢুকেছেন! তিনি আবার নতুন করে কোনো সদুপদেশ দেবেন কিনা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম।

চারদিকে একবার ভয়ে ভয়ে চোখ বুলিয়ে নিলাম; কিন্তু ঘরে আর কেউ নেই ত'!

ঝণ্টুকে জিজ্ঞেস করলাম, কৈ তোমার মামাবাবু?

ঝণ্টু এইবার মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনি ভোম্বলকে চেনেন?

—কে ভোম্বল?

—দর্জ্জিপাড়ার ভোম্বল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সে আর আমি একসঙ্গে পড়েছি যে!

এইবার ঝণ্টু হেসে কুটোকুটি হয়ে ভেঙে পড়ল। কুতকুতে চোখ দুটো নাচিয়ে উত্তর দিলে, সেই ভোম্বল আমার মামা যে! মা বলে দিলে, মামার সঙ্গে কতবার তুমি তাদের বাসায় গেছ! তুমিও ত' তাহলে আমার মামা হলে!

এইবার জ্যাঠামশাই হাতের কাগজখানি ফেলে দিয়ে ঘন ঘন পা দোলাতে লাগলেন। ফোকলা দাঁতে হৃদয়-বিদারক হাসি হেসে বল্লেন, তাহলে মাষ্টার, একটা সম্পর্ক যখন বেরিয়ে গেল তখন ওই সোজাসুজি পাঁচ টাকা করেই নিও। ভাগ্নেকে পড়িয়ে তুমি ত' আর মাইনে চাইতে পারো না।

অবশেষে সত্যি সত্যিই আমি চুপ করে গেলাম! গলা দিয়ে আর কোনো উত্তরই বেরুলো না!

শিশু-শিক্ষা সত্যি সোজা নয়!

● মণি ও মুক্তা

শিশুদের বা বালকদের সঙ্গে মেশবার সেই যোগ্য লোক, যিনি শিশু বলে তাদের অবজ্ঞা করেন না।

—মণ্টেসরী

জেনোয়ার কারাগারে

—প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রায় সাতশো বছর আগেকার কথা বলছি। দক্ষিণ ইউরোপে ইতালী তখন বেশ সমৃদ্ধিশালী। আর ইউরোপের মধ্যে প্রায় প্রথম সভ্য দেশই হোলো ইতালী। এই ইতালীর উত্তরে দুইটি মস্ত শহর। একটির নাম ভেনিস, অন্যটি জেনোয়া। দুইয়ের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বটে। কেউ কারো সাফল্য সহ্য করে না, কেউ কারো কৃতিত্বও বরদাস্ত করে না। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে উভয়েরই খুব নাম, এবং দুই পক্ষই সম্পদে ও ঐশ্বর্য্যে শক্তিশালী। কিন্তু একবার ওই বাণিজ্য-ব্যাপার নিয়েই উভয়ের মনোমালিন্য চরমে উঠলো, এবং যুদ্ধ বেধে গেল। ভেনিস আক্রমণ করলো জেনোয়াকে। ভয়ানক যুদ্ধ, ভীষণ কাণ্ড—চারিদিকে একেবারে রক্ত-গঙ্গা! শেষ পর্য্যন্ত ভেনিসের পরাজয় ঘটলো। জেনোয়াবাসীরা হাজার হাজার ভেনিসবাসীকে একেবারে বেঁধে ফেললো এবং তাদের কারাগারে আটকে রাখলো।

জেনোয়ার সেই কারাগারে পৃথিবীর নতুন ইতিহাস আরম্ভ।

এই কারাগারে যারা বন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল সেনাধ্যক্ষ। লোকটা বয়সে বেশ প্রবীণ এবং আমুদে। নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে সে তার সহ-বন্দীদের ভুলিয়ে রাখতো, এবং তার জন্য কারাগারের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ অতটা গায়ে লাগতো না। লোকটির নাম মার্কো পোলো। তারই কারাকক্ষে আর একটি যুবক থাকতো। ইতালীর পিসা সহরে তার বাড়ী। সে ছিল একজন মেধাবী ছাত্র এবং তার সাহিত্যে বেশ অনুরাগ ছিল।

কারাগারের মধ্যে সময় আর কোনোমতেই কাটে না! অফুরন্ত দিন, আর অন্তহীন রাত্রি। সেই অনন্ত অবসর কাটাবার জন্য মার্কো পোলো তার তরুণ বন্ধুটির কাছে তার নিজের যৌবনকালের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলে যেতে লাগলো। সেই ভ্রমণ যেমন অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়কর। শুনতে শুনতে বন্ধুটি যে কেবল তন্ময় হোলো তাই নয়,—কোনোমতে কাগজ-কলম সংগ্রহ করে মার্কো পোলোর কাহিনীগুলি পরম যত্নে সে লিখে রাখতে লাগলো।

জেনোয়ার সেই অন্ধকার কারাকক্ষে বসে সেই যে লেখাগুলি,—পরবর্ত্তী কালে সেই লেখাগুলি পৃথিবীর সকল সাহিত্যের ইতিহাসে যে অমূল্য রত্ন হয়ে থাকবে, একথা সেদিন ওই ছেলেটিও কল্পনা

করেনি, এবং মার্কো পোলো নিজেও বিশ্বাস করেনি।

সেকালের পৃথিবী সকলের কাছেই ছিল অনাবিষ্কৃত। কেউ জানতো না এ পৃথিবী কত বড়, কোথায় কোন্ দেশ আছে, কোন্ দেশের কি নাম, কোন্ জাতি কোথায় থাকে। যন্ত্র-সভ্যতা তখন মানুষের স্বপ্নেরও অতীত। এরোপ্লেন বা রেলগাড়ীর কথা ছেড়েই দাও,—ঘোড়ার গাড়ীও তখন কল্পনার বাইরে। সেই অন্ধকার যুগে সুদূর ইতালী থেকে পায়ে হেঁটে পূর্ব্ব ও মধ্য-এশিয়ায় অসমসাহসিক অভিযানের জন্য মার্কো পোলো জগদ্বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। ইউরোপের অধিবাসীরা সর্ব্বপ্রথম তাঁর কাছ থেকেই প্রাচ্য মহাদেশের বিষয় সবিস্তারে জানতে পারে। কেউ সেদিন তা বিশ্বাস করেনি। মার্কো পোলোকে কেউ বলেছিল পাগল, কেউ বলেছিল মিথ্যাবাদী, কেউ বা বলেছিল, অসম্ভব আজগুবি কল্পনা।

মৃত্যুর আগে তাঁর বন্ধুরা অনুনয়-বিনয় করে বলেছিল, এইসব মিথ্যে এবং অবিশ্বাস্য কাহিনী যে সত্য নয়, একথা তুমি স্বীকার করে যাও। বলে যাও, এসবই তোমার আজগুবি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

মৃত্যুর ছায়া তখন মুখের উপরে ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু তাঁর পাণ্ডুর মুখে মৃদু হাসির আভাস দেখা গেল। মার্কো পোলো ক্ষীণ মৃদুকণ্ঠে বললেন, যা ঘুরেছি, যা দেখেছি, তার অর্দ্ধেকও বলে যেতে পারলুম না—এই দুঃখ।

মার্কো পোলো চোখ বুজলেন। কিন্তু চিরকালের জন্য রেখে গেলেন মানুষের মনে দুঃসাধ্য অভিযানের ক্ষুধা। মার্কোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুগযুগান্তকাল ধরে কত বীর তাঁদের জীবনের মহৎ গৌরব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে গেছেন।

ইতিহাস বলছে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দে দুজন অতি দুঃসাহসী ব্যবসায়ী ইতালীর ভেনিস শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারা অনাবিষ্কৃত এবং অজানা মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির কথা শুনেছিল। দস্যু-সম্রাট্ চেঙ্গিস খাঁ নাকি ছিলেন সমগ্র এশিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা, এবং তাঁর বংশের উত্তরাধিকারী সম্রাট্ কুবলাই খাঁ তখন মধ্য-এশিয়ার অধিপতি। ব্যবসায়ী দুজন সেই দুর্গম ও দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করে, মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়ে বহুকাল পরে অবশেষে একদিন সম্রাট্ কুবলাই খাঁর দরবারে গিয়ে পৌঁছয়। তারা ছিল নতুন ধরণের মানুষ, নতুন তাদের পোষাকের চেহারা, নতুন ভাষা। তাদের দেখে সম্রাট্ কৌতুক বোধ করেন, এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। চেঙ্গিস খাঁর মতো এই সম্রাটের হিংস্রতা ছিল না, বরং তার বিপরীত। কুবলাই খাঁ ছিলেন ধর্ম্মভীরু, দর্শন, সাহিত্যে ও শিল্পকলার প্রতি ছিল তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ এবং প্রজা-সাধারণের প্রতি ছিলেন অতি দয়ালু। ভেনিসের ওই ব্যবসায়ী দুজনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি আশ্রয় দিলেন এবং তাদের কাছে পাশ্চাত্ত্য দেশের নানাবিধ কাহিনী, পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞান, দর্শন এবং খৃষ্টধর্ম্মের বর্ণনা শুনে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ব্যবসায়ী দুজনকে এই অনুরোধ জানালেন, তারা যেন দেশে ফিরে গিয়ে একশত-সংখ্যক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজককে তাঁর রাজ্যে আনেন এদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য এবং আসবার সময় জেরুসালেমের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে—যেখানে আজও অনির্ব্বাণ প্রদীপটি জ্বলছে—তার থেকে একটুখানি তৈল সংগ্রহ করে আনেন। তাঁর এই বার্ত্তা এবং অনুরোধ সঙ্গে নিয়ে সেই ব্যবসায়ী দুজন দেশে ফিরে যায়।

রোম নগরীতে তখন খৃষ্টান ধর্ম্মগুরু পোপ গ্রেগরীর প্রবল প্রতাপ। তিনি এই সংবাদ শুনে মধ্য-

এশিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য দুজন মাত্র ধর্ম্মযাজককে পাঠান। তারা যথাসময়ে দুর্গম অজানা পথে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু পথের অসহনীয় দুঃখকষ্ট ও অবর্ণনীয় বিপদ ও দুর্দ্দশায় পড়ে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ব্যবসায়ী দুজন এবারেও অদম্য। তারা সেই তৈলপাত্র সঙ্গে নিয়ে জীবনকে তুচ্ছ করে অগ্রসর হতে থাকে। এবারে কিন্তু উভয়ের একজনের সঙ্গে ছিল তার একটি যুবক পুত্র,—নাম মার্কো পোলো। মার্কো পোলোর অসীম উৎসাহ, এবং অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়। পথের কোনো বিপদ ও দুর্দ্দশা তার অধ্যবসায়কে ম্লান করতে পারলো না।

সেটা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

পূর্ব্ব-তুর্কিস্তানের ভিতর দিয়ে আরারত পর্ব্বতমালার পাশ কাটিয়ে এই ক্ষুদ্র অভিযাত্রীর দলটি অগ্রসর হয়ে চললো। তারা মরুভূমির পথে দেখতে পায়, সারবন্দী উটের দলকে নিয়ে চলেছে মধ্য-এশিয়ার ব্যবসায়ী দল। অনেক সময় মার্কো পোলোর দলটি তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতো। এমনি করে তারা দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অন্তহীন পার্ব্বত্য বালু এবং জনশূন্য তৃণশূন্য মরুপথ বেয়ে চলতে লাগলো। পারস্য ও জর্জিয়া পেরিয়ে, পামীর মালভূমি ছাড়িয়ে, ভয়ানক ঠাণ্ডায় এবং ভীষণতর উত্তাপের ভিতর দিয়ে তারা গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে চীনদেশে গিয়ে প্রবেশ করলো। তারপর ধীরে সুস্থে সম্রাট কুবলাই খাঁর রাজধানীতে এসে প্রাসাদে উপনীত হোলো। এ পর্য্যন্ত এসে পৌছতে তাদের লেগেছিল চার বছর এবং এই চার বছরের সুদীর্ঘ ভ্রমণকাল এবং অপরিসীম অভিজ্ঞতা মার্কো পোলোর জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছিল মার্কোর পথে। তারা যখন পারস্যের পথে জর্জিয়া ছাড়াচ্ছিল, তখন সে দেখতে পায়, মাটির তলা থেকে একপ্রকার তরল পদার্থ ওঠে, আর সেটা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। ওরা সবাই এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে একেবারে স্তম্ভিত। পরবর্ত্তীকালে এই কাহিনী যখন সে দেশে গিয়ে বর্ণনা করে, সবাই ভাবলো মার্কো একটা পাগল। মার্কো আর একপ্রকার পশমের কথা বলেছিল যেটা নাকি পোড়ে না। সে যাই হোক, মার্কো বলেছিল—ওই

যে পাতলা তেলের ফোয়ারাটা সে দেখেছিল, সেটা কেউ খাদ্যের সঙ্গে অবশ্য খায় না, কিন্তু ওটা জ্বালানো ভারি সুবিধা। তা ছাড়া উটদের গায়ে ঘা দেখা দিলে ওটা মাখিয়ে সারানো যায়।

মার্কোর উদ্ভট গল্প শুনে সকলে কী হাসাহাসি করেছিল সেদিন! কিন্তু বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে এই পদার্থটির নামই হোলো পেট্রোলিয়ম।

ফিরে এসে কত আশ্চর্য্য গল্প বলেছিল মার্কো। ওই যে পশমের আঁশের মতো যেটা জ্বলে না,— সেটাই হোলো আজকের 'য়্যাসবেসটস'—ওটা দেখেছিল সে গোবি মরুভূমিতে। টিফলিসে সে দেখেছিল পোকা থেকে এক প্রকারের সূক্ষ্ম সুতো তৈরী হয়, তার নাম রেশম। তুলোর চাষ চলছে কোথাও— তার থেকে তৈরী হচ্ছে মসল অর্থাৎ মসলিন। সে দেখে এসেছিল চুনী ও নীলা-পাথরের খনি, তাব্রিজের কারপেট, কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ শাল-আলোয়ান। কেবল এসব নয়। মার্কো দেখেছিল কত অদ্ভুত জাতি, কত আশ্চর্য্য মানুষ! অদ্ভুত তাদের ঘরকন্না আর আচার-আচরণ, বিচিত্র তাদের সমাজ আর সংসারযাত্রা! দক্ষিণ-পারস্যের মরুভূমিতে সে দেখলো মোটা মাটির দেওয়াল-ঘেরা ঘর। এই দেওয়াল ভাঙ্গতে পারে না ডাকাতের দল। ডাকাতরা নাকি পিশাচ-সিদ্ধ। ডাকাতির সময় তারা সে দেশটাকে দিনের বেলায় অন্ধকার করে দিতে পারে একটা শুকনো কুয়াশার সৃষ্টি করে। কিন্তু সে আবার কিরূপ? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। মরুভূমির দেশ মাঝে মাঝে বালুর ঝড়ে অন্ধকার হয়ে যায়, ডাকাতরা সেই অন্ধকারের অপেক্ষায় থাকে—এবং সেই অন্ধকারে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র এবং নিরুপায় দেশবাসীর ওপর। সেই ডাকাতের জাতি আজও আছে।

মার্কো পোলো দেখেছিল একপ্রকার অশ্বারোহীর দল, যারা ঘোড়ার পিঠে ঘুমোয় এবং ঘোড়ার মাংস ও দুধ খায়। তারা ওই দুধ শুকিয়ে গুঁড়ো করতো, এবং সেই দুধের গুঁড়ো সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। সঙ্গে নিত চামড়ার বোতলে জল। ক্ষুধা পেলে সেই জল দুধের গুঁড়োর সঙ্গে মিলিয়ে ঢক ঢক করে খেতো। এই গল্প শুনে মার্কোকে সবাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন, কিন্তু আজ সেই মিল্ক-পাউডারে পৃথিবী ভরে গেছে।

পামীরের মালভূমি পেরিয়েছিল মার্কো। সেখানে দেখেছিল সে আশ্চর্য্য দৃশ্য। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে না এবং আগুনে উত্তাপ কম। ইতালীয়রা এই আজগুবি গল্প একেবারেই বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বহুশত বছর পরে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারে, কথাটা সত্য। একটি বিশেষ উচ্চতায় পৌছলে আবহাওয়ার গুণে জলও ফুটতে চায় না এবং সামান্য একটি ডিমও সিদ্ধ হয় না। মার্কোর চোখে পড়ে অদ্ভুত শিংওয়ালা জন্তু, রঙীন পাখী, বন্য গর্দ্দভ, লোমশ ইয়ক্, বিচিত্র লতা-গুল্ম—যে সকল বস্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের কাছে স্বপ্নবৎ। কিন্তু শত শত বছর পরে মার্কোর বর্ণনা সত্য প্রমাণিত হয়।

সর্ব্বশক্তিমান কুবলাই খাঁর রাজপ্রাসাদ অতি মনোরম। সম্রাট তাঁর রাজপরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে এই অভিযাত্রী দলকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। খৃষ্টান ধর্ম্মগুরু পোপ তাঁর নামে পাঠিয়েছিলেন একখানি পত্র এবং একপাত্র তৈল। এরা সেই দুটি বস্তু পথের সর্ব্বপ্রকার বিপদ ও দুর্য্যোগ বাঁচিয়ে এনেছিল সম্রাটের জন্য। সেইদিন প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন ঘটে, এবং এই মিলনের সাক্ষী ছিল প্রাচ্যবিজয়ী বীর মার্কো পোলো।

সম্রাট্ অতি সমাদরে মার্কোকে কাছে টেনে নেন এবং মার্কোর কাছে তাদের সমগ্র ভ্রমণবৃত্তান্ত মন দিয়ে শোনেন। কী আশ্চর্য্য মার্কোর গল্প বলার ভঙ্গী, কী আনন্দ তার এই সুদীর্ঘপথের অভিজ্ঞতায়।—আত্মহারা হয়ে সম্রাট্‌কে সে সমস্ত কিছু বর্ণনা করে শোনালো। সম্রাট্ মুগ্ধ, সভা স্তব্ধ। কী স্মৃতিশক্তি, কী প্রতিভা, কী অন্তর্দৃষ্টি, কী অপূর্ব্ব তাঁর পর্য্যবেক্ষণ।

অভিভূত সম্রাট্ কুবলাই খাঁ বললেন, আমার সাম্রাজ্য ছেড়ে কোথাও তোমাকে যেতে দেবো না। তোমার প্রতিভার দ্বারা তুমি এদেশকে গড়ে তোলো।

দীর্ঘ সতেরো বৎসর কাল মার্কো পোলো চীনদেশে বাস করে।

মার্কো পোলোর কাহিনীর সঙ্গেই আরেকটি প্রসঙ্গ এখানে বলে রাখি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মোগলেরা যখন বাবরের নেতৃত্বে ভারত আক্রমণ করে, ঠিক সেই সময় মঙ্গোলীয়ার দস্যুরা চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে তিব্বত আক্রমণ করে। এই চেঙ্গিসের বংশধর ও উত্তরাধিকারী কুবলাই খাঁ কিছুকাল পরে চীনদেশ জয় করে সম্রাট্ হন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন ধার্ম্মিক ও সজ্জন। তিনি নানা মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি যেমন একদিকে খৃষ্টানদের অভ্যর্থনা করেছিলেন অন্য দিকে তেমনি সমগ্র চীনে ভারতের গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই তিব্বত আপন স্বতন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে। কুবলাই খাঁ ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি নিজে এবং সমগ্র চীন সেই থেকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

সম্রাট্ অভিযাত্রী দলকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। [পৃষ্ঠা—১৭১

সম্রাট্ কুবলাই খাঁর রাজসম্পদ্ ও বিলাস-ব্যসনের সম্বন্ধে মার্কো পোলো তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাও তারা বিশ্বাস করেনি, অথচ সেসব সমস্তই আগাগোড়া সত্য ও নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। পিকিংয়ের রাজপ্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মার্কো বলেছিল, ভোজের আসরে ছয়

হাজার নিমন্ত্রিত বসেছে। প্রত্যেকের সামনে খাঁটি সোনার পানপাত্র। সম্রাট তাঁর জন্মতিথিতে উজ্জ্বল স্বর্ণময় পরিচ্ছদে আবির্ভূত হলেন, এবং বারো হাজার পারিষদকে এক একটি স্বর্ণ-পরিচ্ছদ উপহার দিলেন। প্রত্যেক পারিষদ তৎকালীন রীতি অনুযায়ী একাশীটি বিভিন্ন রত্ন-মণি-মুক্তা-হীরা, রেশমের পোষাক ও একটি করে শ্বেতকায় অশ্ব সম্রাটের সম্মুখে নিবেদন করলেন। শ্বেতপরিচ্ছদ-পরিহিত বারো হাজার পারিষদের সঙ্গে সম্রাটের পাঁচ হাজার হস্তী শোভাযাত্রা সহকারে রাজধানীর পথে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি টাকার রত্নসম্ভার, এবং তার সঙ্গে নানাবিধ যাদুবিদ্যাসহ বিপুল ভোজের আসর। সম্রাট্ যাবেন শিকারে, সঙ্গে কুড়ি হাজার লোক, দশ হাজার শিকারী কুকুর। চারিটি হাতীর পিঠের উপর রাজার বিশ্রামের কক্ষ নির্ম্মিত, সেই কক্ষটি সোনা মখমল ও চিতাবাঘের চর্ম্মে আপাদমস্তক সুসজ্জিত।

সমস্তটা অবাক বিস্ময়কর। মার্কো বর্ণনা করেছে, চীনের আশ্চর্য্য ডাক-বিভাগের কৃতিত্ব—যেটা পাশ্চাত্য দেশে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি। দুর্ভিক্ষকালে মুদ্রাস্ফীতিকে কন্ট্রোল করা,—সেও আশ্চর্য্য। দরিদ্রের নিকটে প্রচুর অন্ন বিতরণ করা এবং সুযোগ্য লঙ্গরখানার সৃষ্টি। কিন্তু যাদুবিদ্যা, যোগাভ্যাস এবং জ্যোতির্বিদ্যা চীনদেশে তখন খুবই জনপ্রিয়।

পাশ্চাত্যের লোকেরা মার্কো-বর্ণিত যাদুবিদ্যার গল্প বরং বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু মার্কো যখন বললে, পাহাড়ের তলা থেকে পাথর কেটে বের করে সেগুলো জ্বালানো যায়, এবং কাঠের চেয়ে বেশী সেই আগুন স্থায়ী হয়; অথবা সে যখন বললে, একপ্রকার সরীসৃপ সে দেখে এসেছে—যার প্রকাণ্ড চোয়াল একটি মানুষকে সম্পূর্ণ গিলে খায়,—তখন কেউ তারা বিশ্বাস করেনি যে, কয়লা নামক কোনো পদার্থ এবং কুমীর নামক কোনো সরীসৃপ পৃথিবীতে আছে।

দীর্ঘ সতেরো বছর। মানুষের জীবনে সময়টা নেহাৎ কম নয়। আত্মীয়স্বজন বন্ধু স্বদেশবাসীর থেকে এতকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থাকাটা গায়ে লাগে বৈকি। তাছাড়া যৌবনপ্রান্তে এসে মার্কোও চাইছে এবার মুক্তি। ভেনিসের দিকে মার্কোর মন টানছে! আবার টানছে দুস্তর পথের সেই আকর্ষণ, আবার ডাকছে বিচিত্র জীবনের আস্বাদ।

সম্রাটের কানে যখন কথাটা উঠলো, তিনি বললেন, তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিকে তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না।

কিন্তু মার্কোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সতেরো বছর পরে একদা একটি সুযোগ তার সামনে এসে গেল।

সম্রাট্ কুবলাই খাঁর কাছে পারস্যের সম্রাটের একটি অনুরোধ এলো, চীনদেশের একটি রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ্ করতে চান। কিন্তু কোথায় পারস্য আর কোথায় পিকিং! তাছাড়া তুর্কিস্তানে তখন চলছে ভীষণ সংগ্রাম। সুতরাং স্থলপথে রাজকন্যাকে নিয়ে কে যাবে জীবন বিপন্ন করে সেই পারস্যে?

খবরটা শুনে মার্কো ভাবতে বসলো। এর আগে যখন সে শুনেছিল, সম্রাট্ কুবলাই খাঁ ভারতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মে তিনি ও তাঁর প্রজাগণ দীক্ষিত,—তখন মার্কো সেই বিচিত্র ধর্ম্মভূমি ও দেবভূমি ভারতে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। সম্রাটের সম্মতিক্রমে সে পিকিং থেকে রওনা হয়ে সমগ্র মধ্য-চীনের ভিতর দিয়ে এসে বর্ম্মা পেরিয়ে প্রায় আসামপ্রান্তে এসে উপনীত হয়। কিন্তু হিমালয়ের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তের গগনচুম্বী পর্ব্বতমালা তার পথ অবরোধ করে। এছাড়া ভয়ানক হিংস্র জানোয়ার ও সরীসৃপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে ভিন্নপথ দিয়ে পুনরায় পিকিংয়ে ফিরে

যেতে বাধ্য হয়।

সে যাই হোক, মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মার্কো পোলো সম্রাটের সামনে গিয়ে প্রস্তাব করে, রাজকন্যা ও তাঁর দলবলকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রপথে সে পারস্যে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত আছে। তার প্রস্তাবে তখনই সম্রাট্ সম্মত হন।

সুসজ্জিত তেরোখানা জাহাজ প্রস্তুত হোলো। সঙ্গে আগামী দুই বছরের উপযুক্ত খাদ্যসম্ভার। প্রচুর উপঢৌকন। মণি মুক্তা জড়োয়া জহরৎ অস্ত্রশস্ত্র—যেখানে যা কিছু আছে, তাই দিয়ে জাহাজগুলি ভর্ত্তি করা হোলো। সঙ্গে যাচ্ছে মার্কো পোলোরা।

সমুদ্রপথ ধরে চললো নৌশ্রেণী। এ আবার নতুন পৃথিবী। দুবছর ধরেই চললো জাহাজের দল। কত অজানা দেশ আবিষ্কৃত হচ্ছে এ যাত্রায়, কত আশ্চর্য্য কাহিনী! কোচিন চীনের হস্তী আর আবলুস কাঠ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের পরম বিস্ময়কর দৃশ্য, সিংহল দ্বীপের মৎস্য-শিকারের কাহিনী, আন্দামানের অসভ্য অদ্ভুত জাতি এবং অরণ্যলোক। তা ছাড়া, ভারত-মহাসাগরের গর্ভে কত অজানা অনামা অনাবিষ্কৃত দ্বীপপুঞ্জ! বলা বাহুল্য, দীর্ঘ দুবছর পরে পারস্যে পৌঁছে তারা যথাসময়ে রাজকন্যাকে অবশ্য সম্রাটের কাছে হাজির করেছিল। পারস্য-উপসাগর থেকে মার্কোর নিজের লোকেরা পুনরায় স্থলপথে মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

সেই মার্কো পোলো! সবশুদ্ধ প্রায় চব্বিশ বছর পরে দেশের ভূমিতে ফিরছে। তারা মোট তিনজন, পিতা, পুত্র ও খুল্লতাত। কিন্তু এ তিনজন ত' সেকালের সেই তিনজন নয়, তারা ত' মৃত, তারা বিস্মৃত,—আজ তাদের আর কেউ চেনে না! ভেনিসে তারা যখন এসে পৌঁছলো, প্রত্যেকেরই তখন অদ্ভুত চেহারা! ধূলিধূসর মলিন চেহারা, ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, আশ্চর্য্য তাদের চেহারা ও মুখের পরিবর্ত্তন!

তাদের নিজেদের ঘরবাড়ী দখল করেছে দূর-সম্পর্কের আত্মীয়রা, এবং সবাই ধরে নিল তারা নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে তাদের ধাপ্পা দিচ্ছে! তারা যে সেই লোক, তার প্রমাণ কোথায়?

প্রমাণ তারা দেবে বৈকি! মার্কো পোলো নিজের বাড়ীতে নগরের বহুলোককে এক ভোজের আসরে নিমন্ত্রণ করলো। সেই আসরে নিজেরা অতি মূলব্যান পোষাকের পারিপাট্য নিয়ে এসে দাঁড়ালো। তখন সবাই চিনলো, হ্যাঁ, এরা সেই লোকই বটে! আহারাদির পর আবার তারা সেই ময়লা পোষাক পরে এসে দাঁড়ালো, এবং আবার সেই চমক! কিন্তু ওটা একটা ভেলকি মাত্র! ময়লা পোষাক খুলে ফেলতেই পুনরায় ভিতর থেকে বেরোলো সেই মণি-মুক্তো-জহরৎ বসানো রাজবেশ!

জেনোয়ার অন্ধকারে বন্দী মার্কো পোলো তার সাহিত্যানুরাগী সঙ্গীর কাছে বলে গিয়েছিল এই সব যুগান্তকারী আত্মকাহিনী। সেদিন বিশ্বাস করেনি কেউ, কিন্তু শত শত বছর পরে মার্কো পোলোর সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত পাশ্চাত্য জগৎ স্বীকার করে নিয়েছিল!

কেমন লাগে হল্‌টা?

—সুনির্ম্মল বসু

হোঁৎকা-ধেড়ে আস্‌ছে তেড়ে,—
        সামাল্‌, সামাল্‌ ভাই রে,
মোদের আপেল হিঁচ্‌ড়ে খাবে—
        ইচ্ছা মনে তাই রে।
বাস্‌রে, ওটা বেজায় পাজি,
তেমনি আবার বদ্‌-মেজাজী,—
হেথায় ছুটে আস্‌ছে আজি,—
        বল্‌ না কোথায় যাই রে ?

মো'দের খাবার খায় কেড়ে ও;—
        আচ্ছা ঠ্যাঁটা, উজ্‌বুক,—
চ'ক্ষে ওরে দেখ্‌লে পরেই
        বক্ষ করে ধুক্‌ধুক্‌;

লক্ষ্মীছাড়া হতুম-হুতো;
ইচ্ছা করে লাগাই জুতো,
হয়না ওরে মনঃপূত,
দেখলে শুকায় মুখটুক্!

কেড়েকুড়ে খাবারগুলি
সাবাড় করার ইচ্ছে,
যতই ফিকির খাটাও ভায়া,—
কে তোমারে দিচ্ছে?
গাছের তলায় দুই জনেতে—
আপেল খাব এক মনেতে,
ঘট্‌লো এবার সেই ক্ষণেতে
কাণ্ড বিতিকিচ্ছে!

কোথা থেকে আপদ এলো—
উন্‌পাঁজুরে ক্যাংলা,
চ্যাংড়া-উদো, ধূর্ত-ভুঁদো
কুত্তা যেন হ্যাংলা!
পালিয়ে যাবার উপায়টা কি?
আপেলগুলো কোথায় রাখি?
ধরবে মোদের সব চালাকি—
ন্যাংচা-ন্যাটা-ন্যাংলা।

গায়ের জোরে পারব নাকো,—
হাতীর মত বল যে,—

সভয়ে নেকড়েটা দেখলে, প্রকাণ্ড যমের মত দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বুক চাপড়াচ্ছে একটা কালো ভল্লুক।

কঠিন নীরেট মগজ যেমন
তেম্‌নি আবার খল যে।
ঐ যে আসে মাথায় টুপী,—
দরাচ গলায় খুল্‌ছে রূপ-ই,—
আজকে রোসো, চুপি চুপি,
খাটাব কৌশল যে।

ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে,—
আর কোনো ভয় নাই তো,—
বুদ্ধুটাকে জব্দ করার
বুদ্ধি খুঁজে পাই তো!
ছোট্ট দুটি সবুজ ঘরে—
মৌমাছিদের পালন করে;
তার কাছে যেই আস্‌বে সরে'—
জব্দ করা চাই তো!

এই এসেছে সাম্‌নে এবার—
তুই রয়েছিস্ ঠিক তো।
মৌমাছিরা এবার ওরে
হুল্ ফুটিয়ে দিক তো!
আপেলগুলো আচ্ছা করে'
জোরসে ছোঁড়ো কাঠের ঘরে,—
অমনি হবে একটু পরে
অভিজ্ঞতা তিক্ত।

হুম্ বাবা, ওই মৌমাছিরা—
ভন্‌ভনিয়ে উড়্‌ল,
সত্যি এবার দৈত্যি ব্যাটার
কপাল বুঝি পুড়্‌ল!
হাজার হাজার আস্‌ছে তেড়ে,—
এবার দফা ফেল্ল সেরে,
পন্ পন্ পন্ চৌদিকে রে—
গীত বুঝি ওই জুড়্‌ল!

হোট্‌কা-হাঁদা, ভোট্‌কা-গাধার
ভাঙ্‌লো এবার ভুলটা।
ছট্‌কে পড়ে মাথার টুপী,—
ডিগবাজি খায় উল্‌টা!
পালাও পালাও বাঁচতে হলে,
ভাস্‌ছ কেন চোখের জলে,—
দেখছি মোরা গাছের তলে
কেমন লাগে হল্‌টা!

● মণি ও মুক্তা

যে আমার টাকা চুরি করে, সে এমন কিছুই চুরি করে না;
কিন্তু যে আমার সুনাম চুরি করে, সে আমার যথাসর্ব্বস্বই
চুরি করে। —শেক্‌স্‌পীয়ার

—সুকুমার দে সরকার

পূবের আকাশ সবে মাত্র একটুখানি গলা রূপোর আভা মেখে চিকচিকিয়ে উঠেছে। ধাপে ধাপে পাহাড় উঠে উঠে রাতজাগা ধূসর আকাশের মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন, তারপরে পাখা মেলে দিয়েছে পাহাড়েরা! দিগন্ত, দিগন্ত ছড়িয়ে আর ছাড়িয়ে, ছোট হতে হতে নিঃসীমে মিলিয়ে গেছে তারা।

রাত-প্রভাতীর আলো-আঁধারীতে আলোড়ন তুলে সারবন্দী উঠে চলেছে পথ-পাগল রাঙামুড়ি হাঁসের দল—দক্ষিণে আরও দক্ষিণে। পাহাড়ের বরফান মুলুকে লেগেছে শিহরণ, সূয্যি-ঠাকুর এবার চলেছেন উত্তরায়ণে। ঝুমঝুমে ঝরণার স্বচ্ছ তরলতা তাই কেঁপে কেঁপে শুভ্র কঠিনতার রূপ নিতে বসেছে। আজও ফার্ আর দেওদার গাছের দল আকাশে ঝিলিমিলি আঙুল মেলে দিয়ে সোনা-গুঁড়ো আবীর-মাখা সূয্যি-ঠাকুরকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। আর দুদিন পরে তারা মাথা থেকে পা অবধি শ্বেত তুষারের ছাই মেখে সন্ন্যাসীর মত তপস্যায় নিথর হয়ে যাবে! এই সময় তাই সবুজ বনানী পাহাড়ের মাথা থেকে মেঘলায় নেমে আসে। আর সেই সঙ্গে নামে জানোয়ারের দল।

বন-তিতিরের প্রভাতী ডাক শোনা যায় এই নীচের বনে—"ওঠো ওঠো, জাগো! কত ঘুমোচ্ছ? দেখ না সূয্যি-ঠাকুরের রথ দেখা দিল? তার সাতরঙা ঘোড়ার খুরে আকাশে উড়বে এবার রঙীন ধুলো!"

বন-তিতিরের বোকা বৌগুলো ডানা ঝাপটে নিজেদের মনে বকে যায়, "কুঁঃ কুঁঃ, কুম্ কুম্—ছেলেগুলোকে খাওয়াতে হবে।" তারপরে ঝরণার জলে চানও আছে—একটু রোদে পিঠ দিয়ে বসে পাখনাগুলো ঠুক্‌রে নেওয়া আছে। কত কাজ!

ঝিলিমিলি তিলককাটা রঙীন পালক মেলে বন-তিতিরগুলো নেমে আসে মাটিতে। লাল চোখ আর লাল টুকটুকে পা তাদের, হিমালয়ের পাহাড়ী এরা। ফাঁকে-ফাঁকে ঝোপে-ঝাড়ে পোকা আর মাকড়েরাও বাইরে বেরিয়ে এল। সূয্যি-ঠাকুরের পূজো তো হয়েছে, এবার পেট-পূজোর যোগাড় করা যাক!

পাহাড়ের মাথা থেকে বরফের ঢল্ হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে থাকে শিবের জটার মত। ওপরের সে শীত আর সহ্য হয় না ওপরের জানোয়ারদের। বরফের আগে আগে নামতে থাকে তারা। এইরকম একটা তুষার-মুলুকের খেঁকশেয়ালের পরিবার নেমে আসছে এই বনে। ঝুপড়ি সাদা লোমে ঢাকা, মা আর তুলতুলে ছটফটে তিনটে ছোট বাচ্চা। খেঁকশেয়ালদের পায়ে চলার আওয়াজ হয় না কিন্তু বাচ্চাগুলো ছটফটিয়ে ছটকে যাচ্ছিল। শেয়াল-মা পেছন ফিরে মৃদু কেমন একটা শব্দ করে উঠল আর এক সার হয়ে গেল বাচ্চার দল। লম্বা লম্বা ঘাস আর পাতা আর পাথরে পাহাড়ী বন ছেয়ে আছে। পাথরে জড়িয়ে আছে কতদিনের সবুজ শ্যামল শ্যাওলা! তার ওপর দিয়ে তাকাও—সোনার মুকুটপরা শুভ্র শ্বেত বরফান-মুলুক তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে! সাদা সেই বরফের পটে গা মিশিয়ে মিশিয়ে নেমে আসছিল খেঁকশেয়ালের দল। রাঙামুড়ি হাঁসেরা আকাশ নিয়েছে। দুদিন শেয়ালদের খাওয়া হয়নি। নীচের সোনালু গাছের বনে বন-তিতিরদের ডাক শেয়াল-মায়ের কানে যায়। নিথর নিস্তব্ধ বনানীতে তিতিরের ডাক কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। শেয়াল-মায়ের চোখ দুটো কেমন যেন চকচকে হয়ে ওঠে আশার আনন্দে!

প্রায় শোনা যায় না এই রকম একটা শব্দে বন-তিতির চমকে তাকিয়ে সাবধানী ডাক একটা ডেকে উঠল। শেয়াল-মা বনের মধ্যে নিথর দাঁড়িয়ে গেল। বন-তিতিরটা কি টের পেয়েছে? কি জানি? কিন্তু বন-তিতিরটার বোকা বৌগুলো পরম নিশ্চিন্ত! কর্ত্তাগুলো ওই রকম শুধু ভয় দেখাতেই আছে! শেয়াল-মা গোঁফ চুমরে বন-তিতিরের একটা বৌকে তাগ করতে যাবে এমন সময়—পেছনে কি একটা শব্দ? কেউ আসছে? শেয়াল-মা সজাগ কানটা আরও খাড়া করে দিল। নাঃ, শব্দটা আর নেই! কিন্তু না, বোধ হয় হাওয়ার শব্দই হবে। শেয়াল-মা নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন-তিতিরের একটা বোকা বৌয়ের ঘাড়ে।

একটা কর্কশ কাঁপান আওয়াজে বন ভরে উঠল এক মুহূর্ত্তে। বন-তিতিরগুলো উড়ে গেছে পাখা ঝটপট করে। শেয়ালদের আজ পরম ভোজ—মারা পড়েছে একটা।

এদিকে কিন্তু শেয়ালেরা যখন নামছিল বরফের মুলুকে, পাহাড়ী নেকড়ে একটা পেছু নিয়েছিল

শেয়ালদের। এ অঞ্চলে আর জানোয়ার নেই। নেকড়ে বাঘটা তাই ক'দিন উপোস করে ছিল। পথে মিটমিটে চোখ দিয়ে দূর থেকে সে দেখছিল শেয়ালেরা নামছে। শেয়ালেরা প্রায় নেকড়েদের জ্ঞাতিভাই। ক্ষিদের সময় আর বিচার করা চলে না।

এদিকে শেয়ালেরা যখন পেট পুরে বন-তিতিরটাকে হজম করে একটা আশ্রয়ের খোঁজে এগিয়ে চলেছে, নেকড়েও তাদের চলেছে পেছনে পেছনে।

সোনালু গাছের দল ছাড়িয়ে খানিকটা একটু ফাঁকা আকাশ। সূর্য্যের আভা আকাশের উজ্জ্বল নীল মেঘে সোনালু গাছের বড় বড় সোনালী ফুলে লেগে ঠিকরে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, আকাশে ধেয়ে এল কালো মোষের মত শিঙ নেড়ে দুজোড়া পেট-মোটা কালো মেঘ। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। শেয়ালেরা বনের আড়াল ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে যাবে এমন সময় নেকড়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ল শেয়াল-মার ঘাড়ে।

শেষ মুহূর্ত্তেও শেয়াল-মা কি যেন একটা হেঁকে বলল বাচ্চাদের। বাচ্চা তিনটেও ছোট ছোট পায়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের পাহাড়-গুহাটার দিকে। মা তাদের তখন নেই!

নেকড়েগুলো বড় লোভী। মা-টাকে শিকার করেই ক্ষিধে তার মিটতে পারত আপাতত; কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে তিনটে কচি কচি শিকার পার হয়ে যাবে? খেঁকশেয়ালীকে সাবাড় করে নেকড়েটা একটা বাচ্চার পেছু নিল। বাচ্চাটা তখন গুহাটার মুখোমুখী এসে পড়েছে কিন্তু লাফের পর লাফে এগিয়ে আসছে

ঝাঁপিয়ে পড়ল বন-তিতিরের একটা বোকা বৌয়ের ঘাড়ে। [পৃষ্ঠা ১৮০

সাক্ষাৎ মরণ। শিকারও বাগে এসে গেছে! নেকড়েটা দেশী ভাষায় খল্ খল্ করে হেসে উঠল। অবশ্য খিঁচোন সেই হাসিতে। বন রি-রি করে শিউরে উঠল।

মুখের হাসি কিন্তু মুখেই রয়ে গেল! সভয়ে নেকড়েটা দেখল, প্রকাণ্ড যমের মত দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বুক চাপড়াচ্ছে একটা কালো ভল্লুক। কুতকুতে চোখ দুটো তার ভাঁটার মত জ্বলছে। দাঁতগুলো বেরিয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে।

ভাল্লুক-মা তার ছানাপোনা নিয়ে পাহাড়ের সেই গুহাটায় থাকত। নেকড়েকে হিংস্রভাবে তার গুহার দিকে ছুটে আসতে দেখে ভাল্লুক-মা ভেবেছিল, নেকড়েটা বুঝি তার ছানাগুলোকেই শিকার করতে আসছে!

তখন আর ফেরার সময় নেই। নেকড়েটা লাফ দিয়েছে আর ভাল্লুক-মা তাকে বুকে লুফে নিল। তীক্ষ্ণ নখ আর সবল থাবায় মুহূর্তে ফালা-ফালা হয়ে গেল নেকড়েটার দেহ।

বৃষ্টি ধরে গেছে। নাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ঘুঙুর-খোলার মত টুং-টাং করে আওয়াজ হচ্ছে গাছের পাতায় আর থেমে-যাওয়া বৃষ্টির জলে। শকুনেরা নেমে মরা জানোয়ারগুলো শেষ করে ওপর ওপর পরিষ্কার করে দিল বন। তারপরে দেখা গেল পিঁপড়ের সার। যেটুকু রক্ত-মাংস পড়ে আছে, তাও চেঁচে-পুঁছে সাফ করে দেবে তারা। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল চলেছে সেই বেঁচে-থাকার যুদ্ধ।

পিঁপড়েরা বেশ নিয়ম-মানা প্রাণী। তারা চলেছে সার বেঁধে, শুঁড়ে শুঁড়ে সবে কথাবার্তা বলে নিচ্ছে। এমন সময় কোথা থেকে ছোট একটা মাকড়সা টুপ করে একটা পিঁপড়ের সারের ওপর লাফিয়ে পড়ে দুটো পিঁপড়েকে মুখে করে দে-ছুট! এদের বলে নেকড়ে-মাকড়সা। পিঁপড়ে আর মাছি শিকার করে খায় এরা।

পিঁপড়েদের দলে মহা হৈ-চৈ! কিন্তু শত্রু ত' হাওয়া! বাধ্য হয়ে পিঁপড়েরা আবার সার বাঁধে। আবার হঠাৎ নেকড়ে-মাকড়সার আক্রমণ। পিঁপড়েরা ছত্রখান হয়ে যাবার যোগাড়! এমন সময় কোথা থেকে উড়তে উড়তে এল এক কুমরেপোকা! শীত আসছে, কুমরেপোকা মাটির বন্ধ দেওয়াল-তোলা ঘর করে ডিম পাড়বে। বাচ্চাদের খাবার চাই।

নেকড়ে-মাকড়সাটা পড়বি ত' পড় একেবারে কুমরেপোকাটার সামনে! নেকড়ে-মাকড়সাদের সাক্ষাৎ যম হলো কুমরেপোকা। টুপ করে কুমরেপোকাটা লাফিয়ে পড়ল মাকড়সার ঘাড়ে। একটি হুল। অসাড় হয়ে গেল মাকড়সা, আর তাকে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে চলল কুমরেপোকা। সারা শীতকাল ধরে তার ডিম ফুটে বাচ্চারা খাবে।

এ-জগতে যেন ভাঙারও অন্ত নেই, গড়ারও অন্ত নেই। কোন প্রাণীই বলতে পারে না আমিই সব শেষ—আমার ওপর আর নেই কেউ! প্রাণীর সেরা মানুষও নয়। উদার অনন্ত ওই আকাশের পানে চেয়ে, রহস্যময় এই বন-জগতের প্রাণীদের ভাঙা-গড়ার ঢেউ-এর তালে মনে হয় না কি—কে চালাচ্ছে এই অনাদি কালের সৃষ্টি আর প্রলয়? কে যে হাসায়, আর কে যে কাঁদায়?

শীত চলে গেছে। বসন্তের ফুলে ফুলে সোনালু বন জোলুস মেখেছে। চলেছে হিমালয়ের গায়ে রডোড্রেনড্রন ফুলের ফাগুয়ার ফাগখেলা। মৌ-টুসকি পাখীর দল ফুলের মুখে জোর পাখার চামর দুলিয়ে মধু আহরণ করছে। রাঙামুড়ির দল ফিরে চলেছে। সাদা বরফে বরফে গা মিলিয়ে সাদা খেঁকশেয়ালীর দল ওপরে উঠছে আবার।

বন-তিতিরের আবাহনে থেকে থেকে স্তব্ধ বন মুখরিত হয়ে উঠছে। কাকে আবাহন? দেওদার আর ফার্‌ও একটু মাথা তুলে দিয়েছে আকাশে। কাকে যেন' একবারটি উঁকি মেরে দেখে নেবে!

তর্কে বহু দূর

দূর-দৃষ্টি

মহাসাধক প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু নবদ্বীপে ভক্ত-শিষ্য নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করছেন। স্নান করতে করতে হঠাৎ প্রভু গম্ভীর হয়ে জলে দাঁড়িয়ে রইলেন। নবদ্বীপকে ডেকে বল্লেন, নবদ্বীপ, তুমি ছুটে বড়াল ঘাটে যাও। সেখানে দেখবে একটি তরুণ যুবা জলে নেমেছে...তুমি তাকে ডেকে বলবে, আমার আদেশ, সে যেন আত্মহত্যা না করে! নবদ্বীপ বিস্মিত হয়ে তখুনি জল থেকে উঠে বড়াল ঘাটের দিকে ছোটেন। গিয়ে দেখেন, জনবিরল ঘাটে সত্যই একজন যুবা জলে নামছে। ঘাট থেকে নবদ্বীপ দাস চীৎকার করে উঠলেন, প্রভু জগদ্বন্ধুর আদেশ, আপনি আত্মহত্যা করবেন না। তরুণ যুবা চমকে উঠে। ধীরে জল থেকে উঠে নবদ্বীপকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি করে জানলে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম? জগতে কেউ তো জানে না। নবদ্বীপের মুখে প্রভুর কথা শুনে তখুনি যুবা ছুটে এসে জগদ্বন্ধুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে, মৃত্যু থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন, আপনিই আমার গুরু!

দানবের দ্বীপ

—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

হঠাৎ নোগুচির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। নোগুচি লিখেছে ঃ "অনেক দিন থেকেই তো আমাদের দেশে বেড়াতে আসবি লিখেছিলি, এবারে চলে আয়। এখানে দিন কয়েক কাটিয়ে যা, তার পর তোকে একটা খু-ব ভাল জায়গায় নিয়ে যাব। একেবারে নতুন ধরণের জায়গায়।"

নোগুচি আমার বাল্যবন্ধু। ওর বাবা ছিলেন কলকাতার জাপানী কনসাল-অফিসের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। সেই সূত্রে জাপানী হয়েও ওর ছেলেবেলা কেটেছিল বাংলাদেশে। চমৎকার বাংলা বলে ও। শুনেছি ও নাকি এখন বৈজ্ঞানিক হিসাবে খুব নাম করেছে। ও হচ্ছে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি "ন্যাচারালিষ্ট"। গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু—আরও কত কি নিয়ে ওর কারবার!

প্লেনে টোকিওয় এসে নামলাম। দিন দুই আনন্দেই কাটল কিন্তু তৃতীয় দিন হঠাৎ নোগুচি বলল, "দেখ্ নিমে, তোর তো ছুটী এখনও অনেক আছে, ফিরে এসেও আমাদের জাপানের অনেক কিছু দেখবার সময় পাবি। তার চেয়ে, চল্, আমরা কালই বেরিয়ে পড়ি। সেই যেখানকার কথা বলেছিলাম—মনে আছে তো? কালই জাহাজ ছাড়বে; এটা ফস্কালে আবার মাসখানেক বসে থাকতে হবে।"

তারপর নোগুচি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বল্লে। জাপান থেকে কয়েক শ' মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কতকগুলি ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ আছে। এগুলি বেশীর ভাগই আগ্নেয়গিরির দ্বীপ, কিন্তু গাছপালা, জীবজন্তুও যথেষ্ট আছে। তবে দ্বীপগুলিতে মানুষের বসতি নেই বললেই হয়। স্থায়ী ভাবে তো কেউই থাকে না, শুধু মাঝে মাঝে জাপানী জেলেরা কেউ কেউ এসে কিছুদিনের জন্য ওখানে অস্থায়ী ভাবে ঘর বাঁধে। ও অঞ্চলের সমুদ্রে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। দ্বীপগুলি নামে জাপান সরকারের অধীন, তবে লোকের বাস না থাকায় সরকার ওগুলো নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামান না—এক রকম বেওয়ারিশ হয়েই পড়ে আছে দ্বীপগুলো!

যাই হোক, সম্প্রতি নাকি এই সব দ্বীপের গাছপালা আর কীটপতঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করা দরকার হয়ে পড়েছে! তাই ঠিক হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে নোগুচি সেখানে যাবে হাতে-কলমে পরীক্ষা করবার জন্য। কিন্তু ঐ জনমানবহীন দ্বীপে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা তো সহজ কথা নয়, তাই আমার কথাই মনে হয়েছে নোগুচির। আমার দেশভ্রমণের বাতিকের কথা তার অজানা নয়।

এ পথে কোন নিয়মিত যাত্রীজাহাজ যাতায়াত করে না। শুধু কয়েকখানা মাল-টানা জাহাজ অষ্ট্রেলিয়া যাবার পথে এই দ্বীপগুলির কিছু দূর দিয়ে চলাফেরা করে। তারই একখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যাবার পথে একটু ঘুরে আমাদের তারা ৩নং দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে যাবে, আবার ফিরবার সময় তুলে নিয়ে আসবে। দ্বীপগুলির মধ্যে ৩ নম্বর দ্বীপটাই জাহাজ চলাচলের পথের সব চেয়ে কাছে পড়ে।

রওনা হবার সময়ে নোগুচি যত রাজ্যের মাল বাক্সবন্দী করে সঙ্গে নিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক মশলা, ওষুধবিষুধ, বইপত্তর, টিনে-ভরা খাবার-দাবার—এ সব তো বটেই, আরও খুঁটিনাটি

কত কি যে সঙ্গে চলল তার ঠিক নেই। নোগুচির ধারণা, অসুবিধা হলেও ওরকম বিদেশ-বিভুঁয়ে যেতে হলে একটু 'তৈরী' হয়ে যাওয়াই ভাল।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছি। পায়ের নীচে টল্‌টল্ করছে নীল জল—শান্ত, স্থির। কে বলবে এই সমুদ্রই আবার ক্ষেপে উঠে তাণ্ডব নাচ সুরু করতে পারে?

পঞ্চম দিনে দূরে তটরেখা দেখা গেল। নোগুচি বললে, "আমরা বোধ হয় গন্তব্য স্থানে এসে পড়লাম! চট্‌পট্ পোষাক বদলে ফেল্।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, এ পোষাকে দোষ কি?"

"সাবধানের মার নেই। আমরা যে দ্বীপে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগ্নেয় দ্বীপ। যদিও ওখানকার আগ্নেয়গিরিগুলি অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, তবুও কিছু বলা যায় না—কখন কোন্‌টা ভুস্ করে জেগে ওঠে! তাই এই পোষাক। জামাটায় য়্যাস্‌বেসটস্ আর অভ্র মেশান আছে। ঠিক অভ্র নয়, অভ্রের সঙ্গে আর একটা রাসায়নিক মশলা দেওয়া—যার ভেতর দিয়ে আলো বা তাপ ঢুকে কোন ক্ষতি করতে পারে না। চোখের গগ্‌ল্‌স্‌টাও অভ্র আর সেই মশলা দিয়ে তৈরী।"

কি করি, অগত্যা নোগুচির কথামতই পোষাক বদলে নিলাম—যদিও মনে হল এ সব বাড়াবাড়ি। ঘণ্টা খানেক পরেই জাহাজ আমাদের তিন নম্বর দ্বীপে নামিয়ে দিল।

সমুদ্রের এ ধারটায় পাড় খুব খাড়া। বোটে করে একটা সরু খাঁড়ির ভেতর দিয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত ঢালু পাড়ে এসে উঠলাম। সাজসরঞ্জামও সব বোটে করে নিয়ে আসা হল। সমুদ্রের ধারে কয়েকটা জেলে-ডিঙ্গি বাঁধা ছিল, একটা বড় মাছ-ধরা-জালও শুকুচ্ছিল। কাজেই বোঝা গেল, দ্বীপে আপাততঃ আমরা একা নই, জেলেরাও কেউ কেউ আছে।

নোগুচির কথামতই পোষাক বদলে নিলাম।

প্রথম দিনটা তাঁবুটাবু খাটিয়ে, জায়গা-টায়গা পরিষ্কার করে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন থেকে নোগুচি লেগে গেল তার কাজে—অর্থাৎ পিঠে ঝুলি বেঁধে যন্ত্রপাতি নিয়ে সে বেরিয়ে

পড়ল অরণ্যরাজ্যের রহস্যসন্ধানে। আমিও একটা ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—অনেকটা ক্যাপটেন কুকের মত।

কতকটা আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে তৈরী হলেও দ্বীপে গাছপালার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। কোন কোন জায়গায় বেশ ঘন জঙ্গল। হয়তো কোন্ দুর অতীত যুগে এখানে অগ্নি-উদ্গিরণ ঘটে গেছে? তারপর সমুদ্রের ঢেউ আর আকাশের মেঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী তার ওপর আঘাত করে গেছে,—পাথর ফাটিয়ে, পিষে, গুঁড়ো করে তাকে কোমল মৃত্তিকায় পরিণত করেছে! খানিকটা গিয়েই কিন্তু বুঝতে পারলাম, দ্বীপটা সাধারণ দ্বীপ নয়। পর-পর কয়েকটা ব্যাপার চোখে পড়ল যা বেশ অদ্ভুত। এক জায়গায় কতকগুলি গাছ দেখতে পেলাম, গাছগুলির গুঁড়ি থেকে সুরু করে ডালপালা সব কালো রং-এর; পাতাটাতা বেশীর ভাগই ঝরে গেছে; যে ক'টা আছে, তাও কালো কালো। এরকম গাছ কখনও দেখিনি। তা ছাড়া গাছগুলি প্রায় সবই হেলে রয়েছে, যেন কেউ এসে জোর করে ঘাড় ধরে সবগুলোকে কাং করার চেষ্টা করেছে!

আর একটু গিয়ে দেখলাম একটা পুকুর। মস্ত পুকুর, কিন্তু সারা পুকুরটা থেকে ক্রমাগত বুদ্বুদ্ উঠছে—জল ফোটালে টগ্‌বগ্ করে ফুটবার আগে যে রকমটা হয়! কিন্তু অতবড় পুকুরটা নিয়ে কেউ তো আর উনুনে চাপায়নি, তবে ও রকম হবার মানে কি? তবে কি ভিতরে তিমির মত কোন জলজন্তু লুকিয়ে আছে, তারই নিঃশ্বাসে ঐ রকম বুদ্বুদ্ উঠছে? কাছে গিয়ে দেখলাম বেশ পরিষ্কার কাকচক্ষু-জল—তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। তার ভেতরে কোন জলজীব তো নেই-ই, এমন কি একটা মাছ পর্য্যন্ত চোখে পড়ল না। তবে জলে হাত দিয়ে মনে হল, জলটা ঈষদুষ্ণ। রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে কখন ফের সমুদ্রের ধারে চলে এসেছি! এদিক্‌টা গাছপালা অনেক কম। জাপানী জেলেরা, দেখলাম, এদিক্‌টাতেই তাদের আড্ডা গেড়েছে। বেশী নয়, গুটি চার-পাঁচ কাঠের ঘর।

কাছে গিয়ে দেখলাম, ওদের মধ্যে কয়েকজন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। আর একজন, সে বোধ করি এই মাত্র কোন খবর নিয়ে এসেছে, ভয়ে প্রায় মূর্চ্ছা যাবার যোগাড়! সামনে দেখলাম কয়েকটা খালি বোতল, আর তা থেকে কেমন একটা উগ্র গন্ধ আসছে! মাতালের সামনে গিয়ে আবার না জানি কি ফ্যাসাদে পড়ব ভেবে কৌতূহল সত্ত্বেও ফিরে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হল।

নোগুচির সঙ্গে দেখা হল সেই সন্ধ্যার কাছাকাছি। তাকে সমস্ত দিনের ঘটনা বলতে সে বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। মনে হল যেন সেও কিছু কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেছে, এবং বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে!

যাই হোক, সন্ধ্যার পরই রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে দু'জনে দু'খানা ফোল্ডিং চেয়ার টেনে তাঁবুর বাইরে এসে বসলাম।

আকাশে একফালি চাঁদ, ফুর্‌ফুরে হাওয়া বইছে। অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল, সমুদ্রের ধারে বালিগুলি যেন ক্রমাগত জ্বলছে আর নিভছে! যেন একসঙ্গে লক্ষ জোনাকি নাচন সুরু করে দিয়েছে ওখানে! নোগুচি অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল, সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সে ভীষণ ভাবে চমকে উঠল।

বললাম, "শুনেছি একরকম সামুদ্রিক কীট আছে যারা এই রকম আলো দিতে পারে—নক্‌টিলুকা না কি নাম! এ দ্বীপেও বোধ হয় তাদের আড্ডা আছে?"

"হতে পারে; অসম্ভব নয়।"—নোগুচি ঘাড় নেড়ে সায় দিল কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ্ নয়। খানিকক্ষণ এটা-সেটার পর আমি জেলেদের ওখানকার ঘটনার কথাও ওকে বললাম।

নোগুচি কিন্তু অবাক হল না, একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "হ্যাঁ, জানি। আমিও খোঁজখবর নেবার জন্য একবার ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। কথাটা তোকে বলাই ভাল। ওরা বড্ড ভয় পেয়ে গেছে।"

"আমাদের দেখে?"

"দূর, আমাদের তো ওরা চেনে। এর আগেও আমি একবার এ অঞ্চলে এসেছিলাম যে! তা নয়। আজ হঠাৎ ওরা এমন একটা কিছু দেখেছে যা সত্যি হলে খুব ভয়ের কথা!"

"তার মানে?"

"মানে—আচ্ছা, তুই তো আজ সারাদিন এখানে ঘোরাফেরা করলি, কোন জীবজন্তু দেখতে পেয়েছিস কি?"

"নাঃ, একদম নয়! দু'-চারটে নতুন ধরণের পোকামাকড় ছাড়া দ্বীপটায় কোন জ্যান্ত প্রাণী আছে কিনা তাই আমার সন্দেহ হচ্ছিল। অথচ জঙ্গল তো কম নেই!"

নোগুচি একটু চুপ করে থেকে বলল, "বাস্তবিক তাই। এ-দ্বীপে তেমন কোন জীবজন্তুর কথা ওরাও শোনেনি, ওরা তো ফি বছরই আসে কিনা!—শুধু জঙ্গলে দু'-চারটে বাঁদর জাতীয় জীব ছাড়া। কিন্তু আজ সকালে ওরা যা দেখেছে, তা সত্যি হলে বাস্তবিক ভাবনার বিষয়।"

চারদিক তাকিয়ে চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে বললাম, "কি জন্তু? চল্, তাঁবুর ভেতরে গিয়ে বসি।"

নোগুচি হাসতে হাসতে বলল, "খুব বীরপুরুষ দেখছি! ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে। যাক্, যা বলছিলাম। জন্তুটা কি তা বলতে পারলে তো চুকেই যেত! আজ সকালে ঝরণায় জল আনতে গিয়ে ঐ জেলেদের একজন ওটাকে দেখতে পায়। সে যা বর্ণনা দিচ্ছে তাতে সেটাকে দানব ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। আকারে মানুষের মত, কি তার চেয়েও বড়, কিন্তু মানুষের তিন-চার গুণ চওড়া। হাত-পাগুলো নাকি মুগুরের মত ইয়া বড় বড়, আর প্রকাণ্ড লম্বা—বিশেষ করে হাত দুটো! গায়ের রং ঠিক কাঁচা মাংসের মত। মাথাও একদম নেড়া। শুধু তাই নয়, সমস্ত মুখ-ভর্তি বড় বড় গোটা আর ব্রণ—ঠিক কুষ্ঠ-রোগীর মত ভয়ানক! আর সেই বীভৎস মুখে কুৎকুতে দুটো চোখ—তার ভেতর ঘৃণা, হিংসা, ক্রূরতা সব যেন এক সঙ্গে মাখা! এদিকে একেবারে দিগম্বর—পরনে কিছু নেই! লোকটা তো তাকে দেখেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়! শেষে কোন রকমে মরি-বাঁচি করে আড্ডায় গিয়ে খবরটা দিতে পেরেছে। ও কি, তুই যে কেমন হয়ে গেলি! আচ্ছা, চল্, তাঁবুতে গিয়েই বসি।"

তাঁবুর ভিতরে গিয়েও কিন্তু অন্য কথা পাড়া গেল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোর কি মনে

হয় ওরা যাকে দেখেছে, সে কোন জংলী নরখাদক জাতের মানুষ?"

নোগুচি যেন একটু চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দিল, "আমার তা মনে হয় না। কারণ, এ দ্বীপে কোন মানুষের বসতি নেই এটা ঠিক। আর চারদিক্ সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, বাইরে থেকে যে কেউ আসবে এও মনে হয় না। এর সবচেয়ে কাছাকাছি যে ডাঙ্গা—যাকে এ অঞ্চলের দু'নম্বর দ্বীপ বলা হয়,—তাও এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের কম হবে না। এতটা সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়া অসম্ভব। আর, চেহারার যা বর্ণনা পাচ্ছি তাতে মনে হয় না যে, ও এমন কোন জীব যে নৌকোর বা ডিঙ্গির ব্যবহার জানে! যাই হোক কালকে ভাল করে খোঁজ নিতে হবে। আজ রাতে তাঁবুর চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে বলি।"

পরদিন সকালে উঠেই নোগুচির সঙ্গে চলে গেলাম জেলেদের আড্ডায়। দেখলাম, কাল যারা মদের নেশায় চুর হয়ে ছিল আজ তাদের নেশা ভেঙ্গে গেছে, তার জায়গায় দেখা দিয়েছে এক নিদারুণ বিভীষিকা! নোগুচি আলাপ করে জানল, কাল সন্ধ্যার একটু আগে আবার সেই বীভৎস মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়েছে,—এবারে তাদের ঘরের অতি কাছে। ঝোপের আড়াল থেকে চকিতের জন্য মুখ বাড়িয়ে আবার গা ঢাকা দিয়েছে! এবারে এরা একজন নয়, জেলেরা সকলেই প্রায় দেখেছে সেই ভীষণ মূর্ত্তি। অমন বিকট চেহারার মানুষ তারা এর আগে কখনও দেখেনি।

তাদের সাবধানে থাকতে উপদেশ দিয়ে নোগুচি ফিরবার জন্য তৈরী হল। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক,—জেলেদের কারো বৌ হবে,—এগিয়ে এসে জাপানী ভাষায় নোগুচিকে কি বললে! তারপর ঢোলা পোষাকের ভেতর থেকে একখানা হাত বার করে সামনে তুলে ধরল। দেখলাম, হাতখানা ভীষণ ফুলে গেছে আর টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। মঙ্গোলীয়দের রং ফ্যাকাসে হল্‌দে, রোদে পুড়ে বড় জোর ঈষৎ তামাটে হতে পারে, কিন্তু এত টক্‌টকে লাল খুবই বিসদৃশ মনে হল। যাই হোক, নোগুচি তাকেও প্রবোধ দিয়ে বিদায় নিল। বোধ হয় বলল, ওষুধ পাঠিয়ে দেবে। টুকিটাকি নানা ওষুধপত্র নোগুচির জানা আছে। জেলেরাও তা জানে।

বেরিয়ে এসেই নোগুচি বলল, "নিমাই, আর দেরী না করে আমাদের এখনই সেই ঝরণার ধারে যেতে হবে। সেই জংলী মানুষটাকে চোখে না দেখা পর্য্যন্ত আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে, আমরা কোন একটা গভীর রহস্যের মধ্যে এসে পড়েছি! যাই হোক, এই রিভল্‌ভারটা তোর কাছে রাখ্। এখন থেকে সব সময় কাছে রাখবি। তবে পারতপক্ষে ব্যবহার করিস না।"

দ্বীপের জল বেশীর ভাগই নোনা। শুধু এক জায়গায় জঙ্গলের ভেতর একটা ঝরণা আছে, তারই জলটা একটু স্বাদু। নোগুচি আমাকে নিয়ে সেইদিকে চলল। মানুষই হোক আর দানবই হোক, জল খেতে 'তাকে এখানে আসতেই হবে।

একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে দু'জনে লুকিয়ে বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক বসে আছি তো আছিই! ধৈর্য্যের সীমা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা ঝোপ নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল এক দানব-মূর্ত্তি।

ওঃ, কী বীভৎস সে চেহারা! জেলেরা যা বলেছিল, এ যেন তার চেয়েও ভয়ঙ্কর! সাধারণ মানুষের

চেয়ে প্রায় তিনগুণ মোটা—লম্বাও নেহাৎ কম নয়। গায়ের দিকে তাকালে শরীর শির্ শির্ করে ওঠে—মনে হয় কে যেন ওর সমস্ত চামড়া ছুলে নিয়েছে—মাথার চুল শুদ্ধু! দাড়ি-গোঁফেরও কোন চিহ্ন নেই। সমস্ত মুখ জুড়ে অসংখ্য গোটা। দেহের আকৃতিটাও মানুষের তুলনায় খুবই বেখাপ্পা। হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, হাঁটু ছাড়িয়ে নীচে নেমে এসেছে। ঈষৎ কুঁজো হয়ে সন্তর্পণে হাঁটতে হাঁটতে মূর্ত্তিটা এগিয়ে এল, প্রায় আধ-বোঁজা চোখ দুটো দিয়ে মিট্ মিট্ করে চারদিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল ঝরণার পাশে। কিন্তু গায়ে কি অসম্ভব জোর! একটা কাঁটাগাছে বোধ হয় খোঁচা লেগেছিল, বিরক্ত হয়ে এক টানে সেই বিরাট গাছটা যে ভাবে উপড়ে ফেলল, তাতে অবাক হয়ে গেলাম। অথচ মুখ দেখে মনে হল ও খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছে, আর শরীরেও কেমন একটা অসোয়াস্তি বোধ করছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা ওকে দেখতে লাগলাম, ও কিন্তু আমাদের উপস্থিতি টের পেল না। ধীরে ধীরে ঝরণার ধারে গিয়ে উপুড় হয়ে বসল, তারপর জিভ দিয়ে চক্ চক্ করে জল খেতে লাগল—ঠিক জানোয়ারেরা যেমন করে খায়! নোগুচি আমাকে ঠেলে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "মানুষ কখনও এ ভাবে জল খায়?"

মানুষ নয়! তবে কি? আমরা কি তা হলে এই নির্জ্জন দ্বীপে মানুষের কোন পূর্ব্বপুরুষের সন্ধান পেলাম? এ কি সেই আদ্যিকালের 'যবদ্বীপের বানর-মানুষ' না 'পিকিং ম্যান্'! নাকি তার চেয়েও পুরোনো,—মানুষ আর বানরের মাঝামাঝি কোনও জীব—ডারউইন সাহেব যাকে 'মিসিং লিঙ্ক' বলে মনে করে গেছেন?

জল খাওয়া শেষ করে সেই দানব-মূর্ত্তি আবার চারদিকে তাকাতে তাকাতে টলতে টলতে উঠে এল, তারপর তড়াক্ করে একটু উঁচু গাছে লাফিয়ে উঠে গাছের ওপর দিয়ে দিয়েই এ ডাল থেকে ও ডালে দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নোগুচি যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল! একটু পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, "চল্, উঠি।"

সেদিন সে আর সারাদিন তাঁবুর বাইরে বেরুল না, নানারকম বই আর কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে দিন কাটিয়ে দিল। আমিও আর বেরুলাম না। রাতেও নোগুচির বিশ্রাম নেই। দুপুররাতে এক ঘুম দিয়ে উঠে দেখি, তখনও সে বাতি জ্বেলে একমনে বই উল্টে যাচ্ছে! নাঃ, এই বিজ্ঞানীদের অসাধ্য কিছু নেই!

পরদিন সকালে উঠে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়েই নোগুচি বলল, "আমি একবার জেলেদের আড্ডাটা ঘুরে আসি। তুইও ইচ্ছা করলে আসতে পারিস।"

জেলেপাড়ায় গিয়ে দেখলাম, জেলেরা সকলেই মদের বোতল নিয়ে বসেছে। আজ ক'দিন ধরে নাকি জালে একদম মাছ উঠছে না! অগত্যা তারা মাছ ধরা ছেড়ে সময় কাটাবার জন্য এই সহজ পন্থাই অবলম্বন করেছে। নোগুচির সাড়া পেয়ে সেই জেলে-বৌটি বেরিয়ে এল। আজ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সারা মুখময় বড় বড় ফোস্কার মত কি উঠেছে! হাতের অবস্থাও কালকের চাইতে খারাপ। আজ সে ভাল করে কথাও বলতে পারছিল না। ইসারায় দেখাল, হাতের চামড়াও জায়গায় জায়গায় উঠে এসেছে, দেখলে ভয় লাগে!

নোগুচি পকেট থেকে একটা চিরুণী বার করে তার হাতে দিয়ে কি বলল! স্ত্রীলোকটি মাথায় একবার চিরুণী বুলোতেই মাথার অর্দ্ধেক চুল চিরুণীর সঙ্গে উঠে এল। নোগুচি যেন এটাই আশা করছিল! একটু প্রসন্ন মুখে সে এক শিশি বড়ি স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়ে আরও কি কি পরামর্শ দিয়ে চলে এল। তাঁবুতে ফিরেই আবার সে ডুবে গেল বই-এর মধ্যে!

একটানে সেই গাছটাকে উপড়ে ফেলল। [পৃষ্ঠা ১৮৯

আমি আর কি করব, নোগুচির আসবাবপত্রের সঙ্গে একটা ছোট রেডিওসেট্ ছিল, ব্যাটারি দিয়ে সেটা চালাবার ব্যবস্থা করলাম। এরিয়েল্ খাটানো থেকে সুরু করে এটা ওটা শেষ করে যখন যন্ত্র থেকে আওয়াজ বার করতে পারলাম তখন বেলা বেশ বেড়ে গেছে। বি. বি. সি. থেকে খবর বলছিল। নোগুচিকে ডাকতে গিয়ে দেখি, সে কোথায় বেরিয়ে গেছে!

অনেকক্ষণ পরে নোগুচি ফিরল। তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা করতে বলে সে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

তার কাছে বসে বললাম, "কোথায় গিয়েছিলি? এদিকে বি. বি. সি.-র খবর শুনেছিস? আমেরিকান্‌রা আবার তাদের হাইড্রোজেন-বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করেছে দু' সপ্তাহ আগে, কোন অজানা জায়গায়। এতদিন খবরটা চেপে রেখেছিল, আজ প্রকাশ করেছে।"

খবর শুনে নোগুচি তড়াক্ করে উঠে বস্‌ল। "সত্যি? কোথায় ফেলেছে?"

"তা তো বলল না। বোধহয় সেটা মিলিটারী সিক্রেট্—সামরিক গোপনীয় তথ্য।"

সন্ধ্যাবেলা নোগুচি আবার টর্চ্চ হাতে রওনা হচ্ছে দেখে ভড়কে গেলাম। বল্‌লাম, "তুই অবাক্

করলি! এই রাতে কোথায় চলেছিস?"

"ঝরণার ধারে।"

"বলিস কি? সেই বীভৎস দানবের খপ্পরে? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

একটা স্যুট্‌কেসে কি সব গোছাতে গোছাতে নোগুচি সংক্ষেপে বলল, "না। ইচ্ছে হলে তুইও আসতে পারিস।"

"আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই!"—মুখে বললাম বটে কিন্তু ওকে একা এই বিপদে ছেড়ে দিতেও সাহস হল না। শেষ পর্য্যন্ত আমিও তৈরী হলাম।

সম্মুখে সেই বালুময় বেলাভূমি। আজও সেগুলি জোনাকির মত ঝক্‌ঝক্ করছে। সেটা সাবধানে পার হয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চললাম। প্রথম দিন যে কালো কালো গাছগুলো দেখেছিলাম আজও তা চোখে পড়ল কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। রাতের অন্ধকারে গাছগুলো যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে,—ঠিক বেলাভূমির বালির মত! শুধু এ গাছগুলি নয়, জঙ্গলের আরও অনেক গাছের পাতা এ রকম ঝক্ ঝক্ করছে! সামুদ্রিক নক্‌টিলুকা কি এতদূর আসতে পারে?

হঠাৎ নোগুচি একটা গাছের পাশে এসে থেমে গেল। স্যুট্‌কেস্ থেকে ছুরি বার করে চট্‌পট্ কতকগুলো নমুনা কেটে নিয়ে বোতলে পুরল, তারপর আবার এগিয়ে চলল। পথে সেই পুকুর—যেখানে অসংখ্য বুদ্বুদ্

হাঁ করে আঙ্গুল দিয়ে মুখের ভেতরটা শুধু দেখিয়ে দিল। [পৃষ্ঠা ১৯২

দেখেছিলাম। আজও সেখান থেকে সমানে বুদ্বুদ্ বেরোচ্ছে, আর পূর্ণিমার দিন সমুদ্রের জলে আলো পড়লে যেমন সে আলো হাজার আলোর কুচি হয়ে ঝল্‌মল্ করে, পুকুরের জলও তেমনি ঝল্‌মল্ করছে।

কিন্তু আকাশে তো চাঁদ নেই! নোগুচি আবার থাম্‌ল। পুকুরের ধারে গিয়ে সে স্যুট্‌কেস্‌ থেকে কয়েকটা ছোট ছোট কাচের জার না কি বার করে পুকুরের জলে ভরে সেই বুদ্বুদের ওপর উপুড় করে ধরল, তারপর ছিপি এঁটে, স্যুট্‌কেসে পুরে নিয়ে আবার চলল ঝরণার দিকে।

আমার পা আর চলছিল না। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি সেই দানব—সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের নর-বানর এসে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল! কিন্তু সে রকম কিছু ঘটল না। নোগুচি ঝরণার ঠিক ধারে গিয়ে পথের ওপর থেকে মাটী খুঁড়তে লাগল। মাটীটা বোধহয় আল্‌গাই ছিল, একটু খুঁড়তেই কালো কাগজে মোড়া কি একটা বেরিয়ে এল। নোগুচি সেটাও সন্তর্পণে স্যুট্‌কেসে পুরে বলল, "চল্‌ এবার ফিরি।"

সোজা তাঁবুতে কিন্তু আসা হল না, জেলে-পাড়া ঘুরে এলাম। জেলেগুলো সমানে আড্ডা দিয়ে মদ খাচ্ছিল, তাদের কারোরই কথা বলার মত অবস্থা নয় দেখলাম। শুধু সেই জেলে-বৌ কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল। আজ তার আর কোন কথা বলারও শক্তি নেই। হাঁ করে আঙ্গুল দিয়ে মুখের ভেতরটা সে শুধু দেখিয়ে দিল। চমকে উঠে দেখলাম, সেখানটাও ঠিক সমুদ্রের বালির মতই জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে! ওর শরীর আরও দুর্ব্বল হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও কেমন একটা উজ্জ্বল ভাব ফুটে বেরুচ্ছে!

সে রাত্রিও নোগুচি ঘুমোলো না, যন্ত্রপাতি বার করে তার সংগৃহীত নমুনাগুলি পরীক্ষা করতে লাগল। কাজের ফাঁকে শুধু একবার আমাকে বলল, "রেডিওটা খুলে দে নিমাই! যেখান থেকে পাস্‌ খবর পেলেই ধরবি।"

রাত বারোটায় মস্কো-রেডিও থেকে খবর পেলাম। ইংরেজীতে বলছে। আমেরিকার হাইড্রোজেন বোমা ফেলা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে কোথায় বোমা ফাটানো হয়েছে অনুমান করেছে তারা। খুব সম্ভবতঃ বিষুব-রেখার উত্তরে ১৫ ল্যাটিচুড্‌ আর পুবে ১৫৫ লংগিচুডের কাছাকাছি কোথাও!

নোগুচিকে জানাতে সে শুধু বলল, "হুঁ।" অর্থাৎ সে আগেই জানে।

সকালে নোগুচিই আমার ঘুম ভাঙ্গালে। "নিমাই, তোর তো ওয়ারলেসের—বেতারের হবি আছে, একটা কাজ করতে পারবি? আমার সঙ্গে একটা ছোট্ট রেডিও-ট্রান্সমিটার—বেতার-প্রেরক যন্ত্র আছে; ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে ওটা দিয়ে বাইরে খবর পাঠাতে পারবি?—কোন জাহাজ বা এরোপ্লেন কাছাকাছি থাকলে যাতে শুনতে পায়। আমাদের যত শীগ্‌গির সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে হবে,—অন্ততঃ ঐ জেলে-বৌটাকে বাঁচাবার জন্য, আর নিজেদেরকেও।"

"ঐ দানবের হাত থেকে? নাকি ফের কোথাও আগুনে পাহাড় গজাচ্ছে?"

নোগুচি ম্লান হেসে বলল, "তুই কি এতক্ষণেও কিছু বুঝতে পারিস নি? হাইড্রোজেন বোমার খবর শুনেও না? আমাদের এই দ্বীপটার ল্যাটিচুড্‌ লংগিচুড্‌ কত জানিস্‌? উত্তর ১৬ আর পূর্ব্ব ১৬০; অর্থাৎ বোমা ফেটেছে এখান থেকে আন্দাজ শ'খানেক মাইলের মধ্যে। আর তারই ফলে এই দ্বীপের নানা জায়গা তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।"

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। সভয়ে বললাম, "ব্যাপারটা খুলে বল্‌ ভাই! আমার বিদ্যে-বুদ্ধি তো জানিস্‌?"

নোগুচি তেমনি ম্লান হেসে বলল, "ভগবান্ বুদ্ধের অসীম দয়া, তাই আমরা কল্পিত আগুনে-পাহাড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার মতলবে এমন ধারা পোষাক পরেছিলাম—যা আমাদের শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছে। নইলে হয়তো ঐ জেলে-বৌ আর ঐ ওরাংওটাং-এর মত আমাদেরও ঐ অবস্থা হ'ত!"

"ওরাংওটাং!!"

"হ্যাঁ, ওরাংওটাং। তুই আর জেলেরা যেটাকে দানব ভেবেছিলি, সেটা আসলে ওরাংওটাং। এ দ্বীপে বাঁদর জাতীয় জীব ছাড়া আর কোন জীব থাকত না তোকে আগেই বলেছি। ওরাংওটাং বাঁদর জাতীয় জীব। বোর্ণিও, ইন্দোনেশিয়া আর তার আশপাশের দ্বীপে ওদের দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও কিছু সংখ্যক থাকাটা আশ্চর্য্যজনক নয়, এবং ছিলও। অবিশ্যি এখন ক'টা আছে বা একেবারেই আছে কিনা বলা কঠিন; তবে একটির কি হাল হয়েছে তা তো নিজের চোখেই দেখেছি। তুই বোধ হয় শুনেছিস, হাইড্রোজেন বোমা ফাটলে তা থেকে সাধারণতঃ তিন রকম তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরোতে থাকে—বিজ্ঞানীরা যেগুলিকে বলেন য়্যাল্‌ফা-রে, বিটা-রে আর গামা-রে। য়্যাল্‌ফা, বিটা, গামা—এগুলো হল গ্রীক্ অক্ষর—অদৃশ্য রশ্মি বোঝাবার জন্য এই নামকরণ করা হয়েছে। যাক, এই রশ্মিগুলির বিস্তৃত বিবরণ তোকে পরে বলব, তবে এইটুকু জেনে রাখ,—এগুলো নিজেরাই শুধু তেজস্ক্রিয় নয়, যার ওপর পড়ে তাকেও তেজস্ক্রিয় করে তোলে; তেজস্ক্রিয়ার ফলে কত ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা ঘটতে পারে তা তো কাগজেই পড়েছিস! হিরোসিমায় এটম্ বোমা ফাটবার পর আমি নিজের চোখেও কিছু কিছু দেখেছি। জীবদেহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর। প্রথমে গায়ের লোম, মাথার চুল সব উঠে যায়, তারপর সেখানে দেখা দেয় বড় বড় ব্রণ, ফোস্কা আর ঘা। অবশেষে শরীর বিষাক্ত হয়ে পড়ে, শরীর থেকেও তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরোতে সুরু করে। তোদের ঐ দানবের চালচলন দেখে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল, জীবটা বীভৎস হলেও খুব যেন চেনা চেনা! মানুষ কখনও গাছের ওপর দিয়ে অত জোরে ছুটতে পারে? ওই গুণ ওরাংওটাং-এরও আছে বলে শুনেছি। তা ছাড়া ঐ লম্বা হাত, কুঁজো হয়ে টলতে টলতে চলা, বুড়ো মানুষের মত মুখের ভাব, কুৎকুতে আধ-বোঁজা চোখ—ও সবই ওরাংওটাং-এর বিশেষত্ব।

"কিন্তু ওরাংওটাং-এর ঐ রক্তপিঙ্গল, লোমশ শরীরের সঙ্গে এই ছাল-ছাড়ানো জীবের যোগাযোগ কিছুতেই করতে পারছিলাম না। কিন্তু পর পর কয়েকটা ব্যাপারে আমার মাথায় এই সন্দেহই দৃঢ় হল। প্রথমেই মনে কর্ জেলেদের বৌটার কথা। ওরও শরীরে যে তেজস্ক্রিয়া সুরু হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয়ার প্রত্যেকটা লক্ষণ পর পর ওর শরীরে ফুটে বেরুচ্ছে। প্রথমে হাত-পা ফোলা, লাল হওয়া, তারপর মুখে ফোস্কা পড়া, চুল ওঠা—একে একে সবই দেখতে পাচ্ছি। তারপর সবচেয়ে বড় প্রমাণ—ওর মুখ থেকে জ্যোতিঃ বেরোনো।

"আগেই বলেছি তেজস্ক্রিয়ার একটা প্রধান লক্ষণ কোন জিনিষের ওপর তেজস্ক্রিয় রশ্মির আঘাত লাগলে সে জিনিষটাও ক্রমে তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে আর সেটাও তখন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীরণ করতে থাকে। দিনের বেলা ভাল বোঝা না গেলেও রাত্রে এটা বেশ বোঝা যায়। মানুষের শরীরে ফস্‌ফরাসযুক্ত অংশে এই প্রক্রিয়া প্রথম সুরু হয়। আমাদের শরীরে হাড়ই হচ্ছে এই ফস্‌ফরাস্-যুক্ত অংশ। কিন্তু হাড়ের

সবটাই শরীরের ভেতরে থাকায় তা সহজে চোখে পড়বার কথা নয়। দাঁতই হচ্ছে আমাদের একমাত্র সত্যিকার হাড় যা রক্ত-মাংস-চামড়ায় ঢাকা নয়। তাই জেলে-বৌ-এর শরীরে প্রথম জ্যোতিঃ বিকীরণ দেখা যাচ্ছে দাঁত থেকে। নখ থেকেও হয়তো হচ্ছে কিন্তু জামার নীচে তা ঠিক লক্ষ্য করিনি।"

ব্যাপারটা এবার ধীরে ধীরে আমার কাছেও সহজ হয়ে এল। তা হলে এই জন্যই এখানকার সব কিছু—বালুময় বেলাভূমি, জঙ্গলের গাছপালা, এমন কি পুকুরের জল পর্য্যন্ত সন্ধ্যা হলেই অমন জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে? কী সাংঘাতিক কথা! কালো কালো গাছগুলোও তা হলে এই তেজস্ক্রিয়ারই ফল! তেজস্ক্রিয়ার উত্তাপে গাছের অন্য অংশ নষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে গাছগুলোকে কালো অঙ্গারে—অর্থাৎ কয়লায় পরিণত করছে!

নোগুচি বলতে লাগল ঃ "সন্দেহ গাঢ় হতেই আমি প্রায় দু'দিন এ নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করলাম। তারপর আরও নিঃসন্দেহ হবার জন্য ঠিক করলাম গোটা কয়েক পরীক্ষা করে নেব। আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রায় সবই আমার সঙ্গে ছিল। প্রথমে একটা কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফের প্লেট নিয়ে চলে গেলাম ঝরণার ধারে। তুই সেদিন সঙ্গে ছিলি না। ওরাংওটাংটা যেখানে রোজ জল খেতে আসে, সেইখানে মাটী খুঁড়ে অল্প নীচে প্লেট্টা মাটী চাপা দিয়ে এলাম। কালো কাগজে মোড়া থাকলে ফটোগ্রাফের প্লেটের ওপর আলোর কোন ক্রিয়া হয় না তা বোধ হয় জানিস। কিন্তু তেজস্ক্রিয় রশ্মি এই কালো কাগজ ভেদ করে ফটোগ্রাফের প্লেটকে উত্তেজিত করতে পারে। আমার উদ্দেশ্য আর কিছুই না, জন্তুটার শরীর থেকে যদি সত্যি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরোয় তবে তা ফটোগ্রাফের প্লেটকে নিশ্চয়ই উত্তেজিত করবে—ফটোগ্রাফীর ভাষায় যাকে বলে 'এক্সপোজ্ করা'। হলও তাই। জন্তুটা অজানতে প্লেটের ওপর দিয়ে এসেই জল খেয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা তোর সঙ্গে গিয়ে প্লেট নিয়ে এলাম। তাঁবুতে ফিরে সে প্লেট ডেভেলাপ্ করে দেখলাম, আমার সন্দেহ সত্যি।

"শুধু তাই নয়, আরও কতকগুলো পরীক্ষা আমি করেছি। পুকুরের জলে তেজস্ক্রিয়া সুরু হলে জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণও হতে থাকে সেই সঙ্গে। অর্থাৎ জলের ভেতরকার অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন—যা দিয়ে জলের অণু তৈরী—তা ভেঙ্গে গ্যাসের আকারে বেরিয়ে আসে। পুকুরে ক্রমাগত বুদ্বুদ ওঠার কারণ হচ্ছে এই। তবু আমি সেই গ্যাস সংগ্রহ করে এনে পরীক্ষা করে দেখলাম সত্যি সত্যি সেগুলো হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ছাড়া আর কিছু নয়। এ ছাড়া তেজস্ক্রিয়া ধরার আরও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আছে। গাছপালার ওপর পরীক্ষা চালাবার জন্য সেগুলোও আমার সঙ্গে ছিল। গাছের নমুনা তুলে এনে সেগুলোও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আমার অনুমান সত্যি।"

"কি করে?" আমি ফের প্রশ্ন করলাম।

নোগুচি হেসে বলল, "সব বোঝাতে গেলে তো অনেক কিছুই বলতে হয়। আচ্ছা, খুব সংক্ষেপে বলছি। সাধারণ বাতাসের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ—ইলেকট্রিক কারেণ্ট যায় কি? যায় না। কিন্তু তেজস্ক্রিয়া ঘটলে অর্থাৎ ঐ সব রশ্মি ঠিকরোবার সময় তাদের আশেপাশের বাতাসও বিদ্যুৎপরিবাহী হয়ে যায়, তখন সেই বাতাসের ভেতর দিয়েও বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে। কোথাও বিদ্যুৎপ্রবাহ আছে

কিনা জানবার জন্য নানারকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আছে। যে জিনিষ পরীক্ষা করতে হবে সেটা একটা ধাতুর পাতের ওপর রেখে এবং তার খানিকটা ওপরে আর একটা ধাতুর পাত রেখে, তারপর দ্বিতীয় পাতটা ঐ যন্ত্রের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে যদি দেখা যায় ওতে বিদ্যুৎপ্রবাহ সুরু হয়েছে, তা হলে বোঝা যাবে যে জিনিষটা তেজস্ক্রিয়। কারণ দুই ধাতুর পাতের মাঝখানকার বাতাসটার ভেতর দিয়ে যদি বিদ্যুৎপ্রবাহ যেতে পারে, তবেই না এ ব্যাপারটা সম্ভব হবে? কিন্তু এখন এ সব আলোচনা না করে উদ্ধারের চেষ্টা করা দরকার। নইলে আমরাও হয়তো তেজস্ক্রিয়ার হাত এড়াতে পারব না।"

"কিন্তু একটা কথা আগে বল্। জেলে-বৌ-এর শরীরে তেজস্ক্রিয়া সুরু হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর সঙ্গীরা তার হাত থেকে বেঁচে গেছে কি করে? ওদের শরীরে তো এখনও ওরকম কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি?"

"সে কথাও ভেবে দেখেছি আমি, এবং খবরের কাগজে বেরুনো একটা মজার খবর ছাড়া এর আর কোনও যুক্তি আমি এখনও খুঁজে পাইনি। এটা ঠিক যে এই জেলের দল দ্বীপে এসেছে হাইড্রোজেন বোমা ফাটবার অনেক পরে। কাজেই দ্বীপের বাসিন্দাদের,—অর্থাৎ ওরাংওটাং বা গাছপালাগুলোর মত, তেজস্ক্রিয়ার প্রথম চোটটা তাদের ওপর দিয়ে যায়নি। ওরা এখানে আসবার পর তেজস্ক্রিয়ার সংস্পর্শে এসেছে। যাক্, কাগজে কি দেখেছিলাম বলি। কাগজে দেখেছিলাম—শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত এল্‌কহল্ অর্থাৎ সুরা-জাতীয় জিনিষ থাকলে তেজস্ক্রিয়ার হাত থেকে নাকি অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়—অন্ততঃ অত তাড়াতাড়ি আক্রমণ সুরু হয় না। জেলেগুলো রাতদিন মদে কেমন চুর হয়ে থাকে, দেখেছিস তো? ঐ কারণেই মনে হচ্ছে, ওরা এখন পর্য্যন্ত রেহাই পেয়ে গেছে। জেলে-বৌ মদ খায় না, তাই সে-ই আক্রান্ত হয়েছে আগে।"

কথাটা বলে নোগুচি মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বুঝলাম, ও জাপানী, ওদের দেশে মদ খাওয়াটা হয়তো ততটা দোষের নয়, এবং নোগুচিও যে কিছুটা না খায় তা নয়। কাজেই বোধ হয় বলতে চায়—এদিক্ দিয়ে ওর ফাঁড়া কম।

কিন্তু আমি বেচারা কোন দিন মদ ছুঁইনি, আমার কি হবে? শেষে কি প্রাণের ভয়ে ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে মদ ধরতে হবে? ছোঃ!

তাড়াতাড়ি ছুটলাম রেডিও-ট্র্যান্সমিটার নিয়ে মাঠের দিকে। অদৃষ্ট ভাল বলতে হবে। দু'তিন বারের চেষ্টায় সাড়া মিলল। একখানা মাল-টানা জাহাজ আন্দাজ শ'খানেক মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছিল, তারাই সাড়া দিল। এও জানাল, সমুদ্র শান্ত থাকলে পাঁচ-ছ' ঘণ্টার মধ্যেই তারা এসে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে।

নোগুচিকে সুসংবাদটা দেবার জন্য তখনই ছুটলাম তাঁবুর দিকে।
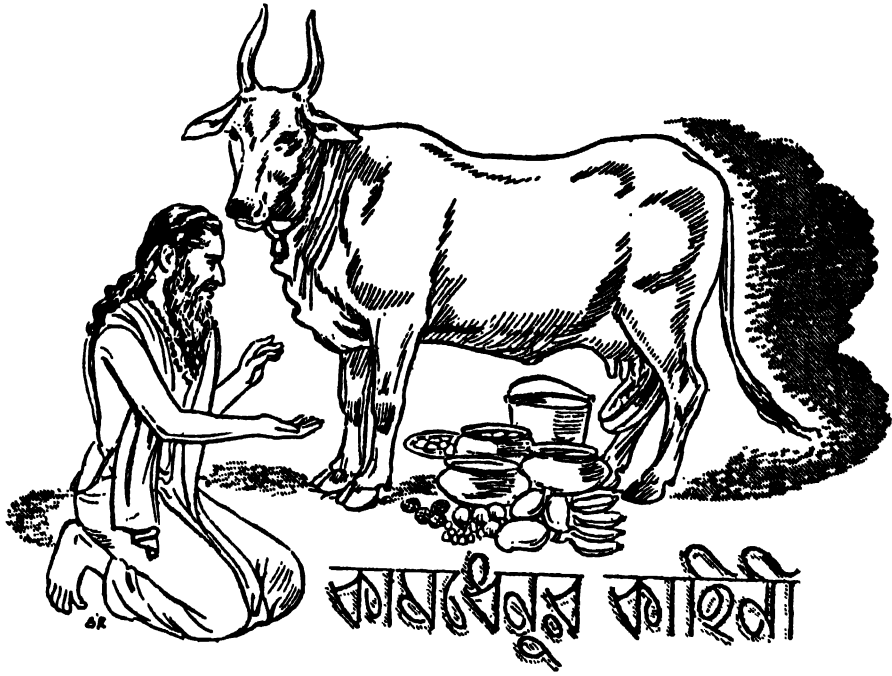
কামধেনুর কাহিনী

—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

একালে বৈজ্ঞানিকরা কত রকম উদ্ভট উদ্ভট যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র, ওষুধপত্র প্রতিদিনই আবিষ্কার করছেন কিন্তু সেকালে এমন একটি প্রাণী পৃথিবীতে ব্রহ্মা ছেড়েছিলেন, যার তুলনায় এখনকার বৈজ্ঞানিক সমস্ত আবিষ্কার একেবারে নস্যাৎ হয়ে যায়!

বিজ্ঞানের বলে এখন জলে স্থলে আকাশে বোঁ করে ঘুরে আসা যায়, পাঁচ হাজার মাইল দূরে পোঁ করে চলে যেতেও পারা যায়, পাঁচশো লোকের কাজ পাঁচ মিনিটে একটা যন্ত্রের সাহায্যে সারা যায়, পাঁচটা পিল্ খেলে পিলে রুগীর ঢিলে শরীর শক্ত হয়ে ওঠে, দশহাজার মাইল দূরের খবর এক নিমেষের মধ্যে কানে ভেসে আসে, ইত্যাদি কত সুবিধেই না বিজ্ঞানের কল্যাণে হয়েছে! কিন্তু বিজ্ঞান এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি যার সামনে দাঁড়িয়ে যা-খুশী জিনিষ চাইলেই পাওয়া যেতে পারে। যদি বল ভবিষ্যতে হয়তো সে-রকম যন্ত্রও বেরুবে, তাহলে তার উত্তরে আমি বলবো, নিশ্চিন্ত থাক, মানুষের এ-হাড়ে তেমন যন্ত্র আবিষ্কারের কোন সম্ভাবনা নেই!

যদি ভাব, বিধাতা স্বয়ং আবার সে রকম একটি প্রাণী পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিতেও তো পারেন, তাহলে জেনে রেখো, সে গুড়ে বালি! একবার এই রকম প্রাণী সৃষ্টি করে পৃথিবীতে যে-সব কাণ্ড হয়ে গেছে, সে-রকম কাণ্ড পুনরায় ঘটলে বিধাতা আর সৃষ্টিকে সামলাতে পারবেন না।

সে অনেক দিন আগের কথা। রাজা দক্ষের সুরভি বলে এক মেয়ে হল। মেয়েটি সর্ব্বসুলক্ষণা, সর্ব্বগুণের আধার। রাজা দক্ষ কশ্যপের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন—কিন্তু বিয়ের পরে সুরভি প্রসব করলেন

একটি গাই, তার নাম রোহিণী। সকলের মহাদুঃখু—তবে বড় লোকদের ছেলে-মেয়ে গরু গাধা যাই হোক্ না কেন, তার একটা গতি হয়ই, রোহিণীরও হল অর্থাৎ বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে করলেন উজ্জ্বল শূরসেন।

এই রোহিণীর গর্ভেই জন্মাল কামধেনু।

কামধেনুর যে কত গুণ ছিল, তা উজ্জ্বল শূরসেন বুঝতে পারলেন না। তিনি এক ঋষিকে সেটি দিয়ে দিলেন। সেকালে গো-দান করাটা খুব পুণ্য কাজ বলে লোকে মনে করতো। যাই হোক্ সেকালের ঋষিরা গরুকে একটু যত্ন-আত্তি করতেন, কামধেনু ঋষিদের কাছে বেশ শান্তিতে রইলেন। ঋষি জমদগ্নি ছিলেন সেকালে বেশ একজন নামকরা জাঁদরেল লোক—তাঁরই গোয়ালে কামধেনু রইলেন।

একদিন জমদগ্নির হঠাৎ কি একটা ফল খাবার ইচ্ছে হল! গোয়ালে গিয়ে তিনি দুধ দুইতে যাবার সময় সেই কথা ভাবছেন হঠাৎ দেখলেন, টপ্ করে কামধেনুর বাঁট থেকে সেই ফলটি খসে পড়লো। বারে! আমি যা ভাবছি কামধেনু তাই দিয়ে দিলে? আচ্ছা বাপু, এক ভাঁড় রাবড়ি খাবার আমার ইচ্ছে, দাও দেখি! সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি-ভর্ত্তি ইয়া সর-সমেত রাবড়ি সামনে হাজির। জমদগ্নি মুনি ভারী খুশী—তিনি কামধেনুর যত্ন-আত্তি পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু কামধেনুর গুণের কথাটা চেপে গেলেন সবার কাছে। অবশ্য ভালই করেছিলেন; কারণ, তার পেটে অত গুণ রয়েছে জানলে হয়তো ঋষিরাই তাকে চুরি করে নিয়ে পালাতেন! লোভ বড় পাজী জিনিষ!

মহাদেব বললেন, "তথাস্তু!" [পৃষ্ঠা ১৯৮

কিন্তু এমন জিনিষ কাছে থাকলে যেমন সুবিধে তেমনি অসুবিধেও যথেষ্ট, কারণ এ-রকম সম্পদ লুকিয়ে রাখা চলে না। এর কাহিনী কিছুদিন পরেই লোকে জানতে পারে, তখন হয় মহাফ্যাসাদ! সত্যি সে ফ্যাসাদ হলও।

জমদগ্নির কামধেনুর কথা লোকের মুখে মুখে আরও পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো; কিন্তু সেটা সঠিক খবর কিনা সে কথা কেউ হলফ করে বলতে পারলে না। পরে অবশ্য ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল মাহিষ্মতীপুরীর রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কাছে। ব্যস্, আর যায় কোথা! জমদগ্নির আশ্রমেই রাজার সঙ্গে

বেধে গেল মুনির কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ—কামধেনুর গুণ শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে খুন করালে। কি করে? বলছি।

এই দাঁতভাঙা নাম-ওয়ালা রাজার আসল নাম ছিল অর্জ্জুন—তাঁর বাবার নাম ছিল কৃতবীর্য্য, সেই হিসাবে তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে পরিচিত হন। এই কার্ত্তবীর্য্য নিজে ছিলেন মহা বীর, উপরন্তু মহাদেবের পূজো করে কতকগুলো সাংঘাতিক বর পেয়ে গিয়েছিলেন। সে বরগুলির ব্যাপার শুনলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়!

মহাদেব তাঁর তপস্যায় খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাও বৎস?

কার্ত্তবীর্য্য হেসে বললেন, এমন কিছু নয় ঠাকুর, এই এক হাজার হাত আমার শরীরে লাগিয়ে দিন যাতে করে অন্ততঃ শ পাঁচেক লোককে এক সঙ্গে গলা টিপে সাবড়ে দিতে পারি।...

আর এমন একটা রথ দিন যাতে করে মনে করলেই আমি যেখানে খুশী যেতে পারি! আর এমন একটা কায়দা আমায় জানিয়ে দিন, যাতে করে আমি শত্রুর সামনে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি, আর যে-কোন দুষ্টু লোককে ঠেঙাতে পারি!

মহাদেব বললেন, তথাস্তু! তোমার হাজার হাত হোক্, তোমার রথের গতি মনোরথের মত দ্রুত হোক্, শত্রুকে ঠেঙাবার শক্তি যথেষ্ট থাকুক, আর অদৃশ্য হবার কৌশলটাও শিখিয়ে দিচ্ছি, কাছে উঠে এসে শুনে যাও।

কার্ত্তবীর্য্য তড়াক্ করে লাফিয়ে মহাদেবের কাছে গেলেন, তিনি তখনই তাঁর কানে কানে বলে দিলেন একটা মন্তর। কার্ত্তবীর্য্য সেটা শুনে আনন্দে আটখানা হয়ে বাড়ী চলে গেলেন। বাড়ী গিয়েই ভাবলেন, রাণীর কাছে একটু অদৃশ্য হয়ে মজা করি! কিন্তু কী সর্ব্বনাশ, দেখলেন রাণীর সামনে তিনি যা করেন, সবই রাণী দেখতে পান।

কী হল? তবে কি মহাদেব মিথ্যে মন্তর শিখিয়ে দিলেন? তারপর ভাবলেন, না, রাণীর সামনে তো মন্তর খাটবে না—কারণ রাণী তো আমার শত্রু নন, অতএব একটা যুদ্ধ না করলে অদৃশ্য হওয়া চলবে না। যাক্, সময় এলে ও-খেল্‌টা দেখানো যাবে।

এখন এই হাজার-হাত-ওয়ালা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করছে কে? তিনি চতুর্দ্দিকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে টহল দিয়ে ফিরতে লাগলেন। যাঁর কাছেই যান তিনিই বলেন, আজ্ঞে মহারাজ, আমরা আপনার ভক্ত। যুদ্ধ করবো কি, আপনি যা বলবেন তাই করবো, শুধু যুদ্ধ করতে আমরা রাজী নই।

—তাহলে তোমরা আমার অধীন সামন্ত রাজা?

—আজ্ঞে সে কথা বলতে! আমরা আপনার অধীন দীনাতিদীন প্রজা হুজুর!

—আচ্ছা মনে থাকে যেন! বলে কার্ত্তবীর্য্য আবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে অন্যদেশে বুক ফুলিয়ে, গোঁপে চাড়া দিয়ে বীরদর্পে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু যেখানেই যান সেখানেই সবাই হাতযোড় করে। যুদ্ধ আর হয় না, ত্রিসংসারে তিনি ঘোরেন।

এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি জমদগ্নি মুনির কুটীরে এসে হাজির। মুনি তো মহা খুশী! রাজা এসেছেন তাঁর কুটীরে, এতে আর আহ্লাদ হবে না? তিনি পরম সমাদর করে রাজাকে বসালেন, খাতির-যত্ন করলেন।

কার্ত্তবীর্য্য বললেন, মুনিবর, এক ভাঁড় করে ঘোল খাওয়ান দেখি, ঘুরে ঘুরে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে

আমাদের। ঐটে খেয়েই আমরা আবার বেরিয়ে পড়বো।

জমদগ্নি বললেন, সে কি মহারাজ! শুধু ঘোল খাবেন কি! দুপুরের খাওয়া-দাওয়া এখানেই সেরে যান।

কার্ত্তবীর্য্য তো মুনির কথা শুনে অবাক্! বললেন, দুপুরে খাব কি? আমি কি একা? সঙ্গে আমার হাজার পাঁচেক সৈন্য রয়েছে, এত খাবার আপনি দেবেন কি করে?

জমদগ্নি হেসে অতি বিনয় সহকারে বললেন, আজ্ঞে তাতে আমি ভয় পাই না, আপনাদের শুভেচ্ছায় আমি এমন জিনিষের অধিকারী যে একলক্ষ সৈন্য থাকলেও খাওয়াতে আমি পিছিয়ে আসবো না।

কি খাওয়াবেন?—রাজা জিজ্ঞেস করেন।

জমদগ্নি বলেন, যে-যা খেতে চাইবে। আমিষ, নিরামিষ, পায়েস, পিঠে, সন্দেশ, পোলাও, কালিয়া—যা খাবেন!

রাজার আরও কৌতূহল হল, তিনি বায়ান্ন রকমের তরকারী আর সাতান্ন রকমের মিষ্টির ফিরিস্তি দিলেন। জমদগ্নি বললেন, বেশ চান করে আসুন, খাবার তৈরী!

কার্ত্তবীর্য্য আরও অবাক্ হলেন।

মুনি চলে যেতে কার্ত্তবীর্য্য গোপনে তাঁর পিছু পিছু গিয়ে দেখলেন, জমদগ্নি ঢুকলেন এক গোয়ালে। সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সাদা ধবধবে গাই। জমদগ্নি ঢুকেই তার কাছে হেসে বললেন, মা, অতিথি এসেছেন। তাঁদের একটু পরিচর্য্যা কর—তাঁরা এই সব খেতে চান, বলে রাজার দেওয়া ফিরিস্তি আওড়ালেন।

মুনি তো মহা খুশী।... [পৃষ্ঠা ১৯৮

এর পর আশ্চর্য্য কাণ্ড! জমদগ্নি একবার করে সেই গাইয়ের বাঁটে হাত দেন আর অমনি মণ মণ ফরমায়েসী খাবার বেরুতে থাকে।

এই সব দেখে কার্ত্তবীর্য্যের মাথা ঘুরে গেল। এ কী কাণ্ড রে বাবা! তিনি খাবেন কি, ভাবনার সমুদ্রে ডুবে খাবি খেতে লাগলেন। পরিশেষে যাবার সময় তিনি জমদগ্নিকে ডেকে বললেন, মুনিবর,

আমি আপনার অতিথি; সেবায় ভারী সন্তুষ্ট হয়েছি কিন্তু পুরো মাত্রায় সন্তুষ্ট হতে পাচ্ছি না।

জমদগ্নি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন মহারাজ?

কার্ত্তবীর্য্য বললেন. তার কারণ, আপনি সব জিনিষ তো আমায় দিলেন না!

—সে কি! আপনার বায়ান্ন রকমের তরকারী, সাতান্ন রকমের মিষ্টি সবই তো হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে কিন্তু একটি জিনিষ আমাকে এখনও দিতে বাকী আছে। সেটি হচ্ছে ঐ ধেনুটি—যার বাঁটে হাত দিতেই এত মাল বেরিয়ে এল। ওটি আমার চাই!

জমদগ্নি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, মহারাজ ক্ষমা করবেন, ও কামধেনু, ওরই ভরসায় আমি বেঁচে আছি—ওকে দিতে পারবো না।

—পারবেন না? আচ্ছা পারেন কিনা দেখছি, বলেই রাজা ক্ষেপে উঠে মুনির সঙ্গে হঠাৎ যুদ্ধ লাগিয়ে দিলেন! জমদগ্নি অতর্কিত আক্রমণে প্রথমটা ভেবড়ে গেলেও শেষে যুদ্ধে নেমে পড়লেন, কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য অদৃশ্য হয়ে গিয়ে দু'হাতে মুনির গলা টিপে মাটিতে কাত্ করে ফেলে দিয়েই অন্য হাতে দিলেন তলোয়ারের কোপ বসিয়ে জমদগ্নির গলায়। ব্যস্, মুনিবরের বাক্যস্ফূর্ত্তি করতে হল না, কন্ধকাটা হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গড়াতে লাগলেন।

কার্ত্তবীর্য্য দু'হাতে মুনির গলা টিপে........

মুনিকে মেরে রাজা গোয়ালে ঢুকলেন। কিন্তু কামধেনুকে পেলেন না, সে গোয়াল ছেড়ে কোন্ এক সময় পালিয়ে গেছে বোঝা গেল না! নিতান্ত দুঃখিত হয়ে রাজা চলে গেলেন নিজের রাজধানীতে।

জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম এই ঘটনার সময় ছিলেন বাইরে, তিনি বাড়ী এসে সমস্ত ব্যাপার শুনে ভীষণ রেগে গেলেন।

'বটে, এত বড় আস্পর্দ্ধা?' বলে তখনই প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, 'পৃথিবীতে আর ক্ষত্রিয় রাজা রাখবো না, এর প্রতিশোধ নেবই।'

শিবের তপস্যা করে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হয়ে, তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে তো মেরে ফেললেনই, তা ছাড়া একুশবার পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাজাদের দফারফা করে দিয়েছিলেন। এক কামধেনুর ঠেলায় লোকে

দিনরাত রামধনু দেখতে লাগলো। কত লোক যে মারা গেল তার ঠিক নেই।

এই রকম আর একটি কামধেনু ছিল বশিষ্ঠ মুনির। সেবারেও ঐ বিশ্বামিত্র রাজা তাঁর একশো ছেলে আর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে বশিষ্ঠের ঘরে ভুরিভোজন করে তাজ্জব বনে গেলেন।

তিনিও যেই খোঁজ পেলেন যে বশিষ্ঠ একটি কামধেনু রেখেছেন, অমনি সেইটি চেয়ে বসলেন।

বশিষ্ঠ যেমনি বলেছেন, 'না', অমনি রাজা আর রাজপুত্তুরেরা গেলেন ক্ষেপে—তখুনি যুদ্ধু। বশিষ্ঠ প্রথমে ব্রহ্মতেজে বিশ্বমিত্রের একশো পুত্রকে ভস্ম করলেন, কিন্তু ঐসঙ্গে বিশ্বামিত্র আর একাদশ অক্ষৌহিণীকে ধ্বংস করতে পারলেন না। অত তেজ বশিষ্ঠ মুনিরও ছিল না—তিনি প্রায় ভূতলশায়ী হন আর কি! ঠিক সেই সময় মুনির বিপদ দেখে কামধেনু নিজেই লাখ-লাখ সৈন্য প্রসব করে ফেললে।

আর যায় কোথা? একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য কর্পূরের মত উপে গেল—বিশ্বামিত্র কোনমতে পৈতৃক প্রাণ নিয়ে সেই যে দৌড় মারলেন আর সংসাবের দিকে ফিরলেন না। একেবারে গেরুয়া নিয়ে বনে। তারপর তিনি বশিষ্ঠেরও কি সর্ব্বনাশ করেছিলেন, সে আবার অনেক বড় গল্প।

আসলে কামধেনু সেকালে অনেকের সর্ব্বনাশের কারণ হয়ে উঠেছিল। একালে যদি জন্মাতো, তাহলে তাকে হাতাবার জন্যে এতক্ষণে পৃথিবীর বড় বড় চাঁইয়েরা যে-কাণ্ড বাধাতেন, তাতে পৃথিবীটাই রসাতলে চলে যেত! নয় কি?

তর্কে বহু দূর

নদীর তীর-পরিবর্ত্তন

মায়ের মিনতিতে তরুণ সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য তখন বাড়ীতেই আছেন। বৃদ্ধা মাতা প্রতিদিন আলোয়াই নদীতে স্নান করতে যান। নদীটি তাঁদের বাড়ী থেকে একটু দূরে। একদিন শঙ্করাচার্য্য দেখেন, দুপুর হয়ে গেল, অথচ মা স্নান সেরে ফিরলেন না। খুঁজতে বেরিয়ে দেখেন, পথের শ্রমে মা পথে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন! মাতৃ-দুঃখে মহাযোগীর অন্তর টলে উঠলো। গভীর ধ্যানে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, যদি তুমি সর্ব্বশক্তিমান, তবে আলোয়াই নদীকে আমাদের গ্রামের কাছে এনে দাও! কয়েক সপ্তাহ পরে গ্রামবাসীরা অবাক হয়ে দেখলো, আলোয়াই নদী পাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তাদের গ্রামের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আলোয়াই নদীর স্রোত বেঁকে শঙ্করাচার্য্যের কুটীরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগলো। পুত্রের সেই অলৌকিক যোগের শক্তি দেখে মাতা বিস্মিত হয়ে গেলেন। জগতের কল্যাণে তিনি তখন ঘরের বাঁধন থেকে পুত্রকে মুক্তি দিলেন।

ব্লাড ব্যাংকার

[ইন্দোচীনের গল্প]

—ধীরেন্দ্রলাল ধর

ইন্দোচীনের অধিবাসীরা দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য জীবন পণ করেছে। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্রমশঃ তারা অগ্রসর হচ্ছে, দেশকে বিদেশী শাসকদের হাত থেকে একটু একটু করে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফরাসীরা বহু চেষ্টা করছে, নির্বিচারে বোমা ফেলছে কিন্তু তবু স্বাধীনতাকামী দেশবাসীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। উদ্দাম গতিতে ইন্দোচীনের জাতীয় বাহিনী ভিয়েটমিন সৈন্যেরা রাজধানী হ্যানয়ের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

লোহিত নদীর তীরে হ্যানয় নগরে যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখা দিয়েছে। মৃত্যু-ভয়ে শঙ্কিত শান্তি-প্রিয় বাসিন্দারা নগর ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। চারিশত জন ভারতীয় ব্যবসায়ী আছে এই নগরে, হাই-কমিশনার আপিসে তাদের নাম লেখানো হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যেতে চায় তাদের যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিনয় রায় এখানে সাংবাদিকের কাজ করে। এখান থেকে 'ভারতীয় প্রেসে' সে প্রতিটি সন্ধ্যায় খবর পাঠায়। সারাটা দিন ধরে সে খবর সংগ্রহ করে, আর সাজিয়ে গুজিয়ে সন্ধ্যার পর সেই খবর পাঠায় ভারতীয় প্রেসে।

নিরপেক্ষ দেশের নাগরিক ও সাংবাদিক হিসাবে বিনয় এখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা পায়, সর্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি, তাছাড়া বহু গণ্যমান্য লোকের কাছে বার বার যাতায়াতের ফলে তার সঙ্গে তাদের রীতিমত পরিচয়ও হয়ে গেছে—জমে উঠেছে হৃদ্যতা। বিদেশীর মুখে মুখে তার নামটা ছোট হয়ে গেছে—বিনরয়।

রাত ন'টা—সাড়ে ন'টার সময় বিনয়কে প্রতিদিন দেখা যায় লোহিত নদীর তীরে। ঘণ্টাখানেক নদীর তীরে একা চুপ করে সে বসে থাকে, শান্ত-স্তব্ধতার মধ্যে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নেয়। হ্যানয়ে কিছুদিন যাবৎ ব্ল্যাক্-আউট্ চলছে, কিন্তু সেজন্য বিনয়ের কিছু বাধে না, জানাচেনা পথে নিঃশঙ্ক মনে সে চলাফেরা করে, তাছাড়া শুক্লপক্ষের রাত্রে চাঁদের আলোয় কোন কষ্টই হয় না। নদীর তীর থেকে রাত দশটার আগে বিনয় কোন দিন হোটেলে ফেরে না। কেউ কিছু বললেই বিনয়

হেসে বলে, ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে স্তব্ধ রাজধানীর একটা মাধুর্য আছে, আমি সেইটুকু উপভোগ করি।

এই মাধুর্যই একদিন বিনয়ের কাছে মর্মান্তিক হয়ে উঠলো, সেই কথাই বলি :

সেদিন নদীর ধার দিয়ে বরাবর এসে হোটেলে যাবার সোজা পথটার দিকে সে যেই ফিরেছে, দেখে অন্ধকারের মধ্যে কয়েকজন লোকে মারামারি করছে! ব্যাপারটা কি বোঝবার জন্যে বিনয় থমকে দাঁড়ালো।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল, চারজন লোক একটি লোককে কায়দা করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। যে লোকটিকে তারা আক্রমণ করেছে, তার দেহে যথেষ্ট শক্তি আছে, সে চারজনের মাঝে পড়েও বিচলিত হয়নি, দু'হাতে ক্ষিপ্রবেগে ঘুসি চালাচ্ছে, কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই চারটি লোককে ঘুসি মেরে সে হটিয়ে দিল। কিন্তু আক্রমণকারীরা পরক্ষণেই আবার তাকে একযোগে আক্রমণ করলো।
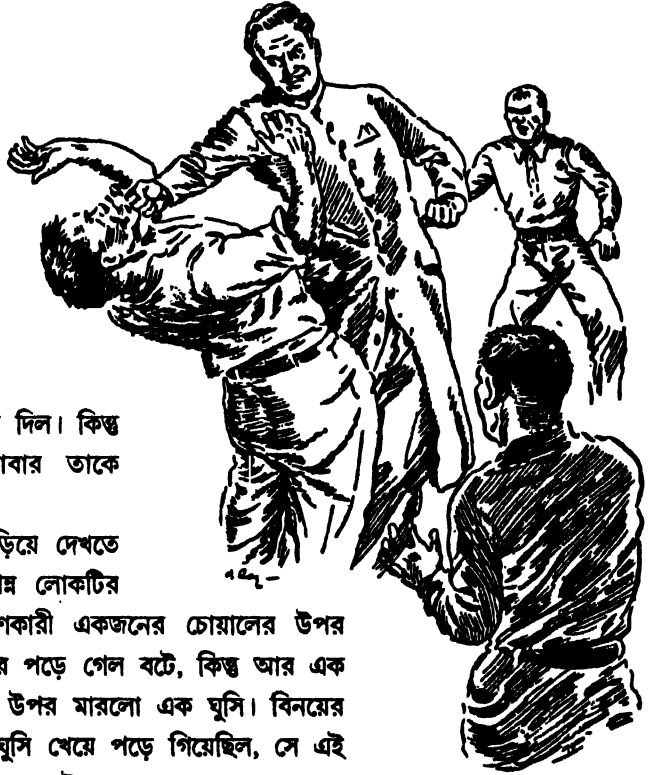
বিনয় আর চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে পারলো না, এগিয়ে গেল বিপন্ন লোকটির কাছে সাহায্যের জন্য। আক্রমণকারী একজনের চোয়ালের উপর বসিয়ে দিল এক ঘুসি। সে ঘুরে পড়ে গেল বটে, কিন্তু আর এক জন তৎক্ষণাৎ বিনয়ের নাকের উপর মারলো এক ঘুসি। বিনয়ের দু'চোখ ধোঁয়া হয়ে গেল। যে ঘুসি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, সে এই অবসরে বিনয়কে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরলো।

চোয়ালের উপর বসিয়ে দিল এক ঘুসি।

আপ্রাণ শক্তিতে বিনয় একখানি হাত মুক্ত করে নিল, না দেখেই মারলো সামনের দিকে এক ঘুসি, এবার যে বিনয়কে জড়িয়ে ধরেছিল সে বিনয়কে নিয়েই পড়লো রাস্তার উপর। পরক্ষণেই বিনয়ের বুকের উপর বসে সে বিনয়ের গলা টিপে ধরলো। বিনয় যুযুৎসুর প্যাঁচ লাগাবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। সে বিনয়ের গলা টিপে ধরলো। দু' একবার ছট্‌ফট্ করেই বিনয় জ্ঞান হারালো।

জ্ঞান যখন হোল, বিনয় প্রথমে কিছু বুঝতে পারলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকার পর সে বুঝলো যে একখানি অন্ধকার ঘরের মধ্যে মেঝের উপর সে পড়ে আছে। তার দুটি হাত বাঁধা। বিনয় উঠে বসলো।

উঠে বসতে গিয়ে কিসের উপর যেন বিনয়ের পা ঠেকলো। আরেকবার পায়ের ঠেলা দিয়ে সে দেখলো, নরম কিছু বলে মনে হোল। যাকে সে বাঁচাতে গিয়েছিল, তাকেও কি এখানে এনে ফেলেছে নাকি?

—আপনার জ্ঞান হয়েছে?

বিনয় বললো—কে আপনি?

—যাকে আপনি বাঁচাতে গিয়েছিলেন, আমিই তিনি। আপনি কে জানতে পারি কি?

—আমি ভারতীয় সাংবাদিক বিনয় রায়।

—আপনিই বিনরয়?

—হ্যাঁ।

—আমি এখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আমীরচাঁদ।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কিছু নয়। গত পনেরো দিনের মধ্যে আমাদের সমিতির সাতজন সদস্য এই সহর থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। দু' একদিন পর-পরই এক-একজন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এবার আমরা তাদের সংখ্যা আরও দুটি বাড়ালাম।

বিনয় বিস্মিত হোল, বললো—কই, আমি তো এমন ব্যাপার কিছু শুনিনি!

—ফরাসী পুলিশ ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না। তারা বলে, ওরা টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেছে শত্রুপক্ষে যোগ দেবার জন্যে।

—আটজন লোক পর-পর নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তাদের আর কোন খবরই পেলেন না?

—খবর পেলে তো চুকেই যেত! খবর পাইনি বলেই খবর নেবার চেষ্টা করছি। সমিতির সম্পাদক হিসাবে আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। সেজন্য আমিই এই সম্পর্কে চেষ্টা করছি।

—আর চেষ্টা কি করবেন, আপনিই তো তাদের কবলে এসে পড়েছেন!

—এতে আমার ভালই হোল। এরা কে এবং কোথায় লোকগুলিকে নিয়ে গেছে, কেন নিয়ে গেছে, তা জানতে পারবো।

, —জেনে আর লাভ কি হবে? যদি এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তবে তো জানাটুকু কাজে লাগবে, নাহলে তো বাকী আটজনের মত আমরাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাব।

—দেখা যাক, আমি তো তৈরী হয়েই আসরে নেমেছি। শুধু আপনার জন্যই দুশ্চিন্তা, আপনি মাঝে এসে না পড়লেই ভাল হোত।

—চোখের সামন একটি লোক বিপন্ন হয়ে পড়েছে দেখেও সাহায্য করবো না!

—হুঁ!—বলে আমীরচাঁদ চুপ করলো, মনে হোল সে যেন অনেক কিছু চিন্তা করছে।

খানিক পরেই দরজা খোলার শব্দ হোল, কয়েকজন লোক ভিতরে এসে ঢুকলো। ভিতরে ঢুকেই তারা আলো জ্বাললো। এবার প্রথম তিনজন লোককে বিনয় চিনতে পারলো, এদের সঙ্গে পথের উপর তার মারামারি হয়েছিল। তিনজনের পিছনে যিনি এসে ঢুকলেন, তাঁর পরণে 'সাদা এপ্রন', গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলছে, বয়স হবে বছর পঁয়তাল্লিশ।

প্রথম গুণ্ডাটি ফরাসী ভাষায় বললো—আজ স্যার দু'জনকে' ধরে এনেছি, দু'জনই ভারতীয়, আজ আমাদের সুদিন। আজ স্যার আমাদের দ্বিগুণ বকশিস দিতে হবে।

ডাক্তার বললেন—অবশ্য, কাজ করলে তার পারিশ্রমিক পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে। আগে কাজটা সেরে ফেলি, তোমরা আমাকে সাহায্য কর।

বিনয় এবার সমস্ত ঘরখানির মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বড় ঘর। বড় কাচের জানালা। একপাশে একটা প্রকাণ্ড টেবিল। টেবিলের ধারে একটি কাঁচের শেল্‌ফের উপর ডাক্তারী যন্ত্রপাতি সাজানো। বিনয়ের চিনে নিতে দেরী হয় না যে এটি একটি হাসপাতালের 'অপারেশন-থিয়েটার'। বিনয় বিস্মিত হোল! একটি হাসপাতালের অপারেশন-থিয়েটারে তাদেরকে ধরে আনা হোল কেন, সে বুঝতে পারলো না।

ডাক্তার বললেন—আচ্ছা, এদের এবার একে একে অপারেশন-টেবিলের উপর শুইয়ে দাও।

গুণ্ডা তিনজন বিনয়ের দিকে এগিয়ে এলো, তিনজনে বিনয়কে চেপে ধরে টেবিলের উপর জোর করে শুইয়ে দিল।

"এদের এবার অপারেশন-টেবিলের ওপর শুইয়ে দাও।"

বিনয়ের হাত বাঁধা, কিছুই করতে পারলো না। তার হাতের বাঁধন খুলে, দু'জনে হাত দু'খানি দেহের দু'পাশে টান করে T-য়ের মত টেনে ধরলো, আরেকজন দু'খানি পা চেপে ধরলো, বিনয়

নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইল কিন্তু পারলো না।

এমন সময় আমীরচাঁদ বললো—তুমি কি আমাদের খুন করতে চাও ডাক্তার?

ডাক্তার বললেন,—ডাক্তার কখনও মানুষ খুন করে?

—তাহলে আমাদের এইভাবে ধরে আনলে কেন?

—কেন? তোমাদের কাজে লাগাবো বলে। তোমাদের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে আমার ব্লাড-ব্যাংকে জমাব। যে সব ফরাসী সৈনিক আহত হয়ে আসবে, তাদের সেই রক্ত দিয়ে বাঁচাব।

—আমাদের দেহ থেকে সব রক্ত বের করে নিলে আমাদের কি হবে?

—কি হবে? দুর্বল হয়ে পড়বে মাত্র।

—সব রক্ত দেহ থেকে টেনে নিলে খালি দুর্বল হয়ে যাব? মরেও তো যেতে পারি?

—সে প্রতিরোধ করার শক্তি না থাকলেই মারা যাবে, সাধারণ মানুষ কি মরে না?

—অর্থাৎ তুমি আমাদের ডাক্তারী কায়দায় খুন করতে চাও, এর আগে তুমি এই ভাবে আরও সাতজন হিন্দুকে ধরে এনে খুন করেছ।

—তোমার বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে গেছে বলে তুমি একে খুন বলছ, আমি কিন্তু তোমাদের হিন্দু হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়েছি। তোমাদের সুভাষ বোস এই দিকে 'আজাদ হিন্দ' তৈরী করলো, সেই তোমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেল যত বিদ্বেষ। তোমরা 'কুইট ইণ্ডিয়া' করে ইংরাজদের দেশ ছাড়া করেছ, তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখেই এখানকার প্রজারা 'কুইট ইন্দোচায়না' করছে। আজ যত ফরাসী এখানে মরছে তাদের মৃত্যুর জন্য মূলতঃ তোমরাই দায়ী, তোমাদের রক্ত দিয়ে ফরাসীদের সেবা করলে তোমাদের সেই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি অনেক

'পিস্তল দেখে বীরের মুখে আর কথা সরলো না। [পৃষ্ঠা ২০৭
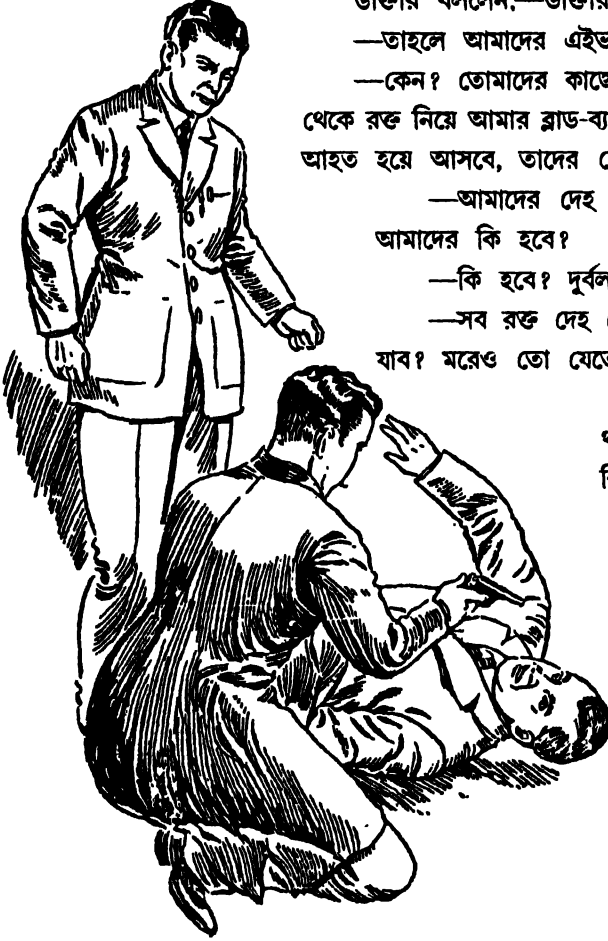
বিচার করে এই পন্থা গ্রহণ করেছি।

—তোমার যুক্তিকে আমি বাহবা দিচ্ছি ডাক্তার, তুমি ঠিক ইউরোপীয়ানের মতই কথা বলেছ!

—আর আমাকে বিরক্ত কর না, আমাকে কাজ করতে দাও।

ডাক্তার সেল্‌ফের কাছে গিয়ে একটি ছোট বাক্‌স খুলে একটি বড় সিরিঞ্জে সূচ পরিয়ে নিল, তারপর টেবিলের পাশে এসে বললো—বনরয়, হাত ঠিক করে রাখ, নাহলে সূচ ভেঙে হাতের মধ্যে ঢুকে যাবে, যীশুর নামে প্রশান্ত চিত্তে ফরাসী সৈনিকদের জন্য তুমি রক্ত দান কর।

বিনয় বললো—যীশু! যীশুর নামে তুমি আমাকে খুন করতে চাও!

ডাক্তার হাসল, সিরিঞ্জটা ঠিকমত বাগিয়ে ধরে বিনয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ইতিমধ্যে যে ভাবেই হোক, আমীরচাঁদ তার হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছিল, কিন্তু এতক্ষণ তা কাউকে বুঝতে দেয়নি। এবার সকলের মনোযোগ যখন বিনয়ের উপর গিয়ে পড়লো, সেই সুযোগে আমীরচাঁদ এক নিমেষে উঠে দাঁড়ালো, তারপর পিছন থেকে এক ঘুসি মারলো ডাক্তারের মুখে। ডাক্তার ঘুরে পড়ে গেল। গুণ্ডা তিনজন এবার বিনয়কে ছেড়ে দিয়ে একযোগে আমীরচাঁদকে আক্রমণ করলো। প্রথম গুণ্ডাকে আমীরচাঁদ এক লাথি মারলো, সে গিয়ে পড়লো আরেক গুণ্ডার উপর, দু'জনে পড়ে গেল। তৃতীয় গুণ্ডা থমকে দাঁড়ালো। আমীরচাঁদ দরজার কাছেই ছিল, এবার সে দরজা খুলে ফেললো, বাহিরের বারান্দায় আলো জ্বলছে, আমীরচাঁদ ছিট্‌কে বাহির হয়ে পড়লো। গুণ্ডা তিনজন ছুটে গেল তার পেছনে।

বিনয় তখন উঠে বসেছে। ঘরে কেউ নেই, ডাক্তার মেঝের উপর পড়ে আছে। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে না, সেও তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লো।

এক দৌড়ে বারান্দা পার হয়েই বাগান, বাগান পার হয়েই ফটক, ফটক পার হয়ে বড় রাস্তা ধরে সে ছুটলো। ছুটতে ছুটতে পথের মোড়ে এসে দেখে সেখানে ভীড় জমে গেছে। জন দশেক হিন্দু যুবক সেই গুণ্ডা তিনজনকে ধরেছে। আমীরচাঁদ উত্তেজিত ভাবে তাদের কি সব বলছে!

আমীরচাঁদ বিনয়কে বললো—এরা আমার স্বেচ্ছাসেবক, এদেরকে পিছনে রেখেই আমি ওই সাতজন নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে ছিলাম। এরা আমাদের অনুসরণ করে হাসপাতালের ফটক অবধি এসেছে। এখন হাসপাতালে ঢুকে ওই ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করতে হবে, আর ওই সাতজন নিরুদ্দিষ্টকে খুঁজে বের করতে হবে।

বিনয় বললো—হাতিয়ার থাকলে ভাল হোত।

আমীরচাঁদ বললো—আমাদের পিস্তল আছে।

গুণ্ডা তিনজনকে বেঁধে রেখে, চারজন তাদের পাহারায় রইল, বাকী ছ'জনকে নিয়ে বিনয় ও আমীরচাঁদ হাসপাতালে এসে ঢুকলো।

ডাক্তার তখনও মেঝেয় পড়ে গোঁয়াচ্ছিল, তার চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে। বিনয়, আমীরচাঁদ আর পিস্তল দেখে ফরাসী ডাক্তার বীরের মুখে আর কথা সরলো না, সুড়সুড় করে আগন্তুক

আটজনকে সে নিয়ে গেল একখানি ছোট ঘরে, সেখানে সাতটি বেডে সাতজন শুয়ে আছে, কোন চেতনা আছে বলে মনে হয় না। আমীরচাঁদ দেখেই তাদের চিনলো। বললো এরাই নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল, ক'দিন ধরে খুঁজছি!

তারপরের ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। ডাক্তার ও তার সহকারী তিনজনকে পুলিশের হাতে দেওয়া হোল। ফরাসী সরকার ডাক্তারকে উন্মাদ বলে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিলেন। গুণ্ডা তিনজনের কারাদণ্ড হোল। হাসপাতালে সাতজন লোকের সুস্থ হতে দীর্ঘ সময় লাগলো। বিনয়ের কিন্তু নদীতীরে রাত্রে বেড়ানো বন্ধ হোল না, হেসে বলে—আর একটা এডভেঞ্চারের সুযোগ নিচ্ছি!

তর্কে বহু দূর

পথ-নির্দেশ

চৈতন্যদেবের প্রিয়তম শিষ্য রূপগোস্বামী বৃন্দাবনে এসেছেন, গোবিন্দ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু কোথায় সেই গোবিন্দ-বিগ্রহ? বৃন্দাবনের পথে পথে, মাঠে প্রান্তরে, বনে বনে রূপ ঘুরে বেড়ান আর কেঁদে কেঁদে বলেন, হে গোবিন্দ, কোথায় মাটির তলায় বিগ্রহের রূপে তুমি লুকিয়ে আছ, কি করে তোমার দেখা পাবো?

হঠাৎ একদিন তাঁর নজরে পড়লো, একটি গাভী দল ছাড়া হয়ে গভীর বনের ভিতর চলেছে! রূপ গাভীকে অনুসরণ করে চলেন। কিছু দূরে গিয়ে দেখেন, বনের ভিতর একটা জায়গায় এসে গাভী দাঁড়িয়ে পড়লো আর তার বাঁট থেকে বর্ষার ধারার মতন দুধ মাটিতে পড়তে লাগলো। এইভাবে কিছুক্ষণ দুগ্ধদান করার পর গাভী চলে গেল। পরের দিন আবার ঠিক ঐ সময়ে একই জায়গায় এসে সেই গাভী আগের দিনের মতন দুগ্ধদান করে চলে গেল।

রূপ পরের দিন লোকজন নিয়ে এসে সেই জায়গাটা খুঁড়লেন। কিছুক্ষণ খোঁড়ার পরই দেখতে পেলেন, মাটির তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে তাঁর সেই বাঞ্ছিত গোবিন্দ-বিগ্রহ। হরিধ্বনিতে বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে রূপগোস্বামী প্রতিষ্ঠা করলেন সেই গোবিন্দ-বিগ্রহ।

গোখরোর মুখে অমরেশ

—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

[শ্রীমান্ অমরেশকে নিয়ে অনেক কাণ্ডই ঘটেছে, গত দশ-বারো বছরে। অনেক কীর্ত্তি করেছে অমরেশ মামা। তোমরা যারা কিশোর-বয়সে ওর ভক্ত ছিলে, আজ সেই তোমরা সবাই যুবক। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছো, কিন্তু আশ্চর্য্য! তবু তোমাদের কাছে অমরেশ-কথামৃত অপ্রিয় হ'ল না। এরকম ভাগ্য অমরেশ ছাড়া বাংলাদেশে আর কার আছে?

যাই হোক, অমরেশেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। তার চেহারা আরও মোটা, বুদ্ধি আরও স্থূল এবং মেজাজ আরও রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

অমিয় পাশ-টাশ করে প্রফেসর হয়েছে। ভুবন রিসার্চ্চ করছে। পতিত কোলকাতার কোন বিলিতী ফার্ম্মের সহ-এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। গদাই দেশে প্রকাণ্ড ষ্টেশনারী দোকান করেছে। পরাণে করেছে একটা মুদীখানা। পতিতের মামা পরিতোষ দেশে থাকে, জমি-জমা আছে বলে চাকরী করতে হয় না।

এখনো পূজোতে অমিয়দের বাড়ীতে প্রতি বছর থিয়েটার হয়, আর সে থিয়েটারে এখনো অমরেশই প্রধান পাণ্ডা। মামাকে বাদ দিয়ে অমিয় কিছুই করতে চায় না।

যেই আকাশে বর্ষার প্যাচ-পেচে মেঘ কেটে গিয়ে নীল রং দেখা দেয়, মাটির বুকে লাগে সোনার রোদ্দুরের ঝিকি-মিকি, অমনি অফিসে-আদালতে-ইস্কুলে বসেও এই দলটির মন চন-মন করে ওঠে, দেশে পালাবার জন্যে—আর বিরক্ত হয়ে ওঠে অমরেশের মন।]

ইন্দ্রধনু

প্রথম দৃশ্য

আশ্বিনের উজ্জ্বল প্রভাত। জানলা দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। অমরেশ তক্তাপোষে বসে একমনে একটা ক্যানভাসের উপর একটা ছবি আঁকছিল। দেখা গেল—ছবিতে একটা উদ্ভট জানোয়ারের মাথার উপর সে একটা মানুষের মুখ এঁকেছে, আর থেকে থেকে এক চোখ বন্ধ করে সেটাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে।

অমরেশের স্ত্রী হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা, আর একটা প্লেটে খান চারেক গরম লুচি, একটু তরকারী ও দুটো ছোট ছোট দানাদার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। অমরেশের স্ত্রীও এই কয় বছরের ব্যবধানে দেখতে ভারী সুন্দরী হয়েছে। লেখাপড়া করেছে বলে সে একটু গর্ব্বিতা একটু অনন্যা।

অ-স্ত্রী ঃ এদিকে একটু দেখলে হতো!

অম ঃ [চোখ না ফিরিয়ে] দেখি, দেখছি...এই দেখলাম বলে। হ্যাঁ, বলো!

অ-স্ত্রী ঃ বলছি, এগুলো খেয়ে নিয়ে আবার বসলে পারতে?

অম ঃ [ছবির দিকেই চোখ রেখে] কালো লাইনটা যদি আর একটু টেনে দিই, তাহলে বোধ হয়, কিন্তু—

অ-স্ত্রী ঃ কিন্তু লুচিগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

অম ঃ (হঠাৎ স্ত্রীর দিকে চেয়ে) ব্যাপারটা বোঝ?

অ-স্ত্রী ঃ কোন্ ব্যাপারটা?

অম ঃ এই চিত্রকলা?

অ-স্ত্রী ঃ কত রকম বিচিত্র কলাই তো তুমি এ অবধি আমায় দেখালে, বাকী আছে চিত্রকলা।— আর কী আর্টই ফলিয়েছো, মরে যাই, মরে যাই!

অম ঃ ডেঁপোমি দ্বারা পৃথিবীতে কোন বৃহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। দেখেছিলে ইণ্টারন্যাশনাল আর্ট একজিবিশন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে? হুঁঃ! পিকাসোর নাম শুনেছ?—জিনিষটা ছেলেখেলা নয়; হেঁসেলের হাতা-খুন্তির কস্‌রত্ নয়। বুঝেছ?

অ-স্ত্রী ঃ কেন বুঝবো না? তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর। ডেঁপোমি দ্বারা যে পৃথিবীতে কোন বৃহৎ কার্য্য সাধিত হয় না, সেতো আজ এই ক' বছর থেকেই দেখছি। আর ঐ আর্ট পয়সা দিয়ে কেউ কেনে? স্রেফ্ ঠাট্টা করে বাহবা দেয়, এটা কেন তুমি বুঝতে পারো না?

অমরেশ কোন কথা না বলে নিঃশব্দে হাত ধুয়ে খেতে লাগলো। তার এই গাম্ভীর্য্য অমরেশের স্ত্রী বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলো না। কাছে বসে লক্ষ্য করতে লাগলো স্বামীকে। তার মুখে যে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল—রাগ করলেও সেটা অমরেশের চোখ এড়ায়নি। খেতে খেতে সে হঠাৎ ফেটে পড়লো।

অম ঃ আমার cost-এ হাসতে লজ্জা লাগে না তোমার?

অ-স্ত্রী ঃ তোমার কষ্টে হাসতে কষ্টই হচ্ছে আমার। কিন্তু কী করবো বলো? তোমার যা কাণ্ড, তাতে মরা মানুষেরও হাসি পায়। বহু বহু ছবি দেখেছি, কিন্তু অমন দাঁত-ছিরকুটো ছবি বাবার জন্মে দেখিনি।

অম ঃ নারী-জাতির রাগ আর শরতের মেঘ—এক জিনিষ। খানিকটা বর্ষণেই সাফ্ হয়ে যায়।

অ-স্ত্রী ঃ তাই বুঝি?

অম ঃ অবিকল তাই।

অ-স্ত্রী ঃ কোনদিন দেখেছ কি আমার চোখে বর্ষণ?

অম ঃ একদিন? বহুৎদিন! শুধু বর্ষণ নয়,

মাঝে মাঝে মুখে গৰ্জ্জনও।

অ-স্ত্রী ঃ তোমার তাতে ভয়টা কী? বজ্রপাত তো হয়নি তোমার মাথায়!

অম ঃ হলে বোধ হয় খুসী হতে?

অ-স্ত্রী ঃ আমি জানি না, খাবার দিয়েছি, খাও!

এই বলে হন্ হন্ করে অমরেশের স্ত্রী চলে গেল। অমরেশ চুপ করে চেয়ে রইল সেদিকে। হঠাৎ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে খাবার খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটলো।

ঘরের বাইরে কাশির শব্দ শোনা গেল। অমরেশ কাশির শব্দ শুনে মুখ তুলে বললো—

অম ঃ কে?

নেপথ্যে ঃ আমি বাবাজী।

অম ঃ আমি বাবাজী মানে?

নেপথ্যে ঃ মানে আমি পুণ্ডরী—

অম ঃ খ্যাক্‌কো! আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়। ওঃ! কতকাল যে দেখিনি আপনাকে!

পুণ্ডরীকাক্ষের প্রবেশ। এই সময়ের মধ্যে তিনি যেন অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছেন। অমরেশ লুচি মুখে দিয়ে বললো—

অম ঃ হঠাৎ?

পুণ্ডরী ঃ হ্যাঁ বাবা।

চুপচাপ বসলেন। অমরেশ খেয়ে যেতে লাগলো। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে জল খেল সে। তারপর মুখ মুছে আড়চোখে চেয়ে বললে—

অম ঃ বাড়ীর সব খবর ভালতো মামা?

পুণ্ড ঃ মন্দ কি?

অম ঃ নতুন কিছু খবর আছে?

পুণ্ড ঃ একটু আছে বাবা ঃ প্র্যাক্‌টিক্যালি দমটা নিই, বলছি।

অম ঃ নিন্। একেবারে ভেতরে গিয়ে দম নিলে হতো না মামা?

পুণ্ড ঃ তাও হতো। তাহলে কি তাই যাব?

অম ঃ অবশ্য বিশ্রামাদির পর হজমের পায়চারী করতে বিকালে তো একবার নামবেনই। তখন কথা হবে।

পুণ্ড ঃ আচ্ছা।

পুণ্ডরীকাক্ষ যেতে যেতে ফিরলেন—

পুণ্ড ঃ বাবা অমর!

অমর ঃ বলে ফেলুন!

পুণ্ড ঃ প্র্যাক্‌টিক্যালি তোমার যে ভায়রা—

অম ঃ আমার ভায়েরা?

পুণ্ড ঃ না-না ভাই নয়! তোমার যে ভাই নেই সেতো আমি জানি। প্র্যাক্‌টিক্যালি তা বলছি না।

অম ঃ তবে?

পুণ্ড ঃ তোমার ভায়রা মানে তোমার বৌ, মানে আমার বৌমার, প্র্যাক্‌টিক্যালি—

অম ঃ বুঝেছি। আমার ভায়রাভায়ের খবর, আপনার বৌমার ভায়েরা জানে।

পুণ্ড ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ সেতো জানবেই। কিন্তু তুমি খবরটা পেলে—

অম ঃ পাইনি।

পুণ্ড ঃ পাওনি? এগুলো প্র্যাক্‌টিক্যালি অত্যন্ত খারাপ। মানুষ আত্মীয়-স্বজনের নাম জানবে না, খবর জানবে না, এতো ভারী অন্যায়। ছি ছি ছি! এসব কথা—

পুণ্ডরীকাক্ষ বক্ বক্ করতে করতে চলে গেলেন। অমরেশ খাবারের থালাখানা ও গেলাসটা নামিয়ে রাখলো। তারপর আবার চিত্রকলার দিকে মন দিলো। একটু পরে বাইরে থেকে আওয়াজ এল—

নেপথ্যে ঃ অমরেশদা আছেন না-কি?

অমরেশ ঃ ছিলাম। আসুন।

একটি যুবক প্রবেশ করলো। হাতে কতকগুলি কার্ড, সে একখানি কার্ড নিয়ে বললো—

যুবক ঃ পরশু আপনাকে যেতেই হবে।

অম ঃ কোথায়?

যুবক ঃ আমাদের প্লেতে।

অম ঃ প্লে? থিয়েটার?

যুবক ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অম ঃ কোথায় হবে?

যুবক ঃ রংমহলে।

অম ঃ কী বই?

যুবক ঃ পৃথ্বীরাজ।

অম ঃ পুরোনোটা, না নিজের লেখা?

যুবক ঃ নিজের লেখা।

অম ঃ ক অংকের বই?

যুবক ঃ চার অংকের।

অম ঃ মেল-ফিমেল?

যুবক ঃ আজ্ঞে?

অম ঃ বলছি, মেল-ফিমেল, না—ফিমেল-ফিমেল?

যুবক ঃ আজ্ঞে ফিমেল-ফিমেল।

অম ঃ কতদিনের রিহারসাল?

যুবক ঃ চার মাস। আপনাকে একবার—

অম ঃ পরে হচ্ছে। আরও একবছর রিহারসাল দিতে বলোগে।

যুবক ঃ আজ্ঞে ষ্টেজ ভাড়া যে—

অম ঃ পায়ে ধরে ভিক্ষে কোরে ডেট্ পিছিয়ে দাও। ধ্যাষ্টামোর কাজ নয়। বুঝেছো? এ হচ্ছে চারুকলা।

যুবক ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, চারুকলা—তো বটেই।

অম ঃ চারুকলা তো বটেই! তুমি তো আচ্ছা ডেঁপো ছোক্‌রা হে! চারুকলা তো বটেই মানে?

যুবক ঃ আজ্ঞে আমি—

অম ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। আমার সঙ্গে ইয়ারকি করতে এসো না। পরিচালক অমরেশ,—ছিয়ত্রিশখানা ড্রামা করেছে—তার মধ্যে ছেষট্রিশখানা ফেল, আর সাচ্চল্লিশখানা সাক্‌সেস্। বুঝলে? ও সব পিথ্বীরাজ ফিথ্থিরাজ আমাদের গোড়ার দিকেই ফিনিশ! যাও, আমি যাবো না!

যুবক ঃ আজ্ঞে আপনি না গেলে—

অম ঃ বাজে তক্কো আমি ভালবাসিনে—বুঝেছ? মরদ্‌কা দাঁত—হাতীকা ইয়ে থিয়েটার সম্বন্ধে কোন গোলমাল আমি সহ্য করবো না।

যুবক ঃ আপনি না গেলে স্যার আমাদের প্রধান অতিথি কে হবে?

অম ঃ গিরীশ ঘোষ, ডি. এল. রায়কে বলোগে।

যুবক ঃ বেশ, তাহ'লে তাঁদের ঠিকানা দিন, আর দয়া করে চিঠি লিখে দিন। তাঁরা যদি রাজী না হন, তাহ'লে কিন্তু আমি আবার আসবো।

অমরেশ কিছুক্ষণ চুপ কবে মুখেব দিকে চেয়ে বললো—

অম ঃ ইয়ারকি করছো নাকি?

যুবক ঃ না স্যার!

অম ঃ গেট্ আউট্!

যুবক ঃ স্যার, প্রধান অতিথি না হ'লে কেলাবে—

অম ঃ গেট্ আউট্!

অমরেশ উঠে দাঁড়াতেই যুবকটি ছুটে ভয পেযে পালালো। অমরেশ দরজা অবধি গেল, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় কবে বললো

অম ঃ আমার সংগে সবাই মিলে এমন তামাসা আরম্ভ করেছে ক্যানো! তবে কি আমার মধ্যে ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটলো? [একটু ভেবে] চিত্তশুদ্ধি করতে হবে।

ফিরে এসে বসলো। ছবিটির দিকে চাইলো একবার। তুলি হাতে নিতে যাবে, এমন সময় অমরেশের সরকার দীননাথ পাঁজা প্রবেশ করলো। ছাঁপোষা মানুষ। কোলকাতায় অমরেশের যে তিন-চারখানি বাড়ী আছে,

সেইগুলির ভাড়া আদায় করে। তাদের মেরামতী দেখাশুনা করে—মাইনে পায় ষাট টাকা। বাপের আমলের লোক বলে—বিশ্বস্ত। সে ঘরে ঢুকে দেখলো—অমরেশ ছবির দিকে তন্ময় হ'য়ে চেয়ে আছে। সে কুণ্ঠিত গলায় বললো—

দীন : আমি এসেছিলাম।

অম : হ্যাঁ।

দীন : বেলঘরের গড়াই তো ভাড়া দিচ্ছে না কিছুতেই।

অম : হাতে পায়ে ধরা অবধি শেষ?

দীন : এ্যাঁ?

অম : [ফিরে] এ্যাঁ কী? খালি 'এ্যাঁ' বললে আমি কী বুঝবো? বলছি যে ভাড়ার জন্য ভাড়াটে মহাপ্রভুর হাতে পায়ে ধরে দেখেছেন?

দীন : আমি নালিশের ভয় দেখিয়ে এসেছি।

অম : বেশ করেছেন। তাহ'লে ভাড়াও বিশবাঁও জলে ঢুকে গেছে। আর আর বাড়ীগুলোর খপর?

দীন : উল্টোডিঙ্গির বস্তীতে পরশুদিন একজন কলেরায় মারা গেছে, তাই তাদের মন ভাল নেই। বলেছে, দিন-পনেরো পরে আসবেন,—আর যদি কারুর অসুখ না হয়, তাহ'লে ভাড়া পাবেন।

অম : বাঃ! নতুন জিনিষ। তারপর?

দীন : তারপর বাগবাজারের বাড়ীটারও গড়্বড়্!

অম : গড়্বড়্?

দীন : হ্যাঁ। ওর ভাড়াটে মনোমোহন মহান্তি বলেছে যে—ছেলের চাকরী না হওয়া অবধি কোন ভাড়া-টাড়া আর দিতে পারবে না।

অম : বাঃ! আর তো বাড়ী নেই বোধ হয়।

দীন : হ্যাঁ। দর্জ্জিপাড়ার বস্তী রয়েছে!

অম : সেখানকার কী খবর?

দীন : একজন তিন টাকা দিয়েছে, আর বাকী সবাই বলেছে যে আমরা এ-মাস থেকে উদ্বাস্তু।

অম : এমাস থেকে উদ্বাস্তু মানে?

"গেট্ আউট্!" [পৃষ্ঠা ২১২

দীন : মানে, গেল মাসের ভাড়া দিতে পারবে না। এই তো বললো।

অম : হুঁ। এইবার আমি আপনাকে কিছু বলি পাঁজামশাই?

দীন ঃ বলো বাবা বলো।

অম ঃ আমিও আর এমাস থেকে আপনাকে মাইনে দিতে পারবো না।

দীন ঃ এ্যাঁ!

[গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগলো দীননাথ পাঁজা। সে বেচারার আর কোন উপায় নেই। চাকরী বহুকালের। অমরেশ কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে বললো]

অম ঃ বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে দেখতেও ভাল লাগে না, নিজেরও চোখ সুড়সুড় করে। কাজেই আমাকে এখনই কাঁদাবেন না। বাড়ীগুলোর ভাড়া যদি আর মাসখানেক না পাওয়া যায়, তবে আমাকেও পথে পথে কাঁদতে হবে। একটু সবুর করুন! দু'জনেই এক সঙ্গে না হয়!

দীন ঃ ও কথা বোলো না বাবা, ও কথা বোলো না অমরেশ,—আমি যে তোমাদের দু'পুরুষের কর্ম্মচারী বাবা!

অম ঃ পুরুষ দেখাবেন না। আমার একগাছা সংসার আছে, এটা মানেন?

দীন ঃ হ্যাঁ বাবা!

অম ঃ খিদে পেলে তাবা খেতে চায়—জানেন একথা?

দীন ঃ তা' জানি।

অম ঃ খিদে পেলে কী দিতে হয়?

দীন ঃ খেতে দিতে হয়।

অম ঃ কী দিয়ে?

দীন ঃ এ্যাঁ!

অম ঃ জ্বালিয়ে মারলে। বলি, খাবার কী দিয়ে কিনতে হয়?

দীন ঃ পয়সা।

অম ঃ এবং সে পয়সা আসে বাড়ী-ভাড়া থেকে। যদি না আসে,—তাহ'লে,—হয় সে বাড়ী বিক্রী করে, নয় যে-কর্ম্মচারী ভাড়া আদায় করতে পারে না, তাকে বরখাস্ত করে। আমি এর কোন্‌টা করবো বলে দিন।

দীন ঃ চাকরী গেলে আমার বড্ড লোকসান হয়ে যাবে বাবা অমরেশ!

অমরেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল দীননাথের মুখের দিকে। তারপর বললো—

অম ঃ লোকসান হয়ে যাবে?

দীন ঃ হ্যাঁ বাবা।

অম ঃ না, চাকরী গেলে কারো লোকসান হয়, এটা আমি চাইনে। অতএব আপনার চাকরী রইল।

দীন ঃ বেঁচে থাকো বাবা।

অম ঃ চেষ্টা করবো।

দীননাথ কৃতজ্ঞচিত্তে চলে গেল। অমরেশ পুনরায় ছবির দিকে চাইলো, তার পর উঠে আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমরেশের বাড়ীর ভিতর। দাওয়ার উপর বসে আছেন পুণ্ডরীকাক্ষ এবং অমরেশের স্ত্রী। পুণ্ডরীকাক্ষ জলখাবার খাচ্ছিলেন, এবং অমরেশের বৌ একখানি চিঠি পড়ছিল। অমরেশ ঢুকতেই সে মাথার কাপড় টেনে দিল।

অম ঃ এসেই আরম্ভ করেছেন?

পুণ্ডরী ঃ [হেসে] হ্যাঁ বাবা। বৌমা বললেন—খালি পেটে থাকলে প্র্যাক্‌টিক্যালি পিত্তি পড়ে যেতে পারে, তাই—

অম ঃ তাহলে খালি পেটেই ভাগ্নের বাড়ীতে এলেন?

পুণ্ড ঃ না। আসতে আসতে খালি হল তো। তোমার মা এখানে নেই, তাতো কই আমায় বললে না!

অম ঃ কোন কথাই তো বলিনি আপনাকে!

পুণ্ড ঃ তাহ'লেও—

অম ঃ তাহ'লেও কী?

পুণ্ড ঃ মা বলে কথা প্র্যাক্‌টিক্যালি!

অম ঃ তেঁতো করলে! আচ্ছা এবার বলছি,—মা গেছেন বৃন্দাবনে। আমার বৌ-এর হাতে সংসারের ভার দিয়ে—

অ-বৌ ঃ দিদি চিঠি লিখেছেন।

অম ঃ হ্যাঁ। তোমাদের বাড়ীর সব খবর ভালতো?

অ-বৌ ঃ আমার দিদি নয়, তোমার দিদি!

অম ঃ আমার দিদি মানে?

অ-বৌ ঃ তোমার দিদি মানে—

পুণ্ড ঃ আমার পুঁটলী।

অম ঃ এই দেখ! আচ্ছা সব ব্যাপারে গ্যাঁজানো কি আপনার স্বভাব? পুঁটলী! কার পুঁটলী! কোথায় ফেলে এলেন? পৃথিবীতে এত সুটকেশ, ব্যাগ আর এটাচি থাক্‌তে—হঠাৎ পুঁটলী বেঁধে বাড়ী থেকে বেরুলেন কেন?

পুণ্ড ঃ আহা-হা! সে কথা নয়। প্র্যাক্‌টিক্যালি আমার—

অম ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার পুঁটলীর কথাই হচ্ছে। কোথায় ফেলে এসেছেন? যত সব উড়ো ঝন্‌ঝাট্‌! ওরে ভূতো! ভজা! রামতারণ! দীননাথ কাকা! শ্যামা! হরে! যে দিনকাল পড়েছে। পাওয়ার আর কোন আশা—হরে! শ্যামা! দীননাথকাকা!

[রামা শ্যামা ইত্যাদি নিজের চাকরসহ পাশের দু-বাড়ীর চাকরও ছুটে এল]

অ-বৌ ঃ তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? অমিয়র মার ডাকনাম পুঁটলী না? ভূতো—ভজা—রামা—শ্যামাকে ডাকা কম্‌প্লিট্‌ হ'য়ে গেল!

অম ঃ অমিয়র মার ডাকনাম—ও! তাই বলুন, আমাদের পারিবারিক পুঁটলি! ওরে তোরা যা! সে পুঁটলী নয়, এ হ'ল গিয়ে আমাদের—

অ-বৌ ঃ হ্যাঁ, ওদের কাছে আবার ঘণ্টাখানেক বলো!

অম ঃ না। বলবো না। ওরে যা!

চাকর-বাকরেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে চলে গেল। পুণ্ডরীকাক্ষ খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আবার বসলেন।

অম ঃ [দাওয়ায় বসে] এমন করো তোমরা—

অ-বৌ ঃ আমরা করি? করলে তুমি—

অম ঃ ওই হল! অর্দ্ধাঙ্গিনী না তুমি!

অ-বৌ ঃ এই সময়?

অম ঃ [রেগে] সব সময়। অর্দ্ধাঙ্গিনীর আবার একাদশী-পূর্ণিমা, ত্র্যহস্পর্শ আছে নাকি?

অমরেশের বৌ কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। পরে বললো—

অ-বৌ ঃ কী বলবো, আমি সুইসাইড্‌ করলে তোমার হাড়ীর হাল হবে বলে—করতে পারছি না। নইলে—

অম ঃ তাতো বটেই। যাকগে। কী লিখেছে দিদি?

অ-বৌ ঃ অমিয়র বিয়ে।

অম ঃ এ্যাঁ! কবে?

অ-বৌ ঃ পরশু। দিদি লিখেছেন যে হঠাৎ ঠিক হয়েছে বলে খবর দিতে পারেননি। আজকেই ওরা তোমার কাছে আসছে। গায়ে হলুদের তত্ত্ব তোমাকেই এখান থেকে পছন্দ করে কিনে দিতে হবে। আর আমাকে নিয়ে—কালকের মধ্যেই তাঁর কাছে পৌছতে হবে।

অম ঃ এই পাপে আর্য্যাবর্ত্ত গেল। আমার অনুমতি না নিয়ে,—মামার অনুমতি না নিয়ে, কী

করে ভাগ্নের বিয়ে হয়—তাতো আমি—

পুণ্ড : প্র্যাক্‌টিক্যালি আমারটা না নিয়ে তোমারটা যেমন হয়েছিল—

পুণ্ড : বলতে দিলে কই বাবা? বলতে চেয়েছিলুম,—তোমার ভায়রার মেয়ের সঙ্গেই অমিয়র বিয়ে হচ্ছে!

অ-বৌ : তাই নাকি? বাঃ বাঃ, কী মজা! আমি তো সে মেয়েকে জানি। গোখ্‌রো ওর ডাকনাম!

অম : [চীৎকার করে] কী ডাক-নাম?

অ-বৌ : গোখ্‌রো। ছেলেবেলায় খুব তেজী ছিল কিনা!

অমরেশ ধপ্ করে দাওয়ায় বসে পড়লো। ডান হাত দিয়ে মাথাটা টিপে রইলো। অনেকক্ষণ পরে সর্দি-ভারাক্রান্ত গলায় বললো—

অম : দশটা নয় পাঁচটা নয়—একটা ভাগ্নে আমার,—তার কিনা—শেষকালে গোখ্‌রোর সঙ্গে—! মামা! তুমি দিদিকে বোলো—হয় এ মেয়ে বাতিল হোক, নইলে—

নেপথ্যে অমিয় : মামা!

অমরেশের বৌ উঠে দাঁড়াল। তার মুখে হাসি ও চোখে আনন্দ। অমরেশ হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো—

অম : ওরে অমিয় রে! তুই আমার দশটা নয় পাঁচটা নয়,—একটা ভাগ্নে, তোকে কিনা শেষকালে গোখ্‌রোতে—

সদলবলে অমিয়র প্রবেশ। ভুবনকে দেখেই অমরেশের কান্না থেমে গিয়েছিল। সে ছল ছল চোখে ওদের দিকে চেয়ে রইলো।

অমি : এ কি! কী ব্যাপার মামা? [অমরেশ আবার কেঁদে উঠলো] মামী! তুমি মেরেছো নাকি?

অ-বৌ : হ্যাঁ, আমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ওই জয়ঢাক পিটে আমার হাত ব্যথা হোক আর কি!

ভুবন : একি মামী! তুমি মাম্-মাম্-আমাকে জ্য-জ্য-জ্য-য়ঢাক বললে!

"বিয়ে পরশু। চলো—সব—" [পৃষ্ঠা ২১৭

অম : ও! আপনি তাহলে এইজন্যে এসেছেন?

পুণ্ড : [হেসে] হ্যাঁ বাবা।

অম : ভায়েরা ভায়েরা করে কী বলছিলেন তবে?

অম ঃ সেই চিরকেলে কেলেংকারী। মানুষ গড়তে গিয়ে ভগবানের এরকম ফেলিয়োর এর আগে দেখিনি। ভুবন! আছিস্ এখনো?

ভুবন ঃ হ্যাঁ-অ্যাঁঃ মামা। ওম্-ওমিয়োর— বিয়ে পরশু। চলো—সব্—সবাই রওনা হই।

পতিত ঃ থিয়েটার হয়ে যাবে নাকি এক হাত? মামা?

অম ঃ পতে! জানিস্ যে ও সব শুনলে ব্যথা পাই তবু বলবি? তার ওপর—যে নাম শুনেছি আজ তোর মামীর মুখে।

সবাই চুপ। মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে।

অম ঃ [কাঁদো কাঁদো] অমিয়! তোর বৌয়ের নাম নাকি গোখ্‌রো?

অমি ঃ গোখ্‌রো! কই শুনিনি তো মামা!

অম ঃ ওই যে বলছে!

ভুব ঃ গোখ্-গোখ্-গোখ্—

অম ঃ ওই দ্যাখ্! একটা সিরিয়াস্ কথা বলবার যো-নেই! ও-ও সেটা বলবে। হ্যাঁরা! কোথা চাকরী করিস?

ভুব ঃ আম্-আম্-আম্—

অম ঃ আম নয় চাকরী।

ভুব ঃ রাই-রাই—রাই—

অম ঃ ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং আপিস? ভাল আপিস। চুপ কর! বাবা অমিয়!

অমি ঃ মামা!

অম ঃ এ নামের কোন মেয়ের সঙ্গে আমি তো সজ্ঞানে তোমার বিয়ে দিতে পারবো না। নামটা বদলাতে হবে যে!

পতি ঃ নাম-ফাম বদ্‌লে নিলেই হবে। এখন তুমি রেডি হয়ে নাও। রাত্তিরে গাড়ী।

অ-বৌ ঃ না-না, এইটেই আমি বুঝতে পারছিনে,—ওর বাবা-মা যদি ওর গোখ্‌রো নাম রেখে থাকে, তাতে তোমাদের ঠেকছে কোথায়?

অম ঃ ঠেকছে ছোবলে, আবার কোথায়? গোখ্‌রোর আবার ঠেকবে কোথায়? জানিস্ অমিয়, আজ এই সত্য আমি উপলব্ধি করেছি যে, তোর মামীর বাপের বাড়ীতে ভাল নাম রাখার রেওয়াজ নেই। এই দ্যাখ্‌না, তোর বৌয়ের নাম গোখ্‌রো, তোর মামীর নাম ফুট্‌কি! এত বড় একটা দশাসই জাঁদরেল মেয়েছেলে হয়ে গেল ফুট্‌কি!

অ-বৌ ঃ যদি ধরো—ওর মা নামটা না বদলাতে চায়?

অম ঃ বিয়ে হবে না!

অ-বৌ ঃ হবে না?

অম ঃ না।

অ-বৌ ঃ শেষকালে এই এত-খরচপত্র করে—

অম ঃ ঠিক কথা! খরচপত্র করে গোখ্‌রো ঘরে আনতে পারবো না। কালী কলুষ-নাশিনী! মা! মা!

ভুব ঃ এই মো-ম্মো-ম্মো-রেছে। তুমি আবার মা-ম্মা-ম্মা-মা বলছো কাকে?

অম ঃ আমার মামাকে। পুণ্ডরী—

অমি ঃ খ্যাক্‌কো। বহোতাচ্ছা! এসে গেছেন তিনি? হুর্‌রে! থ্রি চিয়াস্ ফর...

সকলে হাঁ করে রইল। থ্রি চিয়ার্স কাকে দেবে, ভেবে ঠিক করতে পারলো না। হঠাৎ ভুবন চেঁচিয়ে উঠলো—

ভুবন ঃ মা-ম্মা-ম্মা-মাম্-ইমা! মামীমা! হি-হি-হি-হিপ্ হিপ্ হু-হু-হু-হু—

অম ঃ উর্‌রে! গেঁইয়ার কারবারই আলাদা!

[সবাই হো হো করে হেসে উঠলো]

তৃতীয় দৃশ্য

বিয়ে-বাড়ীর উঠান। কলাগাছ ইত্যাদি দিয়ে ছাঁদনাতলা সাজানো। বাইরে সানাই বাজছে। লোকজন যাতায়াত করছে। হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল—

নেপথ্যে ঃ হতেই হবে!

সবাই চমকে চাইল। দেখা গেল উত্তেজিতভাবে কথা কইতে কইতে অমরেশ, পতিত, ভুবন, গদাই, পরাণে ঢুকছে, সংগে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, পেছনে তিন-চারটি যুবক।

অম ঃ [চেঁচিয়ে] হতেই হবে।

কন্যাকর্ত্তা ঃ কিন্তু হয় কী করে বলুন! মেয়ের ডাক-নাম, তার জন্মের ক্ষণ থেকেই স্থির হয়ে আছে। এখন বদলালে সে নামে তো কোন সাড়াই পাবে না।

অম ঃ সাড়া পাওয়া আর মারা যাওয়া এক ব্যাপার নয়।

কন্যাকর্ত্তা ঃ মারা যাবে কে?

অম ঃ কেন বর! আমার ভাগ্নে অমিয়!

কন্যাকর্ত্তা ঃ ছি-ছি-ছি-ছি! দুর্গা দুর্গা! এরকম অলক্ষুণে কথা বলবেন না অমরেশবাবু! বিয়ের দিনে এ সব বলতে নেই। আপনি না আজ বরকর্ত্তা?

অম ঃ কত্তা দেখাবেন না। হোল্ লাইফ কত্তা ভজে টায়ার্ড হ'য়ে গেছি!

ভুব ঃ ও মেয়ের ডাক-নাম পাল্টে দিন।

কন্যাপক্ষের একজন যুবক ঃ ইম্‌পসিব্‌ল্!

ভুব ঃ খ্যা-খ্যা-খ্যানো ইম্-ইম্-ইম্—

অম ঃ পসিব্‌ল্ শুনি?

২য় ঃ ওর যে ওই নাম!

ভুব ঃ সেতো আম্-আম্-আম-আম্—

অম ঃ জাম-বেল-নারকেল-কলা-শশা-পেয়ারা যা মনে আসে তাই বলে ডাকা যায়, তাই বলে—

[পুণ্ডরীকাক্ষের প্রবেশ]

পুণ্ড ঃ বাবা অমরেশ।

অম ঃ কী মামা?

পুণ্ড ঃ মেয়ের মা বলছেন—এই সব তর্ক তুলে লগ্নটা পিছিয়ে কোন লাভ নেই। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে তোমরা প্র্যাক্‌টিক্যালি যে নামে ইচ্ছে ডেকো!

সকলে মুখ চাইছে।

ভুব ঃ এ হচ্ছে ভাল্-ভাল্-ভাল্-ভাল্—

অম ঃ ভালে যা আছে তাই হবে। গুড্ আইডিয়া! পতিত! যা অমিয়কে নিয়ে আয়। বিয়েটা হোক্!

পতিত চলে গেল।

ভুব ঃ ইংল্যাণ্ডের বড় নাট্-নাট্যকার এই নাম নিয়ে—বুঝেছেন মশায়? বড় নাট্যকার সেক্স্-সেক্স্-সেক্স্-সেক্স্—

অম ঃ সেক্স্ নিয়ে এমন বলা বলেছেন যে ট্যারা হয়ে যাবেন।

অমিয়র প্রবেশ। বরবেশ। সংগে পতিত গদাই আর পরাণে।

পরা ঃ ল্যান্‌না ক্যানে! কত বিহা দিবেন, দ্যান!

গদাই ঃ কিন্তু আমাদের গেরামভাটিটা নিয়ে যাবো, কন্যাপক্ষের কাছ থেকে!

অম ঃ বাবা অমিয়!

অমি ঃ মামা!

অম ঃ সেট্‌লড্!

কন্যাকর্ত্তা ঃ আমি তাহলে মেয়েকে সভায় আনি—অমরেশবাবু!

অম ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে। এ কী একটা কথা হ'ল বেয়াই মশায়? আপনার মেয়ে—আপনার জামাই—

পরা ঃ বলতে গেলে ই একরকম আপনারই বিদ্যা!

কন্যাকর্ত্তা ঃ ছি ছি ছি ছি! দুর্গা! দুর্গা! কী যে বলেন আপনারা!

কন্যাকর্ত্তা লজ্জিতমুখে বেরিয়ে গেলেন।

অম ঃ পরাণে!

পরা ঃ মামা বাবু!

অম ঃ বেরিয়ে যাও!

পরা ঃ বাইরে গিয়ে বসবো?

অম ঃ কোথাও বসবে না, একেবারে বাড়ী চলে যাবে।

পরা ঃ ক্যানে! লুচি খাবোনা মামা?

ভুব ঃ (উত্তেজিত) লু-লু-লু-লু—

অম ঃ লু বইয়ে দিয়েছিস্ তুই!

গোখ্‌রোকে নিয়ে কন্যাকর্ত্তার প্রবেশ। গোখ্‌রোকে অপূর্ব্ব দেখতে হয়েছে। তার মাথায় অল্প ঘোমটা ছিল বলে সবাই তাকে দেখতে পাচ্ছিল। অমিয় বরের আসনে বসেছিল, কন্যাকে নিয়ে গিয়ে অপর আসনে বসানো হলো।

পুরোহিত ঃ উপস্থিত সুধীবৃন্দ! তাহলে আর কালহরণ না করে কন্যা পাত্রস্থ করা যাক।

অম ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়! তা' আর বলতে! বিয়েস্য নানা ব্যাগ্‌ড়াং। শাস্ত্রেই বলেছে।

হঠাৎ ভুবন তার গা টিপে দেওয়াতে

অম ঃ কী রে!

ভুব ঃ মে-ম্মে-ম্মেয়ে তো দে-দেখতে শুনতে ভালই। কিন্তু না-ন্না ন্নামটা?

অম ঃ ওই যে ওর বাবা বললে, যে নামে হোক ডাকলেই হবে!

ভুব ঃ কিন্তু মে-ম্মেয়ে যদি সে-সে কথা না শোনে?

অম ঃ না শোনে? তাহ'লে তো মুস্কিল।... (সজোরে) আচ্ছা তাহ'লে কন্যার ডাকনামটা কী দাঁড়ালো?

পুগু ঃ আঃ! প্র্যাক্‌টিক্যালি আবার ওসব কেন অমরেশ?

ভুব ঃ না-না। সে সম্বন্ধে একটা কায়-কায়-কায়—

অম ঃ কায়মনোবাক্যে কথা হওয়া চাই বৈ কি!

কন্যাকর্ত্তা ঃ ভাই অমরেশ! তুমি আমার আত্মীয়। এখন ওসব কথা থাক্ না ভাই!

ভুব ঃ ভা-ভা-ভা-ভা—

অম ঃ ভাত-কাপড়ের ব্যাপার নয় তো। যাকে বলে বিয়ে।

কন্যাকর্ত্তা ঃ তাহ'লে শুনুন সবাই। ছেলেবেলায় ওকে একবার গোখ্‌রো সাপে জড়িয়ে ধরেছিল বলে ওর ডাক নাম হয়েছে গোখ্‌রো।

অম ঃ ছেলেবেলায় গোখ্‌রোতে জড়িয়েছিল?

ভুব ঃ আশ্-আশ্ -আশ্-আশ্—

অম ঃ আশ্ নয় বাবা ভুবন,—বাঁশ! নামটা না বদলালে তো—

কন্যাকর্ত্তা ঃ ওর মা'র ইচ্ছে নয়।

পতিত ঃ তাহ'লে আমরাই বা খামোখা ইচ্ছে করি কেন? অমিয়! উঠে আয়!

অমি ঃ উঠবো মামা?

ভুব ঃ মা-মা-ম্মা-মামা কী করবে? আমাদের কথা শুনতে হবে তোকে। উঠে আয়।

ক-ক ঃ আমার এমন সর্ব্বনাশ কোরোনা অমরেশ! তুমি আমার আত্মীয়।

ভুব ঃ আঁত্-আঁত্-আঁত্-আঁত্—

অম ঃ আঁতের কথা বলে কোন লাভ নেই দাদা। নরেশদা আসতে পারলেন না—আমাকে পাঠালেন। এমন জানলে—

পতিত ঃ আমরা বাইরে গেলুম মামা। তুমি এস!

নেপথ্যে মেয়েদের কান্নার রোল উঠলো। কন্যাকর্ত্তা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। কন্যাপক্ষের দু' একটি ছেলে ওদের চলে যেতে দেখে বললো—

যুবক ঃ এ অত্যাচার!

পুগু ঃ অমরেশ!

অম : ওরে পতিত। আমার মামাকে নিয়ে যা।

পুণ্ডরীকাক্ষ ও অমিয়কে নিয়ে বন্ধুরা বেরিয়ে গেল।

ক-ক : এই অবিচার একমাত্র এ যুগেই সম্ভব।

"আমি যদি এই পোষাকে থানায় গিয়ে বলি... [পৃষ্ঠা ২২১

অম : প্রগতির যুগ যে দাদা! আমরা যে একালের ছেলে!

ক-ক : এখানে কি এমন কেউ নেই যে আমার আজ জাত রক্ষা করতে পারে?

হঠাৎ গোখ্‌রো উঠে এল।

গোখ্‌রো : বাবা!

বাবা : কী মা?

গো : যা হবার তাতো হ'য়েইছে। এখন আমি কি [অমরেশকে দেখিয়ে, সে চেয়ারে বসে ছিল] এঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?

ক-ক : ওরে! ও যে তোর মেসো—

গো : সে কথা এখন থাক্ বাবা! নদীতে ঝড় উঠলে—দেবতাকে মিষ্টি নামে ডেকে ফল পাওয়া যায় না,—তখন বাঁচবার উপায় হচ্ছে, নিজের উপর নির্ভর করে শক্ত করে হাল ধরা।

অম : বাঃ! বেশ কথা কয়!

ক-ক : বেশ। তুমি অমরেশের সঙ্গে কথা কও মা!

গো : কিন্তু তোমরা কেউ এখানে থাকবে না বাবা! আমি একটু একলা ওঁর সঙ্গে কথা কইব।

ক-ক : বেশ। তোমরা ওখান থেকে চলে এসো বাবা!

সকলে বেরিয়ে গেল। তখনো সানাই বাজছে। গোখ্‌রো এগিয়ে এল। তার পর শান্ত গলায় বললো—

গো : ব্যাপারটা কী হ'ল বলুন তো?

অম : ওই যে গোখ্‌রো নামে ঠেকে গেল মা!

গো : বেশ তো! আমার আর একটা নাম আছে। সেই নামেই না হয় ডাকবেন!

অম : বাঃ! বাঃ। তাহলে তো ভালই হয়। কী নাম?

গো : কেঁচো!

অম : কেঁচো?

গো : হ্যাঁ। ছেলেবেলায় একবার মাটি থেকে ধরে খেয়ে ফেলেছিলুম, তাই বাবা আমাকে কেঁচো বলে ডাকেন!

অম : তা ডাকুন! ও সব নাম আমাদের চলবে না!

গো : ও! আর আমি যদি বলি অমিয় নামটা আমার পছন্দ নয়—

অম : পছন্দ নয়?

গো ঃ না। তার বদলে যদি আমি বলি যে গোবরেন্দু নাম রাখতে হবে—

অম ঃ দূর!

গো ঃ দূর কেন? আমি যদি বলি যে আমার যাতে আদৌ বিয়ে না হয় সে জন্যে আপনি এ বিয়ে ভেঙে দিলেন—জোর করে বাড়ির মধ্যে ট্রেস্‌পাস্ করে?

অম ঃ না-না, ছি ছি! তাও কি সম্ভব?

গো ঃ ছি ছি কেন? আমি যদি এই পোষাকে থানায় গিয়ে বলি—যে আপনি আমায় অপমান করেছেন বলে আমি প্রতিবাদ করাতে, আপনি এই বিয়ে ভেঙে দিলেন!

অম ঃ এই দেখ! মেয়েছেলে থানায় যাবে কি!

গো ঃ আমি যদি থানায় গিয়ে বলি যে আপনি বিয়ের গোলমালে আমার ঘরে ঢুকে এক বাক্স গয়না নিয়ে পালাচ্ছিলেন, আমি দেখতে পেয়ে চীৎকার করে ওঠাতে—আপনি রেগে গিয়ে এ বিয়ে ভেঙে দিচ্ছেন!

অম ঃ কী সর্ব্বনাশ! এতো গোখ্‌রোই বটে! আরে বাপ্‌রে বাপ! এতোটা তো ভাবিনি!

এই বলে অমরেশ যাবার জন্য পা বাড়ালো। পেছন ফিরে দেখলো গোখ্‌রোও পেছনে আসছে।

অম ঃ যাওবা ইচ্ছে ছিল, তাও হ'ল না। এখানে অমিয়র বিয়ে আমি দেব না। কিছুতেই নয়।

গো ঃ কী করে দেবেন? আপনি দু'হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন, বাবা না দেওয়াতে আপনি ভাগ্নের বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন।

অম ঃ [থম্‌কে] তার মানে?

গো ঃ তার মানে আপনি ভাগ্নের বিয়েতে বারগেন করতে চান। কাল্‌কেই 'যুগান্তরে' এ-খবর বেরিয়ে যাবে!

অম ঃ এই দেখ! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

গো ঃ আপনার সঙ্গে!

অম ঃ আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

গো ঃ আপনার বাড়ীতে। আপনার স্ত্রীর কাছে। আমার বাবার জাত এমনিতেও গেছে, ওমনিতেও গেছে। আপনার স্ত্রীকে বলবো কেন আপনি এ বিয়ে ভেঙে দিলেন!

অম ঃ ছি ছি! তুমি এ সব ফ্যাসাদ বাধিও না।

গো ঃ উপায় নেই। নদীতে ঝড় উঠেছে যে!

অম ঃ তুমি আমার বাড়ীতে গেলে আমি সুইসাইড্ করবো।

গো ঃ তবে আমি অমিয়বাবুর বাড়ীতে যাবো।

অমরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গোখ্‌রোর মুখের দিকে চেয়ে থেকে টপ্ করে ফিরে এসে চেয়ারে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল গোখ্‌রোর দিকে। তারপর চি চিঁ ডাকলো—

অম ঃ ভুবন!

নেপথ্যে ভুব ঃ কী মামা!

অম ঃ অমিয়!

নেপথ্যে অমি ঃ কী মামা!

অম ঃ এদিকে আয়!

সবাই প্রবেশ করলো।

অমি ঃ কী মামা?

ভুব ঃ খ্যি—খ্যি—মামা?

অম ঃ বিয়েটা চোখ বুজে করে নে বাবা! নাহ'লে মামাকে হারাবি শেষটা!

অমি ঃ এ্যাঁ! এতদূর দাঁড়িয়েছে! বেশ, করছি বিয়ে। কনে আনুন।

সদলবলে সবাই ঢুকলো।

গো ঃ [অমরেশকে সম্বোধন করে] মামা! রাগের ঝোঁকে অনেক কু-কথা বলেছি,—বলুন ক্ষমা করলেন?

অম ঃ অমিয়!

অমি ঃ কী মামা?

অম ঃ গোখ্‌রোকে ক্ষমা কর্! আর শোন্! ও যে সব কথা বলেছে, কিছু মনে রাখিসনি। ভট্‌চাযি্য মশায়! বসে আছেন কেন? উলু টুলু দিন।

চাদর দিয়ে বাতাস খেতে লাগলো। বাড়ীর মধ্যে মেয়েদের আনন্দ-কোলাহলের সাথে উলু ও শাঁখ শোনা গেল।

স্বাধীন ভারতের শেষ অধ্যায়

—নরেন্দ্র দেব

ভারত সেদিন ছিল সমাসীন স্বাধীন দেশের উচ্চ চূড়ে;
পৃথ্বীরাজের প্রতাপ তখনও আজমীড় হ'তে দিল্লী জুড়ে!
খায়বার গিরি-বর্ত্ম ভেদিয়া গজনী, কাবুল, কান্দাহার;
আসে পাঞ্জাবে, সিন্ধু প্রদেশে, লুণ্ঠন-লোভে বারংবার।
দিল্লী দখলে আসিয়া সদলে মহম্মদ ঘোরী শেরাফ্‌গান,
পরাজিত হয়ে পালালো যেবারে কোনমতে ল'য়ে আপন প্রাণ,
দিল পথ ছাড়ি দুঃসাহসীরে বীর্যানুরাগী পৃথ্বীরাজ,
ভোলে নাই ঘোরী সেই অপমান; উদ্যত-অসি যুদ্ধবাজ—
এসেছে আবার বহু সেনা ল'য়ে পাঠান পাট্‌ঠা শংকাহীন!
হেঁকে বলে ডেকে—'দিল্লীনগরী যমুনার জলে করিব লীন!'

বাধিল সমর পাণিপথ পাশে—তিরোরি ক্ষেত্রে—স্কন্ধাবারে,
বাজে ঝন্‌-ঝন্‌ অসিতে-অসিতে পাঠান সেনানী বুঝিবা হারে!
পৃথ্বীরাজেরই জয় হয় দেখে জয়চাঁদ জ্বলি ঈর্ষানলে,
ল'য়ে অগণ্য কনোজ-বাহিনী যোগ দিল আসি ঘোরীর দলে!
পুরাতন রাগ ভোলেনি সে আজও, যবে দুহিতার স্বয়ম্বরে
পরাস্ত করি সকল রাজারে পৃথু তুলে ল'য়ে অশ্ব'পরে
রূপসী কন্যা সংযুক্তারে, রাণী করিয়াছে প্রাসাদে আনি,
সেই হ'তে ক্রোধে পৃথ্বীর 'পরে ক্ষিপ্ত হ'য়ে সে রয়েছে জানি।

গৃহশত্রু সে, এনেছে ঘোরীরে নিজে ডেকে পুনঃ আপন দেশে;
পৃথ্বীরাজের যশোগৌরব সে চাহে যাহাতে ধূলায় মেশে!

হেরি জয়চাঁদে পাঠানের দলে—পৃথু ভাবে এ তো স্বপ্ন নয়?
জাতির বিনাশে কেহ কি এমন আপন দেশের শত্রু হয় ?
রাজপুত সেনা নিয়োজিত হ'ল নিজ স্বজাতিরই শক্তি ক্ষয়ে ?
ভেবেকি দেখেনি বিপদ তাদেরও,—তাদেরও লজ্জা এ পরাজয়ে ?
ক্ষণেক অন্যমনা বীরবর; সহসা বক্ষে বিঁধিল আসি—
তীক্ষ্ণ প্রখর বিষাক্ত শর; জয়চাঁদ ওঠে অট্ট হাসি!
হানেনি সে তীর পাঠানেরা কেহ, হেনেছে সে শর স্বদেশদ্রোহী;
দিল্লীর শেষ স্বাধীন নৃপের শোণিতে সেদিন প্লাবিল মহী!
পাণিপথ পাশে তিরোরি সীমায় অস্ত গেল সে দীপ্ত রবি,
ভেবে ভারতের ভাবি দুর্গতি ব্যথিত সে মুখে করুণ ছবি!

সমরসিংহ চিতোরের রাণা সেদিন বিদেশী শত্রুনাশে
লড়িতেছিলেন বীর-বিক্রমে দাঁড়ায়ে পৃথ্বীরাজের পাশে;
হঠাৎ হেরি সে দুঃসহ ক্ষতি—বিপদে ব্যাকুল কাতর প্রাণ,
রাখিতে দেশের সম্মান শেষে আপন জীবন করিল দান!
মেবারের সেই শূর সূর্যও ডুবিল যখন অস্তাচলে,
শোকার্ত সেনা অশক্ত রণে, দৃষ্টি ব্যাহত অশ্রুজলে।
হ'ল পরাজয়, স্বাধীনতা হায়, হারালো সেদিন ভারতবাসী,
দেশদ্রোহী সে গৃহ-শত্রুর শত্রুতা যেন সর্বগ্রাসী!

রাজপুত-কুল-কলঙ্ক সেই কনোজ-পতিরে লভিয়া দলে
পাঠান-শিবিরে ভারত জয়ের মন্ত্রণা নানা নিত্য চলে!

জয়চাঁদ নাকি গোপনে দিতেছে রাজস্থানের খবর যত;
নির্বোধ রাজা ভেবেছে হবেনা কনোজের দশা সবার মতো!
কিন্তু বছর নাহ'তে অতীত দেখে সে পাঠান দুর্নিবার
'দীন' 'দীন' রবে ঘিরিল আসিয়া কান্যকুব্জ প্রবেশ-দ্বার!
অতর্কিত সে আক্রমণের বন্যায় গেল কনোজ ভেসে,
অনুশোচনায় জয়চাঁদ ভাবে মোর সম পাপী নাহি এ দেশে!
রাজপুত নহে নিরাপদ এটা বুঝিয়া মর্মে মহম্মদ
কনোজ রাজ্য কেড়ে নিল বলে, জয়চাঁদে করি অগ্রে বধ!
কুতবুদ্দিন সেনাপতি 'পরে হাসিয়া আদেশ দিলেন তাই—
'পেয়েছি কনোজ অনায়াসে আমি, এবার আমার মেবার চাই!'

কুতবুদ্দিন ঘিরিল চিতোর অযুত পাঠান সেনানী ল'য়ে;
মৃত মহারাণা, গত সেনাপতি, একাকী মন্ত্রী ব্যাকুল হয়ে—
জানায় রাণীরে বিপদের কথা, 'আশঙ্কা বড়ো জেগেছে চিতে;
দিল্লী কনোজ জয় ক'রে ওরা এসেছে এবার মেবার নিতে!'
দুঃসংবাদে চিন্তিত অতি চিতোরের রাণী কর্মদেবী;
মেবার রাজ্য শাসিছেন তিনি প্রকৃতিপুঞ্জে যতনে সেবি।
আদেশ দিলেন—'প্রতি রাজপুত করুক এখনি যুদ্ধ-সাজ,
বজ্র-মুঠিতে ধরুক কৃপাণ রক্ষা করিতে চিতোর আজ।'
নিজে মহারাণী সেনাপতিবেশে রাণার অশ্বপৃষ্ঠে উঠি
লয়ে সশস্ত্র বীর সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন ছুটি।

চিতোর বাহিরে দোবারির ধারে শুরু হ'য়ে গেল ভীষণ রণ,
পাঠানে তাড়াতে লড়ে রাজপুত,—হয় জয়—নয় মৃত্যুপণ!
বীর্যবতীর বীর বিক্রমে বিজিত কুতব, ব্যর্থ-আশ,
ছত্রভঙ্গ পাঠান সেনানী; এরা তোলে ঘন রণোল্লাস!
অযুত কণ্ঠে আরাবল্লীর বজ্র-কঠিন শৈল চিরে
ওঠে জয়রব মেবার-মহিষী মহীয়সী মহারাণীরে ঘিরে।
তারপর সেথা এল দুর্দিন; খালজী, পাঠান, মোগল মিলে,
চিতোর গড়ের গৌরব ক্রমে গ্লানির ধূলায় মিলায়ে দিলে!
কোথা সে রাঠোর? শিশোদীয় সেনা? ঝল্ল, মল্ল, চৌহান আজ?
নিঃশেষ সবে, নির্জিত যবে—দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ!

তর্কে বহু দূর

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত তখন বোম্বে অঞ্চলে ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর বাংলোতে এসেছেন শ্রীঅরবিন্দ। কথায় কথায় বন্দুক ছোঁড়ার কথা উঠলো। শ্রীঅরবিন্দ এর আগে কখনো বন্দুক ছোঁড়েন নি। সকলেই তাঁকে ধরে বসলো, তাঁকে বন্দুক ছুঁড়তে হবে, কেমন তাঁর লক্ষ্য দেখা যাক্। নিশানা ঠিক হলো, একটা দেশলাই-এর কাঠির মাথা। কেমন করে বন্দুক ছুঁড়তে হয়, তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হলো। তিনি বন্দুক তুলে লক্ষ্য ঠিক করে নিলেন, তারপর ট্রিগারে আঙুলের চাপ দিলেন। সবাই ছুটে গিয়ে দেখলো, দেশলাই-এর কাঠির কালো মাথাটা উড়ে গিয়েছে। একবার নয়, যতবার তিনি বন্দুক ছুঁড়লেন, ততবারই নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য ভেদ করলেন। এই একাগ্রতা হলো যোগ-সিদ্ধ।

—আশাপূর্ণা দেবী

সকালবেলা উঠে মুখ ধুতে গিয়েই হারুবাবুর নজরে পড়লো ট্যাপা ঘরে নেই।...সঙ্গে সঙ্গে জুতোর র‍্যাকের দিকে নজর দিলেন, দেখলেন সেখানে ট্যাপার জুতো নেই।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে গায়ের রক্ত মাথায় চড়ে বসলো ভদ্রলোকের। হাঁক দিলেন—ট্যাপা!

সাড়া পাওয়া গেলো না কোনোদিক থেকে।

অতএব সন্দেহ সত্যি। এই সক্কালবেলাই বাবু আড্ডা দিতে বেরিয়েছেন। তবু অনুপস্থিত ট্যাপার ওপর রাগ ফলাতেই বোধ হয় গলার শব্দ আকাশে তুলে ডাক ছাড়লেন—ট্যাপা!

ট্যাপার সাড়া অবশ্য এবারেও পাওয়া গেলো না, তবে ভাঙা কাঁসরের বাদ্যির মতো আর একটি শব্দ পাওয়া গেলো। ঠাকুর-ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে ট্যাপার মেজ-জ্যেঠী বললেন—সক্কালবেলা উঠেই "ট্যাপা ট্যাপা" করে বাড়ী মাথায় করছো কেন ঠাকুরপো, কী দরকার তোমার ট্যাপাকে?

—দরকার আবার কি? হারুবাবু খিঁচিয়ে ওঠেন—সক্কালবেলাই নবাব-পুত্তুরের কোথায় কী রাজকার্য্য পড়লো শুনতে পাই না?

মা-মরা ট্যাপাকে ট্যাপার এই মেজজ্যেঠীই ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, কাজেই ট্যাপা-সংক্রান্ত যা কিছু নালিশ তাঁর আদালতেই পেশ করা হয়।

রোগা লম্বা খটখটে চেহারা, মাথাটি কদম-ছাঁট, পরণে তসর কিংবা মটকার থান ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। পুজো করবার সময় আর শোবার সময় ছাড়া অন্য সব সময় পায়ে একজোড়া পেতলের

গুলো বসানো খড়ম। খড়ম পরেই রান্না-বান্না সব করেন মেজজ্যেঠী।

শুনে অবিশ্বাস করছো? ভাবছো এমন দৃশ্য তো কখনো দেখিনি? অবিশ্বাসের কিছু নেই। জগতে এমন কতো অদ্ভুত দৃশ্য আছে, যা তোমরা কখনো দেখোনি।

—খড়ম তিনি পরেন।

তার কারণ, তাঁর মতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই তো 'মেলেচ্ছ কাণ্ড', তার থেকে নিজেকে যতটুকু বাঁচিয়ে রাখা যায়! খড়ম পরলে তো তবু পৃথিবীর ধুলো-মাটি মাড়িয়ে মরতে হবে না।

ট্যাপাকে তিনি প্রাণতুল্য দেখেন, কিন্তু ওই! এতটুকু 'অনাচার' চলবে না। বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোলেই বাড়ী ফিরে এসে হাত-পা ধুয়ে গঙ্গাজল মাথায় দিতে হবে। বাজারে গেলে কাপড় ছাড়তে হবে। স্কুলের পোষাক-টোষাক রাখবার জন্যে নীচের তলায় কয়লা-ঘুঁটের ঘরে একটা আলনা টাঙানো আছে; ভিজে গামছা পরে, সেইখানে সেইগুলি রেখে এসে গা ধুয়ে মুছে তবে 'বাড়ীর জামা' পরা চলবে।

এছাড়া 'খাবার জামা' 'শোবার জামা' সব আলাদা আলাদা। কে জানে কোনদিন যদি মেজজ্যেঠীর অগোচরে জামা এঁটো করে বিছানা-পত্তর সব মেলেচ্ছ কাণ্ড করে বসে?

এসব কিছু বাড়িয়ে বলছি না বাপু, বরং আরো অনেক আছে।

ট্যাপাতো তুচ্ছ কথা, মেজজ্যেঠীর হাতে তাঁর গুরুদেবের নিস্তার আছে? গুরুদেব নবদ্বীপে থাকেন, মাঝে মাঝে শিষ্যবাড়ী আসতে তো হয়? তা রেলগাড়ী চড়ে আসেন বলে মেজজ্যেঠী তাঁকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে রেখে দোতলার বারান্দা থেকে একঘড়া গঙ্গাজল হড়হড় করে মাথায় ঢেলে দিয়ে, তবে ছুটে নীচে নেমে এসে চরণ বন্দনা করেন।

তাই শীতকালে বর্ষাকালে মেজজ্যেঠীর ভাগ্যে গুরুদর্শন ঘটে না।

গুরু বলে তো আর সত্যি ওয়াটার-প্রুফ্ নন তিনি? প্রাণের মায়াও বিসর্জ্জন দিতে পারেন না!

সে যাই হোক, হারুবাবুর কথার উত্তরে মেজজ্যেঠী বললেন—রাক্ষসের মতো চেঁচিও না বাপু, সে গেছে গঙ্গাস্নানে—

—অ্যাঁ! গঙ্গাস্নানে? তার মানে?

—মানে আবার কি? হিঁদুর ছেলে, গঙ্গাস্নানে গেছে, এটুকুর মানে বোঝাতে মাষ্টার ডাকতে হবে নাকি?

হারুবাবু আর মেজগিন্নী, দুই দ্যাওর-ভাজ তুল্যমূল্য। হারুবাবুও সপ্তমে চড়ে বলেন—হ্যাঁ হবে। সকালবেলা উঠে বলা নেই, কওয়া নেই, ট্যাপা হঠাৎ গঙ্গাস্নানে গেলো, একথা বুঝতে মাষ্টারই লাগবে।

তবে আমিই মাষ্টারী করি—বলে খড়ম খটখটিয়ে বেরিয়ে আসেন মেজগিন্নী। বেশী এগোন না, কি জানি যদি কোথায় কিছু অচ্ছুৎ-জিনিষ মাড়িয়ে মরেন।

হাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে বলেন—বলি কাল রাত্তিরে নেমন্তন্ন খেয়ে আসেনি ট্যাপা? সে কি গঙ্গাজলে হবিষ্যি খেয়েছিলো?...মাংস খায়নি? ডিম খায়নি? প্যাঁজ-রসুন খায়নি? বলে কিনা 'হঠাৎ গঙ্গাস্নান করতে গেলো কেন?' বিলেত থেকে এলে নাকি?

হারুবাবু স্তম্ভিত ভাবে বলেন—মাংস ডিম খেলেই গঙ্গাস্নান করতে হয় ট্যাপাকে?

—আকাশ থেকে পড়লে নাকি? জানো না?

হারুবাবু হঠাৎ গুম্ হয়ে যান। বলেন—না, জানতাম না! কই আমি তো—

—শোনো কথা! তোমাকে আমার কি দরকার? ট্যাপা আমার ঠাকুরের বাতাসা আনে—সময় অসময় আমার ঘরে ঢোকে।

আবার ঘরে ঢুকে পড়েন মেজগিন্নী।

হারুবাবু একচক্কর ঘুরে এসে বলে ওঠেন—গঙ্গাস্নানে গেছে যদি তো জুতো পরে কেন?

—জুতো!

মেজজ্যেঠী আবার বেরিয়ে আসেন।

—কি বললে ঠাকুরপো? জুতো পরে গঙ্গায় গেছে ট্যাপা? ও মা, আমি কোথায় যাবো? আমি যে তাকে আসবার সময় ঘাটের ধারের দোকান থেকে প্যাঁড়া আনতে বলে দিয়েছি গো? জুতো পরে এনে আমার পাঁচ-পাঁচসিকে পয়সাই জলে দেবে গো। আসুক সে একবার! মজা দেখাচ্ছি।

অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে ভাঁড়ারের দরজার কাছে আনাগোনা করতে থাকেন মেজজ্যেঠী।

বৌদির সেই মূর্ত্তি দেখে হারুবাবু যে হারুবাবু, তাঁর মুখেও বাক্য সরে না।

কিছুক্ষণ পরে রঙ্গমঞ্চে ট্যাপার আবির্ভাব।

সে বিনা দ্বিধায় গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ঢুকছিলো, মেজজ্যেঠী 'রে রে' করে ওঠেন—ও হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বড্ডো তুমি সাহেব হয়েছো না? জুতো পরে আমার প্যাঁড়া এনেছো—

ট্যাপা একটু শিউরে উঠেই গম্ভীর ভাবে বলে—প্যাঁড়া আনিনি।

—আনিসনি! তা বেশ, তবু ভালো। তবে দে পয়সা ফেরৎ দে।

—পয়সা তোমায় আমি পরে ফেরৎ দেবো মেজজ্যেঠী।

—পরে? কেন, সে পয়সা কোথায় ফেললি? জলে পড়ে গেছে?

ট্যাপা করুণভাবে বলে—পড়ে যায়নি, ফেলে দিয়েছি।

—ফেলে দিয়েছিস? সক্কালবেলা এসেছিস আমার সঙ্গে তামাসা করতে?

—সত্যি কথা বললে তো তুমি বিশ্বাস করবে না।

—বিশ্বাসের যুগ্যি কথা তা হলে নয়, তাই বল্!

ট্যাপা গম্ভীর ভাবে বলে—সত্যিই নয়, মেজজ্যেঠী, এখন ভাবছি, আমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলাম? বাঁ হাতের মুঠোয় পয়সাগুলো চেপে ধরে ডুব দিতে যাচ্ছি—এমন সময় কে যেন জলের তলা থেকে—না তুমি বিশ্বাস করবে না মেজজ্যেঠী—

মেজজ্যেঠী কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বলেন—বিশ্বাস করা না-করা আমার ইচ্ছে, তুই বল্ই না শুনি!

ট্যাপা একবার মাথাটা চুলকে, একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপি চুপি বলে—কে যেন জলের তলা থেকে বললে—'এই এখানে চলে আয় না!'

মেজজ্যেঠী চমকে উঠে বললেন—তুই ঠিক শুনেছিস্?

—শুনবো না?...একবার কি? একবার দু'বার তিনবার।

—তুই কি বললি?

—বলবো কি? ট্যাপা চোখ গোল গোল করে বলে—ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেলো। হঠাৎ কেন জানি না, হাতের পয়সা ছুঁড়ে জলে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম।

এবারে মেজজ্যেঠী বড়োরকম চমকে ওঠেন।

—চলে এলি? তাহ'লে ডুব দেওয়া হয়নি? ও মা, আমি কোথায় যাবো গো? আর তুই এসে আমার চৌকীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিস্? সেই "মাংস খাওয়া" হয়ে আছিস! হায় হায়, আমি এখন ওই কাঁড়ি বিছানা কি করে কাচি গো!

—বিছানা আমি ছুঁইনি মেজজ্যেঠী!

—না ছুঁসনি! আর যদি বা না ছুঁলি, তোর হাওয়া লাগেনি ওতে?...ওমা ওমা, ওদিকে ওকি সর্ব্বনাশ করলো! মাথাটা খেলো আমার! অ ট্যাপা দেখ্, গয়লা মুখপোড়া দুধের বালতী এনে কোথায় নাবালো!...হায় হায়, এবার দেখছি আমাকে কাশীবাসী হ'তে হবে।...অ হতভাগা উজবুক—

খড়ম খটখটিয়ে গয়লার দিকে ধাবিত হন মেজজ্যেঠী।

ট্যাপা গয়লার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি হেনে চলে যায়।

যাক্, ওর কৃপায় খুব ফাঁড়াটা কেটেছে! মেজজ্যেঠীর জেরার মুখে পড়লে কি আর ওই 'গঙ্গার ডাকের' গল্প টিকতো? জেরার চোটে ঠিক আদায় করে ছাড়তেন। পাঁচসিকে পয়সা বন্ধুর কাছে দিয়ে এসেছে ট্যাপা—'সাগরের ডাক' সিনেমার টিকিট কিনে রাখতে।...কিছুদিন থেকে ভারী চালাক হয়ে গেছেন মেজজ্যেঠী। ভোগা দিয়ে পয়সা আদায় আর চলছে না।

"জুতো পরে আমার প্যাঁড়া এনেছো—" [পৃষ্ঠা ২২৮

'ফাঁড়া কাটলো'—বলে মনের আনন্দে আবার রাস্তায় বেরোচ্ছিলো ট্যাপা, হঠাৎ দরজার কাছে এক সজোর সংঘর্ষ।

বাজার নিয়ে ফিরছিলেন হারুবাবু—হাতে মাছ-তরকারি।

—দেখতে পাস না ব্যাটা নবাবপুত্তুর? কপালে দুটো চোখ নেই? চীৎকার করে ওঠেন হারুবাবু।

ট্যাপা কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবে—কপালের ওপর দুটো চোখ সে তো সকলেরই রয়েছে,—কিন্তু মনে পড়িয়ে দিলেই দোষ। উঃ ছোট হয়ে জন্মানো কি যন্ত্রণাকর।

ট্যাপার যখন ছেলেপুলে নাতি-পুতি হবে, তখন দেখিয়ে দেবে একবার শাসন করা কাকে বলে! উঠতে ধমক, বসতে ধমক।...আঃ সেদিন কি আর ট্যাপার জীবনে আসবে?

ইত্যবসরে মাছ-তরকারি হাত থেকে নামিয়ে হারুবাবু হাঁক দেন—সকালে কোথায় গিয়েছিলি রে?

—ইয়ে—গঙ্গা নাইতে।

—বটে? গঙ্গা নাইতে? শুকনো চুলে লম্বা টেরিটি বজায় রইলো কি করে শুনি? জুতো পরে টেরি কেটে লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে গঙ্গা নেয়ে এলে তুমি? বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছো? খালি আড্ডা, খালি আড্ডা! আবার মিছে কথা!...তোমার এই মিছে কথার শাস্তি হচ্ছে বাড়ীর বাইরে পা দেবে না!...বুঝলে? তিনদিন বাড়ীর বাইরে নয়।

বীর-বিক্রমে চান করতে যান হারুবাবু। তাঁর কথার নড়চড় নেই। ট্যাপার চোখে সমস্ত জগৎ শূন্য হয়ে যায়। তিন দিন বাড়ীতে বন্ধ!

'সাগরের ডাকে' সাড়া দেওয়া চলবে না? নিতাই আর অরুণ সাড়ে পাঁচটার সময় টিকিট হাতে সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, ট্যাপা যেতে পাবে না? এতো বড়ো গ্রীষ্মের ছুটিটায় ট্যাপা মাত্র তিনটি দিন সিনেমা দেখলো। হায়! এতো দুঃখী এ জগতে কে আছে?

লোকেদের বাবা কাকারা কেমন অফিসে চাকরী করে! রবিবার ছাড়া ছুটির বালাই নেই তাঁদের। আর ভাগ্যক্রমে বেচারা ট্যাপার বাবাই কিনা স্কুলের মাষ্টার! অর্থাৎ ট্যাপার ছুটির সঙ্গে ওঁর ছুটির নিবিড় একাত্মতা!

রাগে দুঃখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো ট্যাপা।

খেতে ডাকুন মেজজ্যেঠী, পষ্ট বলে দেবে 'জ্বর হয়েছে।' জ্বরের ছুতো করে না খেয়ে মরবে সে!

শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমই এসে গিয়েছিলো বোধহয়, হঠাৎ ঘুম ভাঙলো—নিতাইয়ের ডাকে।

—কিরে এখনো ঘুমোচ্ছিস? দশটা বাজে যে!

ট্যাপা ধড়মড় করে উঠে বসে বলে—এটা সেকেণ্ড এডিশান! তা'পর?

—তা'পর আর কি? টিকিট কিনে ফিরছি। তোকে খবরটা দিয়ে যাচ্ছি।

—একটা বেচে দিগে যা, আমার যাওয়া হবে না।

—তার মানে?

—মানে শুনবি? শোন্ তবে—

নিতাই ট্যাপার প্রাণের বন্ধু, সব কথাই ওকে বলে। গত রাত্তিরের নেমন্তন্ন খাওয়া থেকে সুরু করে বাবার শাসন-প্রণালী পর্য্যন্ত সব বলে বললে—গঙ্গাস্নানের বদলে, ভুলে একবার বন্ধুর বাড়ী গেলে যার

ফাঁসির হুকুম হয়, তার গঙ্গায় ডুবে মরাই উচিত কিনা তোরাই বল্? শুধু শাসন আর শাসন। মেজজ্যেঠী এদিকে ভালো হলে কি হবে, ওই ছুঁৎমার্গ। দূর দূর, যে বাড়ীতে দৈবাৎ একদিন মাংস খেলে পাকস্থলী অপারেশন করে ফেলবার হুকুম হয়, তাদের বাড়ীতে আবার মানুষ থাকে! চল্ ডুবেই মরিগে।

নিতাই গম্ভীর ভাবে বলে—কোন্ বাড়ীতে যে কি আইন, সে যদি জানতিস রে! তবু সকলেই প্রাণটা টিকিয়ে রাখে ভবিষ্যতের আশায়।
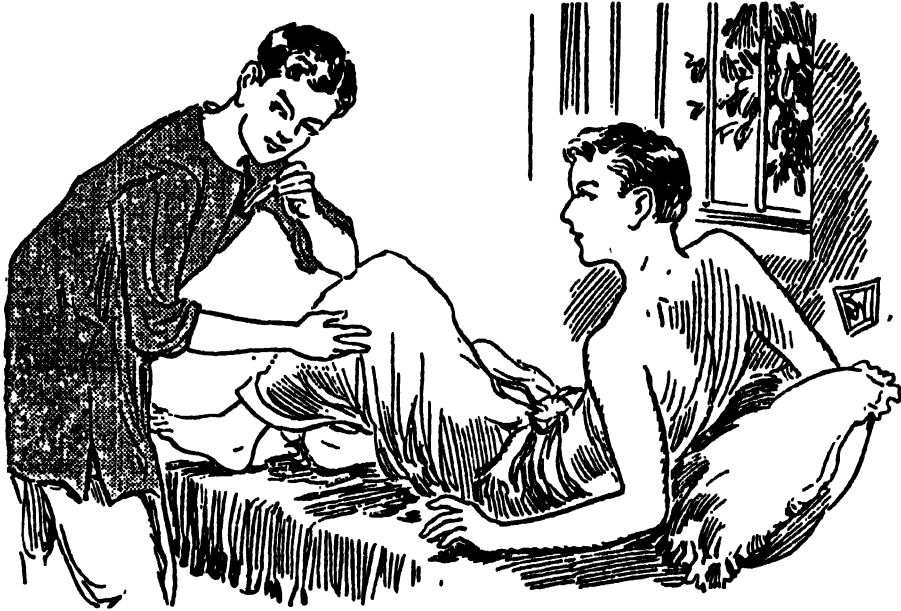
"চল্ ডুবেই মরিগে।"

ট্যাপা মাথার চুলগুলো টানতে টানতে বলে—আমার ভবিষ্যৎই বা কি? বেড়ালে দোষ, খেললে দোষ, কিসে দোষ নয়? বলেছিলাম সাঁতার শিখবো, বাবার মুখ দেখে মনে হলো যেন বলেছি মানুষ খুন করবো!...অথচ রোজ এসে বন্ধুদের বাড়ীর গল্প করেন। কি সব ছেলে তাদের। দেখলে নাকি চোখ জুড়োয়! ফুটবলে কাপ্ পাচ্ছে, সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, দশ বছরের ছেলে তবলা বাজিয়ে মেডেল পাচ্ছে। তার বেলায় দোষ হয় না। কী-লগ্নেই যে আমি জন্মেছিলাম।

নিতাই একটু চুপ করে থেকে বলে—এনাদের সব একটু জব্দ করা দরকার।

—কাকে? মানে কাদের?

—এই—আমাদের গার্জেনদের।

—কী করে?

উৎসাহে উঠে বসে ট্যাপা।

নিতাই গম্ভীর ভাবে বলে—সে একটু নির্জ্জনে পরামর্শর দরকার। চল্ ছাতে যাই।

—এই রোদ্দুরে?

—তাতে কি? মরতেই যখন চলেছিস!

ঠিক এর দু'দিন পরে হঠাৎ বাড়ীতে হারুবাবুর ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন শোনা গেল। ট্যাপা নাকি ভোর বেলা বেরিয়ে গেছে, রাত্তির নটা বেজে গেছে, এখনো আসেনি। ভাত পর্য্যন্ত খায়নি।

মেজজ্যেঠী কিছুক্ষণ লুকিয়ে-চুরিয়ে ঝি-চাকরদের দিয়ে খুঁজিয়ে ছিলেন, এখন কান্না জুড়ে দিয়েছেন।

হারুবাবু যতো তর্জ্জন করেন—এতো বড়ো আস্পদ্দা? ভেবেছে কি লক্ষ্মীছাড়া পাজীটা। আসুক দেখি কে ওকে বাড়ী ঢুকতে দেয়—

মেজজ্যেঠী ততো কাঁদেন—ও ঠাকুরপো, আমার মন নিচ্ছে—সে আর নেই। মা গঙ্গা তাকে ডেকেছিলেন, সে বলেছিলো, আমি গ্রাহ্য করিনি। সে নিশ্চয় ডুবে মরেছে।

—ডুবে মরেছে! হারুবাবু খেঁই খেঁই করতে থাকেন—তার চোদ্দপুরুষে কেউ ডুবে মলো না, আর সে তোমার ডুবে মরলো? ডুবে মরা অতো সস্তা নয়।...আড্ডা, আড্ডা, স্রেফ্ আড্ডা। ওই যে অকালকুষ্মাণ্ড চারটি বন্ধু জুটেছে, ওরাই মাথা খেলে।

হারুবাবুর গর্জ্জন প্রথমটা বাড়তে বাড়তে আকাশে ওঠে...কিন্তু ক্রমশঃ যখন রাত গভীর হয়...তখন কেমন কমতে থাকে। শেষ অবধি খানিকটা গুম্ হয়ে বসে থেকে রাত্তির একটার সময় ছোটেন—থানায় থানায় আর হাসপাতালে হাসপাতালে ফোন করতে।

পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, চাকরটাকে তার বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী পাঠান কিন্তু না, ট্যাপার পাত্তা নেই!

এইবার মেজজ্যেঠী ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন।

আর হারুবাবু ভয়াবহ চেহারা নিয়ে বাইরের রোয়াকে বসে থাকেন।

আজ প্রথম মনে পড়ে জীবনে তিনি কোনোদিন ছেলেটাকে ভালো কথা বলেননি, একটু কাছে-পিঠে করেননি। মা-মরা ছেলেকে বাপ কতো স্নেহ করে। হায়! হায়! কেন এমন রাক্ষুসে স্বভাব তাঁর?...হে ভগবান, এবারটা যদি ভালোয় ভালোয় পাওয়া যায় তো বাকী জীবনটা দেখিয়ে দেবেন তিনি পিতৃস্নেহ কাকে বলে!

ওদিকে মেজজ্যেঠী? কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা বিলাপ করছেন তার সারমর্ম্ম এই—ট্যাপা, তুই ফিরে আয়, আমি তোকে আর কোনোদিন 'চান করা' 'কাপড় ছাড়া' নিয়ে, গোবর-গঙ্গাজলের ছায়া মাড়াতে দেবো না। তুই মুরগী শূয়োর যা প্রাণ চায় খেয়ে দেয়ে শুধু প্রাণে বেঁচে থাক্।...ইত্যাদি...ইত্যাদি...।

কিন্তু হায়! যার জন্যে এতো কাণ্ড, সে ট্যাপা কই?

ক্রমে সকাল হলো...খোঁজার পালা আরও বাড়লো, আবার থানায় থানায় হাসপাতালে হাসপাতালে ফোন।

সকাল গেলো, দুপুরও যায় যায়...এমন সময় নিতাইয়ের আবির্ভাব।

—কাকাবাবু!

চমকে তাকান হারুবাবু।...এই সেই অকালকুষ্মাণ্ডদের একটা কুষ্মাণ্ড না? কিন্তু আজ আর একে দেখে দুই চোখে অগ্নিবাণ বর্ষণ নয়। পরম স্নেহে ছুটে আসেন হারুবাবু।

—কে? ট্যাপার বন্ধু না তুমি? এসো বাবা!...তোমাদের বন্ধু আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে বুঝি! প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন ভদ্রলোক।

নিতাই করুণ কণ্ঠে বলে—কাকাবাবু, তরুণ বলছিলো—ওর জামাইবাবু নাকি বলছিলো ট্যাপার মতো কাকে দেখেছে।

—অ্যাঁ অ্যাঁ। কে দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

—তরুণের জামাইবাবু! দক্ষিণেশ্বরে থাকেন কি না, আজ এসেছেন। বলছেন ট্যাপার মতো কাকে না কি মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে থাকতে দেখেছেন সকালে।

—দেখেছে? আমার ট্যাপাকে দেখেছে? সে চেনে আমার ট্যাপা মাণিককে।

নিতাই কোঁচার কাপড়ে মুখ মুছতে থাকে। মোছা আর শেষ হতে চায় না, একটু পরে মুখ গম্ভীর করে বলে—কবে যেন একদিন দেখেছিলেন! আমি অবিশ্যি তেমন বিশ্বাস করিনি, তবে বলছিলাম যদিই পাওয়া যায়—

—তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক বাবা—দাঁড়াও তুমি একটু। যদি তোমাদের কথায় ফেরে! বাড়ীতে ওর জ্যেঠীকে বলে আসি—

শুনে মেজজ্যেঠী চীৎকার করে উঠলেন—ও ঠাকুরপো, আমিও যাবো। আমি তাকে হাতে পায়ে ধরে নিয়ে আসবো। তার যা প্রাণ চায়, করুক। সে আমার অভিমান করে চলে গেছে।

—জানি না খবর সত্যি কি না! তবু—যাবে তো চলো।

ট্যাক্সী-ড্রাইভারকে নোটের গোছা ধরে দিতে হবে। তা'হোক, তবু তো তাড়াতাড়ি যাওয়া হবে!...ট্যাক্সী একখানা ভাড়া করে ছুটলেন—হারুবাবু, মেজজ্যেঠী, নিতাই আর তরুণ।

—কোথায় দেখেছে বলেছিলো? হ্যাঁ বাবা ইয়ে?

—ওই যে পঞ্চবটীর কাছে না কি। চলুন না।

—হে ভগবান, মুখ তুলে চেও। হে মা কালী, তোমার ষোলো আনা পূজো দিয়ে যাবো।—বলতে বলতে চলেন মেজজ্যেঠী।

হ্যাঁ, ভগবান মুখ তুলে চান।

মা কালীর বোধহয় ষোলো আনা পুজোর লোভ প্রবল হয়ে ওঠে।...পঞ্চবটীর বাঁধানো তলায় বসে থাকতে দেখা গেলো ট্যাপাকে।...

কিন্তু সে কি ট্যাপা?

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা!"
[পৃষ্ঠা ২৩৩

তাকে কি ট্যাপা বলে চিনতে পারা যাচ্ছে?

গায়ে ভস্ম মাখা, পরণে গেরুয়া। মুখে উদাস ভাব, চক্ষু মুদ্রিত।

হারুবাবু সামনে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ান।

নিতাই আর তরুণ পিছনে দাঁড়িয়ে নিজেরা ঠেলাঠেলি করতে থাকে, মেজজ্যেঠী নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকেন সত্যিই ট্যাপা কি না!

তারপর?

তারপর এক কর্ণ-বিদাবী বজ্র-নির্ঘোষ। ট্যাপা! হতভাগা ষ্টুপিড্! বাঁদর, গাধা, জেব্রা, জিরাফ! ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি?

কানের টানে সোজা উঠে দাঁড়াতে হয় ট্যাপাকে! সত্যি ট্যাপার কানটা হারুবাবুর হাতে থেকে যাবে, ট্যাপা তবুও বসে থাকবে, এটা তো সম্ভব নয়?

—বাড়ী চলো নদের চাঁদ, দেখো তোমায় কি করি! চল্ বলছি—চল্ শীগ্‌গির!

হঠাৎ হারুবাবুর গলার স্বর ছাপিয়ে ভাঙা কাঁসরের বাদ্যি বেজে ওঠে—

'চল শীগ্‌গির' মানে? দুম্ করে গেলেই হলো? আমার সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতে হবে না?...কাল থেকে বাড়ীছাড়া হয়ে কোথায় না কোথায় ঘুরছে, কি মাড়িয়েছে, কি ছুঁয়েছে, তার ঠিক কি?...গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে চলুক!...আয় আমার সঙ্গে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! আবার গেরুয়া পরে সঙ্ সাজা হয়েছে!

বাবার হাত থেকে জ্যেঠীর হাতে কানটা ট্র্যান্সফার হয়ে যায়।

খড়ম খট্‌খটিয়ে আগে এগিয়ে চলেন মেজজ্যেঠী সঙ্গে সঙ্গে ট্যাপা। ভাগ্যক্রমে এটা অন্যদিকের কান, তাই রক্ষে, নইলে হয় তো—শুধু কানটাই মেজজ্যেঠীর হাতে চড়ে গঙ্গাস্নানে যেতো।...ট্যাপা দাঁড়িয়ে পড়তো।

বন্ধুরা? তারা অনেকক্ষণ হাওয়া।

ট্যাক্সী চড়ে বাড়ী ফেরবার সুখে আর দরকার নেই তাদের।

তর্কে বহু দূর

জল, না সুরা?

রামপ্রসাদ তখন তন্ত্রের প্রথামত কালীর পূজো করতেন। গাঁয়ের লোকেরা তাঁর নামে নানারকম অপবাদ দিয়ে জমিদারের কাছে নালিশ করলো। তারা বল্লো, রামপ্রসাদ মাতাল, রাতদিন মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে। জমিদার রামপ্রসাদকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গাঁ ছেড়ে রামপ্রসাদ যেদিন চলে যাচ্ছেন, সেদিন জমিদার বাড়ীতে শ্রাদ্ধের ঘটা। জমিদারের মা মারা গিয়েছেন। গাঁ শুদ্ধ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছে, একমাত্র রামপ্রসাদ বাদ। রামপ্রসাদ যেতে যেতে শ্রাদ্ধ-বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সবাই দূর দূর করে উঠলো। রামপ্রসাদ হাত জোড় করে বলেন, আমি তো চলেই যাচ্ছি, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাও। জমিদারের আদেশে একজন জল এনে দিলো। জল খেতে গিয়ে রামপ্রসাদ বল্লেন, একি, জল খেতে চাইলাম, মদ দিলেন কেন? জমিদার তো রেগে অগ্নিশর্ম্মা। কি আমার বাড়ীতে মদ? কিন্তু যত বারই রামপ্রসাদের জন্য জল আনা হয়, ততবারই তা থেকে তীব্র মদের গন্ধ বেরোয়। তখন জমিদার বুঝতে পারলেন, রামপ্রসাদ সাধারণ লোক নন্। তিনি ক্ষমা চেয়ে রামপ্রসাদকে গ্রামে রাখলেন।

—পরিমল গোস্বামী

আলিপুরের চিড়িয়াখানাটি তোমরা অনেকেই দেখেছ, কিন্তু রাত্রে দেখেছ কি?

অনেক রাত্রে—যখন ঘরে ঘরে মানুষ ঘুমোয়, বনে বনে পশুরা ঘুমোয়, গাছে গাছে পাখীরা ঘুমোয়, তখন?

এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখা যায় তখন। তোমরা আর তা দেখবে কি ক'রে, বল? রাত্রে সেখানে থাকবার নিয়ম নেই কি না।

আমি কিন্তু একদিন সমস্ত রাত ধ'রে দেখেছি চিড়িয়াখানার সব কাণ্ড।

ঐ যে হ্রদের ধারে লম্বা গাছটায় কালো কালো সব বাদুড় ঝুলে থাকে, যার কাছে লম্বাগলা জিরাফের বাড়ি, মনে আছে জায়গাটা? ফেজান্ট পাখীদের ঘর ডানহাতি ক'রে সে দিকে যেতে একটা সাঁকো আছে। তারই বাঁ-পাশে ঝাঁকড়ামাথা গাছের নিচে আছে একখানা বেঞ্চি পাতা। একদিন চিড়িয়াখানায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সেই বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে হাঁসেদের সাঁতার কাটা দেখছিলাম। কি যে আরাম হচ্ছিল।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। আর শুধু আমি জানি না তাই নয়, চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং পশুপাখীদের যারা দেখাশোনা করে, তারাও কেউ জানে না।

রাত তখন দুটো। হঠাৎ একটা লাফানোর শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু ঘুম ভেঙে প্রথমে বুঝতেই

পারছিলাম না আমি কোথায়। তার পর আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। ভয় হল খুব।

অন্ধকার রাত, তার উপর মেঘে ঢাকা আকাশ, চারদিকে কিছু দেখা যায় না। ভাগ্যিস আমার ঘড়িটায় ছিল রেডিয়ামের কাঁটা, তাই সময়টা বুঝতে পারলাম। আমি কোথায় তাই বুঝতেই লাগল এক মিনিট পঁচিশ সেকেণ্ড।

যখন বুঝলাম এই গভীর রাত্রে আমি একা, এই সব হিংস্র বাঘ সিংহ সাপ কুমীরের উপনিবেশে আছি, তখন ভয়ে আমার সকল গা কাঁটা দিয়ে উঠল। আর সে কাঁটা রেডিয়ামের কাঁটা নয়।

চার ধারে জনমানবের সাড়া নেই এবং রাত দুটো। চেঁচাতে গিয়ে চুপ ক'রে গেলাম। গলা দিয়ে ঠিকমতো আওয়াজ বেরোল না। মনে পড়ে গেল, কার লাফানোর শব্দে জেগে উঠেছি।

সেই অন্ধকার রাত্রে তারপর কি কাণ্ড ঘটল, বলতেও বুক কেঁপে উঠছে। আমারই প্রায় কানের পাশে মানুষের মতো ভাষায় অথচ পশুর মতো গলায় "কে তুমি এখানে—গোঁ-গ্রো-গ্রো-গ্রোঁ? বড় যে চোরের মতো রাত্রে আমাদের এই উপনিবেশে ঢুকে পড়েছ? জান, এখানে রাত্রে কোনো মানুষের আসা নিষেধ?"

এই প্রশ্ন শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি আর কি। আমার গায়ের চামড়া ব্যাঙের মতো ভিজে উঠল, গা কুমীরের মতো কণ্টকিত হল, মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল, কাঁপতে কাঁপতে বেঞ্চি থেকে প'ড়ে গেলাম, কিন্তু বেঞ্চির হেলান দেওয়া পিঠের সঙ্গে দুখানা পা আটকা প'ড়ে বাদুড়ের মতো ঝুলতে লাগলাম।

"ভয় নেই, আমি ক্যাঙারু।" [পৃষ্ঠা ২৩৮

কিন্তু এমন অবস্থাতেও সেই জন্তুটা আমাকে বলে কি না যে চালাকি ক'রে ঝুলে থাকলে চলবে না, বল তুমি কে এবং কেন এসেছ এখানে, নইলে বাঘ সিংহ, সবাই খাঁচা থেকে বেরিয়ে বাগানময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটুখানি খবর দিলেই তোমার দফা শেষ। জান তো বাঘ, সিংহ, ওরা এক যাদুকরের কাছ থেকে ম্যাজিক শিখেছে, খাঁচা থেকে ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে আসতে পারে?

আমি প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় ক'রে বেঞ্চি থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে ব'সে পড়লাম এবং কাতর ভাবে প্রশ্ন করলাম, "দয়া ক'রে তুমি কে আগে বল, আমার সব কথা তোমাকে বলব। আমি

ইচ্ছে ক'রে এখানে আসিনি। তোমার পায়ে পড়ি, আমার বিরুদ্ধে বাঘ বা সিংহের কাছে কিছু ব'লো না।"

আমার এই নরম সুরে জন্তুটির মন ভিজল, আমার উপর তার বড়ই দয়া হল। বলল, "ভয় নেই, তোমার কথা সব বল, আমি ক্যাঙারু।"

"ক্যাঙারু? খুব ভাল, আমি ক্যাঙারুদের সব কথা জানি। তোমরা হচ্ছ থলেধারী জন্তু, marsupial quadrupeds; এই নাম দেওয়া হয়েছে কারণ, তোমাদের পেটে marsupium বা থলে আছে; তোমাদের দেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এবং কাছাকাছি দ্বীপে।"

ক্যাঙারু এইটুকুমাত্র শুনেই একেবারে গদ্‌গদ হয়ে বলল, "ব্যাস, আর কিছু বলতে হবে না; তুমি আমাদের বংশ-পরিচয় যখন জান, তখন তুমি বন্ধুলোক, তোমাকে সব বলছি, শোন। আমি হচ্ছি এই চিড়িয়াখানার এক ডাকপিওন। আমার পেটের থলেতে চিঠি পোরা আছে, বিলি করে বেড়াচ্ছি ঘরে ঘরে। বাঘ সিংহ এদের চিঠি বিলি হয়ে গেছে, এখন বাকী কেবল চীল, ফ্লেমিঙ্গো আর ময়ূরের। আজ চিঠি নেই বেশি। শুধু গাধার নামে একটা প্যাকেট আছে।"

আমি তো শুনে অবাক! চিড়িয়াখানায় চিঠি বিলি হয় সবার কাছে, চিঠি লেখেই বা কে এবং এখানে আনেই বা কে? তা ছাড়া চিঠি ওরা লিখতে পারে, পড়তে পারে, এবং মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে, একি অসম্ভব কাণ্ড! একবার মনে হল স্বপ্ন দেখছি না তো? নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, না, স্বপ্ন নয়, কারণ এ স্বপ্নের চেয়েও অদ্ভুত।

ক্যাঙারুকে সোজা জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কি ক'রে সম্ভব আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে?"

ক্যাঙারু বলল, "না বোঝবার মতো কিছু নয়। তোমরা চিরকাল পশুপাখীর মুখে মানুষের ভাষা বসিয়ে কত কাহিনী লিখেছ, তা কি ভুলে গেলে? তোমাদের রূপকথায়, হিতোপদেশে, ঈসপের গল্পে পশুপাখী মানুষের ভাষায় কথা বলেছে। অথচ এ সব কল্পনা ক'রেই লেখা। আজ তুমিও যদি সেই রকমই কল্পনা কর, তা হলে ক্ষতি কি? আজ এই অন্ধকার রাত্রে, এই বিরাট পশুপাখীর উপনিবেশে তুমি একা মানুষ যদি একটি রাতের জন্যও কল্পনা কর যে তোমাদের আর আমাদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, তা হলে ক্ষতি কি?"

ক্যাঙারুর কথাগুলো বড়ই ভাল লাগল, বললাম, "আমি তো কল্পনা করতেই ভালবাসি, কোনো ক্ষতি নেই, তুমি আমাকে তোমাদের সব কথা বল।"

ক্যাঙারু বলল, "মাত্র দুটি মিনিট অপেক্ষা কর, আমি এই প্যাকেটটি গাধাকে দিয়ে আসি, নইলে এক বিষম কাণ্ড বেধে যাবে।"

"কিসের প্যাকেট? আর দেবেই বা কাকে? গাধা তো এখানে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।"

"গাধা আছে এখানে। জেব্রাদের মধ্যে একটি নকল জেব্রা আছে। এক গাধা গায়ে ডোরা কেটে জেব্রা সেজে আছে। সে ডাক-যোগে গান শেখে এক গানের স্কুলে। তোমরা যাকে "করেস্‌পণ্ডেন্স স্কুল" বল, সেই রকম এক স্কুল।"

"ডাক-যোগে গাধা গান শেখে?—বল কি?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, এই প্যাকেটে গানের দ্বিতীয় পাঠ আছে। গান রেকর্ড করাবে, এই ওর আশা।

তাই এ প্যাকেট বিলি করতে দেরি হলে কেঁদে অস্থির হবে।"

ক্যাঙারু তিন লাফে চলে গেল। আমি এইখানকার এই অদ্ভুত সব ব্যাপারের কথা ভাবতে লাগলাম একা বসে বসে। কিন্তু আমি কি নির্বোধ? ওদের এত চিঠি আসে বাইরে থেকে, কিন্তু চিঠি বাইরে থেকে আনে কে, সে কথা তো জিজ্ঞাসা করিনি।

নিজে ভেবেও কোনো কিনারা করতে পারলাম না। এমন সময় ক্যাঙারু যেমন তিন লাফে গিয়েছিল, তেমনি তিন লাফে ফিরে এলো। এসে একটুও না হাঁফিয়ে সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "ভয় পাওনি তো একা একা?"

আমি বললাম, "না, ভয় পাইনি, কিন্তু একটা কথার মীমাংসা করতে পারছি না। তোমরা বাইরে থেকে চিঠি পাও, কিন্তু সে সব চিঠি আনে কে? এ তো আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না।"

ক্যাঙারু হেসে বলল, "এই কথা? তবে শোন, কিন্তু ব'লে দিও না কাউকে। বাইরে থেকে চিঠি আনে যে সব হাজার হাজার হাঁস বাইরে থেকে উড়ে আসে, তারা। এখানকার হ্রদে দিনের বেলা দেখো, ওদের জন্য জলই ঢাকা পড়ে যায়, এত আসে। কত জায়গা থেকে যে ওরা আসে! তার জন্য ওরা রীতিমতো মাইনে পায়। নইলে এখানকার ছোট্ট এক হ্রদে সাঁতার কাটবে ব'লে তো আর আসে না। ওটা হচ্ছে লোক-দেখানো। হ্রদ কত আছে পৃথিবীতে, হাজার হাজার আছে, তা ফেলে আলিপুরে আসবে কেন ওরা, বুঝে দেখ কথাটা।"

আমি বললাম, "এখন বুঝতে পেরেছি, তোমার কথাই ঠিক। ওরা দেশ-বিদেশের চিঠি নিয়ে আসে বলছ, কোন্ কোন্ দেশের আনে?"

"এই তো বাঘের চিঠি এসেছে আজ বিলেত থেকে।"

"বল কি! বিলেত থেকে?"

"হ্যাঁ। এখানে যে বাঘটা প্রায় সারাদিন গর্জন ক'রে বেড়ায় খাঁচার মধ্যে, তার বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলায়, কিন্তু তার সহোদর ভাই থাকে বিলেতের হুইপস্নেড পার্কে।"

"এ নাম তো কখনো শুনিনি, হুইপস্নেড পার্ক—সে আবার কি?"

"সে কি, আমিই কি আগে তা জানতাম? ওখানকার চিঠি থেকে তবে তো জানতে পেরেছি। আমার নিজেরই এক মাসি থাকত সেখানে। বড় ভাল লোক ছিল সে। 'লোক' বলছি, হেসো না। সে মারা গেছে সেদিন, আমার মেসো জানিয়েছে চিঠি দিয়ে।"

বলতে বলতে ক্যাঙারুর গলাটা ধরে এলো, বোধ হয় চোখও মুছল দুখানা হাত দিয়ে।

আমি বললাম, "তবে থাক্ ও সব কথা।"

ক্যাঙারু বলল, "না, না, ও কিছু না, শোন। বাঘের ভাই বিলেত থেকে লিখেছে সে সেখানে বেশ সুখে আছে; কারণ তাকে এমন এক উপনিবেশে রাখা হয়েছে যেখানে খাঁচা নেই, ঠিক যেমন জলপাইগুড়ির জঙ্গলে থাকত। তা ছাড়া আসামের এক বাঘিনী আছে সেখানে। সে দন্ত্য স-কে "হ" বলে, তাতে অবিশ্যি কোনো অসুবিধা হয় না ওদের, কারণ এখন ওরা দুজনেই ইংরেজী শিখে গেছে এবং ইংরেজীতে মোটামুটি কথাবার্তা চালাতে পারে! কিন্তু এই চিঠি পেয়ে আলিপুরের বাঘেরা বেজায় অস্থির হয়ে উঠেছে, তারা সবাই বিলেত যাওয়ার জন্য প্রায় ক্ষেপে উঠেছে। বলছে, স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়? লণ্ডন

এবং অন্যান্য শহরের যে সব চিড়িয়াখানায় পশুরা বন্দী থাকে, তারা সবাই এক জোট হচ্ছে ধীরে ধীরে।"

আমি বললাম, "হাঁসেরা যে চিঠি নিয়ে আসে, নিয়ে যায়, আর তোমরা যে চিঠি বিলি ক'রে বেড়াও, এতে তোমাদের লাভ কি? কার জন্য এসব কর?"

ক্যাঙারু বলল, "বা! এতে যে আমাদের সবারই লাভ! আমরা সবাই এই ভাবে আত্মীয়-স্বজনের খবর পাই। সে তো এই পরস্পর সহযোগিতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। এইভাবে দুনিয়ার পশুপাখী ক্রমে একও হচ্ছে। যে হাঁসেরা এয়ার-মেল বহন করছে এইভাবে, সেই হাজার হাজার হাঁস এর জন্য অবশ্য কিছু কিছু মাইনে পায়, প্রশংসা তো পায়ই। তা ছাড়া ধর না কেন, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে যা তোমরা মানুষেরা কল্পনাই করতে পার না! তবে বলতে পার, আমরা এক পশু অন্য পশুকে খাই কেন! কিন্তু সে তো বাধ্য হয়ে। তোমরাও পশুপাখী খাও। ঐ ভাবেই আমাদের গড়া হয়েছে, তাতে আমাদের দোষটা কি শুনি? আমরা নিজেরা নিজেদের খাই না, তোমরা মানুষেরা কিন্তু পরস্পরকে খাও। তাই নয় কি?"

আমি চুপ ক'রে ভাবতে লাগলাম।

ক্যাঙারু বলল, "যাকগে ওসব, আমি আসছি এখুনি চিঠিগুলো বিলি ক'রে।"

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম ক্যাঙারুর কথা। সত্যি কথাই বলেছে সে। মানুষে মানুষে শত্রুতা কবে যে ঘুচবে! একটা অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারুর কাছে আমি মানুষ লজ্জা পেলাম, এতে মনটা বড়ই দমে গেল। নিজেকে বড়ই ছোট মনে হতে লাগল। বসে বসে এই সব ভাবছি এমন সময় ক্যাঙারু ফিরে এলো এবং এসেই বলল, "খুব ভাল খবর আছে।"

"কি রকম?"

"পশুদের একটা দল প্রকাণ্ড এক দরখাস্ত লিখেছে—বাংলাদেশে একটা ন্যাশন্যাল পার্ক গঠনের জন্য। বাঘ নিজে দরখাস্তটি রচনা করেছে। আমাকে শুনিয়েছে সে তার লেখা। সে লিখেছে—বাংলাদেশের সকল শিকারী বেপরোয়া ভাবে বাঘ মেরে মেরে আমাদের বনিয়াদি ব্যাঘ্র-বংশ ধ্বংস ক'রে ফেলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আমরা আপনার কাছে এর প্রতিকারপ্রার্থী। শুধু বাঘ নয়, বনের যাবতীয় পশুর প্রতি তাদের ঐ একই রকম অন্যায় ব্যবহার। শুনেছি আপনাদের নির্দেশ আছে, কোনো পশু-বংশ লোপ করা চলবে না, কিন্তু এ নির্দেশ ক'জন মানে? বাঘ থাকতে বাঘের মর্যাদা মানুষ বুঝবে না—বাঘ-বংশ লোপ পেলে তখন হায় হায় করবে। অতএব প্রার্থনা, আমাদের জন্য দেশ-বিদেশে যেমন সব পশুদের পার্ক আছে, সে সবের চেয়ে আরও বড় এবং ভাল একটি পার্ক তৈরি ক'রে দেওয়া হোক। জলপাইগুড়িতে বা কাছাকাছি যে সব 'স্যাংচুয়ারি' আছে, সেগুলো ভাল রক্ষার ব্যবস্থা নেই। তাই আমরা নতুন একটি ন্যাশন্যাল পার্ক চাই। এই পার্কে ভারতীয় সকল পশু (নরাধম পশুদের কথা বলছি না) থাকবে। এভাবে থাকলে তাদের বংশ লোপ হবার ভয় থাকবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এতে সবাই সই করেছে?"

"সবাই করেনি, কারণ সবাই তো আর ভারতীয় পশু নয়। জিরাফ, জেব্রা, উটপাখী, আমি এবং আরও অনেক বিদেশী প্রাণী সই করিনি। আমরা বিদেশীরা সই করলে দরখাস্তের জোর কমে যেত।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "আমাদের দেশে যারা খাদ্যে ভেজাল মেশায়, ওষুধে ভেজাল মেশায়,

তাদেরও তো আমরা বলি পশু। এর পরে কি তারাও দরখাস্ত পাঠাবে যে পুলিসের হাতে আমাদের বংশ লোপ হচ্ছে, অতএব আমাদের জন্য একটি ন্যাশন্যাল পার্ক বানিয়ে দাও।"

ক্যাঙারু বলল, "তা অসম্ভব নয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বিদেশীরা না করুক, দেশী জন্তুরা সবাই করেছে তো? বাদুড় সই করেছে?"

বাদুড়ের গাছটি আমার সামনেই ছিল। তাদের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই এই পাখাওয়ালা জন্তুদের কথাটি আগে মনে এলো।

ক্যাঙারু বলল, "তা বুঝি জান না? জিরাফকে দিয়ে বাদুড়দের অনুরোধ করানো হয়েছিল কিন্তু অনুরোধ রাখেনি। জিরাফ এতকাল বাদুড়দের কাছাকাছি বাস ক'রে এসেছে, আর তার গলাও খুব লম্বা, তাই সবাই ভেবেছিল, কথা রাখবে। কিন্তু বাদুড়দের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে ভারতীয় পশুদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হলেও বাদুড়দের দলপতি বলেছে, "আমাদের কাছে কেন? আমরা তোমাদের খাই না পরি? আমরা স্বাধীন। এই গাছটি আমাদের একটি আলাদা উপনিবেশ—তোমাদের গোয়া বা পণ্ডিচেরির মতো। বেশি বিরক্ত কর তো 'মার্কিন এড্' চেয়ে বসব।"

"তার পর কি হল?"

"থাক্ সে কথা। শোন। তোমার কথা আমি সবাইকে বলে দিয়েছি। গোরিলা খুব চতুর, সে বলল, ঐ মানুষটাকে কাজে লাগাও। এই দরখাস্তখানা ওকে দিয়েই পাঠিয়ে দাও প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তাই সেখানা তোমার কাছে একেবারে নিয়েই এসেছি। তুমি কথা দাও, দরখাস্তখানা তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে?"

"দরখাস্তখানা যেন ঠিক জায়গায় পৌঁছয়।" [পৃষ্ঠা ২৪২

আমি বললাম, "নিশ্চয় দেব, কিন্তু এখান থেকে বেরোব কি ক'রে? সকাল হলেই যে ধরা প'ড়ে যাব।"

ক্যাঙারু বলল, "কোনো ভাবনা নেই। একটুক্ষণ অপেক্ষা কর।"

ক্যাঙারু আবার তিন লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং মিনিট দুই পরে ফিরে এসে বলল, "আমি একা আসিনি এবারে, ভয় পেয়ো না, আমার সঙ্গে জিরাফ আছে,—আর,—বাঘ আছে।"

ক্যাঙারুর কথায় বিশ্বাস করেছি আগেই, তাই আর ভয় পেলাম না, বললাম, "বেশ তো, কি করতে হবে বল।"

বাঘ ঠিক যেন মেঘ ডাকছে এমনি মধুর স্বরে বলল, "দরখাস্তখানা যেন ঠিক জায়গায় পৌছয়।"

জিরাফ বলল, "এই দড়িগাছা বুকে জড়িয়ে বেঁধে নাও।"

আমি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দড়িগাছা নিয়ে জিরাফ যেমন বলল ঠিক তেমনি বুকে জড়িয়ে বাঁধলাম। কেন, জিজ্ঞাসা করলাম না; মনে মনে ভেবে নিলাম ওদের মাথায় একটা কিছু মতলব গজিয়েছে।

জিরাফ দড়ি কামড়ে ধ'রে আমাকে উঁচুতে তুলে নিল, ঠিক যেন চড়ক গাছে ঝুলছি। তারপর সে দ্রুত এগিয়ে গেল চিড়িয়াখানার প্রাচীরের দিকে। বাঘ ও ক্যাঙারুও সঙ্গে সঙ্গে এলো। আমি শুনতে পেলাম, বাঘ ক্যাঙারুর কানে কানে বলছে, "লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়.তো? যা বলছে তা করবে তো?"

ক্যাঙারু বলল, "বিশ্বাসী ব'লেই তো মনে হয়।"

যতদূর সম্ভব ঘাড় নিচু ক'রে নামিয়ে দিল।

তার পর জিরাফ আমাকে দেওয়ালের বাইরে যতদূর সম্ভব ঘাড় নিচু ক'রে নামিয়ে দিল, কিন্তু জিরাফের গলা যত লম্বাই হোক, দেওয়ালের বাইরে জমি তো আর সে ছুঁতে পারে না, তাই আমাকে ধপাস করে নিচে পড়তে হল প্রায় চার পাঁচ ফুট। পায়ে চোট লাগল খুবই।

তার পর মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম কি না, কিছুই মনে পড়ে না। দরখাস্তখানাও পকেটে আর খুঁজে পাইনি। তাই যতটা মনে আছে তাই লিখে রাখছি—পশুদের জন্য বাংলাদেশে একটা বড় পার্ক হওয়া উচিত, এ বিষয়ে ওদের সঙ্গে আমি একমত। আমি ওদের হয়ে সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

● মণি ও মুক্তো

একদিন ছিল যখন বন্ধুর জন্যে আত্মত্যাগ করা ধর্ম্ম বলে বিবেচিত হতো, আজ আত্ম-সুখের জন্যে বন্ধুকে ত্যাগ করাই হলো ধর্ম্ম।—টলষ্টয়।

বিষ্টু

—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রেনে করে ফিরছিলুম কলকাতায়। সন্ধ্যা হয়ে আসতে দেরী নেই। একটু আগে খুব ঘন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে এসে লাগছে। কলা বন আর নারকেল বনের ওপারে দেখছি বর্ষা-ধোওয়া আকাশে কেমন একটা হালকা সবুজ রং ধরেছে। ট্রেন চলেছে মন্থর গতিতে—প্রত্যেক ষ্টেশানে থামতে থামতে।

ফিরছি হুগলী জেলার এক গণ্ডগ্রাম থেকে এক দুরূহ কাজ সেরে। মনে করেছিলুম, আমার দ্বারা এ কাজ হওয়া অসম্ভব। আমি নতুন লোক, গ্রামের কাউকেই চিনি না; গ্রামের লোকেরা কেমন, তাদের প্রয়োজন অপ্রয়োজন কিছুই জানি না; কেমন স্কুল তারা চায়, কেমন ধরণের হেড-মাষ্টার গ্রামের ছেলেদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো হবে—এ আমি কি করে বলব? চব্বিশটি দরখাস্ত পরীক্ষা করে সব চেয়ে উপযুক্ত হেড-মাষ্টার আমি কেমন করে বাছব?

কিন্তু ঠিক সেই কাজ করেই আজ আমি ফিরছি। গ্রামের স্কুলের জন্যে একজন শ্রেষ্ঠ প্রধান-শিক্ষক বেছে দিয়ে এসেছি। কি করে এ কাজ সম্ভব হল, ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, ভগবানের অদৃশ্য হাত এর মধ্যে ছিল।

আমার সঙ্গে একই কামরায় ফিরছিলেন বৃদ্ধ হারাণবাবু। এতদিন ইনিই ঐ স্কুলের প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। হারাণবাবু অবসর নেওয়ায় নতুন প্রধান-শিক্ষকের প্রয়োজন হয়েছে। হারাণবাবুই উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় গিয়ে আমাকে খুঁজে বার করেন।

এই পক্বকেশ বৃদ্ধ হঠাৎ যেদিন আমার সামনে এসে দাঁড়ান, আমি ভেবেছিলুম, বুঝি কোনো মক্কেল-টক্কেল হবেন। তারপর যখন শুনলুম আমার পিতামহ বহু বছর পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই স্কুলেরই তিনি হেড-মাষ্টার এবং অবসর গ্রহণেচ্ছু, তখন ভাবলুম, এইবার অর্থ-সাহায্য চাইবেন। তারপর শুনলুম, স্কুলটি বর্দ্ধিষ্ণু, গ্রামও তাই—স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের বর্ত্তমান সমস্যা নতুন প্রধান-

শিক্ষকের নিয়োগ নিয়ে। তাঁরা চব্বিশটি দরখাস্ত পেয়েছেন; এবং সকলে মিলে স্থির করেছেন বাছাই-এর ভার দেওয়া হবে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় নবকিশোর চক্রবর্ত্তীর সুযোগ্য পৌত্র, উদীয়মান ব্যারিষ্টার শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তীর উপর।

হারাণবাবু বল্লেন—"দেখ সুকুমার, প্রস্তাবটা আমিই উঠিয়েছিলুম। সকলে একযোগে মেনে নিয়েছেন। 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে কোরো না; তোমার ঠাকুর্দ্দার আমলের লোক আমি। তিনিই আমায় স্কুলের প্রথম প্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। দু' যুগ পরে স্কুল যদিও আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলেও দ্বিতীয় প্রধান-শিক্ষক নিয়োগ করার সময় তোমার কথাটা মনে পড়াই স্বাভাবিক।"

আমি বেশ খানিকটা অবাক হলুম। আমার এই বত্রিশ বছরের জীবনে আমি কখনও আমাদের দেশে যাইনি। ঠাকুর্দ্দার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটার কথা খুব ছেলেবেলায় দু' একবার শুনেছিলুম বটে, তারপর সেটা আছে কি গেছে, কোনো খবরও রাখিনি। দেশের লোকেরা যে এখনও আমাদের এইভাবে মনে রেখেছে এইটেই আশ্চর্য্য লাগল।

হারাণবাবুকে বল্লুম—"বেশ, আমি যাবো। তবে আপনি তো জানেন, নিজের দেশে আমি পরদেশী—এই আমার সেখানে প্রথম যাওয়া। আমি যে এ কাজের উপযুক্ত, আমার তা মনে হয় না।"

হারাণবাবু বল্লেন—"কিছু ভেবো না। নির্দ্দিষ্ট দিনে এসে আমি তোমায় নিয়ে যাবো।"

আজ ছিল সেই নির্দ্দিষ্ট দিন। সকালে গিয়েছিলুম আমাদের দেশের গ্রামে, বসেছিলুম গ্রামের কর্ত্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ঠাকুর্দ্দার স্থাপিত স্কুলের প্রাঙ্গণে।

একজনের পর একজন পদপ্রার্থী আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, প্রয়োজন মতো দু-একটি প্রশ্ন করেছি, তাঁরাও জবাব দিয়ে চলে গেছেন। প্রত্যেকের দরখাস্ত আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। কে ক'টা পাশ, কোন্ বিষয়ে কে প্রথম হয়েছেন, দ্বিতীয় হয়েছেন, কার কত অভিজ্ঞতা, কিসে কার প্রবণতা, সবই দরখাস্তে ধরা ছিল।

হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়াল, বিষ্ণুচরণ মিত্র। আমি দেখেই চিনলুম। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল, বিষ্টু আমায় চিনতে পারল না। চিনলে আমার পক্ষে প্রার্থী নির্ণয় করা একটু শক্ত হত; মনে হত পক্ষপাতিত্ব করে ফেল্লুম। বিষ্ণুচরণ মিত্র'র দরখাস্তে চোখ বুলিয়ে নিলুম। কোথাকার কোন্ গ্রামে সে নিজের চেষ্টায় একটা স্কুল করেছিল, অর্থাভাবে সে স্কুল উঠে গিয়েছে—এ কথা দরখাস্তে লেখা। পাশের বছর, ডিগ্রির বছর অতি সাধারণ—সে দিক দিয়ে বড়াই করবার কিছু নেই।

বাকি যে ক'জন ছিলেন, তাঁদের পালা শেষ হয়ে গেলেই আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলুম—"আমার মতে, এই স্কুলের ভার নেবার শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক, শ্রীবিষ্ণুচরণ মিত্র।"

সকলেই একটু অবাক হলেন। কিন্তু আগেই কথা ছিল, আমার মীমাংসা সকলকে মানতে হবে, কাজেই এর উপর আর কোনো কথা চল্লো না।

হারাণবাবু ট্রেনের একটানা ঝাঁকুনিতে, বর্ষার হাওয়ায়, জানলার কাঠে মাথা রেখে চোখ বুজে বেশ ঘুমুচ্ছিলেন।—আমি ভাবছিলুম, এই পরিশ্রমী একনিষ্ঠ বৃদ্ধের কথা, যিনি শুনেছি একাগ্রভাবে স্কুলের পিছনে, শিক্ষাব্রতের পিছনে নিজের দীর্ঘ জীবনকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। বিষ্টুর উপর আজ আমি সেই কঠিন দায়িত্ব তুলে দিয়ে এলুম। বিষ্টু কি পারবে এই ভার গ্রহণ করে নিজেকে এবং স্কুলকে গৌরবান্বিত করতে? আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস, বিষ্টুই একমাত্র পারবে।

ট্রেনের জানলা দিয়ে দূরে বহুদূরে চলে গেল আমার দৃষ্টি। জীবনের নানা ঘটনা, নানা উত্থান-পতনের স্মৃতিচিত্র যেখানে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে—তারই মধ্যে থেকে ফুটে উঠল একটির পর একটি ছবি।

*   *   *

বহুদিন অগেকার কথা।

খেলার মাঠে বিষ্টুর সঙ্গে সেদিন সবেমাত্র আমার আলাপ হয়েছে। আমার বন্ধু শশীভূষণ দিনকয়েক আগে তাদের পাড়ার ফুটবল-ক্লাবে আমায় ভর্ত্তি করে দিয়েছে। এখনও খেলতে পারিনি, কারণ পায়ে হয়েছিল একটা ফোড়া। ক'দিন তাই বসে বসে আর সকলের খেলাই দেখেছি। বিষ্টুকেও দেখেছি সেণ্টারে খেলতে—ক্লাবের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বলেই মনে হয়। শশীভূষণের সঙ্গে বসেছিলুম, বিষ্টু নিজেই এসে আলাপ করলে। বল্লে—"কি রে শশী, তোর বন্ধুকে ভর্ত্তি করিয়ে নিয়ে এলি, কই একদিনও খেলল না তো?"

আমার ফোড়ার যন্ত্রণা সেদিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি পা দেখিয়ে বল্লুম—"এটা না শুকোলে খেলাধুলোর কথা ভাবতেই পারবো না।"

বিষ্টু আমাদের পাশে বসে পড়ল। দু-একটি ছেলে তখন বল প্র্যাকটিস্ করছে, অন্য খেলোয়াড়রাও একে একে মাঠে আসতে সুরু করেছে। শশীকে বল্লুম—"শশী, আজ আর কিছু ভাল লাগছে না। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে—অথচ যাবারও সাহস নেই।"

শশী বল্লে—"কেন রে কি হল?"

আমি বল্লুম—"আমাদের বাড়ির ব্যাপার তুই তো জানিস সবই। আজ তিন দিন হল দাঁতে দাঁত চেপে ফোড়ার যন্ত্রণা লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু আজ বোধ হয় ধরা পড়ে যাবো। ধরা পড়লে কি হবে তা আর জানিস না?"

শশী সবই জানত—আমাদের বাড়ির পরিচয় তার আর জানতে বাকি নেই। সে এ-ও জানতো যে যন্ত্রণা যতই হোক, আমার মুখে তা প্রকাশ হবে না। কিন্তু আজ দুপুর থেকে সকলেই লক্ষ্য করেছে যে সোজা হয়ে আমি চলতে পারছি না। সুতরাং মুখে প্রকাশ না পেলেও চলায় তা পাবেই। বাড়ির লোক আমায় খুঁড়োতে দেখলেই ধরে ফেলবে; আর ধরে ফেল্লেই বেদম মার। আমাদের বাড়ির রীতিই ঐ। পা পিছলে পড়ে মাথা ফাটাও, গাঁটকাটা তোমার পকেট মারুক, এমন কি আকাশ থেকে বোমা এসেও যদি তোমার মাথায় পড়ে, সে দোষও তোমার। এই আমাদের বাড়ির নিয়ম। সুতরাং প্রথমেই তোমায় বেদম প্রহার দেওয়া হবে, তারপর তোমার চিকিৎসা। আমার রাঙাকাকার মতে প্রহারটা চিকিৎসারই একটা প্রধান অঙ্গ।

শশীভূষণ চিন্তিত মুখে খানিকটা চুপ করে থেকে তারপর আস্তে আস্তে বিষ্টুকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্ল। বল্লে—"সুকুমারের মার খাওয়া গা-সওয়া হয়ে গেছে—মারলেও ওর গায়ে কিছু লাগে না। কিন্তু বুঝলি বিষ্টু, যেখানে বেচারা দেখছে নিজের বেবাক কোনো দোষই নেই, সেখানে শুধু শুধু প্রহারটা মনে বড় লাগে—"

শুনতে শুনতে বিষ্টুর চোখটা হঠাৎ ছল ছল করে উঠল। সে খানিকটা ভেবে বল্লে—"কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমি সব ঠিক করে দেব।"

শশী আর আমি এক সঙ্গে বলে উঠলুম—"কি ঠিক করে দেবে?"

বিষ্টু বল্লে—"তোমার বাড়ির লোকেরা দেখছি বড় বেকুব, বড় বেয়াড়া।"

"তোর বন্ধু একদিনও খেলল না তো?" [পৃষ্ঠা ২৪৫

আমি বল্লুম—"সে আমার চেয়ে আর কে ভালো বোঝে? এবং বুঝি বলেই তোমায় বলছি, আমার বাড়ির লোকদের ঠিক করতে যেও না, তাহলে তারাই বরং তোমায় ঠিক করে দেবে!"

বিষ্টু আর কিছু বল্লে না; উঠে গিয়ে একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এসে বল্লে—"চলো সুকুমার, আমাদের বাড়ি।"

আমি বল্লুম—"সেখানে গিয়ে কি হবে?"

বিষ্টু বল্লে—"বলছি উঠে এসো—আমার কাছে ওষুধ আছে।"

ওষুধের নামে আমি ভরসা পেলুম। বল্লুম—"তা চল্, রিক্সার কি দরকার? আমি তো হেঁটেই যেতে পারব। ভাল ওষুধ তো?"

বিষ্টু বিজ্ঞের মতো বল্লে—"না না, অত হাঁটলে ফোড়ার রস শুকোবে না, যা বলছি কর।" বলে আর কিছুর অপেক্ষা না করেই আমাকে টেনে রিক্সাতে তুল্ল। আমিও যেন পরম নির্ভরতায় তার হাতের মধ্যে গিয়ে পড়লুম!

শশী চেঁচিয়ে বল্লে—"কালকে মাঠে আসিস্ সুকুমার!"

আমি ক্ষীণ গলায় জবাব দিলুম—"আচ্ছা।"

বিষ্টুদের বৈঠকখানায় তার ছোট ভাই কেষ্ট একা একাই ঘুঁটি খেলছিল। সেইখানে আমাকে বসিয়ে বিষ্টু গেল এক ছুটে বাড়ির ভিতর থেকে ওষুধটা আনতে। বিষ্টুর ভাই কেষ্টর সঙ্গে আমার সহজেই আলাপ জমে গেল। তার সঙ্গে সবেমাত্র ঘুঁটি খেলা সুরু করেছি, এমন সময় এক হাতে তুলো আর এক হাতে ওষুধ নিয়ে বিষ্টু এসে উপস্থিত।

ওষুধের গুণাগুণ আমার কিছুই জানা নেই। সে হলদেটে রং-এর টলটলে আশ্চর্য্য বস্তুটার দিকে লক্ষ্য করে আমি বল্লুম—"ভাই, ব্যথাটা চট্ করে সারিয়ে দিতে হবে, সেইটেই হল আসল কথা।"

বিষ্টু কোনো কথা না বলে তুলোর উপর ওষুধটা ঢালতে লাগল। কেষ্ট বল্লে—"দাদা দাঁতের ব্যথায় ছট্‌ফট্ করছে, এই ওষুধ দিতে না দিতেই সেরে যায়—আমি নিজে দেখেছি।"

ওষুধটা ফোড়ার উপর পড়তেই এমন চিড়বিড় করে উঠল যে আমি প্রায় অজ্ঞান! বিষ্টুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে—ওষুধের ক্রিয়া দেখে স্পষ্টই ঘাবড়ে গেছে।

আর দ্বিরুক্তি না করে, টলতে টলতে গিয়ে আমি রিক্সায় উঠলুম। পিছনে পিছনে এসে বিষ্টু আমতা আমতা করে বল্লে—"বোধ হয় ওষুধের কাজটা একটু পরে আরম্ভ হবে—বাড়ি পৌঁছে দেখবে ব্যথা আর কিছু নেই।"

বাড়ি পৌঁছলুম প্রায় কাৎরাতে কাৎরাতে। লুকোবার আর কোনো উপায় ছিল না। চিরদিনের প্রথা অনুযায়ী প্রহার হল। উপরন্তু দাঁতের ওষুধের জ্বলুনিতে সারারাত চোখের দু-পাতা এক করতে পারলুম না।

এমন চিড়বিড় করে উঠল যে আমি প্রায় অজ্ঞান।

বেশ কিছু দিন ভুগলুম। বিষ্টুর উপরেই সব রাগটা গিয়ে পড়ল। পড়াই স্বাভাবিক। যা জানো না তা নিয়ে চাল দিতে যাওয়া কেন? ভাবখানা যেন কত বড় ডাক্তার! বিষ্টুকে মনে মনে খুব গাল দিতে লাগলুম।

ঘা'টা শুকিয়ে আসছে, বাড়ি থেকে কোথাও বেরই না। একদিন শশীভূষণ এসে হাজির। তার মুখে বিষ্টুর আর এক কীর্ত্তি শুনলুম। তারা দু'জনে নাকি আমারই কাছে আসছিল দিন দুই আগে। পথে এক জায়গায় দেখে এক ফলওয়ালা পেঁপে কেটে বিক্রী করছে। বিষ্টু সেদিন কাগজে পড়েছে যে কাটা ফল রাস্তার ধারে বিক্রি করা সহরে নিষেধ করা হয়েছে—এতে নাকি ভয়ানক সব রোগের আক্রমণ বাড়ে। বিষ্টু প্রথমেই ফলওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলে, কে তাকে রাস্তার ধারে কাটা ফল বিক্রী করবার অধিকার দিয়েছে? ফলওয়ালা তাচ্ছিল্য করে বিষ্টুকে তার নিজের রাস্তা দেখতে বলে। বিষ্টু সোজা চলে যায় থানায় এবং পুলিশকে বলে এখনই এর একটা বিহিত করতে। ছেলে-ছোকরা দেখেই হোক বা যে-কোন কারণেই হোক, পুলিশ বিশেষ তৎপরতা দেখায় না, বলে—"আচ্ছা সে আমরা দেখছি, তুমি এখন যাও।" এই শুনে বিষ্টুর ধারণা হল ফলওয়ালার সঙ্গে পুলিশের সড় আছে। সে কথা সে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানায়। আরো কি সব ভয়ানক ভয়ানক কথা পুলিশকে বলতে আরম্ভ করতেই পুলিশ তাকে আটক করে।

শশী থানার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল—তার ভিতরে ঢোকবার সাহস ছিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর কেমন সন্দেহ হয় যে একটা গণ্ডগোল হয়েছে। সে দৌড়ে গিয়ে বিষ্টুদের বাড়িতে খবর দেয়। বিষ্টুর

বাবা তখন বাড়ি ছিলেন না। বিষ্টুর মা'র চোখে জল দেখে শশীই আবার ছুটে বাবাকে ডেকে আনে। অবশেষে তিনি পুলিশের খপ্পর থেকে বিষ্টুকে উদ্ধার করেন।

মেজকাকা এসে ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে তাঁর বিষ্টু।

আমি শুনে বল্লুম—"কি দরকার ছিল বল্ তো শশী? কাটা-ফল যে খাবে সে মরবে—বিষ্টুর তাতে কি?"

শশী বল্লে—"বিষ্টুর ঐ স্বভাব, ও আর শুধরোবে না।"

আমি বল্লুম—"দেখ্, আমার আর কিন্তু বিষ্টুর সঙ্গে কথা-ই কইবার ইচ্ছে নেই। আমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করেছে, এ আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।"

শশী বল্লে—"না রে সুকুমার, বিষ্টু ছেলেটা আসলে ভালো। তোর কোনো ক্ষতি করবার ওর আদৌ ইচ্ছে ছিল না। তবে ওর যেমন স্বভাব, পারুক আর নাই পারুক, নিজের ক্ষমতায় কুলোক আর নাই কুলোক, সব কিছুতে ওর মাথা গলানো চাই। ঐ হচ্ছে ওর দোষ। এই নিয়ে লোকে ওকে কত খোঁটা দিয়েছে, কত গালমন্দ করেছে, বিষ্টু কতবার বিপদেও পড়েছে, কিন্তু তার স্বভাব বদলায়নি। একবার হয়েছিল কি—বিষ্টুর এক পিসতুতো ভাই কাশী গিয়েছিল। দু' মাস পরে যখন সে কাশী থেকে ফিরে এল, সঙ্গে নিয়ে এল এক বাইসিকেল! সে নাকি কাশীতে থাকতে সাইকেল চড়া শিখে ফেলেছে, চমৎকার সাইকেল চালাতে পারে। বিষ্টুদের বাড়ির কোনো ছেলেই তখন সাইকেল চড়তে জানতো না, কাজেই তাদের সকলের চোখে এই পিসতুতো ভাই এক মহাপুরুষ! বিষ্টু প্রথম সুযোগেই তার পিসতুতো ভাই-এর সাইকেলটা চুপি চুপি সরিয়ে তাদের বাড়ির পিছনের ফাঁকা মাঠটায় নিয়ে গেল। সারাদিন কেউ কিছু টের পায়নি। শেষে সন্ধ্যের মুখে যখন বিষ্টুকে সাইকেল-সহ আবিষ্কার করা হল, তখন দেখা গেল তার সর্ব্বাঙ্গ কাদা-মাখা, ধুতি-জামা ছেঁড়া, পা দিয়ে রক্ত ঝরছে এবং সাইকেলের একটা চাকা প্রায় অকর্ম্মণ্য, ঘণ্টাটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! পিসতুতো ভাই রাগে অগ্নিশর্ম্মা! বিষ্টুর মুখে কোনো কথা নেই। এই নিয়ে ওর পিসতুতো ভাই-এর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। বহুদিন মুখ-দেখাদেখি বন্ধ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ক্ষেত্রে মহাপুরুষের সাইকেল চড়া শিখতে একমাস লেগেছিল, বিষ্টু ঐ একবেলাতেই সাইকেল চড়ায় ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিল।"

আমি বল্লুম—"যাই বলিস্, আমি আর ঐ বিষ্টু-ফিষ্টুর দিকে ঘেঁসছিনে।"

এমন সময় আমার মেজকাকা এসে ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে তাঁর বিষ্টু—গায়ে কাদা-মাখা, ভিজে কাপড়. টস্ টস্ করে জল পড়ছে। আমাদের বাড়ি ছিল গঙ্গার কাছে। মেজকাকা কিছু আগেই গিয়েছিলেন গঙ্গাস্নানে—সেদিন ছিল আম-বারুণীর যোগ।

বিষ্টুর দিকে আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি, মেজকাকা বল্লেন—"কি রে চিনিস্ নাকি একে?"

আমি কিছু বলবার আগেই শশী বল্লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, মেজকাকা, ও আমাদের বিষ্টু।"

আমি তিক্তভাবে অভিযোগ করলুম—"মেজকাকা, এই ছেলেটাই আমার ফোড়ায় বিষ ঢেলেছিল—বিষ!"

মেজকাকা বল্লেন—"তাই নাকি?"

বিষ্টু যদি একবার আমার দিকে ফিরে তাকাতো, তাহলেও হয়তো আমি তাকে খানিকটা ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু সে কিছুই করল না।

শশী বল্লে—"কোথায় পেলেন ওকে?"

মেজকাকা বল্লেন—"গঙ্গার বুকে। ভেসে যাচ্ছিলো, কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তি উদ্ধার করেছেন। দাঁড়া ওকে একটা শুকনো ধুতি দিই আগে।"

আমাদের বাড়ির মধ্যে আমরা ছোটরা একমাত্র যাঁকে মানুষ বলে গণ্য করতুম তিনি ছিলেন আমাদের মেজকাকা। বাকি সব কাকা-জ্যাঠা-বাবারা ছিলেন সাক্ষাৎ দৈত্য-দানব—যেমন অত্যাচারী, তেমনি অবুঝ। শুনতে পাই, এই মেজকাকা ছেলেবেলায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন, খুব সম্ভব, তাঁর আমলের খুড়ো-জ্যাঠাদের অত্যাচারে। তারপর দশ বছর নানা দেশ ঘুরে নানা কষ্ট-বিপদের মধ্যে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। আমাদের দুঃখ-কষ্টটা বুঝতেন একমাত্র এই মেজকাকাই। তাঁর কাছে আমরা সব কথাই বলতুম, সব অনুযোগ জানাতুম। তিনি ছিলেন বলেই বোধহয় আমরা শত অত্যাচারেও বাড়ি ছেড়ে পালাইনি।

আমরা তাঁকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতুম—"মেজকাকা, তোমার কোন মেজকাকা ছিল না?" তিনি খুব চেঁচিয়ে হেসে উঠে জবাব দিতেন—"না রে, আমার ছিল বড়কাকা—ইয়া গোঁফ, ইয়া জোয়ান, সারাক্ষণ হাতে বেত নাচছে। তার পরেই সেজকাকা। পেট-রোগা হলে কি হবে, কি গাঁট্টার জোর! পাছে জোর কমে যায় এই ভয়ে অনবরত আমাদের মাথার উপর গাঁট্টার অভ্যাস চালাতেন। আমার মেজকাকাটা অনেককাল আগেই মরে গিয়েছিল।"—আমরাও সেই হাসিতে যোগ দিতুম!

মেজকাকা ধুতি-গামছা নিয়ে ফিরে এলেন। বিষ্টু গা মুছে ধুতি পরতে লাগল। আমরা তখন ব্যাপারটা শুনলুম।

মেজকাকা করছিলেন গঙ্গায় স্নান; একটু দূরে একটি বছর দশেকের ছেলে জলে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিদিমা তখন জলে গা ডুবিয়ে জপ করছিলেন। আম-বারুণীতে লোকে গঙ্গায় আম দেয়, তারই একটা আম ভেসে আসছিল। ছেলেটি সেটি ধরতে যায় এবং ধরতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায় স্রোতের মধ্যে। ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে ছেলেটি যখন মেজকাকার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন দেখা যায় একটি বছর পনের'র ছেলে জামা-কাপড় না-খুলে না-গুটিয়েই ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সে ছোট ছেলেটিকে উদ্ধার তো করতে পারেই না, বরং নিজেই যায় তলিয়ে। মেজকাকা ছোট ছেলেটিকে বাঁচান। যখন তাকে তার দিদিমার কাছে পৌছে দিচ্ছেন, দেখেন কয়েকজন মিলে অন্য ছেলেটিকেও প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় টেনে তুলেছে। ইনিই হচ্ছেন আমাদের বিষ্টু। শোনা গেল, ইনি ডুবন্ত মানুষ উদ্ধার করা দূরে থাক, সাঁতারই জানতেন না। হঠাৎ তবে অমন ধুতি-জামা পরে ঝাঁপ দিলেন কেন জিজ্ঞেস করায় কোনই উত্তর দিতে পারেন না। মেজকাকা সেই উত্তর শোনার জন্যেই তাকে এখানে

নিয়ে এসেছেন।

মেজকাকা বল্লেন—"বল বিষ্টু, কেন তুমি জলে ঝাঁপ দিলে।"

বিষ্টু একটু লজ্জিত হয়ে বল্লে—"ছেলেটা ভেসে যায় দেখে আর থাকতে পারলুম না।"

মেজকাকা বল্লেন—"নিজের কথা একবারও ভাবলে না?"

বিষ্টু বল্লে—"তখন মাথায় আসেনি।"

মেজকাকা বল্লেন—"শশী যা তো মোড় থেকে দু' টাকার রসগোল্লা কিনে নিয়ে আয়। সকলে মিলে রসগোল্লা খেয়ে আজ বিষ্টুর কীর্ত্তিকে স্মরণীয় করে রাখা যাক।"

এই বলে শশীকে টাকা বার করে দিলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে মেজকাকার কানে কানে বল্লুম—"মেজকাকা তুমি করছ কি? এই ছেলেটাকে তুমি রসগোল্লা খাওয়াবে?"

মেজকাকা খালি বল্লেন—"তুই থাম্।" শশী ততক্ষণে রসগোল্লা কিনতে চলে গেছে।

মেজকাকার উপরোধে পড়ে আমি মুখ বেঁকিয়ে রসগোল্লা খেলুম; কিন্তু তাকে আপন করে নিতে পারলুম না।

মেজকাকা আর বিষ্টু কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন! আমি শশীকে বল্লুম—"দেখ্ শশে, বিষ্টুকে তোকে ছাড়তে হবে। মেজকাকাই বলুন আর যেই বলুন, অমন ছেলের সঙ্গে আমরা মিশতে পারব না।"

বিষ্টু এসে অবধি ক্ষমা চাওয়া দূরে থাকুক, একটি কথাও আমার সঙ্গে বলেনি—এ অপমান আমি হজম করতে পারছিলুম না।

শশী বল্লে—"না রে সুকুমার, তুই বুঝছিস্ না—"

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লুম—"তোকে আর বোঝাতে হবে না। আমায় কথা দে, ওর সঙ্গে তুই আর মিশবি নে।"

শশী আবার গোড়ার থেকে সুরু করলে—ওর সত্যি কোনো দোষ নেই। ছেলেটা ভালো। আমার উপকার করতেই চেয়েছিল। ভুল কি আর মানুষের হয় না? মানুষের বাইরেটাই কি সব—ভিতরটাও দেখা উচিত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমি সেদিন অবুঝ। শশীভূষণ ছিল আমার সকলের চেয়ে বড় বন্ধু, সে-ও যখন আমার দিকটা দেখল না, আমি তখন বল্লুম—"দেখ্ শশী, বিষ্টুকে তুই যদি ত্যাগ না করিস্, তাহলে আমি তোকে ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।"

মুখ দিয়ে এত বড় কথাটা বেরিয়ে যাবার পর আমার প্রচুর ক্ষোভ হয়েছিল; কিন্তু শশী যখন মুখ কালো করে বেরিয়ে গেল, আমি একটি কথাও বল্লুম না। তারপর থেকে তাকে আর আমাদের বাড়িতে দেখিনি।

বিষ্টু কিন্তু আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত। সে আসত মেজকাকার কাছে। আমার দিকে ফিরেও তাকাতো না। শশীর সঙ্গে আমার ঝগড়ার কথা সে জানত, কিন্তু কোনোদিন সে নিজে থেকে মিটমাটের চেষ্টা করেনি।

মেজকাকা তাকে সাঁতার তো শেখালেনই, ডুবন্ত লোকের প্রাণ বাঁচানোর কায়দাও শেখালেন; তা ছাড়া তাঁর ব্যায়াম-সমিতিতে নিয়ে গিয়ে তাকে লাঠি খেলা, ছোরা খেলাও শিখিয়ে দিলেন, আরও যে কত কি শেখালেন তা আমার জানা নেই।

বিষ্টুর জন্যে শশীকে হারালুম। তার উপর আমাদের অমন যে প্রিয় মেজকাকা, তিনিও হাতছাড়া হয়ে গেলেন। মেজকাকা বিষ্টুকে নিয়েই থাকতেন। আমরা কাছে থেকেও যেন তাঁর কাছে যেতে পারতুম না। স্পষ্ট দেখতুম মেজকাকা আর আগের মতো নেই—মনের মতো শিষ্য পেয়ে এমনই মশগুল যে পুরোনো ভক্তদের কথা আর মনেই পড়ে না।

জীবনটা বিস্বাদ হয়ে উঠল। তার উপর রাগ হত, অভিমান হত, অথচ বুঝতুম, এর জন্যে ওকে দোষী করা যায় না। বরং আমি নিজে একটু ক্ষমিষ্ণু একটু কম গর্ব্বিত হলে ব্যাপারটা কবে মিটমাট হয়ে যেত। কিন্তু তা আর হয়নি। তারপর যখন ভাবতুম, মেজকাকা ওকে অমন করে শিষ্য করে নিলেন কেন, তখন বুঝতুম বিষ্টু আমাদের চেয়ে উঁচু দরের ছেলে। শেষটা নিজেরই উপর রাগ হত,—কেন বিষ্টুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় না।

দিনের পর দিন কেটে যেত, আর আমি দেখতুম, আমার জীবনটা একটা ফাঁকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সবে মাত্র সবুজ হয়ে উঠছিল আমার সব কিছু—ঠিক সেই সময়টিতে এই ছেলেটি এসে আমায় এমন একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল, যেখান থেকে চোখের সামনে দেখতে দেখতে বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহানুভূতি, কোমলতা, সব কিছু হয়ে গেল উধাও। আমার জীবনের ঐ ফাঁকটা বরাবর ফাঁকাই থেকে গেছে।

উচ্চশিক্ষার জন্যে আমার যখন বিলেতে যাওয়ার সব স্থির, মেজকাকা ঠিক সেই সময় হঠাৎ মারা গেলেন। বিষ্টুও সেই থেকে কোথায় যেন লুপ্ত হয়ে গেল। তার সম্বন্ধে শেষ যা শুনেছিলুম, সে দেশে ফিরে গিয়ে নিজেদের গ্রামে, যেখানে কোনো স্কুল ছিল না, সেখানে একটা স্কুল চালাবার চেষ্টা করছে।

* * *

ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে প্রবেশ করল। হারাণবাবু গা মোড়া দিয়ে উঠে বল্লেন—"আমার কর্ত্তব্য শেষ হল। এই ট্রেনেই আমি বাড়ি ফিরব।"

হারাণবাবুকে দেখে মনে হল বড় ক্লান্ত। তাঁর মনও যেন অশান্ত। স্কুলের কর্ণধারের পদটা যে যোগ্যপাত্রে পড়েছে সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান। কেন আমি বিষ্টুকে পছন্দ করলুম তিনি বোঝেননি।

আমি বল্লুম—"হারাণবাবু, যাঁর হাতে স্কুলের ভার দিলুম, দেখবেন তিনি আপনারই পথে অতি গৌরবের সঙ্গে স্কুলকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

হারাণবাবুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বল্লেন—"তুমি তাকে চিনতে নাকি দাদা?"

আমি বল্লুম—"বিষ্টুর সঙ্গে কোনদিন আমার বন্ধুত্ব হয়নি। কিন্তু আমি তাকে চিনতুম এবং জানতুম ওর আসল সার্থকতা কোথায়।"

হারাণবাবু বল্লেন—"ব্যাস্ ওতেই হবে। তোমার ঠাকুর্দ্দাও আমায় পছন্দ করেছিলেন, কি দেখে জানি না।"

● মণি ও মুক্তা

হে প্রভু, তোমার এই বিরাট বিশ্বে, আমাকে দাও শুধু একটী কাজ...আমাকে কর তোমার দাসী। প্রতিদিন প্রভাতে আমি তোমার মন্দিরের অঙ্গন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবো, প্রতিদিন পাব নগদ মাইনে, তোমার দর্শন। —মীরাবাঈ

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মানুষের জীবন...অনেকে বলেন, ভাগ্য! হয়তো তাই। কার জীবনে কোথা থেকে কি যে ঘটে!

মাণিক আর রতন...দুই ভাই...পনেরো বছরের ছোট-বড়। অর্থাৎ রতন যখন জন্মায়, মাণিকের বয়স তখন পনেরো বছর। বাবা কোন্ অফিসে কাজ করেন—মাহিনা পান মাসে দেড়শো টাকা। গৃহস্থের সংসার। মাণিক স্কুলে পড়ে...সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে [illegible]লে ভালো...এগজামিনে ফী-বছর ফার্ষ্ট হয়...পড়াশুনায় মাণিকের বেশ মন!

রতনের বয়স ছ-মাস...কি যে হলো, খুব শক্ত অসুখ। চিকিৎসা-পত্তর...কিছুতে আর তার অসুখ সারে না! একটা-না-একটা উপসর্গ! রতনকে নিয়ে মা-বাবা হিমসিম খাচ্ছেন...ভাবনা-চিন্তা...পয়সা-খরচ।...মাণিকেরও লেখাপড়া ঘুচে যাবার জো! পড়াশুনা ছেড়ে তাকে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে কখনো ডাক্তারের বাড়ী, কখনো ডাক্তারখানা...ছ'সাত মাস ধরে নাগাড়ে!...ম্যাট্রিকটা কোনো মতে পাশ করলো...থার্ড ডিভিশনে। হেড-মাষ্টার মশায় দুঃখ করলেন—তোমার উপর আমাদের কতখানি আশা ছিল, মাণিক...

মাণিক নিশ্বাস ফেললো। উপায় কি!

রতনের অসুখ তবু সারে না। বিছানায় সে মিশে আছে...যেন টিনের একখানা পাত। ডাক্তাররা বললেন—আমাদের হদ্দমুদ্দ আমরা তো করলুম! এখন মানে, ছেলেকে যদি দেরাদুন, কি নৈনিতাল,

কি আলমোড়া...এমনি কোথাও নিয়ে গিয়ে রাখতে পারেন...এক-বছর না হোক, অন্ততঃ ছ-মাস, তাহলে যদি ও বাঁচে!

বাপের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! সর্ব্বনাশ! তাতে কত খরচ! তিনি ছাঁপোষা মানুষ! তায় চাকরি করেন,...চাকরিতে ছুটি নিয়ে ছ-মাস বাহিরে গিয়ে থাকা,...কি করে তা হয়?

মায়ের চোখে জল! মা বললেন—তা বলে ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো!

ঠিক কথা। বাবা না যেতে পারেন...সত্যই তো, তাঁর যাওয়া চলে না...তাঁকে খরচ জোগাতে হবে। মাণিক ডাগর হয়েছে—তার সঙ্গে সেখানে যাক্।

মাণিক বললে—আমি সবে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি...আমার পড়াশুনা? লেকচার এ্যাটেণ্ড?

মা বললেন—ভাইয়ের প্রাণটা আগে—না, তোমার লেখাপড়া আগে? মায়ের পেটের ভাই না? জলে ভেসে আসেনি! সত্যি!*

তা আসেনি, মাণিক জানে। কিন্তু সে? জটিল প্রশ্ন! মাণিক সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না।

দেরাদুন যাওয়া হলো। মা, রতন, মাণিক আর বাড়ীর পুরোনো ঝি মঙ্গলা। সেখানে যাবার পর রতন যেন একটু ভালো! মাণিকের কাজ, রতন একটু ভালো থাকলে তার মনোরঞ্জন করা—তাকে বুকে নিয়ে পাহাড়ের হাওয়া খাওয়াতে বাহিরে একটু বেড়ানো! আর সে ঘুমোলে তার মাথার শিয়রে বসে পাহারাদারী করা! সে যেন রতনের মাহিনা-করা খানশামা! কলেজের বইগুলো সঙ্গে এনেছে...কিন্তু বই খুলে বসবে কখন? সময় পায় না।...

এক-একবার মনখানা তেতে ওঠে।...মাণিক ভাবে, যে-বাড়ীর মানুষ তার পানে ফিরে তাকায় না—তার কি হবে, চিন্তা করে না...সে-বাড়ীতে কেন থাকা? কিসের আশায়? মনে হয়, চলে যাই বাড়ী ছেড়ে!

কিন্তু পারে না। ইংরেজের ছেলে নয় যে বিশাল পৃথিবীকে অবলম্বন করে বেরিয়ে পড়বে! বাঙালীর ছেলে—তার জীবন বাঁধা-গণ্ডীতে ঘেরা!

ছ-মাসে রতনের শরীর বেশ সুস্থ হলো। তখন বাড়ী ফেরা।...

বাবা বললেন মাণিককে—তোর লেখাপড়া খিঁচড়ে গেল। আমাদের অফিসের বড়-সাহেব বিলেত চলে যাচ্ছেন। আমাকে ভালোবাসেন। তাঁকে ধরলে তোকে অফিসে ঢুকিয়ে দেবেন-'খন। আমি বলি, চাকরিতে লেগে যা। আমার মানুষের শরীর—কখন আছি, কখন নেই! মানে, এমন সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

মাণিকের বুকের মধ্যে অশ্রুর পাথার উথলে উঠলো যেন! অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে মাণিক বললে—আমার লেখাপড়া?

বাপ একটু রুক্ষ কণ্ঠে বললেন—লেখাপড়া! লেখাপড়া শিখে কার কি হচ্ছে, শুনি? ও লেখাপড়া-টড়া নয়। সুবিধা পেলেই নিজের-নিজের ভবিষ্যতের সংস্থান...কালই তুমি আমার সঙ্গে অফিসে যাবে।

মাণিক আর কোনো কথা বললে না। কাকে বলবে? কে বুঝবে, ভবিষ্যতের যে-স্বপ্ন সে দেখে, তার সে-স্বপ্ন?

মাণিককে অফিসে ঢুকতে হলো! চাকরি! জীবনে মস্ত সুযোগ! ঢুকেই মাহিনা হলো তিরিশ টাকা।

বড় সাহেবের দয়া।

বাবা কিন্তু খুব কাজ করেছিলেন! মাণিকের চাকরিতে ঢোকবার পর ন-মাস কাটলো না, বাবা এখানকার সংসার, অফিস, সাহেব সব বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে চলে গেলেন! মাণিকের চোখের সামনে যেন সাগর উঠলো ফুঁসে উত্তাল তরঙ্গ তুলে!

"লেখাপড়া শিখে কার কি হচ্ছে, শুনি?" [পৃষ্ঠা ২৫৩

সংসার। সে সংসারে মা, ভাই রতন... এখন সব ভার মাণিকের ঘাড়ে!

মা বললেন—বরাত!...তোমার লেখাপড়া হলো না। ভাইটা যাতে ভালো লেখাপড়া শিখে উকিল-ডাক্তার হতে পারে, সেই চেষ্টা করো। ও তোমাকে পরে দেখবে।

অভিমানে মাণিকের মন ভরে উঠলো। রতন! সে ডাক্তার হবে—উকিল হবে! মাণিকের মনে যে-সাধ ছিল...যে-আশা—সব তাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে মায়ের কথায় মায়ের ছোট ছেলের জন্য! মনে হলো, সেও মায়ের ছেলে নয়? তার ভবিষ্যতের কথা, মা কখনো এমন করে ভাবেননি তো! আর রতন কতটুকু ছেলে! ও বাঙলা পড়তে শিখবে, ইংরেজী পড়তে শিখবে...তারপর স্কুল-কলেজ...কত কত বছর লাগবে—এখন থেকেই মা রতনের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন! কিন্তু উপায় কি? মা বলেন, বাড়ীর বড় ছেলে সে! তার দায়িত্ব কতখানি! ছোটর মুখ তাকে চাইতেই হবে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। মাণিক বাড়ীর বড় ছেলে—তার মস্ত দায়িত্ব...পৃথিবীতে তার নিজের সুখ নেই, দুঃখ নেই, সাধ নেই, আশা নেই। সংসারের সুখ-দুঃখ-সাধ-আশা...এই নিয়েই তার বেঁচে থাকা! অফিসের কাজে নিজেকে সে-সঁপে দেছে। সাহেব খুব খুশী তার উপর! সাত-আট বছরের মধ্যে অফিসের অনেককে টোপকে সাহেব তাকে বসিয়েছেন একটা ডিপার্টমেন্টের হেড্

করে—সে এখন মাহিনা পায় একশো টাকা।

রতন...এখন বড় হয়েছে। ইস্কুলে যায়। বাড়ীতে তার জন্য মাষ্টার রাখা হয়েছে। না হলে কে ওর পড়াশুনা দেখবে? মায়ের কথায় মাষ্টার রাখতে হয়েছে। মাষ্টারকে মাহিনা দেয় মাসে কুড়িটি করে টাকা। মায়ের জেদ! রতনের লেখাপড়ায় মন নেই। তার নিত্য নতুন বায়না...এ চাই, ও চাই! মায়ের কথায় মাণিককে সে সব জোগাতে হয়। রতনের ঘুড়ি-লাটাই...ছোট ট্রাইসিক্‌ল্‌...ফুটবল...ব্যাট্-বল—পিঙপঙ—কি নেই? ক্লাশের এগজামিনে কখনো ইংলিশে পায় বারো নম্বর, অঙ্কে জিরো। এক ক্লাশে দু বছর তিন বছর করে থাকে—স্কুলের মাষ্টাররা বিরক্ত হয়ে শেষে ঠেলে উপরের ক্লাশে তুলে দেন।

সেদিন রতনের বায়না, কলকাতায় সেই অষ্ট্রেলিয়া থেকে কারা আসছে ক্রিকেট খেলতে। দত্ত-বাড়ীর হিতেন যাবে, তার ক্লাশের ভোলা, গোপাল, মহিম যাবে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে, রতনও যাবে। পাঁচ টাকা করে টিকিট। তাকে পাঁচ টাকা দিতেই হবে! নাহলে...নাহলে...

কথাটা মা বললেন মাণিককে। মাণিকের সহ্য হলো না। এমন নবাবী! হয়তো রাগ করতো না, ভাই যদি ক্লাশে প্রোমোশনটা পেতো।...মাণিক বললে—সখ দিন-দিন বেড়ে চলেছে দেখছি! লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই! পাঁচ টাকার টিকিট কিনে ম্যাচ দেখবেন! এ-ম্যাচ দেখে কাদের বাড়ীর ছেলেরা?

"আয় রতন, আমি তোকে টাকা দিচ্ছি।" [পৃষ্ঠা ২৫৪

রতন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো—বারে, আমি যে বলেছি ওদের, আমার জন্য একখানা টিকিট কিনে আনবে।

—ওদের বলবে, পাঁচ টাকার টিকিট কিনে খেলা দেখবার সামর্থ্য আমাদের নেই।...আমি বড়মানুষ

নই। ম্যাচ দেখবার জন্য তোমাকে পাঁচটা টাকা দেবো কোথা থেকে?

এ কথায় মা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, বললেন,—রোজগার করে ছোট ভাইকে খাওয়াচ্ছিস পরাচ্ছিস বলে এত-বড় কথা! থাক...তোমায় দিতে হবে না। আমার ঐ সোনা-বাঁধানো নোয়াগাছটা আছে, সেটা থেকে আমি দেবো'খন টাকা। আয় রতন, কাঁদিস নে...আমি তোকে টাকা দিচ্ছি।

রতনের হাত ধরে মা তাকে টেনে নিয়ে গেলেন। মাণিক গুম্ হয়ে রইলো প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর নিশ্বাস ফেলে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে সেটা নিয়ে গিয়ে মার হাতে দিয়ে বললে,—তোমাকে আর গহনা বেচে টাকা দিতে হবে না।

...মার হাত থেকে ছোঁ মেরে নোটখানা নিয়ে রতন চকিতে অদৃশ্য হলো। মা চলে যাচ্ছিলেন, মাণিক থাকতে পারলো না...মাণিক বললে—লেখাপড়া একটু করতে বলো মা। লেখাপড়া না শিখলে এর পর কি করবে? গোরুর গাড়ী চালিয়ে পেট চালাতে হবে যে।

মা বললেন—ওর বরাতে যদি তাই থাকে, গোরুর গাড়ীই হাঁকাবে।...তোমার টাকা খরচ হচ্ছে বলে বলছো তুমি! কখনো ওকে ডেকে একটা ভালো কথা বলো না তো। তুমি যদি ছোট ভাই বলে স্নেহ করে ওকে একটু দেখতে! জানি, ও তোমার গলগ্রহ! কিন্তু কি করবো? তিনি যদি তেমন কিছু রেখে যেতেন...

কি কথায় কি কথা! মাণিক চলে যাচ্ছিল, মা বললেন,—ওর মাষ্টারের মাইনেটা এবার থেকে আমিই দেবো। আমার দু-একখানা গহনা তো আছে, বেচবো। তবে এও বলি, তুমি টাকা-টাকা করো, এ টাকা আসছে যাঁর দৌলতে...রতনও তাঁর ছেলে...তোমার এ চাকরি একরকম পৈতৃক সম্পত্তি। ওরও এতে ভাগ আছে।

এ কথায় মনের কতখানি বিষ...সে-বিষের জ্বালায় মাণিকের মন...

সেদিন থেকে রতনের কোনো ব্যাপারে মাণিক আর কোনো কথা বলে না। মায়ের কাছে মাপ চেয়ে বলেছিল—রাগ করো না মা, আমি না বুঝে যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি। তুমি মা—আমি তোমার ছেলে। অধম ছেলে বলে আমাকে মাপ করো। তুমি ঠিক কথা বলেছো, বাবা আমার চাকরি করে দিয়ে গেছেন—সে টাকায় রতনেরও ভাগ আছে, আমি বুঝতে পারিনি, মা।

আরো পাঁচ-সাত বছর পরের কথা। পাড়ার বারোয়ারি পূজা। ছেলেরা থিয়েটার করবে...মেঘনাদ বধ। রতন সাজবে প্রমীলা। সন্ধ্যার সময় মায়ের ঘরে রতন প্রমীলার পার্ট বলছে...

...মা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন ছেলের পার্ট...

রতন বলে চলেছে বেশ সুরেলা ভঙ্গীতে—মাণিক ঢুকলো বাড়ীতে। অফিস থেকে ফিরলো। এ্যাক্‌টিং শুনে ঘরের সামনে কাঠ হয়ে সে দাঁড়ালো। রাগ হলো। এক ক্লাশে তিন বছর পড়ে আছে, লজ্জা নেই তার জন্য...থিয়েটার করছেন!

তার মাথায় যেন একদল ফৌজ মার্চ করে চলেছে...তাদের সঙ্গে চলেছে কামানের গাড়ী। মাণিকের মাথাটা যেন এখনি ভেঙ্গে চুর হয়ে যাবে!—যাক্, উপায় নেই!

বারোয়ারি পূজা হলো। থিয়েটার হলো। মাণিক পূজায় চাঁদা দিলে, পূজা দেখলো। থিয়েটার দেখলো

না। শরীর খারাপ বলে বাড়ীতে পড়ে রইলো।

থিয়েটারের খুব সুখ্যাতি—বিশেষ করে ঐ প্রমীলার পার্ট! রতনের এত-গুণ...পাড়ার লোক তার জয়-জয়কার করতে লাগলো। মায়ের আনন্দ ধরে না।

এ দলের ডাক পড়লো বেহালায়। সেখানে বারোয়ারি কালীপূজায় এ-দলকে 'মেঘনাদ বধ' প্লে করতে হবে!

রতন গেল বেহালায় কালীপূজার দুদিন আগে—দেখে-শুনে ষ্টেজ তৈরী করাবে। তাছাড়া বেহালার সেক্রেটারি-বাবু বলেন, ক'দিন তাঁর ওখানে থিয়েটারের ছেলেরা থাকবে খাবে। মহাসমারোহ।

কালীপূজার দিন সকালে মার হঠাৎ জ্বর। মা শুয়ে পড়লেন। ডাকলেন,—রতন...

মাণিক বললে—তার আজ থিয়েটার মা...বেহালায়। সেই মেঘনাদ বধ!

—ও! মা বললেন—একটু জল দে বাবা!

মাণিক জল খাওয়ালো। মা চুপ করে চোখ বুজলেন।

মায়ের কপালে গায়ে হাত দেয় মাণিক...গা পুড়ে যাচ্ছে। খুব জ্বর।

মাণিক ছুটলো ডাক্তারবাববুর কাছে ঃ ডাক্তার এলেন, দেখলেন। ডাক্তারের মুখ ঘোরালো হলো।

ডাক্তার বললেন—সিরিয়াস। সারা শক্ত।

একটু জল দে বাবা!

রাত দশটা। মা চোখ চাইলেন, ডাকলেন—রতন...

মাণিক বসে মায়ের শিয়রে। মাণিক বললে—রতন বাহিরে গেছে মা, ডাক্তারের কাছে। এখনি আসবে।

মা তাকালেন মাণিকের দিকে, বললেন—ডাক্তার কি করবে? তোমরা দু-ভাইয়ে আমার কাছে বসো পাশাপাশি—কোথাও যেয়ো না। আমার ডাক এসেছে। উনি ডাকছেন।

বুকের ভিতর থেকে অশ্রুর সাগর উঠলো ফুঁসে! মাণিক কেঁদে ফেললো। মায়ের বুকে মুখ রেখে মাণিক ডাকলো—মা ..মা...

মার চোখ বুজে এলো। মুখে কথা নেই। তার পর অস্থির ভাবে এ-পাশ ও-পাশ, ও-পাশ আর

এ-পাশ।

মাণিক ডাকলো—মা...

জবাব নেই। মাণিক হাতের নাড়ী টিপলো।

সব শেষ।...

পাশের বাড়ীতে থাকে অনঙ্গ। মাণিক ছুটে গেল; বললে,—মা চলে গেছেন অনঙ্গ ভাই! রতন বেহালায়।

—ও। ওদের থিয়েটার না? আমি এখনি যাচ্ছি। গিয়ে তাকে নিয়ে আসছি।

একখানা ট্যাক্সি নিয়ে অনঙ্গ ছুটলো। মাণিক বসে রইলো মায়ের বিছানায়—মায়ের পাশে। জীবনের অতীত দিনগুলো ম্যাপের মতো চোখের সামনে খুলে গেছে! মাণিক দেখছে সে ম্যাপে...ঐ তাব সেই স্কুল। প্রাইজ নিচ্ছে সে। সামনে সোজা লাইন গেছে সেই হাইকোর্ট...সেখানে জজেদের সামনে দাঁড়িয়ে মাণিক কেস্ করছে—মক্কেলের মকর্দ্দমা—গায়ে কালো গাউন। এদিকে আর একটা লাইন...এ লাইন গেছে ডোবা ঝোপ কাঁটার জঙ্গল ঠেলে! সে জঙ্গলে চলেছে মাণিক...কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত দেহ! অবসন্ন মন। স্বপ্নে সে বিভোর যেন!

স্বপ্ন ভাঙ্গলো অনঙ্গর ডাকে। অনঙ্গ বললে—রতন এলো না...ভাই! বললে, চালাকি! দাদার ধাপ্পা!...

মায়ের মৃত্যুর দু-মাস পরে...রতন এসে ডাকলো—দাদা...

মাণিক বললে,—কেন?

—একটা কারবার করবো। মার গহনাগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে আমার ভাগে যা পড়ে, সেগুলো বেচে টাকা...

মাণিক দু-মিনিট চুপ করে রইলো, তারপর বললে—ওর ভাগ আমি চাই না। সবই তুমি নাও। গহনা নিয়ে আমি কি করবো?

শুনে রতন অবাক্! যে-চোখে তাকালো দাদার দিকে...দাদা বললে,—সত্যিই...তামাসা করছি না!

রতন বললে—বেশ। বেচে যে-টাকা পাবো, তার অর্দ্ধেক তোমার ভাগের টাকা—তোমার কাছ থেকে হাওলাত বলে কারবারের খাতায় টুকে রাখবো।

—তোমার যা খুশী করতে পারো। তবে সাবধানে কারবার করো—যেন মার না খাও!

—না, না। এ যা কারবার—এতে মার খাবার কোনো ভয় নেই।

দেরাজ খুলে গহনাগুলো বার করে নিয়ে রতন চলে গেল।

তারপর তার দেখা নেই! কোথায় গেল, কি তার কারবার, মাণিক একদিনও জানলো না।

দেড় বছর পরে হঠাৎ একদিন রতন এসে হাজির। শীর্ণ চেহারা, ময়লা জামা-কাপড়। এসেই দাদার

পায়ের উপরে পড়লো—খেতে পাচ্ছি না দাদা, কারবার গেছে। যার সঙ্গে করছিলুম, ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। একটা লোক মকর্দ্দমা করেছে। ফৌজদারী মকর্দ্দমা। পাঁচশো টাকা পেলে মকর্দ্দমা সে মেটাবে...নাহলে জেল। পাঁচশো টাকা আমাকে দাও দয়া করে!

মাণিকের দু-চোখ কপালে উঠলো!

মাণিক বললে—এত টাকা...হঠাৎ কোথায় পাবো, রতন?

—যেখান থেকে পারো, দাদা—নাহলে আমাকে জেলে যেতে হবে!

মাণিক বললে—সেভিংস্ ব্যাঙ্কে বড়-জোর শ-দুই টাকা আছে। আমাদের অফিসে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড তো—তাতে মাসে মাসে টাকা কেটে নেয় মাইনে থেকে।

রতন আর সামলাতে পারলো না, বললে—বাড়ীতে আমার অর্দ্ধেক ভাগ আছে—সেই অংশ...তোমাকে বলিনি...চুপি চুপি দলিল লিখে আমি আমার সে-অংশ বন্ধক দিয়েছি। কারে পড়ে দিতে হয়েছিল। সে-দেনাও সুদে জমে এত! তারা নালিশ করে আমার নামে ডিক্রী করেছে। কবে আমার শেয়ার নীলামে তুলবে! তাই আমি বলছিলুম...

মাণিকের বুকে যেন আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়লো! এই ছোট বাড়ী—তার অর্দ্ধেক শেয়ার বন্ধক! লাটে উঠবে! তার মানে?

কিন্তু কার উপরে রাগ করবে? করে লাভ?

মাণিক বললে—কত টাকার ডিক্রী?

তাঁর কাছে আমার শেয়ারও বেচে দেবো। [পৃষ্ঠা ২৬০

—তা প্রায় তেইশ-শো টাকা।

—এর উপর তোমার চাই আরো পাঁচশো?

—হ্যাঁ, দাদা। পাঁচশো না হলে জেলে যেতে হবে।

মাণিক ভাবলো...অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো। তারপর বললে—যে-লোক ডিক্রী করেছেন, চলো, তাঁর

কাছে যাই। তিনি সব বাড়ীটা কিনে নিন...তাঁর কাছে আমার শেয়ারও বেচে দেবো। তার দামের দরুণ আগাম পাঁচশো টাকা বায়না নিয়ে তোমাকে দেবো। জেল থেকে তো বাঁচবে তাহলে?

—আঃ, তা যদি করো! তিনি এখনি তোমরা শেয়ার কিনবেন...আমাকে সে-কথা বলেছেন।

যাঁর ডিক্রী...তিনি দয়ামায়াশূন্য নন! মাণিকের শেয়ার তিনি নিতে রাজী হলেন, তবে এ-শেয়ারের জন্য তিনি দিতে পারেন...পাঁচ-হাজার। ব্যস্! তার উর্দ্ধে আর এক পয়সা নয়! মাণিক তাতেই রাজী। পাঁচশো টাকা তিনি দিলেন—অগ্রিম বায়না।

সে-পাঁচশো নিয়ে রতন অদৃশ্য হলো।

তারপর বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল।

মাণিক বাড়ী ছেড়ে একটা মেসে আস্তানা নিয়েছে।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই! যখন-তখন রতন আসে, বলে, ভালো কাজ পেয়েছে...দুমাস পরে পাকা কণ্ট্রাক্ট হবে—গ্রামোফোনওলারা তার গানের রেকর্ড করবে।

এ-কথা বলে দাদার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা—নিদেন দশটা টাকা নিয়ে যায়।

কণ্ট্রাক্টের সে দুমাস পার হয়ে দু-চার বছর পার হতে চলেছে, তবু সে কণ্ট্রাক্ট আর পাকা হয় না!

অনঙ্গ মেসে আসে,—সব কথা শোনে...বলে,—কেন তুমি দাও, মাণিক?

মাণিক হাসে...বলে—আমি বড় ভাই...দাদা। দাদার দায়িত্ব অনেক, অনঙ্গ! ও-যে ছোট ভাই...বড়র উপর ছোটর দাবী চিরদিন!

● **মণি ও মুক্তা**

হে পরিত্রাণকারী দেবতা, তোমাদের গভীর আশীর্ব্বাদে আমাদের ধন্য কর। আমরা যেন নিদ্রায় আর আলস্যে আর অকারণ বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করি। আমরা যেন সু-বীর হয়ে সভায় সু-কর্ম্ম আলোচনা করি, সু-ব্রতের পরিকল্পনা করি।

—কাণ্ব ঋষি-বেদ

হয়ে গেল মিলটা

—আশা দেবী

শোন্ ভাই ঘণ্টা—
অনুতাপে ভরে গেছে মোর সারা মনটা।
আজ থেকে আর মোরা হবো নাকো ক্রুদ্ধ
করব না গালাগালি—মারামারি যুদ্ধ
ভালবেসে প্রাণ মন করে নেব শুদ্ধ
দুই জনে হবো যেন বুদ্ধ—
"আয় ভাই ভাব করি"—ডেকে বলে ডণ্টা—
"ঠিক দাদা—তাই হবে"—শুনে বলে ঘণ্টা!

ছাতে ওকি পড়ল ?
ঝট্ পট্ দুই ভাই চট্ পট্ চড়ল!
রংচঙে ঘুড়িটার সুতো ধরে ডণ্টা
ল্যাজ ধরে টানাটানি জুড়ে দিলে ঘণ্টা—
তারপর শুরু হলো কি ভীষণ রণটা—
মুছে গেল ভাব-টাব মুছে গেল পণটা—
কখনো বা চুলে টানে—কখনো বা কামড়ায়
কখনো বা মারে চড়—খিমচায় চামড়ায়!

ছুটে এসে মাথা ধরে ঠুকে দিলে বড়দা—
কলিশন হল যেন এঁড়েদা ও খড়দা!
ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে দুই জনে খেয়ে রাম কিলটা—
কান্নার কোরাসেতে হয়ে গেল মিলটা॥

———

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এমন লোক সব দেশে সব সময়েই আছে—পেয়েও যাদের আশ মেটে না—কেবল চায়, "আরো দাও, ভগবান, আরো দাও।"

সব জিনিসেরই সীমা আছে। পাওয়ার ইচ্ছাকেও সীমার মধ্যে রাখতে হয়—নইলে তা শুধু দেয় দুঃখ। সূর্য্য উঠতে উঠতে মধ্য-গগনে পৌঁছেও থামতে পারে না, তাই তাকেও আমার নেমে যেতে হয় অস্তাচলের দিকে।

অতি লোভের গল্প অনেক শোনা যায় বৈকি! অনেক গল্পই শুনেছি ছেলেবেলা থেকে, কিন্তু আজ আমি বলতে বসেছি একটি সত্যিকার কাহিনী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। দু'শ বছরেরও বেশী দিন হয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডে তখন তৃতীয় জর্জ রাজত্ব করতেন।

কিন্তু তারও আগেকার কথা একটু আছে।

পিটার থেল্যুসন ফরাসী দেশের লোক। ছেলেবেলায় প্যারী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন লণ্ডনে—কিছু টাকা রোজগারের চেষ্টায়। তাঁর পূর্ব্বপুরুষরা এককালে খুব ধনী ছিলেন কিন্তু পরে তাঁদের অবস্থা কিছু পড়ে যায়—তবু টাকার নেশা তাঁর রক্তে ছিল। এটা-ওটা—দু'একটা ছোটখাট ব্যবসা থেকে শীগ্‌গিরই তিনি ব্যাঙ্কিং ব্যবসা ফেঁদে বসলেন।

এখন যেমন যৌথ-কারবার ছাড়া ব্যাঙ্কের ব্যবসা (টাকা লেনদেনের কারবার) চলে না—তখন তেমন ছিল না। মানুষ টাকা জমা রাখত দেখে-শুনে। একটা মানুষ বা পরিবারকে দেখে তার বা তাদের হাতে টাকা তুলে দিত। তারাই বংশ-পরম্পরায় সেই ব্যাঙ্ক চালিয়ে যেত। মানুষও চোখ বুজে বিশ্বাস করত।

থেল্যুসন ছিলেন খুব হুঁশিয়ার ব্যবসায়ী—বিশ্বাসীও বটে। দেখতে দেখতে তাঁর কারবার ফুলে ফেঁপে উঠল। ইউরোপের সব বড় বড় শহরে তাঁর লোক—কোটি কোটি টাকা লেন্‌-দেন্‌ হয়।

শেষে একসময় দেখা গেল, বিলেতের ছ'জন সবচেয়ে ধনী লোকের মধ্যেও তাঁকে ধরা হচ্ছে—এতই টাকা করেছেন তিনি। রাজা সুদ্ধ তাঁকে সমীহ্‌ করে চলেন।

একদিন হিসেব করতে বসলেন পিটার থেল্যুসন—কত টাকা তাঁর হয়েছে। নব্বুই লক্ষ টাকা তাঁর নগদই হয়েছে। এছাড়া জমিদারী আছে, তার আয়ও বছরে সাড়ে সাতষট্টি হাজার টাকা। তার ওপর

ব্যাঙ্কে ত টাকা খাটছেই। তার আয়ও কমেনি, বরং বেড়েই যাচ্ছে।

কী করবেন এ টাকা দিয়ে? ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন? তাহলে ত কমে গেল টাকা। কেউই এমন টাকা পাবে না যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী বলে গণ্য হতে পারে। বড় ছেলেকে শুধু দিয়ে যাবেন? উঁহু—ছেলেটা তেমন নয়। টাকা হয়ত উড়িয়েই দেবে সে।

অনেক ভাবলেন তিনি। বেশ-কিছুদিন ধরেই ভাবলেন। আর না ভাবলেও নয়। বয়স এধারে ষাট পেরিয়ে গেছে যে! ক-দিনই বা এ-টাকা আগ্‌লে থাকবেন?

আরও একটি লোভ ছিল থেল্যুসনের।

নামের সঙ্গে উপাধি একটা জোড়া লাগালে মন্দ হয় না।

তিনি হয়ত সেটা ভোগ করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর বংশেরও যদি কেউ পায় কোন উপাধি—লর্ড, মার্কুইস্, ডিউক বা অমনি কিছু—তবু সে-ও ত তাঁর গৌরব। লোকে ত বলবে যে এর পূর্ব্বপুরুষ ছিল অমুক, আর সেই অমুকের টাকার জোরেই এরা আজ এই উপাধি পেয়েছে।

কিন্তু যা টাকা আছে, এতে কি উপাধি পাওয়া যাবে?

বোধহয় না। আরও টাকা চাই। বহু টাকা হলে হয়ত রাজাকে কিছু টাকা দিয়ে উপাধি কেনা যেতে পারে।

তিনি উইল করে দিয়ে গেলেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে থেল্যুসন এক ফন্দী বার করলেন।

মাত্র পনেরো লাখ টাকা তিনি উইল করে দিয়ে গেলেন—তাঁর স্ত্রী, তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে—এই সাত জনকে। আর বাকী টাকা ও সমস্ত জমিদারীর আয় জমবে এবং সুদে খাটবে (এতদিন টাকাটা প্রায় এককোটিতে গিয়ে পৌঁচেছে)—যতদিন না তাঁকে নিয়ে তিনপুরুষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। মানে নাতি-নাৎনীরা পর্যন্ত সকলে মারা যাওয়া যাই। তখন তাঁর যে নিকটতম উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকবে, সে-ই পাবে সমস্ত টাকাটা।

কোটি কোটি টাকার মালিক হবে সে-ই অনাগত থেল্যুসন! তখন আর তাঁর পক্ষে একটা উপাধি পাওয়া এমন শক্ত কি?

থেল্যুসন নিশ্চিন্ত হলেন।

শুধু নিশ্চিন্ত হলেন না—নিশ্চিন্ত মনেই মারা গেলেন তিনি (১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু তারপরই শুরু হলো গোলমাল।

উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি উইল করেছিলেন, তবু যত ভাল উকীলই হোন্, তাঁর আইনজ্ঞানের ফাঁক ধরবার মত উকীলও ত আছে!

ছেলেরা আনলে মামলা।

ও উইল ঠিক নয়। বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিছল। এমন উইল করবার কোন অধিকারই ছিল না তাঁর—এই সব হলো তাদের যুক্তি।

তখন এই সব বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে যে দেওয়ানী আদালতে মামলা হত—বিলাতে তাকে বলত কোর্ট অব্ চ্যান্সারী। এমনই বিচিত্র ব্যবস্থা ও আইন ছিল তখন যে, এই চ্যান্সারী কোর্টে মামলা একবার উঠলে, তা আর সহজে মিটত না। পঞ্চাশ-ষাট বছর ত' বটেই—একশ দু'শ বছর পর্য্যন্ত ঐ মামলা গড়াত। যারা মামলা আনত, তাদের পর তিন-চার পুরুষ বৃথা আশায় দিন গুণে গুণে একসময় ইহলোক থেকে সরে পড়ত—তবু মকদ্দমা মিটত না। যে টাকা বা বিষয়ের জন্য মামলা, তা মকদ্দমার খরচেই নিঃশেষ হয়ে যেত—অনেক সময় তার চেয়েও বেশি—শুধু মকদ্দমা চল্‌তই—বছরের পর বছর।

ইংরেজী ভাষার সবচেয়ে বড় ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্স্ এই ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ব্লিক্ হাউস' লেখেন—আর তাতে এমন তীব্র বিদ্রূপ করেন যে পরে এই আইন এবং বিধি-ব্যবস্থা পাল্‌টে যায়।

যাক সে কথা—

পিটারের ছেলেমেয়েরা ত মামলা জুড়ল। দেখতে দেখতে একটা মামলা থেকে অসংখ্য মামলা বেরিয়ে এল। এরা একটা করে ত উইলের অছিরা পাল্‌টা মামলা করেন তিনটে। এর ভেতর দেশের আইন বদলায়—আবার নতুন করে মকদ্দমা শুরু হয়ে যায়। উকীল ব্যারিষ্টার য়্যাটর্ণী, এমন কি আদালতের চাকর-পেয়াদাদেরও যেন মহোৎসব পড়ে গেল!

মকদ্দমা চলল, ত্রিশ-চল্লিশ, পঞ্চাশ-ষাট বছর। তবুও মামলা থামল না।

অবশেষে আসল থেল্যুসনের শেষ নাতিটিও কল্পনায় ঠাকুরদাদার বিষয় গুন্‌তে গুন্‌তে পরলোকে যাত্রা করলেন—এবার উইল অনুযায়ীও মামলা থামবার কথা, তবু থামল না। বরং নতুন করে আরও গোটাকতক মামলা শুরু হয়ে গেল!

অবশেষে মামলা পার্লামেণ্ট পর্যন্ত গড়াবার পর যখন মীমাংসা হলো, তখন দেখা গেল যে, ওঁর বড় ছেলের বড় নাতিটিই বিষয়ের মালিক হবেন—চার্লস্ থেল্যুসন বলে এক ভদ্রলোক—কিন্তু পিটার থেল্যুসনের স্বপ্ন-দেখা সে কোটি কোটি টাকা ত নয়ই...উনি যা পেলেন তা পিটারের রেখে-যাওয়া আসল টাকারও অনেক, অনেক কম। সামান্য কয়েক লক্ষ মাত্র টাকা!

বাকী সবটাই এই দীর্ঘদিনের মামলা-মকদ্দমার জন্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে!

এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেইজন্য পার্লামেন্ট থেকে পরে এই ধরণের উইল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। থেল্যুসনের ব্যাপার থেকেই ঐ আইন চালু হয় বলে আজও সে আইনকে "থেল্যুসন-আইন" বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

তবে একটা কথা। থেল্যুসনের একটা আশা মিটেছিল। উপাধি পেয়েছিলেন ওঁর বংশধররা ঠিকই। কিন্তু সে জন্য তিন পুরুষ অপেক্ষা করতে হয়নি.....কোটি কোটি টাকাও লাগেনি। পিটার থেল্যুসনের বড় ছেলেই লর্ড রেণ্ডেলশ্যাম উপাধি পেয়েছিলেন।

তর্কে বহু দূর

বোমার মশলা (শ্রীঅরবিন্দ)

স্বদেশী-আন্দোলনের সময়। ইংরেজ-পুলিস একটা বৃহৎ বিপ্লবের আয়োজনের খবর পেয়েছে। এই বিপ্লব-আন্দোলনের নেতা হলেন শ্রীঅরবিন্দ।

গ্রে স্ট্রিটে তাঁর বাড়ী ভোর না হতেই পুলিস ঘেরাও করে ফেল্লে। পুলিসের সাহেব কর্ত্তা বাড়ীর ভেতর ঢুকে শ্রীঅববিন্দকে গ্রেফতার করলেন। ঘরে বোমা বা বন্দুক আছে কি না, তার জন্যে সাহেব লোক দিয়ে তল্লাসী করে। হঠাৎ সাহেবের নজরে পড়লো, একটা ছোট পিচবোর্ডের বাক্সের ভেতর ধুলোর মতন কি সব রয়েছে। সাহেবের ধারণা হলো, এটা নিশ্চয়ই বোমার মশলা। সাহেব খুব সাবধানে সেটা নিয়ে গেলেন। শ্রীঅববিন্দ শুধু নীরবে হাসলেন। তিনি জানতেন, সেই কাগজের বাক্সে ছিল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ-পুণ্য দক্ষিণেশ্বরের ধুলো। তিনি মহাসম্পদের মত সেই ধুলো তাঁর কাছে রেখে দিয়েছিলেন। সাহেবের অনুমানও ভুল হয়নি, সেই ধুলো সত্যিই হলো বোমার মশলা, যে বোমায় আজ বিশ্বের অবিশ্বাস ভেঙ্গে পড়ছে।

—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এ গল্প আমার ডাইভারের কাছ থেকে শোনা। এল. টি. ডাইভার ছিলেন নিউজিল্যাণ্ড এয়ারফোর্সের একজন বড় অফিসার। গত যুদ্ধে আমেরিকানরা যখন জাপান অধিকার করে, তখন আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে তিনিও জাপানে যান। প্রাচ্যের বিচিত্র দেশ জাপান তাঁকে অভিভূত করে। কাজ থেকে ছুটিছাটা পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়তেন দেশ দেখতে— দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে আনন্দে তাঁর বুকে ভরে উঠত। আসলে তাঁর মনের মধ্যে প্রাচ্যের শিল্প-সভ্যতার প্রতি ভালবাসা ছিল অসীম। নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে আমি তাঁর পরিচয় পেয়েছিলুম। একদিন [illegible] নীদের জীবনধারা ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাস ও ভক্তির কথা বলতে বলতে তিনি একটি বিস্ময়কর গল্প বলেন। গল্পটি আগাগোড়া সত্যি এবং এর এতটুকুও অতিরঞ্জন নয়। এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজেই জড়িত ছিলেন। গল্পটি তাঁর মুখ দিয়েই তোমাদের এখানে শোনাচ্ছি।

ডাইভার বললেন ঃ ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৭ সালে। আমি তখন আইওয়াকুনি এয়ার-ষ্টেশনে এসেছি সবে বদ্‌লি হয়ে। তখনও পুরোপুরি কাজের ভার বুঝে নিতে চার-পাঁচ দিন বাকী। এই চার-পাঁচ দিন আমার একরকম ছুটিই বলতে গেলে। এর আগে যেখানে আমি ছিলুম, তার চেয়ে এই ছোট্ট শহরটি ও এখানকার গ্রাম্য পরিবেশ আমার ভালই লাগল। তাছাড়া এখানে আমার পুরোন বন্ধু জো উইলসনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম! জো অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশী নয়। আমার চেয়ে মাত্র বছর দু'একের বড় ছিল সে। বহুদিন সৈন্য বিভাগে আছে।

৯ম অষ্ট্রেলিয়ান ডিভিশনে বেশ কিছুদিন সে প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডে কাজ করেছিল। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় সেই সময়েই। তার বাবার দুষ্প্রাপ্য পুরোন জিনিসের দোকান ছিল ব্রিসবেনে। জো যে দেশেই যেত, সেখান থেকেই কিছু না-কিছু 'কিউরো' পাঠিয়ে দিত তার বাবার কাছে অষ্ট্রেলিয়ায়। এর জন্যে তার মোটা খরচও হয়ে যেত মধ্যে মধ্যে। এ কথা প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডে থাকার সময়েই সে আমায় বলেছিল। তাছাড়া আমি আমার নিজের চোখেও অনেকব্যর এটা-সেটা তাকে পাঠাতে দেখেছি।

আমাকে এখানে দেখেই জো একেবারে লাফিয়ে উঠল। বললে, 'সেই এলে ত',—এলে একেবারে শেষ সময়ে! আর কয়েক মাস পরেই ত' আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি!'

জো উইলসন্

আমি বললুম, 'কয়েক মাস মানে ত' আর দু'চার দিন নয়, কাজেই তোমার হতাশ হবার কিছু নেই।'

উত্তরে জো বললে, 'কিন্তু তুমি পুরোপুরি কাজে যোগ দেবার আগেই যে ক'দিন ছুটি হাতে আছে, সে ক'দিনই আমরা উপভোগ করে নিতে চাই।'

তার উপভোগের ইচ্ছেটা কি ধরণের হবে, তা না ভেবেই আমি বললুম, 'আমার না হয় তিন-চার দিন ছুটি হাতে আছে, কিন্তু তুমি কি করে আমার সঙ্গে যোগ দেবে?'

—'তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি ছুটিতেই আছি—চলো কালই বেরিয়ে পড়ি,' বলে জো আমার কাঁধের উপর সজোরে তার হাতটা রাখলে।

গোড়া থেকেই জো'র সঙ্গে আমার মিল হয়েছিল এই বেড়ানোর ব্যাপারে। প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডের বহু জায়গা আমরা অবসর পেলেই ঘুরে আসতুম দু'জনে। এই ভ্রমণের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না জমা রয়েছে! অবশ্য বেশীর ভাগই জো ঘুরে বেড়াত ঐ 'কিউরো'র সন্ধানে। কোথাও বিচিত্র নতুন কিছু পেলেই সস্তা দরে কিনে পাঠিয়ে দিত স্বদেশে, তার বাবার কাছে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নানা গল্প করতে করতে জো বললে, 'চল কালই আমরা বেরিয়ে কিয়োতুতে 'হাজার মূর্ত্তির মন্দির' দেখে আসি। অনেক দিন থেকে ওখানে যাব-যাব ভাবছি, কিন্তু মনের মত সঙ্গী না পাওয়ায় যাওয়া আর ঘটে ওঠেনি।'

গাইড্ বুকটা বার ক'রে তক্ষুণি সে 'টেম্পল অফ্ থাউজ্যাণ্ড আইডল' সম্বন্ধে পড়ে শোনাল। এই 'হাজার মূর্ত্তির মন্দির'-এর আসল নাম 'সানজিয়াসানজেনডো'। কাওয়েননেন নামে এখানে প্রায় ৩৩,৩৩৩টি মূর্ত্তি আছে। ক্ষমার দেবী হিসাবে এদের প্রসিদ্ধি। এই মূর্ত্তিগুলির আকৃতি, বিশেষ করে দাঁড়ান ও বসার ভাব অনেকটা বুদ্ধের মতই ; তবে এরা দেবতা নয়, দেবী—এই যা তফাৎ।

পরের দিন জো'র কথা মত ভোরের দিকেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম সেই বিস্ময়কর মন্দির দেখবার জন্যে। সৈন্য-বিভাগে আমাদের উপরওয়ালাদের কাছ থেকে অনুমতি-পত্র আগের দিন রাত্রেই জো সংগ্রহ

করে রেখেছিল, কাজেই ইউনিটের ট্রাকে করে যাত্রা করায় আমাদের কোন অসুবিধা হল না। ট্রাক আমাদের এনে পৌঁছে দিল কোবে যাবার পথে কুরি রেলওয়ে ষ্টেশনে। শহরতলীর ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে এই রেলের লাইন। তৃণগুল্মহীন রুক্ষ জমির উপর দিয়ে দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলতে লাগলুম। চতুর্দ্দিক এবড়োখেবড়ো উঁচু-নীচু পাহাড়ে ঘেরা এই অনুর্ব্বর দেশে কি করে যে লক্ষ লক্ষ লোক খেয়ে-দেয়ে জীবনধারণ করে আছে, তা একটা ভাববার বিষয়।

কুরি ত্যাগ করে ঘণ্টা-চারেকের মধ্যে আমরা কোবেতে এসে পৌঁছে গেলুম। কুরি শহরের তুলনায় কোবে সম্পূর্ণ অন্য রকমের। এর চেহারাই আলাদা। কোবের 'মাইকো হোটেল'-এ গিয়ে উঠলুম আমরা। এমন সুন্দর প্রাসাদোপম হোটেল-বাড়ী সচরাচর নজরে পড়ে না। প্রাচীনকাল থেকে জাপানের রাজা-রাজড়াদের বিলাস-ক্ষেত্র হিসাবে এই হোটেলের প্রসিদ্ধি ছিল, এবং এর সাজগোজও ছিল ও-দেশের রুচি ও শিল্পকলা অনুযায়ী। কিন্তু কালে প্রায় ইউরোপীয়ানদের জন্যেই এই নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। এখানে আমরা ঠিক যেন সেই প্রাচীনকালের রাজা-রাজড়াদের মতই খাতির পেলুম। তখন অবশ্য জাপানে বিদেশী সৈন্যদের খাতির সব জায়গাতেই। মিলিটারী পোষাক-পরা বিদেশী লোক দেখলেই তারা সবার আগে এগিয়ে আসত সম্মান দেখিয়ে, সাহায্য করতে।

একটা রাত হোটেলে কাটিয়ে, দ্বিতীয় দিন আমরা এখান থেকে সানোমিয়া ষ্টেশনে ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেনে চেপে জাপানের পুরাতন রাজধানী কিয়োতুতে এসে পৌঁছলুম। মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় লাগল এই পথ অতিক্রম করতে। জাপানের মধ্যে কিয়োতুই একমাত্র শহর, যুদ্ধের সময় যার কোন ক্ষতি হয়নি বোমা পড়ে।

কিছুক্ষণ শহরের এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরির পর জাপানী অক্ষরে লেখা রাস্তার নাম আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে মুস্কিল হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারও সুরাহা হল। ইংরেজী জানা একজন জাপানী আমাদের হাজার মূর্ত্তির মন্দিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

জাপানে অনেক বড় বড় কাঠের বাড়ি আমরা দেখেছি বটে, কিন্তু এমন চিত্তাকর্ষক কারুকার্য্য-করা পেল্লায় বাড়ি আর দেখেছি বলে মনে হল না। দু'জনেই আমরা বাইরে থেকে তার আকৃতি দেখে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেলুম। বহু যুগ পূর্ব্বে যখন দাসপ্রথা প্রচলন ছিল, তখন ঐ সব দাসদের দিয়েই সম্ভবত তৈরি হয়েছিল এই বিরাট দারু-হর্ম্ম্য। বহুকালের বুড়ো বুড়ো নানা গাছপালায় ঘেরা একটি বাগানের নির্জ্জনতার মধ্যে বসে আছে যেন আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো! হানা-বাড়ির মত দেখলে ভয়ও হয়, আবার ভালও লাগে। ঢোকবার মুখে সামনেই পড়ে বিরাট হলঘর। তার মধ্যে বড় বড় মোটা কাঠের অজস্র থাম একেবারে ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। একজন রক্ষী বসে আছে প্রবেশ-দ্বারে। বাইরে থেকে প্রথমে হলঘরের মধ্যে ঢুকলে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু ক্রমশঃ সেই অন্ধকার সরে গিয়ে বিস্তৃত ঘরের মধ্যে প্রথমেই সামনে জেগে ওঠে বুদ্ধমূর্ত্তির মত কাল রঙের এক দেবী-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির সামনে একটি পাত্রে কিছু ধূপ ধিকি-ধিকি করে পুড়ে চলেছে। সারা হলঘর ভরে গিয়েছে তার সুগন্ধে। একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ পুরোহিত তার জোব্বা-জাব্বা পরে ঐ মূর্ত্তির পাদদেশে বসে। আর তারই দু'পাশে দেয়ালের গা-ঘেঁষে সারবন্দি দাঁড় করান রয়েছে একই রকমের শত-সহস্র মূর্ত্তি। মাথায় তাদের সুন্দর কারুকার্য্যকরা মুকুট,

গায়ে অন্যান্য অলঙ্কার। দারুশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন এই মূর্ত্তিগুলির দিকে চেয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়—মনে হয়, যেন তাদের সবগুলিই জীবন্ত, এখুনিই কথা বলবে!
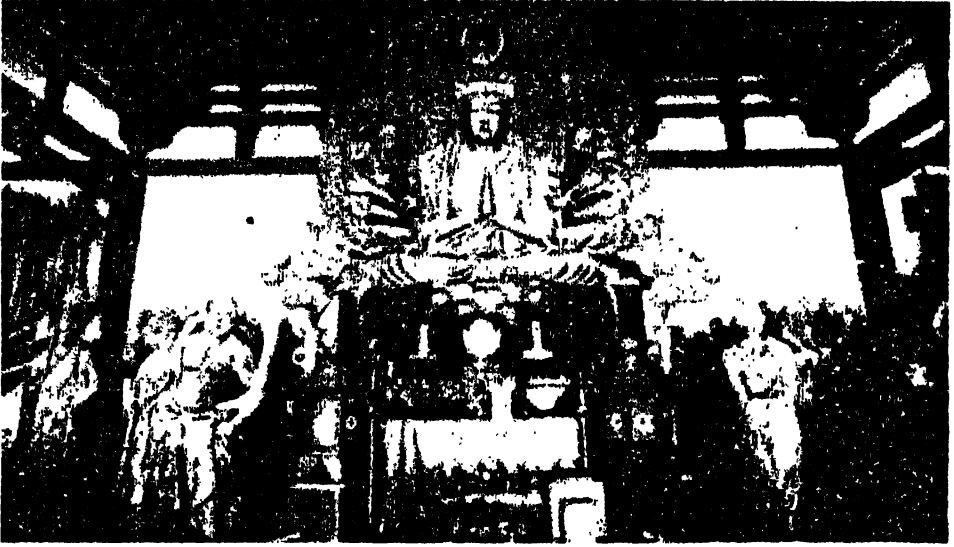
প্রথমেই জেগে ওঠে কাল রঙের এক দেবী-মূর্ত্তি। [পৃষ্ঠা ২৬৮

কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে সেগুলি দেখতে দেখতে গা-ছমছম করতে লাগল। আধা-অন্ধকার আধা-আলো এই নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে আর বেশী ঘুরতে ভাল লাগছিল না আমার। কিন্তু তবুও জো'র উৎসাহের অন্ত নেই! ধুলো ও ঝুল ঠেলে ঠেলে সে এগিয়ে চলেছিল আমার সঙ্গে বেশ খানিকটা তফাৎ রেখে রেখে। খানিকটা ঘোরার পর আমি একটু পা চালিয়ে জো'র কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'দেখ, যদিও প্রাচ্যের এই সব জিনিস আমার খুবই ভাল লাগে, এবং সেই জন্যেই তুমি একবার বলবামাত্র বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এখন আর একেবারেই ভাল লাগছে না জায়গাটা—চলো বেরিয়ে পড়ি।'

আমার কথা যেন তার কানেই ঢোকেনি এমনি ভাব করে সে আমার হাতটা ধরে বললে, 'আর একটুখানি এদিকে এসো আমার সঙ্গে, তোমায় একটা কথা বলি।' বলে সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল দেয়ালে লাগানো একটা উঁচু তাকের কাছে। গিয়ে দাঁড়াল সেখানে। দেখলুম, কতকগুলি খুব সুন্দর ছোট ছোট মূর্ত্তি সাজান রয়েছে ঐ তাকের উপর। অন্য বড় বড় যে মূর্ত্তিগুলি আমরা চারিদিকে এতক্ষণ দেখছিলুম এগুলি সেগুলিরই ছোট সংস্করণ। এদের মুখের আকৃতিতে বড়দের সঙ্গে ছোটদের চমৎকার মিল রয়েছে! লম্বায় এদের কোনটি আট ইঞ্চির বেশী নয়। এতটুকু কাঠের মূর্ত্তির মধ্যে এমন সূক্ষ্ম হাতের কাজ রয়েছে যে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

জো সেগুলির আরও কাছে এগিয়ে গেল, তারপর চাপা গলায় আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'ঠিক এমনিটিই চেয়েছিলুম—বাবা পেলে দারুণ খুশি হয়ে উঠবেন; নিয়ে যাবার পক্ষেও ভারী সুবিধে!'

আমি একটু হেসে বললুম, 'কিনবে ত' বলছ, কিন্তু এ-সব কিনতে অনেক হাজার ইয়ান (জাপানী মুদ্রা) পড়ে যাবে। তাছাড়া জাপানীরা এই মূর্ত্তিগুলিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে পূজা করে থাকে, বিক্রি হয়ত নাও করতে পারে—তবে তুমি দেখ—'

—'আঃ, আমি কেনার কথা বলছি না কি?' সে আমায় বাধা দিয়ে বলে, 'একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করলে আমরা অনায়াসেই এখান থেকে একটি ছোট মূর্ত্তি নিয়ে যেতে পারি—তবে এর জন্যে তোমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই!'

জো'র কথা বলার ভাব দেখে আমি যেন প্রথমটা কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সাধারণভাবে নিজেকে আমি একজন সৎলোক বলেই জানতুম এবং কারু কোন জিনিস চুরি করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন—তার উপর এইসব দেব-দেবীর ব্যাপার! ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করলুম বটে, কিন্তু তবুও, সেই মুহূর্ত্তে আমার যে কি মতিভ্রম হল বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে, আমি তার প্ল্যান সব শুনলুম। তারপর এই বলে মনকে প্রবোধ দিলুম যে, এই মন্দিরে ত' ছোট-বড় হাজার হাজার মূর্ত্তি রয়েছে, তার মধ্যে একটা গেলে নিশ্চয়ই এদের কোন ক্ষতি হবে না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জো'র অভিসন্ধি মত আমি আমার অভিনয় সুরু করে দিলুম। বুড়ো পুরোহিত তখনও সেই প্রধান বড় মূর্ত্তিটির ধূপদানির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি দূর থেকেই আমার পেটে হাত রেখে, গোঙাতে গোঙাতে একটু নুয়ে তার কাছে গেলুম, তারপর টলতে টলতে তার হাতটা ধরবার ভান করে একেবারে এসে চার-চাপটে পড়লুম তার পায়ের কাছে! অকস্মাৎ আমার এই অবস্থা দেখে বুড়োর ত' চক্ষুস্থির! ঐ অঞ্চলে কয়েকদিন তখন কলেরা দেখা দিয়েছিল, প্রায়ই লোক মারা যাচ্ছিল এদিক-সেদিকে। আমরা অবশ্য এ খবর কেউই জানতুম না। কিন্তু আমার এই অবস্থা দেখে বৃদ্ধের নিশ্চিত ধারণা হল যে, আমায় কলেরায় ধরেছে। বৃদ্ধ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে চীৎকার করে দ্বাররক্ষীকে ডাক দিতেই সে ছুটে এলো আমার কাছে।

'ইতআই, ইতআই!' (মানে, লাগছে—ভীষণ লাগছে) বলে পেট ধরে ধুলোর উপরেই গড়াগড়ি খেতে লাগলুম আমি, এবং তার মধ্যেই আড়চোখে একবার দেখে নিলুম জো আর সেখানে নেই। এই গোলমালের মধ্যে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেছে সে। তার মনোবাঞ্ছা তা'হলে পূর্ণ হয়েছে ভেবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে ফেললুম। তারপর আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে দোলাতে উঠে বসলুম, এবং ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করছি এমনি ভাব দেখিয়ে, ইশারায় হাঁ করে এক গ্লাস জল চাইলুম বুড়ো পুরোহিতের কাছে; দ্বাররক্ষী তখুনি ছুটে গিয়ে জল এনে দিলে। জল খেয়েই পুরোহিতের কাছে নতজানু হয়ে প্রণাম জানিয়ে, আমি দু'তিন মিনিট স্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। রক্ষীটি আমার একটি হাত ধরে ফটকের কাছে নিয়ে এলো। সেখানে আরও দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে, তাকে একটা সেলাম করে আমি বেরিয়ে এলুম হাজার মূর্ত্তির মন্দিরের বাইরে। মন্দিরের বাউণ্ডারী না পেরনো পর্য্যন্ত আমায় আস্তে আস্তে পা ফেলে চলতে হল। এখানের হাত চল্লিশেক পথ অতিক্রম করার সময় আমি

যেন কয়েক মাইল চলার অবসাদ মনের মধ্যে অনুভব করলুম! নিজেকে অপরাধী মনে করার মত পীড়াদায়ক অনুভূতি বোধ হয় আর কিছুই নেই। আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হচ্ছিল তখন অত্যন্ত দ্রুত।

কোন রকমে দৌড়বার ইচ্ছেকে দমন করে আমি যখন ঐ মন্দিরের বাউণ্ডারী পেরিয়ে বেশ খানিকটা এসে পড়েছি, তখন হঠাৎ আমার কানে ভেসে এলো মন্দিরের দিক থেকে কয়েকজনের চেঁচামেচি! তা'হলে আর রক্ষে নেই! ওরা নিশ্চয়ই চুরির ব্যাপারটা জানতে পেরেছে ভেবে, আমি সেখান থেকেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করে দিলুম। সোজা রাস্তা ধরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলুম কোলাহল-মুখরিত বাজারের ভিড়ের মধ্যে। এখানে এসে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলুম বটে, কিন্তু এ জায়গাও আমার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এর পর আমি সোজা চলে এলুম একেবারে রেলওয়ে স্টেশনে। এখানেই জো আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু কোথায় জো? আমি হন্যের মত ছুটোছুটি করেও কোথাও তার দেখা পেলুম না।

পড়লুম তার পায়ের কাছে। [পৃষ্ঠা ২৭০

ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে—হাতে আর মোটেই সময় নেই। এখানে বাইরে আর বেশী ঘোরাঘুরি করা সমীচীন নয় ভেবে, আমি ট্রেনের ভিতরে উঠে, জানালা দিয়ে প্রতি মুহূর্ত্ত জো'র অপেক্ষা করতে লাগলুম।

হুইসল পড়ে গেল, চারিদিকের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গাড়ি ছাড়ল বলে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে জো এসে লাফিয়ে উঠল গাড়িতে। এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "কি, ব্যাপার তোমার? মুখখানা যে একেবারে শাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে দেখছি!'

আমি কোন গতিকে কি ভাবে মন্দিরের ভেতর থেকে ধরা না-পড়ে বেঁচে এসেছি, এবং তাদের পিছু ধাওয়ার কথা চুপিচুপি বলায় সে হেসেই উড়িয়ে দিলে। যদিও তার হাসি মোটেই স্বাভাবিক ছিল

না, তবুও সে-কথা চাপা দিয়ে জোর করে সে অন্য কথা বলতে লাগল।

গাড়ি তখন বেশ গতি নিয়েছে। শহরের ভেতর দিয়ে তখনও চলেছি আমরা। জো বক্ বক্ করে বকে যাচ্ছে; তার বাবা ওটা দেখলে কত খুশি হবেন, তাছাড়া কি সুন্দর প্ল্যানই সে মাথা থেকে বার করেছিল, এমনি সব কথা। এ-সময় ঐ-সব কথা যত আমি শুনতে চাইছি না, ঐ-সব কথা যত আমার ভাল লাগছে না, ততই সে যেন উৎসাহিত হয়ে আমায় শোনাবে বলে ক্ষেপে উঠেছিল! কিন্তু হঠাৎ যেন ঈশ্বর তার মুখ তখনকার মত একেবারে বন্ধ করে দিলেন! শুধু তার মুখই নয়, খবরটা শুনে আমিও একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলুম।

জো ঐ ভাবে যখন বকে চলেছে, ঠিক সেই সময় একজন আমেরিকান করপোরাল আমাদের গাড়িতে এসে বসেই বললে, 'সামনের দিকে বেশ গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেছে যে!'

—'গণ্ডগোল?' জো উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে।

—'হ্যাঁ, এম্-পি (মিলিটারী পুলিস) সারা ট্রেনে প্রত্যেকের প্রত্যেকটি জিনিস সার্চ্চ করছে।'

এতক্ষণে জো'র মুখের চেহারা বদলে গেল। ফ্যাকাশে মুখের উপর সন্ত্রস্ত দুটো চোখ তক্ষুণি ঘুরে গেল মাথার উপর দিকে র‍্যাকে-রাখা ছোট হল্‌দে রঙের হ্যাভারস্যাকটার (haversack) দিকে। একটা হাই তোলার ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে সে সেটা পেড়ে নিল সেখান থেকে। তারপর আমাকে বললে, 'ধুলো-বালিতে হাত-মুখ ভরে রয়েছে, আমি চট্ করে স্নানাগার থেকে একটু ঘুরে আসি।'

স্নানাগার থেকে জো'র ঘুরে আসার একটু পরেই এম. পি.-রা এসে ঘরে ঢুকল এবং প্রত্যেকের ছুটির 'পাশ' দেখলে এবং জিনিসপত্র তন্নতন্ন তল্লাসি করে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলুম আমরা!

মিলিটারী পুলিস চলে যাবার পর জো চুপিচুপি বললে, 'মূর্ত্তিটাকে স্নানাগারের ভেন্টিলেটারের (ventilator) মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে এসেছি। যে পর্য্যন্ত না মিলিটারী পুলিস চলে যায়, সে পর্য্যন্ত ওখানে সে ভালভাবেই থাকবে।'

কিয়োতু থেকে কোবের মাঝামাঝি একটা ছোট ষ্টেশনে পুলিসের লোকেরা নেবে গেল। এখন সেখানে মূর্ত্তিটাকে রাখার আর কোন প্রয়োজন নেই ভেবে জো সেটিকে আবার আমাদের কামরায় নিয়ে এলো। কিন্তু নিয়ে এসেই দুঃখ প্রকাশ করে বললে, 'তাড়াতাড়ি গোঁজাগুঁজি করে রাখতে গিয়ে তার একটি হাত ভেঙে গেছে, আর একটা চোখও নষ্ট হয়ে গেছে ঘষ্‌ড়ানিতে!' অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা যে মূর্ত্তিকে অতি সন্তর্পণে নাড়াচাড়া কার উচিত, তার সঙ্গে এভাবে কোস্তাকুস্তি করলে এই ফলই ত' অনিবার্য্য!

যাই হোক, এ ব্যাপারে জো একটু দুঃখিত হলেও কোনরকমে সেটাকে জোড়াতাড়া দিয়ে সে চালিয়ে নেবে বলে ভাঙা হাতটাকে সুদ্ধ গুছিয়ে প্যাক করে তুলে রাখলে হ্যাভারস্যাকের মধ্যে।

ট্রেনে শেষের পথটুকু আমরা নিজের নিজের দেশের বাড়িঘর ও আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে কাটিয়ে দিলুম।

কুরিতে পৌঁছেই দেখা গেল জো'র নামে উপর থেকে এক জরুরী নোটিস। তাকে এখুনি বদ্‌লি হয়ে যেতে হবে অন্যত্র। ডকের কাজে তার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা থাকায়, এখান থেকে সরিয়ে কিছুদিন তাকে

ঐ বীভৎস জানোয়ারটাকে সামনে দেখে তারস্বরে চীৎকার করলো 'সিয়া রাম সিয়া রাম'

রাজার ছেলে তাকে আনবে অবশেষে
অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া দেশে।

ওখানে রা। হবে। জো অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেল। কিন্তু মিলিটারীর কাছে উপরওয়ালাদের সিদ্ধান্তই সব; সেখান টুঁ-ফ্যা করার উপায় নেই।

চলোবার সময় মূর্ত্তিটা সে আমার কাছেই রেখে গেল। ওটা রাখবার একটুও ইচ্ছা ছিল না আমার, কিন্তু এ অবস্থায় বন্ধুকে কিছু বলা যায় না ভেবে, ভয়ে ভয়ে ওটাকে রাখতে বাধ্য হলুম। আসলে একে জিনিসটা চোরাই মাল, তার উপর রহস্যজনক এই সব দেব-দেবী সম্বন্ধে আমার ভীতিও ছিল যথেষ্ট। কাজেই অতি সন্তর্পণে আমি সেটাকে মুড়েঝুড়ে তুলে রাখলুম আমার কিট্-ব্যাগে।

জো চলে যাবার পর কয়েকদিন তার আর কোন খোঁজ-খবরই পেলাম না। প্রায় তিন সপ্তাহ যখন কেটে গেল, তখন তার ইউনিট থেকে খবর নিয়ে জানতে পারলুম যে, সে ভীষণভাবে আঘাত পেয়ে 'ইটাজিা' হাসপাতালে আছে। এরপর হাসপাতালেও দু'খানা চিঠি দিলুম, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন উত্তর এলো না।

এই ভাবে প্রায় মাস দুই-তিন কেটে গেল। তখন সেটা জানুয়ারী মাস। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে, ব্যারাকের বাইরে ছ'ইঞ্চি মোটা বরফের আস্তরণে ঢেকে গেছে চারিদিক। আমার ঘরের দশ-বারোজন অন্যান্য সঙ্গীদের সকলেই বেরিয়ে গেছে, আমি এক মনে বিছানায় বসে ছেঁড়া মোজা সেলাই করছি এমন সময় ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল একজন লোক। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, প্রথমটা আমি সেদিকে ভাল করে লক্ষ্য করিনি; ভাবলুম, আমার ঘরেরই কোনো বাসিন্দা হবে হয়ত। কিন্তু কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতার পরই আমার এবার ভাল করে চোখ পড়ল ঐ লোকটির উপর। দেখি, একজন বেশ লম্বা ধরণের লোক অষ্ট্রেলিয়ান সৈনিকের বেশে গ্রেট্ কোট পরে আমারই খাটের কাছে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা বেঁকানো ঝোলা টুপি একপাশের একটা চোখ ও মুখের আধখানা ঢেকে রেখেছে।'

আমি তাকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি কি কারুকে খুঁজছেন?

—'হ্যালো ডাইভার, তুমি আমায় চিনতেই পারলে না?' বলে যেন দুঃখিত হলেন তিনি।

জো'র পরিচিত গলা শুনেই বিছানা থেকে আমি লাফিয়ে উঠলুম—তাকে চিনতে আর দেরি হল না। কিন্তু এ কি মুখ তার! সে তখন আমার বিছানার উপর বসে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলেছে। টুপিতে মুখের যে দিকটা তার আড়াল করা ছিল, ভাল করে সে দিকে দেখেই আমি আঁত্কে উঠলুম। বাঁ দিকের একটা চোখ তার নষ্ট হয়ে গেছে। মুখের সে দিকটায় বিকৃত একটা ক্ষত-চিহ্ন—কানের নীচের দিকও খানিকটা উড়ে গেছে! ডান হাতটা এতক্ষণ তার ওভারকোটের পকেটের মধ্যেই ছিল। বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে কোটের সেই হাতটা সে টেনে বার করলে, তারপর জামাটা গুটিয়ে আসল হাতটা দেখাল আমায়। দেখে আমি আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। সে হাতের মাত্র অর্দ্ধেকটা আছে তার—কনুইয়ের উপর থেকে কেটে ফেলতে হয়েছে।

জো উত্তেজিত হয়ে বললে, 'কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গেছি এ-যাত্রা, কিন্তু এ ভাবে বেঁচে না থেকে যুদ্ধে মরলেই ভাল হত!'

এতদিনের যুদ্ধে অক্ষত অবস্থায় বেঁচে এসে, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর জো'র এই দুর্দ্দৈবে আমি সত্যিই দুঃখিত হলুম। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'তা কি আর হবে—মনে করো তুমি বীর সৈনিকের

মত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই এই হাত খুইয়েছ—এই ভাবে আঘাত পেয়েছ!'

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই সে জিজ্ঞেস করলে, সেই মূর্ত্তিটা আমি এখনও রেখে দিয়েছি কিনা। আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই!—সেটা কি তুমি এখন তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছো?'

সে কথার কোনই উত্তর দিল না জো, শুধু রূঢ়স্বরে বললে, 'কই বার করো ত' এবার!'

আমি যত্নে তুলে রাখা সেই দেবীমূর্ত্তিটি আমার কিট্-ব্যাগ (kit-bag) থেকে বার করে তখুনি তুলে ধরলুম তার সামনে।

খপ্ করে আমার হাত থেকে সেটা তুলে নিয়েই জো পাগলের মত মেঝের উপর মারলে এক আছাড়! তারপর বললে, 'আমি এখুনিই একে শেষ করে দিতে চাই বন্ধু—এ থেকেই আমার এই দুর্ভোগ! এর হাত থেকে আমাকে রেহাই পেতেই হবে! দেশে যাবার আগে এর চিহ্নমাত্র রাখব না!'.....
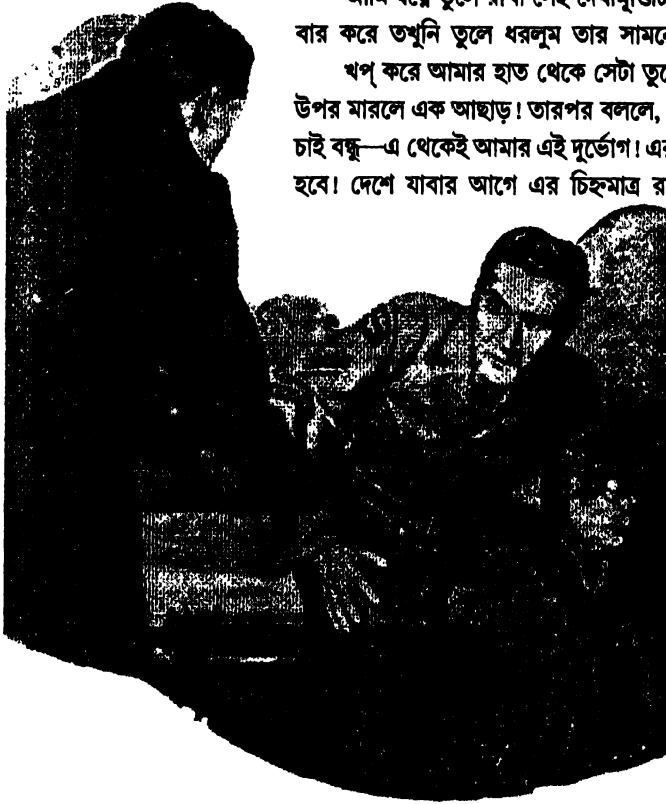
তাকে অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি মূর্ত্তিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললুম, 'এ সব বাজে-বাজে কি বলছ তুমি? একটা কাঠের মূর্ত্তি তোমার ক্ষতি করতে পারে এ তোমার অত্যন্ত ভুল!'

কিন্তু কে শোনে আমার কথা! জো আবার সেটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে গেল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, তোমাকে আর এ মূর্ত্তি পাঠাতে হবে না, আমি আমার কাছেই রেখে দিচ্ছি।' বলে আমি তাড়াতাড়ি সেটাকে প্যাক্ করে আমার কিট্-ব্যাগের মধ্যেই তুলে রেখে দিলুম। জো'র এই আছাড়ের চোটে মূর্ত্তিটার যে আরও খানিকটা ক্ষতি হয়েছিল, তুলে রাখতে গিয়ে তা আমার নজরে পড়ল।

ভাল করে দেখেই আমি আঁত্কে উঠলুম। [পৃষ্ঠা ২৭৩

এর দিন দুই পরে জো কুরি থেকে 'ওয়েষ্টেলিয়া' জাহাজে সিড্নী চলে যায় অসুখের ছুটিতে। যাবার আগে দেশ থেকে সে আর ফিরবে না বলে গিয়েছিল আমাকে। এবং সেখানে পৌঁছেই চিঠি লিখবে বলেছিল। অনেকদিন আগে থেকেই দেশে বিয়ে হবার কথা ঠিক হয়েছিল জো'র। সেই ভাবী বউয়ের

সামনে এই কাটা হাত ও এক চোখ নিয়ে গিয়ে কি করে যে সে দাঁড়াবে, এই ছিল তার সবচেয়ে দুঃখু। আমি এ ব্যাপারে তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিলুম, কিন্তু কিছুতেই তার মনের বেদনার উপশম করতে পারিনি। যাবার আগের দিন আমার হাত ধরে সে শুধু বলে গিয়েছিল, ঐ মূর্ত্তিটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে।

জো চলে যাবার পর কাজের চাপে সে কথা আমার আর বিশেষ মনে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন অষ্ট্রেলিয়া থেকে জো'র ভাবী বউ-এর চিঠি পেয়ে সে কথা আবার আমার মনে পড়ে গেল। ঐ মূর্ত্তিকে কাছে রাখতে কিছুতেই আমার আর সাহস হল না।

ঐ মহিলা পত্রে লিখেছেন—

—'আপনার বন্ধুর কথা শুনলে যদিও আপনি দুঃখিত হবেন, তবু তার বিশেষ অন্তরঙ্গ হিসাবে এ কথা আপনাকে না জানিয়ে পাচ্ছি না। এখানে আসার পর থেকেই জো'র মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে; এখন সে পাগলা-গারদে। ডাক্তাররা বলেছে, এ ধরণের পাগলামী আর সারে না। আপনার কথা অনেকবার বিশদভাবে অনেক চিঠিতে সে লিখেছিল, আন্দাজে আপনার ঠিকানায় চিঠি লিখছি। জানি না, এ চিঠি আপনি পাবেন কিনা। কিন্তু যদি পান, এই সঙ্গে আর একটি বিশেষ অনুরোধ আপনাকে করে রাখলুম—আপনি সেই দুর্ভাগ্যবহনকারী 'কিউরো'টি এখনও যদি আপনার কাছে থাকে, তা'হলে অবশ্যই নষ্ট করে ফেলবেন।' ইতি—

চিঠিতে জো'র আরও দুর্ভাগ্যের কথা পড়ে আমার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল! সেই রাত্রেই সন্ধ্যার দিকে কাগজে মোড়া ভাঙা মূর্ত্তিটা রেন্-কোটের পকেটে পুরে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। তারপর এধার-ওধার ঘুরে রাত্রি একটু গভীর হলে, কাছাকাছি এক পুরোন সিণ্টো মন্দিরের মধ্যে চুপি চুপি সেটাকে রেখে

হঠাৎ দেখি, এক দীর্ঘাকার আলখাল্লা-পরা, পুরোহিত ....[পৃষ্ঠা ২৭৬

আসব বলে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সবেমাত্র জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি, এক দীর্ঘাকার আলখাল্লা-পরা, চুল-দাড়িওয়ালা পুরোহিত আমার সামনে দাঁড়িয়ে! তুষারের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন ঝকমকে দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছে তাঁকে। ফিকে চাঁদের আলোয় জ্যোতির্ম্ময় মুখখানার দিকে চেয়ে আমি যেন কেমন হয়ে গেলুম! পালাবার শক্তি নেই, কথাও যেন গলার কাছে আটকে গেছে, এমন অবস্থা।

আমার এই অবস্থা দেখেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, তিনি মূর্ত্তিটা আমার হাত থেকে অতি সন্তর্পণে তুলে নিয়ে ইসারায় আমায় চলে যেতে বললেন। যন্ত্র-চালিতের মত আমি সেখান থেকে চলে এলুম সোজা ক্যাম্পে।

ঘর থেকে ঐ মূর্ত্তিকে বিদায় করে অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করলুম বটে, কিন্তু ঐ পুরোহিতের ব্যাপারে সে রাত্রি আমার আর ঘুম হল না। কেবলই মনে হতে লাগল, লোকটা অশরীরী, না অন্য কেউ?

দিন দুই পরে সকালের দিকে একদিন কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ নজরে পড়ল বড় বড় অক্ষরে লেখা : 'কিছুকাল পূর্ব্বে 'হাজার মূর্ত্তির মন্দির' থেকে যে ছোট দেবীমূর্ত্তিটি চুরি গিয়েছিল, সেটি আবার ফিরে পাওয়া গেছে ভগ্ন অবস্থায় এই মন্দিরেই।'

এখানে যতদিন ছিলাম তার মধ্যে সেই বৃদ্ধ পুরোহিতকে আমি কখনও দেখিনি এবং এখানের এই সিণ্টো-মন্দির থেকে এ মূর্ত্তি সেখানেই বা গেল কি করে তার হদিশও আমি কিছু খুঁজে পাইনি।

পরিব্রাজক অবস্থায় বিবেকানন্দ ঘুরতে ঘুরতে মথুরায় এলেন। পরণে শুধু একখানি কাপড়। নির্জ্জন বনের ভেতর এক পুকুর দেখে কাপড় খুলে স্নান করতে নামলেন। স্নান করে উঠে দেখেন, বানরে কাপড়টা নিয়ে গিয়েছে। মনে নিদারুণ অভিমান হলো। মনে মনে বল্লেন, ভগবান, আমাকে যদি বস্ত্রহীনই করলে, তাহলে উলঙ্গই আমি চল্লাম। যদি তুমি আমার বস্ত্র এনে না দাও, তাহলে বস্ত্র আর পরবো না। এই বলে নগ্ন সন্ন্যাসী গভীর বনের ভেতর ঢুকলেন। কয়েক পা যেতে না যেতেই হঠাৎ শুনতে পেলেন, যেন কে ডাকছে। পিছন ফিরে দেখেন, একজন লোক, হাতে নতুন কাপড় নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। বিবেকানন্দের কাছে এসে লোকটি বল্লে, প্রভু, আমি দেখেছি দূর থেকে বানরে আপনার কাপড় নিয়ে গিয়েছে। তাই নতুন কাপড় নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি। দয়া করে গ্রহণ করুন এই কাপড়!

বিবেকানন্দের অন্তর ভরে জেগে ওঠে আনন্দ, এই তো প্রভু, তুমি আছ সঙ্গে সঙ্গে! দূর হয়ে যায় সব অভিমান।

ডাইনী-বনের গল্প

—রাধারাণী দেবী

এক গভীর বনের ধারে এক কাঠুরে বাস করতো।

মা-মরা দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া আর তার কেউ ছিল না।

কাঠুরে বন থেকে কাঠ কেটে এনে দূর গ্রামের হাটে সেই কাঠ বিক্রি কোরে অতি কষ্টে ছেলে মেয়ে দু'টিকে মানুষ কোরতো। তারা একটু বড় হয়ে উঠলে কাঠুরে তাদের ডেকে বললে—

দেখ বাবা মাণিক, দেখ মা মণি, তোমরা দুই ভাই বোনে এই জঙ্গলে খেলা করতে যাও, বনের গাছের ফল পেড়ে খাও, এখানে তোমাদের কিছু ভয় নেই। এই বন ছাড়া তোমরা অজানা কোনও বনে বা পাহাড়ে যেও না, বিপদ্ হবে।

মাণিক বললে—বাবা, কোন্ বনে বিপদ্ আছে, বলে দাও।

মণি বললে,—বাবা, কোন্ পাহাড়ে বিপদ্ আছে বলো।

কাঠুরে বললে—এদেশে সবচেয়ে ভয়ের—ডাইনী-বন। সবচেয়ে ভীষণ, ডাইনী-পাহাড়। সেখানে কোনও মানুষ গিয়ে জ্যান্তো বা মরা ফিরে আসেনি কখনও।

মণি বললে—তাদের বুঝি ডাইনীরা খেয়ে ফেলে বাবা?

কাঠুরে বললে—শুনেছি, তার চেয়েও দুর্দ্দশা ঘটে সেখানে। কাউকে জন্তু-জানোয়ার বানিয়ে রেখে দেয়, কাউকে দিয়ে নানারকম কাজ করায় ডাইনীরা। পালাবার চেষ্টা করলে ডাইনীরা বন্দীদের ধরে নিয়ে তাদের সৈন্য-সামন্তের খাবার করে দেয়।

—ডাইনীদের সৈন্য-সামন্ত আছে বুঝি ?

কাঠুরে বললে—শুনেছি হিংস্র জানোয়ার ওদের সৈন্য।

মাণিক বললে—সে বন আর পাহাড় কোন্ দিকে বাবা?

কাঠুরে বললে—উত্তর দিকে। কিন্তু কেউই সেটা ঠিক চেনে না। তোমরা খেলতে খেলতে কিংবা শিকার করতে কোনও অজানা বনে যেন কখনও ঢুকে পোড়ো না।

দুই ভাইবোনে বললে—আচ্ছা বাবা।

একদিন কাঠুরের জ্বর হয়েছে। মাণিককে ডেকে সে বললে—আজ আর আমি কাঠ কাটতে বনে যাবো না। খোকা তুই আজ কুড়ুলখানা নিয়ে গ্রামে কামার-বাড়ী থেকে ধার দিয়ে নিয়ে আয়। বেশি দেরী করিস্‌নি যেন।

খোকা কুড়ুলখানি কাঁধে ফেলে মালকোঁচা মেরে রওনা হোলো গ্রামের দিকে, কামার-বাড়ীর পানে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মণি বললে—দাদা, শীগগির করে ফিরে এসো কিন্তু, আজ আমি হরিণ-মাংস রান্না করছি।

মাণিক বললে—আমি যাবো আর আসবো। মাংস-ভাত রান্না হলে তুই খাওয়ার জন্যে তৈরি থাকবি, এসেই দুজনে খেতে বোসবো।

কাঠুরের ছেলে বনের ধারে কুটীর থেকে রওনা হয়ে বড় বড় কয়েকটা মাঠ আর একটা ছোট্ট পাহাড় পার হয়ে গ্রামে পৌছুলো। কামার-বাড়ীতে কুড়ুলে ধার দিতে বেশী দেরী হোলো না। কুড়ুলখানা কাঁধে নিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে বাড়ী আসছে। মনে মনে ভাবছে—খুকি এতক্ষণে হরিণ-মাংস রান্না শেষ করে নিশ্চয়ই ঝর্ণায় নাইতে গেছে!

এমন সময়ে দেখতে পেলে, পথের ধারে গাছের তলায় একটি বুড়ী বসে বসে কাৎরাচ্ছে।

কাঠুরের ছেলেকে দেখতে পেয়ে কাতর গলায় ডাকলে—ও খোকা, একবার শুনে যাও বাবা! আমি বড় বিপদে পড়েছি।

কাঠুরের ছেলে ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলে—কী হয়েচে বুড়ীমা?

বুড়ী দু'হাত দিয়ে তার ডান পাখানা ধরে বসে ছিল। বললে—পথে চলতে চলতে একটা ছোট্ট গর্ত্তে পড়ে এই পা-টা এমন ভীষণ মচ্‌কে গেছে যে, আমি হাঁটতে পারছিনি। তুমি যদি আমাকে একটু কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে সাহায্য কর তো আমি বাড়ী যেতে পারি।

কাঠুরের ছেলে বললে—তোমার বাড়ী কতদূরে বুড়ীমা?

বুড়ী বললে—বেশী দূরে নয় বাছা, কাছাকাছিই। ঐ—ঐ উত্তর দিকের জঙ্গলটার ধারে।

মাণিক বুড়ীর হাত ধরে তাকে হাঁটবার সাহায্য করতে লাগলো। বুড়ী মাণিকের গলা জড়িয়ে কাঁধের উপরে হাত রেখে কাৎরাতে কাৎরাতে, উঃ আঃ করে এগিয়ে চললো।—

হাঁটতে হাঁটতে পথ যেন আর ফুরোয় না।—

মাণিক যতো বলে আর কতদূর—বুড়ী বলে—এই আর একটুখানি বাবা! ও—ই—ওই যে দেখা যাচ্ছে আমার বাড়ী!

এমনি করতে করতে—বুড়ী অনেক—অনেকদূরে নিয়ে গেল মাণিককে।

এদিকে এমন ভাবে গলা জড়িয়ে তার কাঁধে হাত চেপে রেখে বুড়ী হাঁটছে যে—মাণিক নড়তে চড়তেও পারছে না নিজের ইচ্ছে মতন।

শেষে হাঁপিয়ে উঠে কাঠুরের ছেলে বললে—তুমি বল্লে—কাছেই বাড়ী। কিন্তু এ যে অনেকদূর! তুমি আরও কত দূর যাবে বলো তো? আমি যে আর হাঁটতে পারছিনি!—

বুড়ী বললে—এই তো পৌঁছে গেলুম বাবা! কী কোরবো, এতটা দূর যদি আগেই তোমায় বলি, তা'হলে তুমি কি আর আমাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে চাইতে? আর অল্প একটু চলো—তার পরেই আমার বাড়ী।

বুড়ী একটা গভীর শালবনের ভিতরে ঢুকে তার কুটীরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

কাঠুরের ছেলে বিরক্ত ভাবে বললে—যাক্! তুমি তা'হলে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ো। আমি চললুম। বাড়ীতে আমার ছোটবোন চান করে না-খেয়ে বসে আছে। আমার বাবার অসুখ।

বুড়ী দরজার কাছে এসে বললে, তুমি এতদূরেই যখন আমায় কষ্ট করে নিয়ে এলে বাবা, ঘরের ভেতর পৌঁছে দিয়ে যাও। এই বলে তার বাড়ীর দরজাটা খুলে তার ভেতরে ঢুকতে বললে।

কাঠুরের ছেলের ইচ্ছে ছিল না ভিতরে ঢোকার। কিন্তু বুড়ী এমনভাবে তাকে টিপে জড়িয়ে ধরে আছে যে, তার হাত থেকে নিজের ইচ্ছেয় রেহাই পাওয়া শক্ত।

কী আর করে? ভেতরে ঢুকলো বুড়ীর সঙ্গে। ভেতরে ঢোকা মাত্রই সদর দরজাটা আপনিই দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা-জানালা আর কড়িকাঠগুলো হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

"কী হয়েছে বুড়ীমা?" [পৃষ্ঠা ২৭৮

কাঠুরের ছেলে চম্‌কে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে—বুড়ী তাকে ছেড়ে দিয়ে দিব্যি সহজ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে!

বুড়ী বললে—বাপ্! এতটা পথ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে সত্যি সত্যিই পা মচ্‌কে ব্যথা হবার জোগাড়।

কাঠুরের ছেলে ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলো—সে কি বুড়ীমা? তোমার কি পায়ে ব্যথাই লাগেনি?—

বুড়ীর তখন চেহারাই অন্যরকম। করুণ কাৎরানিও নেই, উঃ আঃ করাও নেই, মিষ্টি করে 'বাবা' 'বাছা' বলে কথাও নেই। দুই চোখ গোল করে পাকিয়ে কর্কশ আওয়াজে বললে—হতভাগা নির্ব্বোধ ছোঁড়া! যার পায়ে ব্যথা লাগে—সে এতখানি পথ তোর মতন বাঁদরকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে হেঁটে আসতে পারে কখনও? যা,—চুপ্ করে ঐ কাঠ-কয়লা রাখার কুঠুরীটার মধ্যে ঢুকে বসে থাক্। রাত্রি হলে তখন খেতে পাবি। আর তোকে বাড়ী ফিরতে হবে না এ জীবনে।

কাঠুরের ছেলে তাড়াতাড়ি ছুটে দরজা খুলে পালাতে গেল,—সমস্ত দরজা-জানালাগুলো সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—আরে! আরে! কর কি? কর কি?—

বুড়ী রেগে আগুন হয়ে ছুটে এসে তার কাণ টেনে ধরলে। তারপর ভীষণ গলায় বললে—দ্যাখ্, এই যে শালবন দেখছিস্, এই হচ্চে বিখ্যাত ডাইনী-বন। এই বনের মধ্যে হাজার হাজার বাঘ পোষা আছে আমাদের!

হলদে ডোরা বাঘ—চিতা বাঘ—কালো বাঘ—নেকড়ে বাঘ—মানুষ পেলেই তারা টুক্‌রো টুক্‌রো করে পেটে পুরবে।

কাঠুরের ছেলে মাণিক কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমাকে দিয়ে তুমি কী করবে? কেন আমায় ধরে আনলে?

ডাইনী বললে—আমার বাড়ীতে কাজ কোরতো যে চাকরটা, সেটা পালাবার চেষ্টা করে বাঘেদের পেটে গেছে। ক'দিন ধরে আমার সংসারের কাজকর্ম্মের ভারী অসুবিধা হচ্চে। আমার চাকরের কাজের জন্যে আমি লোক ধরতে বেরিয়ে ছিলুম। তোকে এই কাজ করতে হবে। কাল সকাল থেকে সব করবি।

ডাইনী কাঠুরের ছেলেকে ঘরে বন্দী করে চলে গেল। না খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ধুলোয় মেঝেয় পড়ে বেচারা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে ডাইনী মাণিককে রান্নার জন্যে কাঠ কেটে আনা, ঘরবাড়ী ঝাঁট দেয়া, ধোয়া-মোছা, বাসনমাজা, বাট্‌না বাটা, ইঁদারা থেকে জল তোলা, সমস্ত কাজ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে। বারে বারে সম্‌ঝিয়ে দিলে—পালাবার চেষ্টা করা মানেই মৃত্যু।

তখন থেকে মাণিক চোখের জল মুছতে মুছতে ডাইনীর রান্নাঘর, উঠান, দালান, বারান্দা সমস্ত ধোয়া-মোছা কোরতো, ইঁদারা থেকে দড়ি টেনে বালতি বালতি জল তুলতো, কাঠ কাটতো, উনুনে আঁচ দিতো, কাপড় সাফ্ কোরতো। কোন ক্রমেই পালাবার পথ ছিল না কোথাও।

দিন সাতেক বাদে ডাইনী-বুড়ী একদিন বাজার থেকে ফিরে এলো, সঙ্গে নিয়ে এলো একটা সাদা ধবধবে সুন্দর বেড়াল। বেড়ালটার চোখ দুটো ভারী উজ্জ্বল।

ডাইনী বললে—আমার বুড়ো বেড়ালটা মরে গেছে। এই বেড়ালটা নিয়ে এলুম। ভাঁড়ার ঘরে বড় ইঁদুরের উৎপাত হয়েছে।

কাঠুরের ছেলে বেড়ালটার সাদা তুলোর মতন চেহারা, চক্‌চকে গোলাপী ঠোঁট আর স্ফটিকের মতন ঝক্‌ঝকে চোখ দেখে খুশি হোলো।

বেড়ালটা তার দিকে তাকিয়ে আনন্দে মিউ—মিউ—মিউ করে ডেকে তার পায়ের কাছে এসে গা

ঘষতে ঘষতে গর্ গর্ আওয়াজ করতে লাগল।

ডাইনী তাই দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে বেড়ালটার গলা টিপে উঁচু করে তুলে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে বললে—আ মোলো যা হতভাগী ছুঁড়ি! বেড়াল হয়েও স্বভাব বদলালো না! দূর হয়ে যা এখান থেকে। তুই ভাঁড়ার-ঘর আর ধানের গোলা পাহারা দিবি।

বেড়ালটা কাতর স্বরে ম্যা—ও করে কেঁদে উঠলো। কাঠুরের ছেলের মনে কষ্ট হলেও মুখে কিছু বললে না।

পরদিন কাঠুরের ছেলে যখন ইঁদারায় জল তুলছে, বেড়ালটা গিয়ে মানুষের স্বরে খু—উ—ব নিচু স্বরে বললে—আমাকে চিনতে পারছো না দাদা, আমি তোমার ছোটবোন মণি! তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম হাটের পথে, একলা পেয়ে ডাইনী বুড়ী আমাকে মন্ত্র পড়ে বেড়াল বানিয়ে তার ঝুলিতে পুরে এখানে ধরে এনেছে।

মাণিক তখন যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললো—বলিস্ কি? তুই আমাদের মণি? তোর এই দশা?

মণি বললে—চুপ্! চুপ্! ডাইনী শুনতে পাবে। ও জানে না আমি তোমারই নিজের ছোটো বোন। জানতে পারলে আমাদের দু'জনকে কখনই এক জায়গায় রাখবে না।

মাণিক বললে—ঠিক বলেছিস্। কিন্তু এখন কী উপায়ে এখান থেকে পালানো যায় বল্ দিকিনি।

মণি বললে—সে যেমন করেই হোক্ ঠাহর করে একটা উপায় বার করতেই হবে। কিন্তু—আর নয়, আমি সরে পড়ি, বুড়ী এই দিকেই আসছে।

এমনি করে দুই ভাই-বোনে লুকিয়ে লুকিয়ে কেবলি পরামর্শ করে কী করে এই ডাইনী-বনের ভিতর থেকে পালানো যায়।

বেড়ালটা আনন্দে মিউ মিউ করে ডেকে... [পৃষ্ঠা ২৮০

রাত্রিবেলায় ভীষণ বাঘেদের গর্জ্জন শোনা যায়! চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, হায়েনা, কোনও কিছুই বাদ নেই। মাণিক রাত্রিবেলায় তার শোবার ঘরের জানালার একটি খড়খড়ি উঁচু করে খুলে রাখে, তার ভিতর দিয়ে গলে মণি ওর ঘরে পালিয়ে আসে। বলে—দাদা, বাঘের হুঙ্কারে ভয়ে আমার ঘুম হয় না।

তারপর সারারাত্রি ধরে দুই ভাই বোনে ফন্দী আঁটে কেমন করে পালাবে।

একদিন রাত্রিবেলায় বেড়াল এসে বললে—দাদা, আজ সুখবর আছে। এখান থেকে পালাবার উপায় জানতে পেরেছি।

মাণিক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি কি? কেমন করে?

"বন পার হয়ে আকাশেতে ভেসে এখুনি চলো।"

বেড়াল বললে—ডাইনী বুড়ী কাল রাত্তিরে দেখলুম খৈ-এর ধান-চালার চালুনীটা নিয়ে তার উপরে বসে, মাথায় চাল ঝাড়বার কুলোটা চাপা দিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলো, আর অমনি খৈ-চালার প্রকাণ্ড চালুনীটা আকাশে উঠে মেঘের গায়ে ঠেকে হু হু করে উত্তর দিকে উড়ে চলে গেল।

মাণিক বললে—সত্যি?

মণি বললে।—মন্ত্রটা আমি শিখে নিয়েছি শুনবে?

ঝাড়ন-কুলো! ঝাড়ন-কুলো! ধুঁধুল খাবে।
মেঘ উথরিয়ে উত্তর দিকে উজিয়ে যাবে।।
ঝাড়ন-কুলো! ক্লিং ক্লিং ক্লিং ধাঁধাটি বলো।
বন পার হয়ে আকাশেতে ভেসে এখুনি চলো।।

মাণিক লাফিয়ে উঠে বললে—কালই তাহলে আমরা দুজনে মিলে চালুনী চড়ে উড়ে পালাবো। চালুনী আর কুলো পাওয়া যাবে তো?

সাদা বেড়াল তার ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বললে—রোসো দেখি। চুরি করতে হবে সুবিধে মতন। কিন্তু মন্ত্রটার প্রথম দু'লাইন আমি পষ্ট শুনেছি। তৃতীয় লাইনটা পষ্ট মনে নেই।

রাত্রি তখন গভীর। বাইরে বাঘের গর্জ্জন আর হায়েনার বিকট হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাঠুরের ছেলে মাণিক তার সাদা বেড়াল-বোন মণিকে নিয়ে ভাঙা ঘরের মধ্যে ছেঁড়া ময়লা বিছানায় গুড়িশুড়ি মেরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে বেড়ালটা খুব মার খেলে ডাইনী বুড়ীর কাছে। ভাঁড়ার-ঘরে ইঁদুর চিঁড়ে খেয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে ফেলে গেছে। পাজী বেড়ালটা কোথায় গিয়ে ঘুমিয়ে ছিল! সে পাহারা দিলে ইঁদুরেরা কি উৎপাত করতে পারতো?—সেদিন মণির বরাদ্দ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাকে একটা ঘরে উপোসী কয়েদ করে রেখে ডাইনী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাইনী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে মাণিক চুপি চুপি খানকতক মাছের টুক্‌রো আর নিজের খাবার থেকে খানিকটা খাবার মণির জন্যে জানলার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিলে।

ভিতর থেকে মিউ মিউ করে কেঁদে কেঁদে মণি বললে—দাদা, আর তো পারা যায় না। তুমি যত শীঘ্রি পারো পালাবার জন্যে তৈরি হও।

ডাইনীদের নিয়ম—প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন বিশ্ব-সংসারে যেখানে যত ডাইনী আছে সব্বাই একত্র হয়। ডাইনী-পাহাড়ের চুড়োয় একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। তার নাম মায়াবিনী ঝর্ণা। প্রতি সংক্রান্তিতে মায়বিনী ঝর্ণায় চান করে সারারাত্রি সেখানে খাওয়া-দাওয়া নাচগান করা ডাইনীদের নিয়ম। এ যদি কেউ না করে, তাকে ডাইনী-রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ডাইনী-খাতা থেকে তার নাম কেটে তার মন্ত্রতন্ত্র তুক্‌-তাক্‌ সমস্ত কেড়ে নিয়ে, ধাক্কা দিয়ে ডাইনী-পাহাড়ের চুড়ো থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। সে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে মানুষদের রাজ্যে এসে পড়ে। সেখানে এলে কি হবে? মানুষেরাও তখন কেউই আর তাকে বিশ্বাস করে না। তাকে দেখে ভয় পায়, ঘেন্না করে, সন্দেহ করে। শেষ পর্য্যন্ত মানুষেরা তাদের সমস্ত অমঙ্গলের জন্যে তাকেই দায়ী করে তাকে ধরে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে।

সুতরাং—বুঝতেই পারছ, কুম্ভমেলায় নাগা-সন্ন্যাসীদের চেয়েও সংক্রান্তিতে ডাইনী-পাহাড়ের চুড়োয় মায়াবিনী ঝর্ণায় চান করা ডাইনীদের কাছে অতি জরুরী ব্যাপার।

আগের সংক্রান্তির রাত্রে ডাইনী বুড়ী যখন চালুনীতে চড়ে মাথায় কুলো চাপা দিয়ে আকাশে উড়ে ডাইনী-পাহাড়ে চলে গিয়েছিল তখন সাদা বেড়াল তা' দেখতে পেয়েছিল।

এ মাসের সংক্রান্তিতে 'মাণিক' আর 'মণি' দুজনেই আগে থেকে তক্কে তক্কে রইলো, ডাইনীর যাওয়া আর মন্ত্রপড়া দেখে শুনে নেবে বলে।

গভীর রাত্রে দেখা গেল, ডাইনী বুড়ী চালুনী আর কুলো বের করে উঠোনের মধ্যিখানে রাখলে। তারপর কুলোটা মাথায় চাপা দিয়ে চালুনীর ভেতরে চড়ে বস্‌লো। বসে—বিড়্‌ বিড়্‌ করে মন্ত্র পড়তে লাগলো—

ঝাড়ন-কুলো! ঝাড়ন-কুলো! ধুঁধুল খাবে।
মেঘ উথরিয়ে উত্তর দিকে উজিয়ে যাবে।।
কুলো! চালুনী! ধীং ক্লিং পীং ধাঁধাটি বলো।
বন পার হয়ে আকাশেতে ভেসে এখুনি চলো।।

মাণিক বলে উঠলো—"ক্লিং ক্লিং ক্লিং" নয়রে,—মন্ত্রটা হচ্ছে "ধীং ক্লিং পীং"! রোস্‌ আমি লিখে রেখে দিই ভালো করে, নইলে ভুলে যাবো।

সংক্রান্তির সারা রাত নাচগান খাওয়া-দাওয়া জটলা করে মায়াবিনী-ঝর্ণায় চান করে তুক্‌তাক্‌ মন্ত্রগুণগুলোকে তাজা করে নিয়ে সারা দুনিয়ার ডাইনীর দল শেষ রাত্তিরে উড়ে উড়ে যে-যার দেশে যে-যার বাড়ীতে ফিরে এলো।

এদিকে মণিতে আর মাণিকে মিলে পরামর্শ করেছে, তার পরের দিনই তারা রাত্রিবেলায় চালুনী চড়ে পালাবে। মণি বললে—দাদা! ডাইনী যদি অন্য চালুনীতে চড়ে আমাদের পেছনে ছুটে এসে আমাদের ধরে ফেলে?

মাণিক বললে—ঠিক বলেছিস। রোস্‌ এক কাজ করি। চুপি চুপি আজ রাত্তিরে বাড়ীতে যেখানে

যত কুলো চালুনী আছে, সব পুড়িয়ে রাখবো।

মাণিক করলে কি, সেদিন সমস্ত দিন ধরে ডাইনীর উঠোনের আর বাগানের যত শুকনো পাতা আর জঞ্জাল ছিল সমস্ত ঝাঁট দিয়ে দিয়ে এক-এক জায়গায় স্তূপ করে করে জড়ো করলে। ডাইনী তাকে সারাদিন ধরে প্রতিদিনের নিয়ম বাঁধা সমস্ত কাজ করেও আরও অতিরিক্ত খাটুনি খাটতে দেখে খুসী হোলো। কিন্তু মুখে খুব কর্কশ করে বললে, সমস্ত বাগানটা কতো নোংরা করে রেখেছিস্ হতভাগা! যা, ওগুলো সব আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফ্যাল্। নৈলে হাওয়ায় উড়ে আবার সারা বাগান নোংরা হবে।

সন্ধ্যের সময় মাণিক বাগানে জঞ্জালের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিলে। চুপি চুপি তার মধ্যে বাড়ীতে যতো চালুনী আর কুলো ছিল সমস্ত ফেলে পুড়িয়ে দিলে। একটি মাত্র বড় কুলো আর চালুনী নিজের শোবার ঘরের মধ্যে বাক্স-পেঁটরার আড়ালে লুকিয়ে রেখে দিলে।

ডাইনী বুড়ী মাসের পয়লা তারিখে সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কারণ, তার আগে সংক্রান্তির রাত্তিরটা তাদের সারারাত্তির জেগে থাকতে হয়।

ডাইনী বিছানায় যেই পড়া—অম্‌নি নাকডাকা! নাকডাকা নয় যেন বিয়েবাড়ীর জোড়া শাঁখের আওয়াজ!!

মাণিক বেড়ালরূপী মণিকে নিয়ে উঠোনে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো আকাশের নিচে। তারপর চালুনীর মধ্যে বসে মাথায় কুলো চাপা দিয়ে মণিকে নিজের কোলে বসিয়ে নিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলো—"ঝাড়ন-কুলো! ঝাড়ন-কুলো!" ইত্যাদি। মন্ত্রপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুহু করে চালুনী আকাশে উঠতে লাগলো।

বেড়াল বলে উঠলো—সর্ব্বনাশ! তুমি যে অবিকল সেই ডাইনী বুড়ীর মন্ত্রটাই পড়লে! আমরা যে তাহোলে ডাইনী-পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌছুবো। শীগ্‌গির তুমি উল্‌টো বলো—

"মেঘ উৎরিয়ে দক্ষিণ দিকে উজিয়ে যাবে।"

মাণিক তখন "উত্তর দিকে"র বদলে "দক্ষিণ দিকে" বলে মন্ত্র আওড়াতে লাগলো।

চালুনী উত্তর দিকে উড়ে যেতে যেতে উল্টে ঘুরে দক্ষিণ দিকে ফিরে গেল। তারপরে দক্ষিণ দিকে একটা বুনো পাহাড়ের উপরে গিয়ে ঝপ্ করে নেমে পড়লো।

বেড়ালের চোখে রাত্রিবেলায় বাতি জ্বলে। মণি বললে—দাদা, এ'বনে অনেক ভীষণ জন্তু-জানোয়ার রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। চলো রাত্রিটা একটা গাছের উপরে উঠে কাটিয়ে দিই্। সকাল হোলে তখন মাটিতে নামা যাবে।

সকাল বেলায় রোদ উঠলে ওরা গাছ থেকে নেমে এলো। গভীর বনের মধ্যে পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথে ঘুরে ঘুরে ওরা নিচের দিকে নামতে লাগলো। ক্ষিদেয় তেষ্টায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে মাণিক। বেড়াল কিন্তু একটুও ক্লান্ত হয়নি। সে দিব্যি মানুষের ভাষায় মিউ-মিউ করে কথা বল্‌তে বল্‌তে খুর্ খুর্ করে চারখানি ছোট পায়ে দৌড়ে দৌড়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে নেমে চলেছে। অনেকক্ষণ পরে নিচের দিক থেকে কাঠুরেদের কাঠ কাটার আওয়াজ পেয়ে ওরা ভাইবোনে বিষম উৎসাহ পেলো। সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে ওরা ছুটে ছুটে নামতে লাগলো।

যখন সেই কাঠুরেদের প্রায় কাছাকাছি পৌছেচে এমন সময়ে মাণিক অজ্ঞান অবসন্ন হয়ে একটা গাছের তলায় লুটিয়ে পড়লো।

মণি পাগলের মত হয়ে তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে লেজ খাড়া করে মিউ-মিউ করে ডাকতে লাগলো।

যখন কিছুতেই চৈতন্য হোলো না, সে ভয় পেয়ে দৌড়ে ডাকতে গেল কাঠুরেদের।

কাঠুরেদের কাছে গিয়ে সে মিউ-মিউ করে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে তাদের আসতে বললে মাণিকের কাছে। কাঠুরেরা প্রথমে তার ডাক ও ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি। তারপরে তারা বলাবলি করতে লাগলো— সুন্দর কাবুলী বেড়ালটা মেও মেও করে ডেকে ঐদিকে আমাদের ইসারা করে কি যেন দেখিয়ে দিচ্ছে! চল তো দেখে আসি।

বেড়ালের পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে তারা দেখতে পেলে,'গাছের তলায় একটি ছোটো ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তারা গিয়ে তাকে নেড়েচেড়ে দেখলে বেঁচে আছে। তখন তাকে তুলে নিয়ে এসে মুখে-চোখে নদীর জলের ঝাপটা দিয়ে বাতাস করে সুস্থ করে তুললে।

জ্ঞান ফিরতে সে কাঠুরেদের কাছে তার বাবার নাম বললে। কাঠুরেরা বললে তার বাবাকে তারা চেনে। তার বাড়ী বহুদূরে। সেঁদিন মণি আর মাণিক সেই কাঠুরেদের গাঁয়ে গিয়ে তাদের বাড়ীতেই রইলো। কয়েকদিন সেখানে থেকে বিশ্রাম করে শরীরে জোর হলে তারা দুই ভাইবোনে বাবার গ্রামের দিকে যাত্রা করলো। কাঠুরেরা বললো—তার বাবা ছেলেমেয়ে দুটিকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেছে। গ্রামের সকলেরই ধারণা, তারা ভুল করে ডাইনী-বনে ঢুকে পড়েছে। যেখানে কোনও মানুষ একবার গিয়ে পড়লে আর কখনও ফিরে আসে না।

কাঠুরের ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে পৌছুতে তার বাবার আনন্দের সীমা রইলো না। শুধু একমত্র দুঃখ রইলো আদরের মেয়ে মণি সাদা বেড়াল হয়েই রইলো।

কিছুদিন বাদে সেই গ্রামে এক যাদুকর এলো। সেই যাদুকরের একটিমাত্র ছেলে ছিল। সে তার জন্যে একটি সুন্দর মেয়ে বৌ করবে বলে খুঁজছিল। যাদুকরের ছেলে বলে কেউই তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়নি। কাঠুরে গিয়ে বললে, আমার একটি খুব সুন্দর লক্ষ্মী মেয়ে আছে।

যাদুকর ব্যস্ত হয়ে বললে,—আমার ছেলেটির সঙ্গে তুমি কি তার বিয়ে দেবে? আমি নিজে যাদুবিদ্যা জানি বটে, কিন্তু আমার ছেলেকে কিছুই শেখাইনি। আমার ছেলে পাথর খোদাইয়ের কাজ করে, সে খুব সুন্দর আর সৎস্বভাব।

কাঠুরে বললে,—আমার মেয়েটির মত লক্ষ্মীমেয়ে অল্পই হয়। কিন্তু তাকে যদি তুমি সুস্থ করে তোমার বৌ করে নিতে পার তো আমি দিতে পারি।

এই কথা বলে কাঠুরে সমস্ত কাহিনী যাদুকরকে খুলে বললে। যাদুকর ডাইনীদের মন্ত্রগুণ দূর করার মন্ত্র জানতো। সে বেড়ালকে মন্ত্র পড়ে আবার মানুষ করে দিলে। মণির সঙ্গে তার সুন্দর ছেলেটির ধুমধাম করে বিয়ে দিয়ে তাকে বৌ করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে চলে গেল। আমার কথাটি ফুরুলো।।

● **মণি ও মুক্তা**

জীবনে যে কোনদিন তলোয়ার ধরেনি, সে-ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর হতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া জীবনের একান্ত তুচ্ছ জিনিসের মধ্যেও বীরত্ব দেখাবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

হোমার

অনিবার্য

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

আজকে যাকে করছো ঘৃণা
কে জানে হায় কালকে তা'র
শাসন মেনে চলতে হবে
ঘুচবে সকল অহঙ্কার।

আজকে যাকে কঠিন ভাষায়
করছো তুমি অসম্মান
সময় এলে কণ্ঠে তারই
করতে হবে মাল্যদান।।

দুয়ার থেকে ফিরিওনাকো
আর্ত আতুর অতিথকে
হয়তো তারি চরণ ধরে
সাধবে স্মরি' অতীতকে।।

বীজের মাঝে বনস্পতি
অঙ্কুরেতে অরণ্য।
অণুর মাঝে বিশ্বপ্রাণের
সত্তা জাগে অগণ্য।।

সকল জীবের মধ্যে মানুষ
সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব ;
সর্বজীবেই প্রণাম করো
সবার মাঝেই জাগেন শিব।।

পাখ্‌না ওঠা পিঁপড়ে যেন
বদ্‌মেজাজীর স্বেচ্ছাচার,
মরণ-শিখায় ঝাঁপিয়ে মরে
ফলটা শুধুই ভস্ম তার।।

পথের ধূলায় ঐ যে শিশু
কাঁদছে বসে নিরন্ন,
কান্নাতে তার আকাশ-বাতাস
সাগর মাটি বিষণ্ণ।।

শিশু-শিবের দুঃখ দেখে
করলে জেনো উপেক্ষা
সমাজ তোমায় ছাড়বে নাকো
করতে হবেই অপেক্ষা।।

সর্বনাশা "আমার, আমার!"
স্বার্থপরের বদ্‌ স্বভাব
ছাড়তে হবে আত্মঘাতী
লোভের প্রলাপ মত্ততার।।

ইন্দ্রধনু

আজকে যারা মরছে খেটে
শুকনো পেটে দিন কাটায়
তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণাতে
আর্তনাদে বুক ফাটায়,

আসবে সেদিন দেখবে তা'দের
চোখের জলে সাত-সাগর
তরঙ্গিত গর্জ্জরবে
আনবে ধরায় কালান্তর।।

ঈশান কোণে সজল ঘন
ছোট্ট মেঘের রূপ দেখে
তুচ্ছ ভেবে হাসছে যারা
তাদের আকাশ যায় ঢেকে—

প্রলয়-মেঘের অঙ্গরাখায়
বাজ বিজলীর সিংহনাদ—
চূর্ণ করে দম্ভ তা'দের
ভয়ঙ্করের বজ্রাঘাত।।

আজকে যাকে মারছো লাথি
নিষ্ঠুরতায় নির্বিচার,
তৈরী থেকো পাবেই ফিরে
সহস্র গুণ আঘাত তার।।

নবাব সাহেব

—বনফুল

এক

নবাব সাহেবকে তিনবার দেখেছিলাম। একবার সামনা-সামনি; আর দু'বার মনে মনে। সামনা-সামনিও বেশীক্ষণ দেখিনি, পাঁচ মিনিটের বেশী নয়। সেই গল্পটাই আগে বলি।

আমি সেখানে ডাক্তারি করতাম। একদিন খবর পেলাম কয়েকজন বড়লোক মিলে নবাব সাহেবকে চা খাওয়াবেন ঠিক করেছেন। তাঁকে সঙ্গ দান করবার জন্য স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করা হবে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন থাকব। যিনি আমাকে খবর দিতে এসেছিলেন, তিনি বললেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার বাড়িটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে, আপনার পরিবার কবে আসবেন?"

"আসতে এখনও মাসখানেক দেরি আছে।"

"তাহলে নবাব সাহেবের খানা তৈরি করবার জন্যে বাড়িটা যদি ব্যবহার করতে দেন তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। আমাদের কারও বাড়িতে এত ফাঁকা জায়গা নেই, তাছাড়া যা শুনছি—"

এই বলে থেমে গেলেন ভদ্রলোক।

"কি শুনছেন?"

"আমাদের মতো সাধারণ কোনও লোককে চা খাওয়ালে এত হাঙ্গামা কিছুই করতে হত না। কিন্তু নবাব সাহেবের কথা আলাদা। খানা রাঁধবার জন্য তাঁর নিজের লোকজন আসবে। তিনজন সাধারণ বাবুর্চি, একজন হেড বাবুর্চি। তাঁরা এসে যা যা চাই ফরমাস করবেন, একদিন আগে এসে রাঁধবার জায়গা,

উনুন-টুনুন ঠিক করে যাবেন। তারপর যেদিন খাওয়ানো হবে সেইদিন ভোর থেকে এসে রাঁধবেন। অনেক ঝঞ্ঝাট মশাই। আপনার বাড়িটা বড়ও আছে, ফাঁকাও আছে, তাই বলছি আপনার বাড়িটা যদি দেন—"

বাড়ির ভিতর এত হাঙ্গামা করবার ইচ্ছে আমারও হচ্ছিল না, কিন্তু অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। বলতে হল—"বেশ তো, আমার আর আপত্তি কি! আচ্ছা, নবাব সাহেবকে আপনারা হঠাৎ চা খাওয়াচ্ছেন কেন বুঝলাম না।"

ভদ্রলোক ভুরু দুটো কপালের উপর তুলে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ।

"নবাব সাহেবকে চা খাওয়াতে পারা একটা সৌভাগ্য তা জানেন? উনি কারও বাড়িতে কখনও খেতে যান না, আমরা গত চার বছর ধরে অনুরোধ করছি ওঁকে। এবারে কি জানি কেন রাজি হয়েছেন—"

আমি চুপ করে রইলাম কয়েক মুহূর্ত্ত।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি খুব—"

"উনি আমাদের একজন মস্ত বড় খাতক।"

"তার মানে?"

"আমরা হাজার হাজার টাকা ধার দিই ওঁকে। যখনই দরকার হয় আমাদের খবর দেন, আমরা গিয়ে টাকা পৌঁছে দিয়ে আসি।"

এবার আমি অবাক হলাম। চিরকাল জানি, যে টাকা ধার নেয় সেই কৃতজ্ঞতায় নুয়ে থাকে যে টাকা ধার দেয় তার কাছে। এ যে দেখছি উল্‌টো ব্যাপার।

"উনি অনেক টাকা ধার করেন বুঝি?"

"অনেক।"

"শোধও করেন ঠিক ঠিক!"

"করেন, কিন্তু ঠিক ঠিক নয়। আমরা ওঁর কাছ থেকে কখনও কোনও হ্যাণ্ড নোট নিই না। এমনি টাকা দিই। তারপর যখন শুনি ওঁর হাতে টাকা আছে তখন একদিন গিয়ে কুর্ণিশ করে বলি যে, অমুক দিন আপনার হুকুমে এত টাকা আপনার খিদমতের (সেবার) জন্য দিয়েছিলাম এখন যদি সেটা পাই তাহলে বড় উপকার হয়।

সঙ্গে সঙ্গে খাজাঞ্চিকে হুকুম দিয়ে দেন।

যত টাকা চাইব তৎক্ষণাৎ তত টাকাই পেয়ে যাব। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যদি দশ হাজার টাকা চাই তা-ও পাব। কখনও জিগ্যেস পর্যন্ত করবেন না। সত্যিকার নবাব, উনি, বুঝলেন?"

চুপ করে রইলাম, কি আর বলব। লোকটিকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম একটু।

নবাব সাহেবের কথা শুনেছিলাম আমিও, কিন্তু দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। ডাক্তার হিসাবে সে অঞ্চলে সেই সবে গেছি।

"কবে আসবেন উনি?"

"দিন চারেক পরে। মানে, আগামী বুধবার বেলা পাঁচটায়। ওঁর বাবুর্চিরা কাল আসবে।"

যথাসময়ে বাবুর্চিরা এল। বাবুর্চিদের দেখে আমার চক্ষুস্থির। আসল নবাব সাহেব কি রকম হবেন জানি না, কিন্তু এঁরা দেখলাম প্রত্যেকেই এক একটি ক্ষুদ্র নবাব। একজনের দাড়িতে মেহেদী লাগানো; একজনের পায়ে মখমলের জুতো, আদ্ধির পাঞ্জাবীর উপর মখমলের বান্ডি পরে আছেন একজন; আর একজনের আঙুলে যে আঙটিটা রয়েছে, মনে হল তা আসল হীরের। যিনি হেড বাবুর্চি তিনি পরে' এসেছেন নিখুঁত সাহেবী পোষাক, কথা বলছেন নিখুঁত ইংরেজিতে। শুনলাম ইনি বিলেতফেরত। মোগলাই, পাঠানী, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালিয়ান, গোয়ানিজ, জার্ম্মানী, জাপানী, চীনা—নানারকম রান্না জানেন। বেতন পান পাঁচ শ' টাকা।

আমি তো দেখে শুনে ঘাবড়ে গেলাম। প্রত্যেককে সাদরে অভ্যর্থনা করে চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তাঁরাও আমাকে সম্ভ্রমসহকারে আদাব করলেন। যিনি হেড বাবুর্চি তিনিই বসলেন চেয়ারে, বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে রইলেন। যে বড়লোকেরা নবাব সাহেবকে খাওয়াবেন তাঁদের মধ্যেও একজন এসেছিলেন সঙ্গে। তিনি একটা চেয়ারে বসলেন। হেড বাবুর্চি তাঁকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নবাব সাহেবকে কি খাওয়াবেন আপনারা?"

"চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু শুধু চা কি নবাব সাহেবকে দেওয়া যায়? ওর সঙ্গে কিছু পোলাও, মাংস, আর আপনি যা যা ভাল মনে করেন তাই থাকবে। আমরা ফিরপোতে পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, জ্যাম জেলির অর্ডার দিয়েছি। কিছু প্লেট, আর চায়ের বাসনপত্র নিয়ে সেখান থেকে লোকও আসবে একজন। চায়ের আর বাসনপত্রের ভার তারা নিয়েছে—"

হেড বাবুর্চি বললেন, "কিন্তু তারা, সোনার বাসনপত্র আনতে পারবে কি? নবাব সাহেবকে যখন খাওয়াচ্ছেন, তখন—"

স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখে আমার মনে হল ভিতরে ভিতরে তিনি ঘামছেন।

"ক'জন লোককে খাওয়াচ্ছেন আপনারা?'

"জন দশেক।"

"মোটে জন দশেক? তাহলে আমিই সোনার প্লেট আর বাসন নিয়ে আসব।"

"ফিরপোকে মানা করে দেব?"

"আনুক তারা। চায়ের কাপ-টাপগুলো দরকার হবে। এইবার আমাকে একটা কাগজ দিন তো। ফর্দ্দ করে ফেলি একটা।"

আমি একটা চিঠি লেখবার প্যাড এগিয়ে দিলাম। হেড বাবুর্চি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "দশজনকে খাওয়াচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

হেড বাবুর্চি মিনিট খানেক চোখে বুজে রইলেন। তারপর বললেন, "আমার মনে হয় চায়ের সঙ্গে

বেশী কিছু করে দরকার নেই। দু'রকম পোলাও হোক, সফেদ আর জরদা। আর কাবাব হোক চার রকমের। চায়ের সঙ্গে 'কারি' সুবিধে হবে না। আমি সেই অনুসারেই ফর্দ্দ করছি। কিছু নিমকি, কচুরি, সিঙাড়াও রাখতে পারেন। এখানে ভাল ঘি পাওয়া যাবে কি? যদি না যায় তাহলে আমাকেই সেটা আনতে হবে, ভাল ময়দাও আমি দিতে পারি আমার বাবুর্চিখানা থেকে। নবাব সাহেবের জন্য কাশ্মীর থেকে ঘি আসে, কাশ্মীরী মেয়েরা নিজের হাতে তৈরী করে পাঠায়। ময়দা আসে পঞ্জাব থেকে—"

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ, ঘি আর ময়দা আপনি আনবেন, দাম যা লাগে দেব।"

"আমরা মুদী নই বাবু সাহেব।"

"দাম? আমরা মুদী নই বাবু সাহেব।"

হেড বাবুর্চির মুখে সম্ভ্রমপূর্ণ বিনীত হাসি ফুটে উঠল একটা।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন, "মাফ করবেন আমাকে।"

হেড বাবুর্চি বললেন, "যে সব জিনিসের ফর্দ্দ করে দিচ্ছি, আপনারা সেইগুলো জোগাড় করে রাখবেন। পরশু সকালে, মানে মঙ্গলবার সকালে আমি আবার আসব। কাল গোটা দুই চাকর চাই, তারা উঠোনটাকে পরিষ্কার করুক; রাজমিস্ত্রীও চাই একজন, উনুন তৈরি করবে। রমজান আলী, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে উনুন তৈরি করাবে—"

"জি হুজুর।"

হীরের আংটি-পরা রমজান আলী সেলাম করে গ্রহণ করলে তাঁর হুকুম।

তারপর তিনি গফুর খাঁকে হুকুম করলেন, "তুমি বাবুর্চিখানা সাজাবে। ফুলের টব, ফুলদানী, গালিচা, কুর্শি যা যা তোমার দরকার বাবুসাহেবকে বলে দাও, ইনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

গফুর খাঁ আদাব করে সেই ভদ্রলোককে বললেন, "কুড়ি-বাইশটা ফুলের টব, একটা ভালো ফুলদানী, একটা গালিচা আর একটা আরাম-কুর্শি চাই। আরাম-কুর্শির দু'পাশে রাখবার জন্য দুটো ছোট টেবিলও দরকার। একটা আতরদান চাই, সিগারেটের ছাই ফেলবার জন্য একটা ছাই-দানও চাই। আর একটা ভাল চাঁদোয়া—"

আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

রান্নার জায়গা সাজাবার জন্য এত সরঞ্জাম চাই না কি!

জিজ্ঞাসা করলাম—"যেখানে রান্না হবে সেখানে এত সব জিনিস লাগবে?"

হেড বাবুর্চি নিখুঁত ইংরেজিতে উত্তর দিলেন মৃদু হেসে—"নিশ্চয়। বাবুর্চিদের মেজাজ যদি ভালো না থাকে, চারদিকের আবহাওয়া যদি আনন্দপূর্ণ না হয়, তাহলে রান্না ভাল হবে কি করে? যেখানে নবাব-সাহেবের জন্য খানা তৈরী হবে, সেখানে পরিবেশটা ভাল করতে হবে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

সেই ধনী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। কিন্তু তাঁর চোখ-মুখ দেখে মনে হল ভিতরে ভিতরে তিনি ঘামছেন বেশ।

"এবার ফর্দ্দটা করে ফেলি। দশজন লোক খাওয়াবেন তো?"

"হ্যাঁ, দশজন।"

হেড বাবুর্চি ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আচ্ছা, আমি বাড়ি থেকে গিয়েই ফর্দ্দ পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই। এখানে করলে হয়তো বাদ পড়ে যেতে পারে কিছু। একটু পরেই আমার লোক এসে ফর্দ্দ দিয়ে যাবে। আমি এখন উঠি। ফর্দ্দটা পেয়ে আপনি জিনিসগুলি আনিয়ে রেখে দেবেন। আবিদ মিঞা, তুমি কাল এসে নবাব সাহেব যে ঘরে খাবেন, সেই ঘরটা সাজিয়ে ফেলো। ঝাড়লণ্ঠন আছে তো?"

ধনী ভদ্রলোক বললেন, "আছে। ক'টা লাগবে?"

"যদি বড় হল্ হয় তাহলে দশ-বারোটা লাগবে।"

"আচ্ছা। তা সে জোগাড় হয়ে যাবে।"

তৃতীয় বাবুর্চি আবিদ মিঞা সেলাম করে সরে দাঁড়াল। হেড বাবুর্চি উঠে যথারীতি সকলকে আদাব করে বিদায় নিলেন। বাকী তিনজনও তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে গেল। বলে গেল কাল সকালে আবার আসবে। সেই ধনী ব্যক্তিটি পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল, মুখ, ঘাড় ভাল করে মুছলেন, তারপর বললেন, "আমরা ভেবেছিলাম শ'-দুই টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু যে রকম আঁচ পাচ্ছি আরও বেশী লাগবে। লাগবেই তো, নবাব সাহেবকে খাওয়ানো কি সোজা কথা! আচ্ছা, আমিও এখন উঠি। ফর্দ্দটা যদি এখানে দিয়ে যায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আচ্ছা।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পরে একটি লোক এসে আমার হাতেই ফর্দ্দটি দিয়ে গেল। ফর্দ্দ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সন্দেহ হল লোকটা পাগল নয় তো! আমরা মাত্র দশজন খাব, আর ফর্দ্দ দিয়েছে—সাতটা খাসির (প্রত্যেকটির ওজন ৭ থেকে ১০ সেরের মধ্যে হওয়া চাই), সফেদ পোলাওয়ের জন্য সরু আলো চাল (তুলসী মঞ্জুরী বা কাটারি ভোগ) আধমণ, জরদা পোলাওয়ের জন্য ভাল পেশোয়ারী চাল আধমণ। তাছাড়া পোলাওয়ের মশলা প্রায় কুড়ি রকম, প্রত্যেকটি পাঁচ সের করে, জাফরান কেবল দু'সের। পেঁয়াজ দশ সের, রসুন দশ সের, আদা পাঁচ সের,—কিসমিস, পেস্তা, বাদাম প্রত্যেকটি পাঁচ সের! অবাক কাণ্ড!

যাই হোক, ফর্দ্দ সেই ভদ্রলোকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁরা নবাব সাহেবকে খাওয়াচ্ছেন, তাঁরাই ঠিক করুন কি করবেন। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি করব! যথাসময়ে গিয়ে খেয়ে আসব আর দেখে আসব নবাব সাহেবকে। ফর্দ্দ পাঠিয়ে দিলাম। তারপর রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে রমজান আলী, গফুর খাঁ আর আবিদ মিঞা এসে হাজির হল। একজন রাজমিস্ত্রী আর দুটো কুলীও এল। দেখলাম কিছু ইট আর সিমেণ্টও এসেছে। আমার বাড়ির পিছন দিকে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল, সেইটে দেখিয়ে দিয়ে আমি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলাম। ফিরলাম বেলা দুটো নাগাদ। ফিরে দেখি জায়গাটার চেহারাই বদলে দিয়েছে তারা। চেঁছে-ছুলে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলেছে, পাকা উনুন তৈরী করেছে চমৎকার, ফুলের টব সাজিয়ে দিয়েছে চারিদিকে, সুন্দর চাঁদোয়া টাঙিয়েছে একটা, চাঁদোয়ায় চমৎকার কাজ করা, চাঁদোয়ার বাঁশগুলো পর্যন্ত জরি বসানো শালু দিয়ে মোড়া। কাছেই দেখলাম একটা ক্যাম্বিসের আরাম-কেদারা আর গোটা দুই তেপায়া রয়েছে! ফুলদানী, আতরদান, ছাইদানও এসে গেছে। একটা গালিচাও পাট করা রয়েছে দেখলাম।

স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শুনছিলেন ভিতরকার অবস্থা কি। [পৃষ্ঠা ২৯৫

রমজান আলী সসম্ভ্রমে আমাকে বললে, "গালিচা, তেপায়া, চেয়ার বুধবার সকালে কাজে লাগবে হুজুর! আতরদান, ফুলদানী আর ছাইদানও তখনই দরকার হবে। এখন এগুলো আপনার একটা ঘরে রাখিয়ে দিচ্ছি—"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এগুলো দিয়ে কি হবে?"

"নূর মহম্মদ সাহেব মানে, হেড বাবুর্চি সাহেব, বসবেন। গালিচা পেতে তার উপর আরামকুরশীটা বিছিয়ে দেব, আর কুরশীর দু'পাশে তেপায়া দুটো থাকবে। একটাতে থাকবে আতরদান, ফুলদানী আর একটাতে থাকবে ছাইদান।"

কি কাণ্ড! কিছু না বলে জিনিসগুলো ঘরের ভিতর রাখিয়ে দিলাম। তার পরদিন ফর্দ্দ অনুযায়ী অন্যান্য জিনিসপত্রও এসে পড়ল। সাতটা পুষ্ট খাসী ব্যা ব্যা করতে লাগল আমার বাড়ির সামনে।

চাল মশলা সব এসে পড়ল। একটু পরে কাশ্মীরী ঘি আর পাঞ্জাবী ময়দা নিয়ে নূর মহম্মদ সাহেব স্বয়ং এসে গেলেন। সেই ধনী ভদ্রলোকটিও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দেখলাম।

এইবার আর একবার আশ্চর্য্য হবার পালা। নূর মহম্মদ সাহেব ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি খাসীকে দেখতে লাগলেন ভাল করে। তারপর আবিদ মিঞাকে একটা খাসীর কোমর ধরে তুলতে বললেন। আবিদ মিঞা তুলে ধরলে।

তিনি খাসীটির সর্ব্বাঙ্গ ভাল করে দেখে সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "এই খাসীটাই থাক। বাকীগুলো ফেরৎ দিন। এরও সব মাংসটা লাগবে না। আমি এর থেকেই বেছে বেছে সের তিনেক মাংস বের করে' নেব।...."

তারপর রমজান আলীর দিকে ফিরে তিনি বললেন—"এইবার তোমরা তিনজন লেগে পড়। দু'রকম চাল, দু'সের করে চাই। কিন্তু প্রত্যেকটি চালের দানা হওয়া চাই গোটা, এবং পাকা। বেশী করে চাল আনিয়েছি ওই জন্যেই। তোমরা দু'জনে মিলে বেছে ফেল। তারপর মশলাও বাছতে হবে, প্রত্যেক রকম মশলা এক পোয়া করে হলেই হবে। কিন্তু সেটা বাছাই মশলা হওয়া চাই। লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ এগুলো খুব সাবধানে বাছবে, একটিও বাজে দানা যেন না থাকে। মেওয়াগুলো ভাল করে বেছে নাও; কিসমিস, পেস্তা এসবের মধ্যে অনেক বাজে জিনিস মেশানো থাকে। প্রত্যেকটি দানা বেশ পাকা আর পুষ্ট হওয়া চাই, পচা যেন একটি না থাকে—"

"জি হুজুর!"

সেলাম করে রমজান আলী চালের ঝুড়িটির দিকে এগিয়ে গেল। হেড বাবুর্চি হুকুম দিয়ে চলে গেলেন সেদিন। যাবার আগে বলে গেলেন, এরা চাল আর মশলা আজ বেছে ধুয়ে রাখবে, তিনি কাল সকালে আসবেন। উনি চলে যাবার পর এরা তিনজনে কাজে লেগে পড়ল এবং রাত নটা পর্য্যন্ত মেহনত করে কাজ শেষ করে ফেললে সব। অধিকাংশ চাল, মশলা আর মেওয়া ফেরত গেল। নিখুঁত জিনিসগুলি রইল কেবল।

পরদিন ভোরে নূর মহম্মদ সাহেব এসে পড়লেন। তাঁর হুকুম মতো রমজান, গফুর আর আবিদই সব করতে লাগল। তিনি গালিচার উপর ইজিচেয়ারে বসে খুব দামী সিগারেট খেতে খেতে হুকুম দিতে লাগলেন শুধু। রান্নার গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক। পোলাও রান্নার সময় নূর মহম্মদ সাহেবকে একটু শারীরিক মেহনত করতে হচ্ছিল মাঝে মাঝে। পোলাওয়ের চালে মশলা ঘি মেখে আর তাতে আখনির জল মাপ মতো দিয়ে হাঁড়ি দুটোর মুখ একেবারে ময়দার আটা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নূর মহম্মদ সাহেব মাঝে মাঝে উঠে হাঁড়ির গায়ে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শুনছিলেন হাঁড়ির ভিতরকার অবস্থা কি, আঁচ কমাতে হবে না বাড়াতে হবে। ডাক্তাররা যেমন রোগীর বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে নানারকম শব্দ থেকে বুঝতে পারেন বুকের অবস্থা কি রকম, নূর মহম্মদ সাহেবও তেমনি ফুটন্ত পোলাওয়ের আওয়াজ থেকে ঠিক করছিলেন, পোলাও হতে কত দেরী আছে! আমি তো কাণ্ড দেখে 'থ' হয়ে গেলাম।

ঠিক পাঁচটার সময় নবাব সাহেব মোটর থেকে নামলেন এসে। পরিষ্কার ধপধপে সাদা চুড়িদার

পাঞ্জাবী আর 'চুস্ত' পায়জামা পরে এসেছিলেন। মাথায় ছিল একটি শাদা মুসলমানী টুপি। তাঁকে দেখে আমার একটি উপমা হঠাৎ মনে হয়েছিল, মানুষ নয় যেন চকচকে তলোয়ার একখানা। নীল চোখ, মুখে মৃদু হাসি। আমাদের প্রত্যেককে আদাব করে চেয়ারে এসে বসলেন। যাঁরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে কিছু না কিছু বললেন। ঘাড় বাঁকিয়ে মৃদু হেসে তিনি শুনলেন, কখনও বা মাথা নাড়লেন একটু।

খাওয়ার জিনিস সোনার থালায় আসতে লাগল একে একে। তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হল। তারপর চা এল। নবাব সাহেব চায়ের পেয়ালাটা কেবল তুলে নিলেন এবং দু'চার চুমুক চা খেলেন খালি। কোন খাবার স্পর্শ পর্য্যন্ত করলেন না। আধ কাপ চা খেয়ে উঠে পড়লেন তিনি। সবিনয়ে বললেন, "আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।"

সকলকে আদাব করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দুই

নবাব সাহেবের দ্বিতীয়বার পরিচয় পাই অন্য সূত্রে। এক গরীব পানওলার ছেলের অসুখের চিকিৎসা করেছিলাম। পানওলা গরীব বলে পুরো 'ফি' দিতে পারেনি আমাকে। তার ভাঙা কুঁড়ে ঘর আর পানের দোকানটি মাত্র সম্বল। ওষুধ কিনতেই জেরবার হয়ে গিয়েছিল বেচারী। মাস কয়েক পরে সে আবার আমাকে ডাকলে একদিন। এবার তার স্ত্রী অসুখে পড়েছে। গিয়ে দেখলাম এবার তার অবস্থা ফিরেছে, দোতলা পাকা বাড়ি হয়েছে একটি। এবারও সে আমাকে কম 'ফি' দিতে এল।

আমি বললাম, "এখন তো তোমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে মনে হচ্ছে। পাকা বাড়ি করেছ—"

সে বললে—"ডাক্তার বাবু, আমার অবস্থা তেমনি আছে। ও বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন নবাব সাহেব।"

"নবাব সাহেব?"

"হ্যাঁ ডাক্তার বাবু। আমার ভাগ্য ভাল, তাই আমার দোকানের সামনে তাঁর মোটর গাড়ির টায়ার ফেটে যায় একদিন। তাঁর ড্রাইভার যখন চাকা বদলাচ্ছিল তখন আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম একটু। নবাব সাহেবকে কুর্নিশও করেছিলাম। নবাব সাহেব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইখানে তুমি থাক?"

আমি উত্তর দিলাম, "হাঁ, হুজুর। ওই আমার বাড়ি।"

তিনি আমার ভাঙা কুঁড়েটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর চলে গেলেন। পরদিন সকালে এক ইঞ্জিনিয়ার এসে হাজির। ইঞ্জিনিয়ার বললেন, "নবাব সাহেব তোমাকে একটা পাকা বাড়ি করিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন।" সেই দিনই কাজ সুরু হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে আমার কুঁড়ে ঘরের জায়গায় ওই দোতলা বাড়ি উঠল—

নবাব সাহেবকে আমি যেন দেখতে পেলাম। ধপধপে ফরসা চেহারা, নীল চোখ, মুখে মৃদু হাসি...।

তিন

কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি নবাব সাহেব মারা গেছেন। অসুখে ভুগে নয়, সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে। অনেকে বলছেন ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কারণ তিনি সে উইল করে গেছেন তা অদ্ভুত। তাতে লেখা আছে, "আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি গরীবদের উপকারের জন্য দান করে দিলাম। আমার কাছে আর এক কপর্দকও রইল না, বাকী জীবনটা কি করে কাটাব!"

সেদিন পুরী গিয়েছিলাম। পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, মনে হল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে যেন নবাব সাহেবের মুখটা দেখতে পেলাম। নক্ষত্র-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে আছেন, সেই নীল চোখ, মুখে সেই মৃদু হাসি।

তর্কে বহু দূর

ভক্তের মান-রক্ষা

পরিব্রাজক অবস্থায় বিবেকানন্দ ট্রেণে করে যাচ্ছেন। সেই কামরায় একজন ধনী শেঠ উঠলো। সন্ন্যাসীর বেশে বিবেকানন্দকে দেখে শেঠজী ঠাট্টা করতে লাগলো। অমন জোয়ান চেহারা...ভিক্ষে করে খেতে লজ্জা করে না? বিবেকানন্দ গম্ভীরভাবে বলেন, ভিক্ষে করে খাই না। শেঠজী বলে, তবে, চুরি কর নাকি? বিবেকানন্দ বলেন, ভগবান জুটিয়ে দেন। শেঠজী হেসে ওঠে। ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসীর সামনে নিজের নানান রকমের খাবার বার করে দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। বিবেকানন্দ নীরবে থাকেন। সারা দিনরাত ট্রেণে অভুক্ত অবস্থায় কেটে গেল। হাথ্‌রাস ষ্টেশনে নামলেন। শেঠজীও নামলো। বিবেকানন্দকে ঠাট্টা করে বলে, কই, তোমার ভগবান তো খাবার দিয়ে গেল না! এমন সময় একদল লোক নানান রকমের খাবার নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে বিবেকানন্দের কাছে এলো। তাদের ভেতর একজন সাষ্টাঙ্গে বিবেকানন্দকে প্রণাম করে বল্লো, প্রভু, স্বপ্নে আদেশ পেলাম, যেন আমার গৃহদেবতা বলছেন, ওরে, আমার ভক্ত ষ্টেশনে গাছতলায় বসে আছে অভুক্ত, এখনি তাকে খাবার দিয়ে আয়। তাই ছুটতে ছুটতে এসেছি প্রভু।

শেঠজী দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার শুনলো। বিস্ময়ে অবাক হয়ে সে মাটীতে লুটিয়ে বিবেকানন্দের পায়ের ধুলো নেয়।

শিকারী-জীবন

—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(লালগোলার মহারাজা)

পদ্মানদীর অনতিদূরেই আমাদের লালগোলা রাজবাড়ী। আগে নাকি বাড়ীর ঠিক পাশ দিয়েই পদ্মানদী বইত। সেই নদীর একটা পাড়কে আমার পূজনীয় প্রপিতামহ ভাল করে খুঁড়িয়ে পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা একটা দীঘিতে রূপায়িত করেছিলেন। দীর্ঘে আধমাইল লম্বা আর প্রস্থেও প্রায় আড়াইশ গজের উপর! শোনা যায়, আগে কল্ কল্ করে নদীটা এখান দিয়ে বয়ে যেত বলেই দীঘিটার নাম কল্‌কলি হয়েছে। এরই পূর্ব্ব সীমান্তে আমার পিসিমার বাড়ী—নাম নূতন বাড়ী—কেউ বা রাজকন্যার বাড়ীও বলে। আমার পিতামহ মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ তাঁর একমাত্র কন্যাকে কাছে রাখবার জন্যে তাঁকে ঐ বাড়ীটি তৈরী করে দিয়েছিলেন। পশ্চিম সীমান্তে, রাজবাড়ীর সংলগ্ন লালগোলা হাইস্কুলের ব্রাঞ্চ-হোষ্টেল। নূতন বাড়ী হতে ব্রাঞ্চ-হোষ্টেল পর্য্যন্ত কল্‌কলির ধার দিয়ে সোজা আধমাইল পনেরো ফিট চওড়া সুরকীর রাস্তা। তার পাশ দিয়ে বরাবর আমাদের বাড়ীর উঁচু প্রাচীর চলে গিয়েছে।

আমার পিস্‌তুতো ভাই তিনটি—জ্যেষ্ঠ নীরেন্দ্রনারায়ণ, মধ্যম শিবেন্দ্রনারায়ণ, কনিষ্ঠ জীবেন্দ্রনারায়ণ—ডাকনাম, যথাক্রমে, নীরু, শিবু, জীবু। তারা সবাই বয়সে আমার ছোট। আমরা চার ভাই একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলাম।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে তারা প্রত্যহ বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগাতো। মলয়ানিলে নাকি মনটাও বিচিত্র রঙে ভরে ওঠে! সুতরাং সে সময় তিন ভায়েরই কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ দেখা যেত। শিবু উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, জীবু নিজেই কবিতা রচনা করে তার আবৃত্তি চালায়, আর জ্যেষ্ঠ নীরেন্দ্রনারায়ণের ভূমিকা ছিল দুপাশে দুই ভাইকে রেখে শুধু বাহবা দিতে দিতে পথ চলা।

সেদিনও ছিল ফাল্গুনের এমনি একটি সুন্দর প্রভাত। 'পী কাঁহা' 'বৌ কথা কও' পাখীর অবিশ্রান্ত ডাকে আকাশ-ভুবন ছেয়ে ফেলেছে।

ফুরফুরে মলয়—চনমনে মন নিয়ে তারা প্রাতর্ভ্রমণান্তে সবে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেদিনকার মত কাব্যচর্চ্চার শেষ আহুতি দিচ্ছিল—এমন সময় তারা দেখতে পায় একটা বৃহদাকার দাঁতাল বন্য শূয়োর সাঁওতালদের তাড়া খেয়ে কল্‌কলির উত্তর পার হতে জলে ঝাঁপিয়ে, সাঁতরে এপারে আসছে। ব্যস্—কাব্যচর্চ্চার আগুন একদম ঠাণ্ডা!

নীরেন্দ্রনারায়ণ শিকারে আমার নিত্যসঙ্গী এবং প্রধান উৎসাহদাতা—যদিও স্বহস্তে শিকারে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ। তিনি বন্য বরাহের এই সুবর্ণসুযোগ হাতে পেয়ে, লম্বমান কোঁচাকে কষে মালকোঁচায় পরিণত করলেন। তারপর ছুটে গিয়ে সামনের বৈঠকখানা হতে দোনলা বন্দুকটায় দুটো গুলী ভরে নিয়েই বিপুল পরাক্রমে হলেন শূকরের প্রতি ধাবমান। পশ্চাতে তাঁর অনুজদ্বয়—শিবু আর জীবু। অগ্রজের এরূপ

অসমসাহসিক অদম্য উৎসাহ দেখে তারাও পায়ের চটী জুতো ফেলে বড়দা'র পশ্চাদ্ধাবন করলে। শূয়োরটাও ইতিমধ্যে এপারে উঠেই ভ্রাতৃত্রয়ের সেই বিকট চীৎকার আর হৈ-হল্লা শুনে সোজা পশ্চিম মুখে দৌড়!

দীঘির পশ্চিম প্রান্তে রাজবাড়ীর পশ্চিম দেশীয় সিপাহীরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে, একহস্তে লোটা, অপর হস্তে নিমের দাঁতন নিয়ে, ঠিক হিন্দু হোষ্টেলের সামনের বাঁধা ঘাটে ফিরে আসছিল। ঐ বীভৎস জানোয়ারটা সামনে দেখে তারস্বরে চীৎকার—'সিয়া রাম—সিয়া রাম!' কারণ হাতের লোটা আর নিমের দাঁতন ছাড়া কোনও অস্ত্রই যে তাদের সম্বল নেই—আর্ত্তনাদ ছাড়া উপায় কী? অগ্রপশ্চাৎ তাড়া খেয়ে শূয়োরটা গত্যন্তরহীন অবস্থায় ব্রাহ্ম-হোষ্টেলের ভিতর ঢুকে পড়ল—তারপর সম্মুখের দীর্ঘ বারান্দার উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণদিকে ছুট্।

বারান্দার উপর থেকে নীচে নর্দ্দমায় পপাত!

ছাত্রগণের মধ্যে দু'একজন উঠলেও আর সবাই গাঢ় সুষুপ্তিমগ্ন। হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরম বৈষ্ণব। কণ্ঠে হরিকাঠের মালা—কীর্তন-সভায় যতই তালসুরবিহীন হরিনাম-গান হোক না কেন, তথাপি অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জনে যাঁর কোনও দিন কোনও প্রকার ত্রুটী দেখা যায়নি—যাঁর দুটি চক্ষুর অন্তরালে যেন দুটি পূর্ণ কুম্ভ সর্ব্বদাই স্থাপিত—খোলের আওয়াজ শুন্‌লেই যাঁর বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হবার উপক্রম, এমন যে ফোঁটা-তিলককাটা দ-বাবু—তিনি তখন বারান্দার ধারে বসে দন্তধাবনে ব্যাপৃত। পার্শ্বে তাঁর সযত্নে রাখা গামছা-ঢাকা নাতি-উচ্চ কমণ্ডলু।

মনে মনে তিনি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-নাম স্মরণ করে থাকেন। কিন্তু প্রভু যে সহসা সশরীরে তৃতীয় অবতার-রূপে আকস্মিকভাবে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হবেন—এটা তাঁর ধারণাতীত। তবে কী অন্তিমকাল সন্নিকট? দর্শন-মাত্র, ভীত সন্ত্রস্ত দ-বাবু একটি অর্দ্ধোচ্চারিত "ওরে ব্বা—" শব্দ করেই বারান্দার উপর থেকে একেবারে নীচে নর্দ্দমায় পপাত! দু-একজন ছাত্র, যারা আগেই উঠেছিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের এই দুর্দ্দশা দেখেও "আত্মানং প্রথমং রক্ষেৎ"—এই নীতি অনুসরণ করে করলে তাদের নিজের নিজের ঘরে পুনঃপ্রবেশ ও যথারীতি দ্বার অর্গল বন্ধ!

শূয়োরটা হোষ্টেলের দীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করে প্রচণ্ডবেগে একটা ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে পাশেই লক্ষ্মীবাড়ীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে নীচে নেমে পড়ল বটে—কিন্তু সেখান থেকে আর ঐ পথে বেরিয়ে আসবার উপায় নেই। লক্ষ্মীবাড়ী রাজবাড়ীরই একটা অংশ—সেখানে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবীর সাময়িক পূজা হয়। চতুর্দ্দিক সুউচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত—এবং একটিমাত্র লোহার গেট। সেটাও আবার উপরে নীচে মোটা লোহার শেকলে বেশ মজবুত করে বাঁধা। কাজেই বাছাধন এবার বন্দী—দস্তুরমতো মুস্কিলেই পড়ে গেল। সে লক্ষ্মীবাড়ীর চতুর্দ্দিকে বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে—যদি কোথাও নিষ্ক্রমণের পথ পায়! শেষটায় লোহার গেটটি লক্ষ্য করে ছুটে এসেই সে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে। গেট্‌টা ঝন্‌ঝন্ করে উঠ্‌ল।

নীরেন্দ্রনারায়ণ এযাবৎ প্রকৃত বীরের স্পর্দ্ধা নিয়ে শূয়োরটার পেছনে ছুটে আসছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে উক্ত গেটের বাইরে উপস্থিত হয়েছেন—কিন্তু শূয়োরটার সেই দুরন্ত আস্ফালন চাক্ষুষ করে তাঁর হস্তধৃত বন্দুকটি ঘন কম্পমান। লক্ষ্য স্থির করা তখন তাঁর পক্ষে সুদূরপরাহত। শূয়োরটা একবার করে চতুর্দ্দিক ঘোরে—আবার এসে গেটে ধাক্কা দেয়। এইভাবে ক্রমাগত ধাক্কা দেওয়ার ফলে দরজার গায়ে প্রাচীরের গাঁথনি খানিকটা ভেঙ্গে পড়ল—আর সঙ্গে সঙ্গে গেটটাও হেলে একধারে কাত্ হয়ে গেল।

সর্ব্বনাশ। গেটের বাইরে দণ্ডায়মান সকলেরই তখন জীবন-সংশয়। নীরেন্দ্রনারায়ণের গায়ে খোঁচা দিয়ে তার ভ্রাতৃদ্বয় যতই গুলী করতে বলে, সে ততই দিশাহারা বিভ্রান্ত-দৃষ্টিতে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

শূয়োরটা আবার ভীমবিক্রমে ছুটে আসে—প্রবল আঘাত করে—আবার ফিরে যায়।

খবরটা আমি আগেই পেয়েছি। গোলমাল শুনে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে সেই ধর্ম্মক্ষেত্র লক্ষ্মীবাড়ীর কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে শুন্‌লাম—"যুযুৎসব" জনতার পশ্চাতে দণ্ডায়মান, পরম বৈষ্ণব দ-বাবুর কম্পিত

কণ্ঠের ব্রজবুলি, "বিপত্তারণ, মধুসূদন!" আর দেখ্‌লাম, রাম বিহ্নে, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নের বিপন্ন মুখচ্ছবি।

প্রবেশ করেই বল্‌লাম—"ম্যয় আয়া হুঁ"—

আমাকে দেখেই নীরেন্দ্রনারায়ণ বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"এই যে দাদা—তুমি এলে?"

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলাম—"না এসে উপায় কী?"

দেখলাম শূয়োরটা ভীমবিক্রমে ছুটে আস্‌ছে—প্রচণ্ড আঘাতে এবার লোহার গেট্‌টা ঝন্‌ঝন্ করে নীচে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত জনতার ভয়ার্ত্ত মর্ম্মভেদী চীৎকার! শূয়োরটা ভড়্‌কে আবার ঘুরে গেল।

সাম্‌নের লৌহদ্বার একদম চিচিং ফাঁক! এবার কে রোধিবে গতি তার?

আমি নতজানু হয়ে রাইফেল তাক্ করে ঠিক সামনেই বসে পড়লাম। শূয়োরটা ক্ষিপ্রবেগে ছুটে আসতেই—ঠিক যখন ছ'সাত হাত দূরে—আমার একটি গুলীতেই—"পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্"—তার এত বিক্রম—সব একমুহূর্ত্তেই অসাড়—হিম—স্তব্ধ।

সকলেরই উচ্ছ্বসিত আনন্দে সেই রণাঙ্গন যেন নাচের আসর হয়ে উঠ্‌লো।—আমার উপযুক্ত বীর ভ্রাতা নীরেন্দ্রনারায়ণ সেই মৃত শূকরের বক্ষে উপর্য্যুপরি দুইটি গুলী ছুঁড়ে সমবেত জনতার প্রতি একটা অসীম সাহসের অবিস্মরণীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।—মধ্যম ভ্রাতা শিবেন্দ্রনারায়ণ অগ্রজের এই অমিত বিক্রমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তাকর্ষণ করে অনুরোধ জানায়—

চলুন, কালীবাড়ীতে মাথা ঠুকে, পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে বাড়ি ফেরা যাক্। আজ পরমানন্দে পরমান্ন খাওয়ার দিন।

তর্কে বহু দূর

মা ও ছেলে

মাতৃ-সাধক বামা ক্ষেপা শ্মশানে শুয়ে আছেন। শ্মশানের পাশেই তারা দেবীর মন্দির। মন্দির থেকে একজন পুরোহিত রোজ মার প্রসাদ বামা ক্ষেপাকে এনে দেয়। তাই খেয়ে ক্ষেপার দিন চলে যায়। মন্দিরের পুরোহিতেরা ক্ষেপাকে জব্দ করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করলো, মার প্রসাদ দেওয়া বন্ধ করে দিল। বামা ক্ষেপার ভ্রূক্ষেপ নেই। তেমনি শুয়ে থাকেন শ্মশানে, আর তেমনি আনন্দে ডাকেন মাকে।

এমনি করে একদিন, দুদিন, সাতদিন চলে গেল। ক্ষেপা শুয়েই থাকেন। কারুর কাছে খেতেও চান না। মন্দিরের পুরোহিতেরা ভাবে, এইবার ক্ষেপা উঠে এসে খাবার জন্যে ভিক্ষে চাইবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। হঠাৎ আট দিনের দিন এক রাজার লোক ভারে ভারে খাবার নিয়ে ক্ষেপার কাছে উপস্থিত হলো। রাজা স্বপ্নে আদেশ পেয়ে ক্ষেপার খাওয়ার ভার নিয়েছেন। বামা ক্ষেপা তেমনি আনন্দে হেসে উঠলেন। মার কোলে তিনি শুয়ে আছেন, মা-ই দরকার মত খাবার জোগাবেন। সেই দিন থেকে পুরোহিতেরাও ক্ষেপার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

"ঝাঁসি নাহি দিব"

—সুনির্মল বসু

ইংরাজ সেনাপতি
হিউরোজ ক্রমে সেনাদল লয়ে
হাজির ঝাঁসির দুর্গ-আলয়ে,
রাণীর নিকটে পাঠাইল ক'য়ে—
"দ্বার ছাড়ো সম্প্রতি,

তোমার দুর্গে মোরা অধিকারী,
সন্তানহীনা অক্ষম নারী,
দুর্গের দ্বার দাও তুমি ছাড়ি';
নহে হবে দুর্গতি।"

ইংরাজ দূত ধীরে—
দিল এই লিপি দুর্গ-মাঝারে,

বিমর্ষ সব হোলো দরবারে,
ঝাঁসির রাণী সে ক্রোধ সহকারে
সে পত্র ফেলে ছিঁড়ে ;
জানায় দূতেরে—"মিথ্যা বাসনা,
আমার এ ঝাঁসি কারেও দিব না,
পাবে না, পাবে না ধূলি এককণা—
দূত যেতে পারে ফিরে।"

'সাজ্ সাজ্' রব ওঠে,
ঝাঁসির দুর্গে ডংকা বাজিল,
সৈন্যের দল অস্ত্রে সাজিল,
উত্তেজনায় সবাই মাতিল—
এক সাথে এসে জোটে;
"আমাদের ঝাঁসি ইংরাজ-করে
বিনা-সংগ্রামে কেন দেব ধরে'?
শিয়াল ঢুকিবে সিংহ-বিবরে?
ভীষণ স্পর্ধা বটে!"

নারীবেশ পরিহরি'
যোদ্ধার সাজে সাজিল অমনি,
পুরুষের সাথে বীর সে রমণী,
দাঁড়াল সমুখে সে হেম-বরণী
অশ্বের পিঠে চড়ি'।
মহিমময়ীর সেই রূপ হেরি'—
যত বীরদল জোটে তারে ঘেরি',
বাজে ঢাক ঢোল দামামা ও ভেরী,
সারাটি দুর্গ ভরি'।

হিউরোজ ভাবে মনে—
মোদের দাবীতে ভয় পাবে রাণী,
ছেড়ে দেবে ঝাঁসি নিশ্চয় জানি,
প্রস্তুত হবে দুর্গের প্রাণী
আত্ম-সমর্পণে।
দূত ফিরে এসে কহিল বারতা,
জানাইল তারে রাণীর সে কথা
ঝাঁসি নাহি দিবে, থাকিলে ক্ষমতা
লহ তা' জিনিয়া রণে।
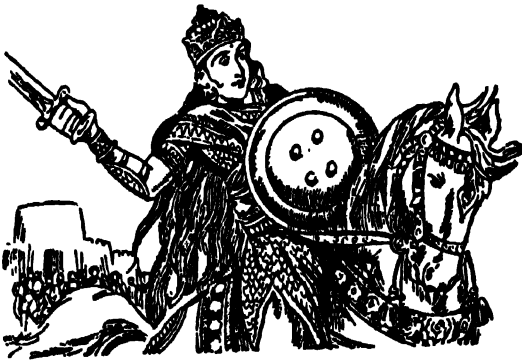
ইংরাজ কাঁপে ক্রোধে,
তুচ্ছ নারীর তেজ দেখি বড়,
লইল এ ঝুঁকি অতি গুরুতর,
এখনি মোদের সেনা হও জড়
দুর্গের অবরোধে।
দেখা যাবে তার সাহস কতটা,
কার ঘাড়ে দেখি মাথা আছে ক'টা,
ঝাঁসির আকাশে মিছে ঘনঘটা
ঘটাইল নির্বোধে।
সে দিন তরুণ প্রাতে—
মহা-বিক্রমে ইংরাজ দলে
আসিল দুর্গ-প্রাচীরের তলে,
প্রভাত-আলোকে সঙ্গীন ঝলে
নবীন ভঙ্গিমাতে।
থামিল আসিয়া রুদ্ধ-দুয়ারে,
দুর্গের মাঝে ঢুকিতে না পারে,
কাঁপাইল তারা পুরী বারে বারে
অস্ত্র-ঝঞ্ঝনাতে।

"ফটক খুলোনা কেহ"—
রাণীর আদেশে রক্ষীরা যত
দুয়ার রক্ষা করিছে সতত,
পাহারা দিতেছে সেনা অবিরত
বিরাট দুর্গ-গেহ।
বাহিরে চেঁচায় ইংরাজ-সেনা—
দুর্গ ছাড়িয়া তারা সরিবে না,
মরিবে তাহারা তবু নড়িবে না,
নাহি কোনো সন্দেহ।

আট দিন গেল কাটি',
অবিরাম সেই গোলার আঘাতে
ভাঙে না দুয়ার, তবু দিনে রাতে
চলিল প্রয়াস উন্মাদনাতে,
সব বুঝি হয় মাটি।
বিশ্বাসঘাতী ঠাকুর লালাজী
শেষে চুপে চুপে করি কারসাজি
খুলে দিল দ্বার গোপনে সে আজি'
মতলব কিছু আঁটি'।

বন্যার জল সম—
ইংরাজ যত সে খোলা দুয়ারে
করিল প্রবেশ ক্ষেপে একেবারে,
যারে কাছে পায় হানিছে তাহারে,
নিষ্ঠুর নির্মম।
পিছু দ্বার দিয়া ঝাঁসির রমণী
অশ্বের পিঠে চড়িয়া তখনি
ছুটিল ঘাঁটিতে আশঙ্কা গণি'
যা ছিল নিকটতম।

ছিল বিপ্লবী নেতা—
তান্তিয়া টোপী, রাও সাহেবেরে
সঙ্গে লইয়া পুনরায় ফেরে
বীর-বিক্রমে ইংরাজদেরে
ঘায়েল করিতে সেথা।
বীরাঙ্গনার রণ-কৌশলে
ইংরাজগণ মরে দলে দলে,
তবু পরাজিতা, ছুটে গেল চলে
ঝাঁসির মহাশ্বেতা।

"ধর ধর বাঘিনীরে"—
ইংরাজ সেনা ছুটে পশ্চাতে,
বহুদূরে শেষে বনে নিরালাতে
সাক্ষাৎ হোলো ঝাঁসি-রাণী সাথে,
বিশাল নদীর তীরে;
অশ্বের মুখ ঘুরায়ে সে নারী
রুখিয়া দাঁড়ায় লয়ে তরবারি,
শত্রু-সেনারে অতি তাড়াতাড়ি
নিঃশেষ করি ফিরে।

কঠিন আঘাতে শেষে
লক্ষ্মীবাইয়ের বর-তনু হতে
ঝরিল শোণিত দরদর স্রোতে,
আহত বাঘিনী রহে কোন মতে
ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে।
যারা এসেছিল ধরিতে তাহারে
লুটায়ে পড়িল ধরণী মাঝারে,
বাঘিনীর শেষ থাবার প্রহারে
রক্তেতে গেল ভেসে।

অনুচর ধরে আসি',
অশ্বের পরে টলে পড়ে রাণী,
কোমল অধরে জাগে হাসিখানি,
অন্তিম কালে ক'য়ে গেল বাণী,
"দিব না আমার ঝাঁসি।"
রক্ত ছড়ায়ে সারাটি ভুবনে,
রক্তিম রবি ঢলিল গগনে,
দেহ ছেড়ে গেল সেই মহাক্ষণে
আত্মা সে অবিনাশী!

তর্কে বহু দূর

সুরের মায়া

বাদশাহ আকবর ভ্রমণ থেকে ফিরছেন। সঙ্গে আছে তাঁর কন্যা। হঠাৎ আগ্রার এক বনের ধারে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বনের ভিতর থেকে আসছে এক অপরূপ তন্ত্রীর আওয়াজ। কে বীণা বাজাচ্ছে। এমন বাজনা তিনি জীবনে শোনেন নি। মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁরা সকলে দাঁড়িয়ে শোনেন। প্রাসাদে যখন ফিরে এলেন, তখন দেখেন তাঁর মেয়ের গলার নও-লখী হার হারিয়ে গিয়েছে। কি হলো সেই অমূল্য হার? কে চুরি করলো? চারদিকে সৈন্যরা ছুটলো। খুঁজতে খুঁজতে আগ্রার সেই বনের ধারে এক হরিণের গলায় সেই হার পাওয়া গেল। তখন রাজকুমারীর মনে পড়লো, বাজনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে তিনি গলার হার বনের হরিণের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। কে সেই অদ্ভুত বাদক? বহু অনুসন্ধানের পর আকবর জানলেন, তিনি হলেন হরিদাস গোস্বামী, তানসেনের গুরু।

তানসেনকে তিনি রাজসভায় আনতে পেরেছিলেন কিন্তু তানসেনের গুরুকে পারেন নি।

বাংলার রূপান্তর

—ডাঃ শ্রীসরসীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ইজ্রেলাইট্ ও ফিলিষ্টাইন্ এই দুটো জাতের মাঝে বিবাদ ছিল চিরকেলে। দুর্ব্বল ইজ্রেলাইট্‌রা মার্ খায়, আর তাই নিয়ে বিদ্রূপ করে ফিলিষ্টাইনের দল।

ইজ্রাইল্ দেশে মন্দিরে মন্দিরে তাই যুগে যুগে চলে কত আরাধনা, কত প্রার্থনা! সকলেই বলে, "হে প্রভু! একটা মানুষের মত মানুষ দাও তো! কিন্তু এমন তাজা মানুষ চাই, যে হবে ফিলিষ্টাইন্‌দের যমদূত! সে যেন ফিলিষ্টাইন্‌দের ধ্বংসের কারণ হয়!"

অবশেষে একদিন ইজ্রাইল্ দেবতার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "তথাস্তু। তাই হবে।"

এর পর অমিত বলশালী এক পুরুষের আবির্ভাব হলো। নাম তার স্যাম্‌সন্। দেবতা বলে দিলেন, "স্যাম্‌সন্ হবে অতুলন শক্তিশালী! কিন্তু মনে রেখো, তার শক্তির উৎস হলো তার মাথার চুল। চুল যতই বড় হবে, ততই তার শক্তি বাড়বে বর্ষার কচুগাছের মত! কিন্তু চুল যদি কেউ কখনো কেটে ফেলে, তাহলেই তার সমস্ত শক্তি-সাহস ধুলোয় মিলিয়ে যাবে।"

ইজ্রেলাইট্ নর-নারী মহাখুশী! তাদের স্যামসন্ আছে, তারা কি এখন আর ফিলিষ্টাইন্‌দের ভয় পায়?

স্যাম্সনের বয়স বেড়ে চলে, সে হলো যুবক স্যাম্সন্! সে নিজেও জানে যে, ফিলিষ্টাইন্দের হাত থেকে তার স্বজাতিকে মুক্ত করবার জন্যই তার জন্ম। আর এ কথাও সে জানে, দেবতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে সে জন্মেছে, শক্তি-সাহসে পৃথিবীতে কেউ তার জুড়ি নেই!

স্যাম্সন্ তার উদ্দাম খেয়ালে বুনো হাতীর মত এখানে সেখানে অত্যাচার করে বেড়ায়। ভাবলো না সে একবারও, খেয়ালী ও অসংযত ব্যক্তি কখনো চিরকাল দেবতার আশীর্ব্বাদ ভোগ করতে পারে না! নিজের পতন একদিন সে নিজেই তার কাছে ডেকে নেয়।

স্যাম্সন্ ভুল করলো ভালো করেই—

জন্ম তার ফিলিষ্টাইন্দের হাত থেকে তার স্বজাতিকে বাঁচাবার জন্য! সে হিসাবে ফিলিষ্টাইন্রা তার শত্রু! কিন্তু অসংযত স্যাম্সন্ সেই শত্রু-শ্রেণীর একটা মেয়েকেই ভালোবেসে ফেললো। মেয়েটির নাম ডেলাইলা!

ডেলাইলার কুহকে পড়ে সে বুঝি ভুলে গেলো সব-কিছু, ভুলে গেলো তার করণীয় কাজ! হিতাহিত-জ্ঞানও সে হারিয়ে ফেললো।

ডেলাইলা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করে, "আমি বুঝতে পারি না স্যাম্সন্, এত শক্তি তুমি পেলে কেমন করে! দিনকে দিন, তুমি যে ক্রমশঃই বেশী বলশালী হয়ে উঠছ!"

স্যামসন্ ভুলে গেলো, প্রশ্ন যে করছে সে তো শুধু ফিলিষ্টাইনী মেয়ে নয়, সে যে শত্রুদেরই একজন! ডেলাইলাকে সে যতই ভালোবাসুক, জাতি হিসাবে সেও যে তার শত্রু, স্যাম্সন্ তা ভুলে গেলো।

কাজেই মৃদু হেসে স্যাম্সন্ জবাব দেয়, "ডেলাইলা, তুমি প্রশ্ন করেছ সুন্দর! কিন্তু সে অতি গোপন কথা। একমাত্র তোমাকেই আমি সে গোপন খবর দিতে পারি।

আমার মাথায় এই যে এমন ঝাঁকড়া চুল দেখছ, এই চুলগুলিই হলো আমার শক্তির মূল; চুল যত বড় হবে, আমার শক্তিও ততই বাড়বে ডেলাইলা! কিন্তু কেউ যদি একবার তা কেটে ফেলে দেয়, তবেই হবে আমার সর্ব্বনাশ! আমার সমস্ত বল তাহলে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যাবে!"

ডেলাইলা নীরবে শুনে যায় স্যামসনের কথা। তার অতুলন সুন্দর মুখে ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে! তার বুকের মধ্যে ফিলিষ্টাইনী বিদ্বেষের সাপ কিল্বিল্ করে মাথা চাড়া দেয়!

ঘুমিয়ে পড়েছিল স্যাম্সন্। কি একটা দুঃস্বপ্নে জেগে ওঠে সে। তার কানের কাছে বেজে ওঠে একঘেঁয়ে আওয়াজ—"ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্!"

ডেলাইলা দ্রুত কাঁচি চালিয়ে তার মাথার চুল প্রায় নির্ম্মূল করে ফেলেছে! আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে কতকগুলো ফিলিষ্টাইন্ যুবক ঝাঁপিয়ে পড়লো স্যাম্সনের কাঁধে!

ডেলাইলার ইঙ্গিতে পেতলের তার দিয়ে তারা স্যাম্সন্কে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো! অমিত বলশালী স্যাম্সন্—তার চুল কেটে ফেলায়—দুর্ব্বল শিশুর মত অসহায় ভাবে বাঁধা পড়লো! দেবতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যে এসেছিল, সংযমের অভাবে মুহূর্ত্তে সে পৃথিবীর আবর্জ্জনায় পরিণত হলো।

এর পর স্যাম্সনের যে ইতিহাস, সে ইতিহাস পাষাণ-গলা চোখের জলে তৈরী! স্যাম্সনের চোখ

উপড়ে ফেলে, তাকে অন্ধ তৈরী করে, ফিলিষ্টাইন্‌রা তাকে কারাগারে আটকে রাখলো। আর সেইখানে দিনের পর দিন যাঁতাকলের হাতল ঘুরিয়ে অন্ধ স্যাম্‌সন্ ধান-গম পেষাই করে তার অসংযমের প্রায়শ্চিত্ত করতো।

অবশ্যি, প্রতিশোধ সে নিয়েছিল একদিন। কিন্তু সেই হলো তার নিজেরও শেষ।

এক সুন্দর প্রাসাদে ফিলিষ্টাইন্‌দের এক জাতীয় উৎসব। কত খানাপিনা, নাচগান। তারি মাঝে অন্ধ স্যাম্‌সন্‌কে নিয়ে আসা হলো, কোমরে শেকল এঁটে। প্রকাশ্য সভায়, অসহায় স্যাম্‌সন্‌কে নিয়ে সবাই একটু রঙ্গরস করবে, করবে তাকে বিদ্রূপ ও নির্য্যাতন—এই হলো সকলের মৎলব! ডেলাইলা নিজেও বুঝি তাতে যোগদান করেছিল পরম কৌতুকে!

দিনের পর দিন যাঁতাকলের হাতল ঘুরিয়ে অন্ধ স্যাম্‌সন্...
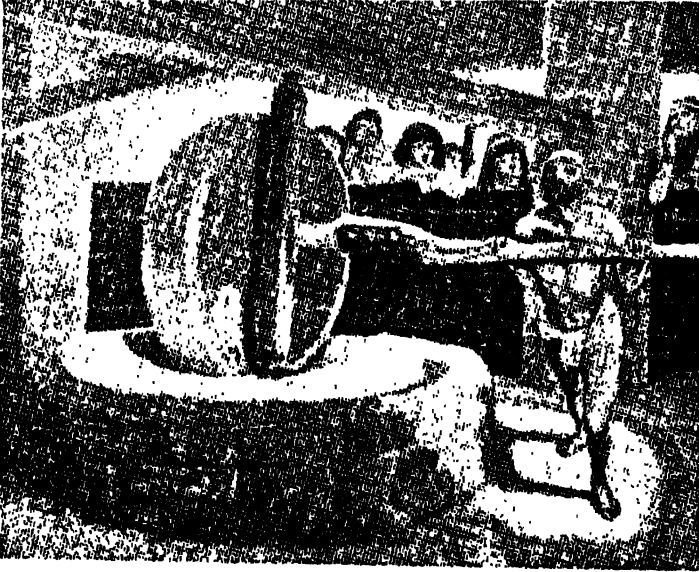
স্যাম্‌সনের লাঞ্ছনা উপভোগ করবার জন্য সমস্ত ফিলিষ্টাইন্‌রা দলে দলে সেদিন সেই উৎসবে উপস্থিত। সুবিশাল হল্‌ঘরে সকলেই সমবেত।

অন্ধ স্যাম্‌সন্ হাতড়ে হাতড়ে হল্‌ঘরের একটি স্তম্ভ ধরে দাঁড়ায়, তার ক্লান্ত দেহখানিকে সে তারি ওপর হেলান দিয়ে রেখে একটু জিরিয়ে নিতে চায়!

চারদিক হতে ফিলিষ্টাইন্‌দের ঘৃণা ও সেই উপহাসের কথা স্যাম্‌সনের কানে ভেসে আসে, তার দেহে এসে লাগে কত ঢিল ও থুতু! চরম অপমান তার সুরু হয়ে গেছে!

স্যাম্‌সনের বুঝি কোন অনুভূতি নেই। কিন্তু একটা ক্ষুদ্র অনুভূতি তার মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। তার মনে হয়, দীর্ঘ কারাবাসে, তার মাথার চুল যেন আবার বড় হয়েছে। মনে হলো তার, কাঁচির ছোঁয়ায় ডেলাইলা তার মাথার যে অবস্থা করেছিল, ধীরে ধীরে এতদিনে তার পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেকটা! নিজের গোপন বুকে অনুভব করলো সে, চুল তার বড় হয়েছে!

তবে? তাহলে? তাহলে কাকে আর ভয়? চুলই যে তার শক্তির উৎস। সে উৎসের অভাব হয়েছিল,

তার সাথে এসেছিল অসংযম। কাজেই শক্তির বেদীমূল হতে সে অপসারিত হয়েছিল। কিন্তু আজ সে ফিরে পেয়েছে তার হারানো উৎস, আর সাথে আছে অনুতাপ। কাজেই অন্ধ স্যাম্‌সনের আজই হবে পুনর্জ্জন্ম!

হল্‌ঘরের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ সে তার দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। তারপর প্রচণ্ড বলে সহসা করলো সে আকর্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠলো—প্রলয়-রবে ধ্বসে পড়লো সুবিশাল হল্‌ঘরের মেরু-মজ্জা সব-কিছু!

অন্ধ স্যাম্‌সন্ সেদিন এম্‌নি ভাবেই তার প্রতিশোধ নিয়েছিল! অত্যাচারী ফিলিষ্টাইন্‌রা ধ্বংস হয়ে গেল—ধ্বংস হলো স্যাম্‌সন্ নিজেও।

অতীতের সেই স্যাম্‌সন্ আজও পৃথিবীর বুক হতে চিরতরে মিলিয়ে যায়নি! সারা দেশের ঘরে ঘরে আজও কত স্যাম্‌স্ন উঁকি দিয়ে ফিরে যায়!

নবজাত শিশু তার দেবতার আশীর্ব্বাদ নিয়েই তো পৃথিবীতে আসে! শক্তির উৎস তার কোন্‌খানে, সেও তার অজানা থাকে না তো! জন্মের পর—সবাই তারা শোনে, তাদের অভিভাবক যাঁরা তাঁরাও জানেন যে, ব্যায়াম ও পরিমিত ব্যবহারই তাদের শক্তির উৎস!

তবু অলস জীবন-যাত্রা ও কুড়েমি যেন কুহকিনী ডেলাইলার মত তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়, আর তারি সঙ্গে এসে যায় কত অসংযম! ফলে, কৃত বাঙালী সন্তান—পরিপূর্ণ স্যাম্‌সন্ যারা হতে পারতো, তারা শুধু অন্ধ স্যাম্‌সনের মত কারাজীবন ভোগ করে চলে যায়!

হাসি, আনন্দ, চাঞ্চল্য—এই নিয়েই তো শিশুর জীবন-যাত্রা! ছোটখাট কত জিনিষ, সামান্য একটু খাবার, এতেই তারা কত খুশী!দেবতার আশীর্ব্বাদ তখন তাদের চোখে-মুখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!

হাসি, আনন্দ, চাঞ্চল্য—এই নিয়েই তো শিশুর জীবন-যাত্রা।

তারপর শৈশবের সেই চাঞ্চল্য ও শ্রমে অনাসক্তি যারা অক্ষুণ্ণ রেখে, নিয়মিত ব্যায়াম করে এগিয়ে যেতে পারে, পৃথিবীতে তারাই পায় বিজয়ীর বরমাল্য। হাসিমুখে বাহুবলে পৃথিবী জয় করবার সাহস কেবল তাদেরই বুকে সম্ভব হতে পারে।

অতুলন শক্তিশালী হয়েও স্যাম্‌সন্‌, কুহকিনী ডেলাইলার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, বিকিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। তাই না কারাগারের অন্ধ জীবন হয়েছিল তার ভাগ্যের পুরস্কার। আজ বাঙালী ছেলেমেয়েদের যখন দেখা যায় যে, তাদের অধিকাংশই এখন অতিরিক্ত নিদ্রা ও অলস জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, তখন কি সেই স্যাম্‌সন্‌ ও ডেলাইলার কাহিনী মনে করিয়ে দেয় না?

আফ্রিকার দুর্জ্জয় সিংহ, আর তারই মাঝখানে যৌবনের প্রতিমূর্ত্তি।—এ যেন আধুনিক জগতের স্যাম্‌সন্‌।

বাঙালী ছেলেমেয়েদের আজ আবার নতুন করে ভাবতে হবে, কোথায় তাদের শক্তির উৎস। ব্যায়াম ও সংযমকে আজ আবার নতুন করে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। অলস জীবন-যাত্রা আজও যে মূর্ত্তিমতী ডেলাইলার মত তাদের বিপথে পরিচালিত করতে চায়, একথা আজ আবার তাদের ভাবতে হবে নতুন করে।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য জগৎ অনেকটা বেশী সচেতন। পরিশ্রম ও ব্যায়াম তাদের জীবন-যাত্রার পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে তাদের উন্নতি ও সুগঠিত দেহ আজ অনেকেরই ঈর্ষ্যার বস্তু।

তারা জানে, সংসারের প্রতিটি স্তরে কত ডেলাইলার কুহক ছড়ানো রয়েছে। কত শত্রু যে প্রচ্ছন্ন মিত্রের মত ভালবাসায় আবদ্ধ বলে বন্ধুর অভিনয় করে যায়, এ জিনিষও তারা অনেকেই ভুলে যায় না। আর ভুলে যায় না বলেই বলিষ্ঠ তরুণ কখনো আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেয় না।

ব্যায়ামে ও সংযমের মধ্যেই শক্তির উৎস, পাশ্চাত্ত্য তরুণগণ, এ সত্য জানে বলেই তারা আজ শক্তি-সাধনায় প্রাচ্য বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। তাদের শক্তি অসাধারণ, সাহস অপরিমিত, মনোবল অটুট। মানুষের চিরশত্রু বাঘ-সিংহও আজ তাদের অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বস্তু! আফ্রিকার দুর্জ্জয় সিংহ, আর তারই মাঝখানে যৌবনের প্রতিমূর্ত্তি, এমন দৃপ্ত ছবি আজ অনেক পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য দেশেই সম্ভব!

এমন গৌরবময় চিত্র কি আধুনিক জগতে স্যামসনের চিত্র নয়? তবে পার্থক্য এইখানে যে, ফিলিষ্টাইন্‌ সুন্দরী ডেলাইলার কাছে স্যাম্‌সন্‌ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু এখানে, মূর্ত্তিমান যৌবন তার

সিংহকে ভালবাসলেও তার কাছে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেনি! কারণ, জাত হিসাবে ফিলিস্টাইন্ যেমন ইস্রেলাইট্‌দের শত্রু, সিংহও তেমনি মানুষের শত্রুরূপেই সুপরিচিত। কাজেই পরস্পর যত ভালবাসাই থাক্ না কেন, তবু আত্মসমর্পণ করা চলে না!

পাশ্চাত্ত্য জগতে মেয়েরাও এখন জানে শক্তির উৎস কোথায়? তাই গৃহকোণে শুধু সাংসারিক কাজেই তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলে না! খেলাধূলায়, শিকারে, সাঁতারে—সর্ব্বত্রই তারা আজ শক্তি-সাধনায় ব্যস্ত।

বাঙালী মেয়ে যখন বুকজলে দাঁড়িয়ে, পায়ে শাড়ী জড়িয়ে হাবুডুবু খায়, তখন অপর দেশে তাদেরই সমবয়সী মেয়েরা দুস্তর ইংলিশ-চ্যানেল সাঁতার কেটে পার হয়ে যায়!

বলা বাহুল্য, মাত্র দু'এক দিনের সাধনায় কেউ কখনো এত সাহসের অধিকারিণী হতে পারে না। না জানি, মাসের পর মাস, কত দিন অবিরত এজন্য তাদের চেষ্টা করতে হয়েছে!

বাঙালী মেয়েরা দূরের কথা, ছেলেরাও এখন অনেকেই সাঁতার কাটা ভুলে গেছে! দিন-কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে অনেকেই এখন শহরের অধিবাসী। কাজেই গ্রাম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী-নালা, পুকুর-দীঘি তাদের কাছে এখন হয়ে গেছে অদৃশ্য! তাদের কাছে কলের জল, টিউবওয়েল ও পাতকুয়া গজিয়ে উঠেছে ঝুড়ি ঝুড়ি অসংখ্য!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাগর-জলে রইবে বলে মেয়ে-সাঁতারু হাসিমুখে দেহে তার পুরু করে চর্ব্বি মাখিয়ে নেয়!

এদেশের ছেলেমেয়েরা যখন শীতের ভয়ে শিউরে কুঁকড়ে বসে থাকে জলের ধারে, ওদেশে তখন মেয়ে-সাঁতারু ইংলিশ-চ্যানেল পার হবার আয়োজন করে হাসিমুখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাগর-জলে রইবে বলে, হাসিমুখে দেহে তার পুরু করে চর্ব্বি মাখিয়ে নেয়!

মোট কথা, এদেশের ছেলেরা যেটুকু জানে না, ও দেশের মেয়েরাও জানে তার চেয়ে অনেক বেশী। তারা জানে যে, শত্রুর আক্রমণ হতে নিজেকে বাঁচাতে হলেও চাই নিজের শক্তি-সাহস। কাজেই লেখাপড়া

ও ঘর-সংসারী কাজের মত তারাও অনেকেই আত্মরক্ষার উপায়টুকু শিখে নিতে চায়! আর সেইজন্য আজ জাপানী কুস্তি 'যুযুৎসু' তাদের কাছে এত বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছে!

কুমারী ব্রেণ্ডা দেখতে পেলো, এক গুণ্ডা ছেলে—পার্সি ব্রাউন—তার অনুসরণ করছে। ভয় না পেয়ে সে তখনই তার কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেললো।

গুণ্ডা ছেলে পার্সি ব্রাউন ভেবেছিল, কুমারী ব্রেণ্ডা এখন অসহায়। তাই সে রাহাজানির মৎলবে তাকে টানতে সুরু করে। কিন্তু—

এদেশের মত ওদেশের মেয়েদেরও কত সময় বনপথে যেতে হয়। সতেরো আঠারো বছরের এমনি এক মেয়ে, নাম তার ব্রেণ্ডা। বনপথে যেতে যেতে দেখলো সে একদিন, পার্সি তাকে অনুসরণ করছে।

পার্সি ব্রাউন তাদেরই এক প্রতিবেশীর ছেলে, গুণ্ডামি ও রাহাজানির জন্য সে বিখ্যাত। হঠাৎ সে এগিয়ে এসে ব্রেণ্ডার বাহু ধরে দিলে এক টান! কিন্তু পার্সি জানতো না যে, অতটুকু মেয়ে ব্রেণ্ডা, 'যুযুৎসুর' প্যাঁচে সে ওস্তাদ!

ব্রেণ্ডা করলো মাটিতে পড়ে যাওয়ার ভান। তারপর হঠাৎ সে পার্সির পেটে পা লাগিয়ে তাকে এমন ডিগ্‌বাজি খাইয়ে দিল যে, বেচারার দম প্রায় বন্ধ!

কিন্তু পার্সি আবার উঠে দাঁড়ালো আর চোখের নিমেষে ছুটে এলো সে ব্রেণ্ডার দিকে। ব্রেণ্ডাকে এবার সে মেরেই ফেলবে নির্ঘাৎ! বেচারার মাথায় যে চোট লেগেছে, তখনো সে তা ভুলতে পারেনি!

ব্রেণ্ডার তুলনায় পার্সি ঢের বেশী শক্তিশালী, দেহের ওজনও তার অনেক বেশী।

কাজেই পার্সির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ব্রেণ্ডাকে সে এবার শিখিয়ে দিবে ভালো করেই। কিন্তু ব্রেণ্ডা চট্ করে তার পায়ে পা লাগিয়ে করলে তাকে ভূমিসাৎ!

পার্সি তো স্তব্ধ হতভম্ব। তবু এবার তাকে কিছুমাত্র সময় না দিয়ে ব্রেণ্ডা তড়াক্ করে তার দিকে এগিয়ে গেলো, ও তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো, "কি গো মশাই! সখ তোমার মিট্‌লো?"

বলে হঠাৎ সে তার ডান হাতখানি প্রসারিত করে, তার হাতের চেটোকেই করলে তরোয়ালের মত

ব্যবহার। ঘচাং করে সে তার ডান হাতে পার্সির গলদেশে করলো প্রচণ্ড আঘাত।
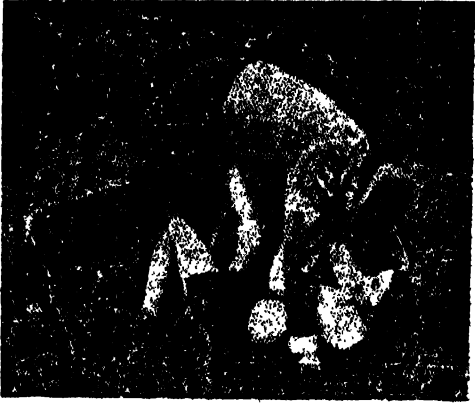
কুমারী ব্রেণ্ডা মাটিতে পড়ে গেছে। কিন্তু এ যে তার পড়ে যাওয়ার ভান মাত্র, গুণ্ডা পার্সি তা বুঝলো—

—যখন সে উল্টে গেলো ডিগ্‌বাজি খেয়ে। অমন একটা দৈত্যকে সে কুপোকাৎ করলে শুধু যুযুৎসুর দৌলতে!

সঙ্গে সঙ্গে অতবড় ষণ্ডা জোয়ান সেই পার্সি ব্রাউন ষাঁড়ের মত আর্ত্তনাদ করে উঠলো, তার উঠবার ক্ষমতা আর রইলো না একেবারেই!

বটে! আবারও উঠে আসে গুণ্ডা পার্সি! ব্রেণ্ডা চট্ করে তার পায়ে পা লাগিয়ে দিলে এক প্যাঁচ্ কসে!

পার্সি এবার সশব্দে ভূমিসাৎ। "কিগো মশাই! সখ তোমার মিট্‌লো?" কুমারী ব্রেণ্ডার বিদ্রূপ।

বিজয়িনী ব্রেণ্ডা যুযুৎসুর দৌলতে শুধু আত্মরক্ষাই করলো না, শত্রুকে চরম আঘাত করে, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলে গেলো।

যুযুৎসুর অপর এক কৌশল! তার ফলে ষাঁড়ের মত আর্ত্তনাদ করে উঠলো গুণ্ডা পার্সি!

বাঙালী মেয়েদেরও বিপদের অভাব নেই। তাদের আশে-পাশে কোথায় যে কোন্ বিপদ্ মূর্ত্তিমান্ পার্সির মত লুকিয়ে আছে, কে জানে? কিন্তু বাংলার নারী-মহলে আজ ব্রেণ্ডা কই?

যে শক্তি-সাধনার ফলে ওদেশের মেয়ে ব্রেণ্ডা এমন অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিল, বাঙালী আজ যদি সেই শক্তি-সাধনাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এদেশের মেয়েরাও হবে ব্রেণ্ডায় রূপান্তরিত, আর ছেলেরা হবে স্যাম্‌সন্! শুধু শক্তি-সাধনা ও সংযম যদি একবার বাংলার তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়, তাহলে বাঙালী তরুণ-সমাজে যে পরিবর্ত্তন এসে যাবে, তাকে নিঃসংশয়ে বলা যাবে 'বাংলার রূপান্তর'।

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রেরা পিল পিল ক'রে বেরিয়ে গেল ইস্কুল থেকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোটা ইস্কুল-বাড়ীটা শূন্য হয়ে গেল, খাঁ-খাঁ করে একটা শূন্যতা। শিক্ষকেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ হেডমাষ্টার চন্দ্রভূষণবাবু।

ছ' ফুট লম্বা শীর্ণদেহ সোজা মানুষ, চোখে স্থির পলকহীন দৃষ্টি; বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত দীর্ঘ মিছিলে সারিবন্দী সাড়ে তিন শো ছেলের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাঁচ বছরের শিশু থেকে ষোল-সতের বছরের ছেলের দল। চীৎকার করছে, আমাদের দাবী—

—মানতে হবে।

চন্দ্রভূষণবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। নিজের কানে শোনা ওই শব্দগুলির অর্থ যেন তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

ছেলের দল কম্পাউণ্ড থেকে বের হয়ে রাস্তা ধরে চলে গেল। হেডমাষ্টার মশায় সিঁড়ির মাথা থেকে ফিরলেন। ছ'ফুট মানুষটির পদক্ষেপ স্বাভাবিক ভাবেই চিরকালই দীর্ঘ। একটু সামনে ঝুঁকে লম্বা পা ফেলেই তিনি হাঁটেন। বারান্দার কোলেই ইস্কুলের হল। সারিবন্দী চারটি চারফুট বাই আট ফুট দরজা; একটা দরজার মুখে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মাষ্টার মশায়দের দেখতে পেলেন। চৌদ্দ জন মাষ্টারদের মধ্যে চার জন ছাড়া সকলেই তাঁর ছাত্র। হেডপণ্ডিত কিশোরীমোহন কাব্য-বেদান্ততীর্থ তাঁর থেকে বয়সে বৎসর দুয়েকের বড়, মৌলবী সাহেব জনাব জিয়াউদ্দিন খান তাঁর সমবয়সী; আর দুজন বিদেশ থেকে এসেছেন; বয়সে তরুণ তাঁরা, তাঁর ছাত্র নন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু

থেমে গেলেন, ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল; তিনি মুখ ঘুরিয়ে আবার অগ্রসর হলেন। হলের মধ্যে ঢুকলেন।

বিস্তীর্ণ হল। চারটি চারফুট দরজায় ষোল ফুট এবং ছটি দরজার মধ্যে পাঁচটি ও দু' পাশে দুটি ছ' ফুট দেওয়ালে বিয়াল্লিশ ফুট মোট আটান্ন ফুট লম্বা-চওড়া আঠাশ ফুট হলে পাশাপাশি তিনটে ক্লাস শূন্য পড়ে রয়েছে, খাঁ খাঁ করছে। ওপাশের দেওয়ালে মার্ব্বেল ট্যাবলেট গাঁথা রয়েছে। দরজার মাথায় মাথায় ছবি টাঙানো রয়েছে। পশ্চিম দিকের চওড়া দেওয়ালটার মাঝখানে ক্লকটা চলছে—ঘরখানা এমনি স্তব্ধ যে ক্লকটার পেণ্ডুলাম চলার শব্দটাই একমাত্র শব্দ হয়ে উঠেছে; অবিরাম শব্দ উঠছে টক্ টক্, টক্ টক্, টক্ টক্। কতদিন ছুটির পর এমনই শূন্য স্তব্ধ হলের মধ্য দিয়ে তিনি হেঁটে চলে গেছেন—কত ছুটির দিন প্রয়োজনে এসে তিনি এই হল দিয়েই লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকেছেন কিন্তু কোন দিন এমন স্পষ্টভাবে তিনি ঘড়ি চলার শব্দ শুনতে পান নি। তিনি থমকে দাঁড়ালেন; মনে পড়ে গেল আর একদিনের কথা। তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু-দিনের কথা। উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল—ষোল বছর আগে তাঁর চব্বিশ বছরের ছেলে ব্রজকিশোর যেদিন মারা গিয়েছিল সেই দিনের কথা। ব্রজকিশোরের শেষকৃত্য সেরে বাড়ীতে ফিরে ব্রজকিশোরের ঘরে ঢুকেছিলেন; বাড়ীতে তিনি একা; দশবছরের ব্রজকিশোরকে রেখে তার মা মারা গিয়েছিল, কাঁদবারও কেউ ছিল না। ব্রজকিশোরের ঘরখানায় তার জিনিসপত্র যেমন সাজানো তেমনিই ছিল; টেবিলের উপর সেদিন ব্রজর টাইমপিস্‌টা ঠিক এমনি ভাবে শব্দ করেছিল। না; শব্দ ঘড়িটা বরাবরই করত, কতদিন ব্রজর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে ঢুকে বই এনেছেন, বই রেখে এসেছেন, এই তো অসুখের সময়েও তিনি বসে থেকেছেন ব্রজর পাশে—ঘড়িটা ঠিক এইভাবেই শব্দ করে চলেছে, শব্দ করাই ওর ধর্ম্ম; কিন্তু শব্দটা কানে ঠেকত না; সেদিন ঠেকেছিল; এই আজকের মতই ঠেকেছিল। অথবা সেদিনের মতই ঠেকছে আজকের শব্দটা।

কাছে এসে দাঁড়ালেন হেডপণ্ডিত মশায়। চলুন আপিসে চলুন মাষ্টার—। মশাইটা আর মুখ থেকে বের হ'ল না তাঁর। চন্দ্রভূষণবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন। চন্দ্রভূষণবাবুর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

তাঁর জীবনের তপস্যার সকল পুণ্য ইস্কুলকে দিয়েছেন তিনি। তার অকাল-মৃত্যু হবে না। মনে মনে ভাবতেন, ব্রজকিশোরের বিয়ের সময় একটি মনোহর উৎসব করবার গোপন অভিপ্রায় তাঁর মেটেনি, নবগ্রাম ইস্কুলের জয়ন্তী উপলক্ষে সে সাধ মেটাবেন তিনি।

অনেক বাঁশী অনেক কাঁসী অনেক আয়োজন তিনি করবেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর সকল কল্পনা বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। ছেলেরা ধর্ম্মঘট করে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে চলে গেল; বলে গেল—তাঁকে তারা মানে না, বলে গেল—তিনি অত্যাচারী, বলে গেল—তাঁর ধর্ম্মকে তারা চায় না।

তারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছে। তারা জানিয়ে দিয়ে গেল—তাদের ধর্ম্মকে না মানলে তারা তাঁকে পরিত্যাগ করবে।

হেডমণ্ডিত মশায় ডাকলেন কেষ্টকে। কেষ্ট, অরে অ কেষ্ট।

সতেরোর কাছাকাছি বয়স কেষ্টর। ইস্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে সে আপিস-ঘরের দরজার পাশে টুলে বসে ঘুমোয়। বসে বসে ঘুমানো কেষ্টর অভ্যেস হয়ে গেছে। আজ সে পার্সী ক্লাসের জানালার গরাদ ধরে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল; এটা কি হ'ল? এ কি কাণ্ড? হে ভগবান! চন্দ্র মাষ্টারের সামনে দিয়ে তার হুকুম ডোণ্টোকেয়ার করে ছেলেগুলো চলে গেল?

হেডপণ্ডিতের ডাক শুনে সে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি পার্সী ক্লাস থেকে বেরিয়ে হলে এসে দাঁড়াল।—আজ্ঞে!

পণ্ডিত মশায় বললেন—হলের দরজাগুলো বন্ধ কর বাবা!

এতক্ষণ পর্য্যন্ত চন্দ্রভূষণবাবু নির্ব্বাক হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন—শুধু মৃদুস্বরে পণ্ডিতমশাইকে একবার বলেছিলেন—ব্রজকিশোরের মৃত্যুদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল পণ্ডিত মশায়। ওই ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ শুনে। সকরুণ মৃদু কণ্ঠস্বর। সে কথাগুলি কোন ধ্বনি তোলেনি, ঘড়িটার পেণ্ডুলামের শব্দ একটুও ঢাকা পড়েনি; পণ্ডিত মশায় ছাড়া আর কেউ শুনতেও পায় নি।

এবার হলের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি বলে উঠলেন—না।

হলখানা গম্ গম্ করে উঠল। না—। ঘড়ির শব্দ আর শোনা গেল না। সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত হলখানার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত নিস্তব্ধতার জালখানা অকস্মাৎ যেন দু'টুকরো হয়ে কেটে গুটিয়ে গেল।

চন্দ্রভূষণবাবু বললেন—না। ইস্কুল খোলা থাকবে। ইস্কুল চলবে। আপনারা যে যার ক্লাসে গিয়ে বসুন। কেষ্ট—যেমন তুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিয়ে থাকিস—দিয়ে যাবি! ইস্কুল চলবে।

অন্য মাষ্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা ক্লাসে যান। [পৃষ্ঠা ৩২০

এগিয়ে এলেন--সেকেণ্ড মাষ্টার—বললেন—কিছু মনে করবেন না মাষ্টার মশাই, একটা কথা বলব।

—বলুন।

—আপনি ইনষ্টিটিউশনের হেড, আপনার কথা আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু তাতে ফল কি হবে? সারাটা দিন শূন্য ক্লাসে বসে না হয় আমরা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম কি বই পড়েই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু সেটা হাস্যকর হবে না দেখতে?

চন্দ্রভূষণবাবু তার দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। গৌরবর্ণ তরুণ, দীপ্ত চোখ, মাথার চুলগুলি রুখু, ধারালো নাক, ঠোঁটের রেখায় রেখায় কি যেন একটা চাপা অভিপ্রায় অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে, প্রশস্ত কপালের ঠিক মাঝখানে দুটি ভুরুর মধ্যস্থলে একটি সূক্ষ্ম কুঞ্চন দেখে মনে হয়, সে অভিপ্রায় ক্ষুব্ধ, সে অভিপ্রায় অপ্রসন্ন, সে সংকল্প রূঢ়।

চন্দ্রভূষণবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি আমার সঙ্গে আপিসে আসুন সীতেশবাবু। আপনারা—। অন্য মাষ্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা ক্লাসে যান।

বলেই অভ্যাসমত দীর্ঘ পদক্ষেপে তিনি এসে আপিস ঘরে ঢুকলেন। তাঁর নিজের চেয়ারের সামনের চেয়ারখানি দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

সীতেশবাবু হেসে বললেন—আপনি আমাকে সন্দেহ করেছেন? এ ধর্ম্মঘটে আমি উৎসাহ দিয়েছি। কথা শেষ করে তিনি আবারও একটু হাসলেন।

চন্দ্রভূষণবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সন্দেহ নয় সীতেশবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই। এ ধর্ম্মঘট আপনি করিয়েছেন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সীতেশবাবু। তারপর বললেন—হ্যাঁ করিয়েছি। অবশ্য একা আমি নই। আপনার প্রাক্তন ছাত্র এখানকার মাননীয় ব্যক্তিও আছেন।

—তাও জানি। কিন্তু ছেলেদের নিয়ে যে খেলা খেলছেন—তাতে তাদের ক্ষতির কথা ভেবে দেখেছেন?

—খেলার কথা নয় মাষ্টারমশাই। খেলা আমরা করিনি। খেলা করেছেন আপনি। আপনিই তাদের খেলনা ভেবেছেন। কিন্তু তারা তা নয়।

—খেলনা তাদের আমি কখনও মনে করিনি সীতেশবাবু। তারা দেশের ভবিষ্যৎ, তারা আমার কাছে সবাই ব্রজকিশোর। তাদের মানুষ, সত্যকারের মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই। আজ ঊনপঞ্চাশ বছর ইস্কুল হয়েছে। প্রথম এ ইস্কুল যখন গড়ে তোলা হয় তখন মাধববাবুর কাছে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বসে থেকেছি। তাঁকে টাকা খরচ করতে রাজী করিয়েছি। এখানকার সমাজপতিদের দোরে দোরে ঘুরেছি। মাটির ঘর তুলে ইস্কুল হল প্রথম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটিয়েছি। এ ইস্কুল আমার হাতের গড়া। এখানকার ষাটের নিচে যাদের বয়স—তারা আমার ছাত্র। তাদের জিজ্ঞাসা করে আসুন, তারা বলবে— আমার কাছে তারা সন্তান ছিল, খেলনা ছিল না। কোন দিন ভাবিনি। আজও ভাবিনে।

—তা হলে সেকালের ছেলেরা সত্যিই খেলনার মত নির্জ্জীব ছিল। তাই তাদের নাড়াচাড়া করে ছেলেদের খেলনা ভাবা আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে মাষ্টার মশাই। আজকাল কাঠের পুতুলেরা কালধর্ম্মে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠেছে। আপনার অভ্যস্ত ধরণের নাড়াচাড়া তারা সহ্য করতে পারছে না। তাদের একটা নতুন জাগরণ হয়েছে—তারা নতুন পথে চল্‌তে চাচ্ছে—তাদের আপনি খোঁয়াড়ে আবদ্ধ

ডাকের মূল্য

পশ্চাৎ হতে সন্ন্যাসী আসি চাহি তাঁর মুখ পানে —

জানোয়ারের মত আটকাতে চাইলে থাকবে কেন?

—সেটা আপনি আসবার পর থেকেই হয়েছে সীতেশবাবু! আপনি জাগিয়েছেন তাদের।

হেসে সীতেশবাবু বললেন—আপনি আমাকে যে কম্‌প্লিমেণ্ট দিলেন—সে আমার চিরদিন মনে থাকবে মাষ্টারমশাই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—কিন্তু 'ঈশ্বর না-মানা' এ জাগরণ না উন্মত্ততা? এ শিক্ষা কি আপনি দেননি?

—না।

—আমার বিশ্বাস ছিল আপনি সত্য বলতে ভয় পাবেন না।

—আমি অসত্য বলিনি।

—আপনি এসে যে ময়দান ক্লাব করেছেন—মাঠে যে ছেলেদের নিয়ে জটলা করেন, সেখানে কি নিয়মিত এই বক্তৃতা দেননি?

—দিয়েছি। কিন্তু সে ইস্কুলের বাইরে। ইস্কুলে আমি এ শিক্ষা কোন দিন দিইনি।

—আমরা কিন্তু ইস্কুলের ভিতরে এক শিক্ষা বাইরে এক শিক্ষা কখনও দিইনি সীতেশবাবু।

—সত্য শিক্ষা যখন ইস্কুলে দেওয়া নিষিদ্ধ হয় মাষ্টার মশাই, দেওয়ার যখন উপায় থাকে না—তখন ইস্কুলের ভিতরে মিথ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত এ ভাবে ছাড়া করার উপায় কি? আমি অন্যায় করিনি।

—সত্য বাদ দিয়ে সত্য শিক্ষা? হাসলেন চন্দ্রভূষণবাবু।—ঈশ্বর বাদ দিয়ে সত্য?

—আপনার সঙ্গে তর্ক করব না মাষ্টার মশাই। ছেলেদের দাবী আপনি মেনে নিন। নইলে এ ষ্ট্রাইক মিটবে না।

—রিলিজিয়াস ক্লাস—স্তোত্রপাঠ এ আমি উঠিয়ে দেব না। নেভার!

—অপশোনাল করে দিন।

—না। তাও দেব না। তাতে ইস্কুল উঠে যায়—উঠে যাক।

—তা হলে হয়তো শেষ পর্য্যন্ত—। হাসলেন সীতেশবাবু—হাসির ইঙ্গিতের মধ্যেই শেষ পর্য্যন্ত কি হবে সে কথাটা উহ্য রয়ে গেল।—আমি ক্লাসে যাচ্ছি। বলে হাসতে হাসতে সীতেশবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন।

* * *

হেডপণ্ডিত মশায়ের পায়ের শব্দে তিনি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। পণ্ডিতমশায় মৃদুস্বরে বললেন—কাঁদছেন আপনি? চোখের চশমাটা খুলে চোখ মুছে চন্দ্রভূষণবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—ব্রজকিশোরের মৃত্যু-দিনের কথাটা মনে পড়ে গেল পণ্ডিতমশায়। সন্ধ্যেবেলা তার ঘরে ঢুকেছিলাম—এমনি সাজানো ঘর-দোর—শুধু কেউ ছিল না, আর ওই ঘড়িটার মত সেদিনও টাইমপিসটা টিক্ টিক্ করে চলেছিল।

পণ্ডিতমশায় আবার বললেন—চলুন, আপিসে চলুন। বলেই তিনি ডাকলেন—কেষ্ট—ওরে, অ কেষ্ট!

কেষ্ট মণ্ডল ইস্কুলের পুরানো চাকর। হেডমাষ্টার হেডপণ্ডিত মৌলবীর সমসাময়িক। পণ্ডিতমশায় রসিকতা করে বলেন—যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যতদিন—কেষ্ট আমার ততদিন।

মৌলবী জিয়াউদ্দিন বলেন—ওরে বামনা—তা হলে বলছিস তুই চন্দ্র আর হেডমাষ্টার সূর্য্যি—আর আমিটা বুঝি কেউ নই? আমিও যে তোদের বয়সী রে বামনা।

পণ্ডিতও মৌলবীকে গাল দেন। বলেন—ওরে দেড়েল মামদো—বয়সে এক হলে কি হবে—তুই যে অনেক পরে এসেছিস। পারসী কেলাস পাঁচ বছর পরে হয়েছে। আমাদের সঙ্গে তোর সঙ্গ?

পণ্ডিত এবং মৌলবীতে এমনি গাঢ় প্রীতির রস মাখানো ঝগড়া চিরকাল চলে আসছে। টিফিনের সময় কল্কেতে ফুঁ দিত কেষ্ট, মৌলবী বলতেন—এই কেষ্ট, বামনাকে আগে দিবি না। উ টানলে আর কিছু থাকবে না!

পণ্ডিত হুঙ্কার দিতেন—খবরদার দাড়িয়াল মামদো! তুই তামাক খেতেই পাবিনে। তুই তামাক খাবি কি?

—কেন রে মাকুন্দা তিলক মার্কা বামনা—তামাক খাব না কেন?

—ওরে মুখ্যু তোকে তামাক খেতে নেই। বিচার করে দেখনা!

—শুনি তোর বিচারটা।

—শুনবি?

—বল।

—তুই মরে গোরে যাবি কি না?

—হাঁ যাব।

—আমি মরে চিতায় পুড়ব কিনা?

—পুড়বি। তোর চিতের আগুন নিভবে না বামনা। তোদের রাবণের মত। সে আমি বলে দিলাম।

"এই কেষ্ট, বামনাকে আগে দিবি না।"

—নিশ্চয়। হরদম তামাক সাজব আর খাব রে দেড়েল। আমাকে সেই জন্যেই তামাক খেতে আছে। তুই যাবি গোরে—কোথা পাবি আগুন? কি করে তামাক খাবি? খাসনে, বদ অভ্যেস করিসনে; মরবি, মামদো হয়ে পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে তোর।

কেষ্ট হাসত।

চন্দ্রভূষণবাবুই কেষ্টকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর গ্রামের লোক কেষ্ট। কেষ্ট মণ্ডল। স্কুল হয়েছে আজ উনপঞ্চাশ বৎসর। উনপঞ্চাশ বৎসর আগে চন্দ্রভূষণবাবু এসেছিলেন এখানে সেকেণ্ড মাষ্টার হয়ে। সঙ্গে এসেছিল কেষ্ট। কিশোরীমোহন কাব্যতীর্থ তখন শুধু কাব্যতীর্থ—হেড পণ্ডিত হয়েই এসেছিলেন। আগামী বৎসর ইস্কুলের পঞ্চাশ বৎসর—গোল্ডেন জুবিলী—সুবর্ণ জয়ন্তী; কিশোরীমোহন পণ্ডিত, কেষ্ট এবং মৌলবী জিয়াউদ্দিন সেই অপেক্ষাতেই আছেন; জয়ন্তীর সময়েই অবসর নেবেন। চন্দ্রভূষণবাবুও হেডমাষ্টারের পদ থেকে অবসর নেবেন কিন্তু আচার্য্য হয়ে থাকবেন; তাঁর জন্য নূতন পদের সৃষ্টি হবে। আগেকার আমল হলে আচার্য্য না বলে বলত সুপারিনটেণ্ডেন্ট। জয়ন্তীর আয়োজন চলছে। পুরানো ছাত্রদের ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লেখা হচ্ছে। উনপঞ্চাশ বছরে তো কম ছাত্র এ ইস্কুলে পড়েনি। অন্তত কয়েক হাজার। চাঁদা তোলা হচ্ছে। একটি সাধারণ সভা ডেকে জয়ন্তী কমিটি তৈরী হয়েছে, কয়েকটি সাব কমিটি গঠিত হয়েছে। অনেক আয়োজন।

চন্দ্রভূষণবাবুর প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। তাঁর কাব্য তখন তিনি পড়েননি, পড়েছেন পরবর্ত্তী জীবনে। এবং বৃদ্ধ বয়সেও সে কাব্য তিনি কণ্ঠস্থ করবার চেষ্টা করেছেন। জয়ন্তীর আয়োজনের প্রথম দিন থেকেই তাঁর মনে একটি লাইন গুণ গুণ করছে।

"অনেক বাঁশী অনেক কাঁসী অনেক আয়োজন।"

করতে হবে, করতে হবে; অনেক কষ্টে গড়ে তুলেছেন নবগ্রাম হাই ইংলিশ স্কুল—এখনকার নাম নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ। ব্রজকিশোর মারা গেছে, নবগ্রাম ইস্কুল বেঁচে আছে; নবগ্রাম ইস্কুল তাঁর আর এক সন্তান। যাক—তাই যদি উঠে যায়—তাই যাক।

ব্রজকিশোর মরে গেছে—নবগ্রাম বিদ্যাপীঠও উঠে যাক। সোত্তর বছর বয়সে তাও সইবে। কিন্তু রিলিজিয়াস ক্লাস আর স্তোত্র-পাঠের ব্যবস্থা তিনি তুলে দিতে পারবেন না। কখনও না। নিজের হাতে প্রাণপাত পরিশ্রমে তিনি এই স্কুল গড়ে তুলেছেন।

১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গের বৎসর। একুশ বছরের সদ্য ডিষ্টিংশনে বি-এ পাশ চন্দ্রভূষণবাবু সরকারী চাকরী খোঁজেননি—নবগ্রামে এসে ইস্কুল করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গড়ে তুলেছেন, উনপঞ্চাশ বৎসর তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—পরিপুষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। ইস্কুলের প্রথম দিন থেকেই ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্র-পাঠের ব্যবস্থা আছে।

গীতার বিশ্বরূপ স্তোত্র।

ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ—
স্তমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।

ইস্কুলে এখন সাড়ে তিনশো ছাত্র। একটা হলে সব ছেলেদের সঙ্কুলান হয় না, সেই জন্যে স্কুলের মাঠে ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়—মাষ্টাররা দাঁড়ান সামনে স্কুলের সিঁড়ির উপর; চারটি ছেলে এই

স্তোত্র গান করে—বাকী ছেলেরা তাদের পরে সমস্বরে সেই সুরে স্তোত্র গান করে যায়। চন্দ্রভূষণ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। সমস্ত দিনের জন্য মনের তারে সুর বেঁধে নেন। ১৯০৫ সালে ইস্কুলে কোন মুসলমান ছাত্র ছিল না। সাত সাল থেকে মুসলমান ছাত্র ভর্ত্তি হতে আরম্ভ হয়েছিল। তারা এতে কোন আপত্তি জানায়নি; তারা তখন পারসী পড়ত না, সংস্কৃত পড়ত। দশ সাল থেকে পারসী ক্লাস আরম্ভ হয়েছে, জিয়াউদ্দিন এসেছেন দশ সালে। জিয়াউদ্দিন শুধু পারসীই জানেন না—তিনি সংস্কৃতও জানেন। তিনিও আজ পর্য্যন্ত এ ব্যবস্থায় আপত্তি জানান নি। মুসলিম লীগ আমলে মুসলমান ছাত্রেরা আপত্তি জানিয়েছিল, তাতে জিয়াউদ্দিন বলেছিলেন—"ওরে বাবা, পঞ্চামৃত দিয়ে হিঁদুরা ঈশ্বরের ভোগ দেয়। তাতে দুধ থাকে, দই থাকে, মধু থাকে, ঘি থাকে, চিনি থাকে—সে কি ঈশ্বরের ভোগ দিয়েছে বলে—অখাদ্য হয়? খেলে বিস্বাদ লাগে? না—দেহের ক্ষেতি করে? ও যখন খেতে মিঠা তখন খেয়ে নে।"

ছেলেরা শোনেনি, রাগ করেছিল মৌলবীর উপর। নাম দিয়েছিল—জেয়াউদ্দিন ভটচাজ। সে সময় চন্দ্রভূষণবাবু মুসলমান ছেলেদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন থেকে তারা আলাদা অন্য জায়গায় কোরাণের প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করে আসছে।

আর রিলিজিয়াস ক্লাস; শনিবার স্কুলের নিয়মিত ক্লাসের পর আধ ঘণ্টা ধর্ম্মসভা বা রিলিজিয়াস ক্লাস হয়। হিন্দুর আলাদা—মুসলমানদের আলাদা। এ ব্যবস্থা ষোল বছরের। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর পর থেকে। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর আঘাত তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। পৃথিবী শূন্য মনে হয়েছিল। জীবন অর্থহীন নিরর্থক ভেবেছিলেন, পৃথিবীর আলো নিভে গিয়েছিল, তিক্ত ছাড়া স্বাদ ছিল না পৃথিবীতে, কটু ছাড়া গন্ধ ছিল না, দুঃখ ছাড়া আর কিছু ছিল না সৃষ্টিতে। ইস্কুলে এসে বসে থাকতেন—চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ত, ক্লাসে পড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতেন—মিনিট দুই পরে উঠে চলে আসতেন, আপিসে এসে তখনকার সেকেণ্ড মাষ্টারকে পাঠিয়ে দিতেন—'আপনি যান ননীবাবু—আমি পারছি না। পারলাম না।'

সেই সময় গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। মহাকবির কাছে গিয়েছিলেন—জিজ্ঞাসা করেছিলেন সান্ত্বনা কিসে? কোথায়?

মহাকবি পুত্র-শোকাতুর প্রৌঢ়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আনন্দের ধ্যানে।

বুঝতে পারেননি চন্দ্রভূষণবাবু। পরদিন প্রভাতে উপাসনা-মন্দিরে ছিল একটি বিশেষ উপাসনা। কবিগুরু সেদিন নিজে গিয়েছিলেন। চন্দ্রভূষণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

গানে আরম্ভ।

সে গান আজও তাঁর মনের তারে অহরহ ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

"তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ—সুরের বাঁধনে—
তুমি জান না।—
তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।।"

আনন্দের সন্ধান—আনন্দের ধ্যানমন্ত্র চন্দ্রভূষণবাবু সেইখানে বসেই পেয়ে গিয়েছিলেন। উপাসনার পর মহাকবির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিলেন—আমি পেয়েছি। ধ্যানমন্ত্র ধ্যানপদ্ধতি আমি

পেয়েছি। ফিরে এসে তিনি শনিবার স্কুলের পর শান্তিনিকেতনের উপাসনা-আসরের অনুকরণে এই ধর্ম্মসভার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। গান দিয়েই আরম্ভ। তারপর হিন্দুর উপনিষদ পুরাণ, ইসলামের কোরাণ, কৃশ্চানের বাইবেল থেকে কিছু কিছু পাঠ করা হয়।

এতকাল পর ছেলেরা বলেছে—এ ব্যবস্থা চলবে না।

বিদ্রোহ করেছে তারা।

তাদের কয়েকজন নিঃসংশয়ে না কি জেনেছে—ঈশ্বর নেই। তাদের সে কথা জানিয়েছেন—নিঃসংশয়ে বুঝিয়েছেন এই নবীন বিদেশী শিক্ষকটি। সেকেণ্ড মাষ্টার—সীতেশবাবু।

ধ্যানমন্ত্র ধ্যানপদ্ধতি আমি পেয়েছি। [পৃষ্ঠা ৩২৪

এই তো মাসখানেক আগে ছোট একটি ছেলে—দশ এগার বছরের শিশু—কাঁদোকাঁদো মুখ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাঁর কোয়ার্টারের বাইরের ঘরের দরজায় উঁকি মারছিল। চন্দ্রভূষণবাবু ইস্কুলে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে তামাক খাচ্ছিলেন চেয়ারে বসে। ছেলেটির দিকে চোখ পড়তেই ছেলেটি সরে গেল। যেন ভয় পেয়েছে।

হেডমাষ্টার তিনি। গাম্ভীর্য্য তাঁকে অভ্যাস করতে হয়েছে।গাম্ভীর্য্য তাঁকে রাখতে হয়। দীর্ঘ উনপঞ্চাশ বছরের প্রথম দু' বছর তিনি ছিলেন সেকেণ্ড মাষ্টার, তারপর তিনিই হয়েছিলেন হেডমাষ্টার। তেইশ বছর বয়সের হেডমাষ্টার সাতচল্লিশ বৎসর আগে। তখন ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদেরই অনেকের বয়স ছিল উনিশ-কুড়ি। স্কুলের দ্বিতীয় বৎসরে বরদা পণ্ডিত এণ্ট্রান্স দিয়েছিল; নর্ম্যাল পাশ করে বরদা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে এসেছিল; বরদার বয়স ছিল চব্বিশ। বরদা দাড়ী রেখেছিল, বড় বড় দাড়ী গোঁফ নিয়ে সে ক্লাসে বসে থাকত। চণ্ডীপুরের দুই ভাই নলিন আর নরেন উনিশ বছর বয়সে দাড়ী গোঁফ নিয়ে মাইনর পাশ করে এসে ভর্ত্তি হয়েছিল ফোর্থ ক্লাসে। শম্ভু, ষষ্ঠী, ফুরু, গুলু, হিমাংশু, ভোলা, হলা, নবীন এই নবগ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে; ব্রাহ্মণ,

ভূসম্পত্তিবান্, কুলধর্ম্মে তান্ত্রিক, আবার ইংরিজী ফ্যাশনে ঘাড় চেঁচে চুল ছাঁটত—একটার জায়গায় দুটো সিঁথী চিরে টেরী কাটত। সেই সব ছেলেদের শৃঙ্খলাধীনে রাখতে তাঁকে গাম্ভীর্য্য অভ্যাস করতে হয়েছিল। নিজের দীর্ঘ দেহের জন্য তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন। একে বয়স অল্প, তার উপর যদি তিনি মাথায় খাটো হতেন—তবে অভ্যাস করলেও গাম্ভীর্য্য তাঁকে মানাত না। হেডমাষ্টার হয়ে তিনি দাড়ী রেখেছিলেন। গোঁফ সে কালে কেউ কামাত না। কাপড় কামিজ কোট ছেড়ে তিনি চোগা-চাপকান পরতেন। তাতে আরও লম্বা দেখাত, আরও গম্ভীর মনে হ'ত। স্কুলের প্রথম ঘণ্টাতেই তিনি বের হতেন একবার। দীর্ঘ পদক্ষেপে প্রতিটি ক্লাসে একবার ঢুকতেন। প্রতিটি ক্লাস দেখে আপিসে ফিরে আসতেন। গাম্ভীর্য্য যা একদিন আবরণ ছিল মুখোস ছিল—সেইটেই আজ জীবনে আসল চেহারায় দাঁড়িয়ে গেছে।

সেকালে ব্রজকিশোর যখন ইস্কুলে ভর্ত্তি হল ছেলে বয়সে তখন সে বাড়ী এসে তাঁকে বলত—ইস্কুলে আপনাকে দেখে এমন ভয় লাগে!

হেসে বেশ একটু অহঙ্কার অনুভব করেই তিনি বলতেন—লাগে?

—বড্ড ভয় লাগে!

এবার সশব্দে হেসে উঠতেন তিনি। কিন্তু একটু শব্দ করেই হেসেই নিজকে সংযত করতেন। ছেলের যদি ভয় ভেঙে যায়, সে যদি ইস্কুলেই আবদার করে পিতৃস্নেহ দাবী করে অন্যদের চেয়ে বেশী—তবে সে যে অপরাধ হবে তাঁর! ইস্কুলের ক্ষতি হবে।

আজ বৃদ্ধ বয়সে প্রাণটা কেমন করে। ব্রজকিশোর বেঁচে থাকলে—তার ছেলেদের নিয়ে খানিকটা ছেলেমানুষী করতেন। তাঁর গাম্ভীর্য্যের মুখোসটা—যেটা অহরহ পড়ে থেকে থেকে—আসল মুখেই পরিণত হয়ে গেল, সেটা তারা টান মেরে ছিঁড়ে দিতে পারত!

একটু সকরুণ হাসি দেখা দিল মুখে।

পারত কি? তারাও কি এই ইস্কুলে পড়ত না? অন্তত ইস্কুলে যাওয়ার সময় তারাও ঠিক এই শিশুটির মতই সঙ্কুচিত হ'ত।

ছেলেটি আবার উঁকি মারলে। মুখখানি যেন কেমন কেমন! তিনি ডাকলেন—কেষ্ট।

কেষ্ট তাঁর বই খাতা গুছিয়ে নিচ্ছিল। সে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে—আজ্ঞে।

—দেখ তো একটি ছেলে—উঁকি মারছে। চশমা নেই ঠিক চিনতে পারলাম না। কিন্তু মনে হ'ল—মুখখানা শুকনো শুকনো। হয় তো শরীর খারাপ করছে—কি বাড়ীতে কিছু হয়েছে—ছুটি চায়—দেখ তো!

কেষ্ট বেরিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে এল।

সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। মুহূর্ত্তে চিনলেন—এবার আপার প্রাইমারি থেকে বৃত্তি পেয়ে ক্লাস ফাইভে এসে ভর্ত্তি হয়েছে—এই গ্রামেরই শ্যামাদাসের ছেলে সুকুমার। শ্যামাদাস তাঁর ছাত্র। অকৃতী ছাত্র। কিন্তু এ ছেলেটি উজ্জ্বল—এ ছেলে কৃতী হবে—সে ছাপ যেন ওর মুখে লেখা আছে। সুন্দর আবৃত্তি করে, সুন্দর গান করে; স্তোত্র গানের ধরতাই ধরে যারা—তাদের মধ্যে সুকুমার একজন।

কেষ্ট বললে—কি বলছে বুঝতে পারলাম না। কি বলছে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে—শুধান আপনি।

—কি রে সুকুমার? কি হয়েছে?

—স্যার—

—বল কি হয়েছে?

—ঈশ্বর নেই স্যার?

—কি? ঈশ্বর নেই? অবাক বিস্ময়ে ছোট ছেলেটির প্রশ্নটির পুনরুক্তি করা ছাড়া আর কোন উত্তরই বৃদ্ধ খুঁজে পেলেন না।

—ওরা বলছিল স্যার। বলছিল—বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে ঈশ্বর নাই। সেকেণ্ড স্যার অনেক বিজ্ঞান পড়েছেন—তিনি বলেছেন যারা বলে ঈশ্বর আছেন—তারা ভুল বলে নয় মিথ্যে বলে। বলছিল—এইবার স্তোত্র পাঠ আর ধর্ম্ম কেলাস উঠে যাবে। উঠিয়ে দেবে।

চমকে উঠলেন চন্দ্রভূষণবাবু। পা থেকে রক্ত উঠতে লাগল মাথার দিকে। বৃদ্ধ বয়সের শীতল রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠছে যেন। তিনি সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—বললেন—সেকেণ্ড স্যার বলেছেন? চন্দ্রবাবু হাতের নলটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। তুই শুনেছিস?

—না স্যার। ওরা বলছিল ময়দান ক্লাবে বলেছেন। ওদের কাছে বলেছেন।

—ওরা কারা?

—ফার্ষ্ট ক্লাসের জীবেন দা, ভূপেশ দা,

—সেকেণ্ড ক্লাসের দীপু, ফিনা,—

চন্দ্রবাবু নিজেই নামগুলি করে গেলেন। অনেকগুলি নাম।

—হ্যাঁ স্যার! আবার সে প্রশ্ন করলে—ক্লাস উঠে যাবে স্যার? ঈশ্বর নেই স্যার?

ছেলেটির করুণ মুখচ্ছবি দেখে চন্দ্রবাবুর চোখ দুটি হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে জলে ভরে গেল। সে জল তিনি মুছলেন না—ছেলেটির পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—না, ক্লাস উঠে যাবে না। আর ঈশ্বর নেই এ কি কখনও সত্য হয়? আমি তাঁকে বুকের ভিতর বুঝতে পারি রে। তুইও তো নিজেই বুঝতে পারছিস। পারছিস নে? নইলে তোর মনে এত কষ্ট হচ্ছে কেন?

—হ্যাঁ স্যার।
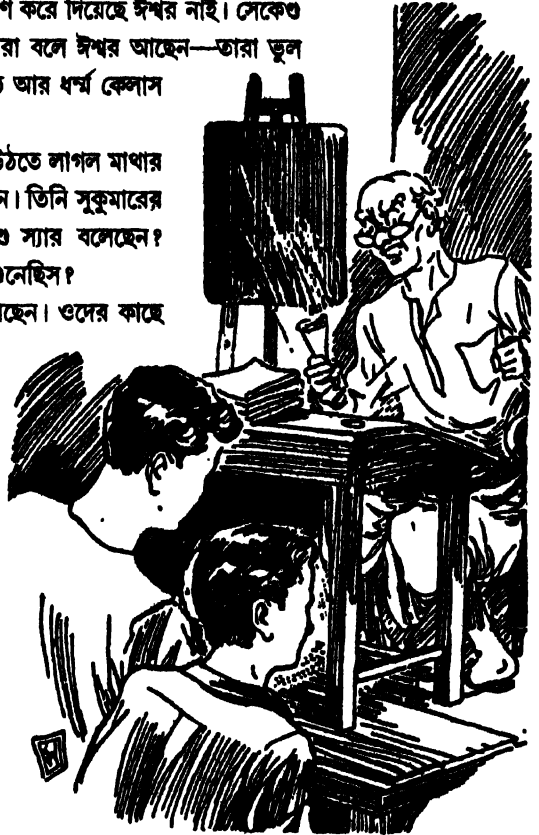
কিন্তু কবিতা পড়ে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে খাতাটা দুমড়ে টেবিলের উপর আছড়ে ... [পৃষ্ঠা ৩২৮

—যা, স্তোত্র পাঠের জায়গায় যা। ঘণ্টা পড়বে। আমি যাচ্ছি।

সুকু চলে গিয়েছিল।

জীবেন, ভূপেশ, দীপু, ফিনা, পিণ্টু, নিতু এরা। সীতেশবাবু এদের পিছনে। তিনি না জানা নন। কিন্তু এতটা অনুমান করতে পারেননি।

কৃতী ছাত্র, উজ্জ্বল দীপ্ত চেহারা, শিক্ষকতায় অসাধারণ দক্ষতা—সীতেশের। এখানে এসেছিল সাময়িক ভাবে। পুরানো সেকেণ্ড মাষ্টার অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়েছিলেন, ছ' মাসের ছুটি; সীতেশকে এনে দিয়েছিল—তাঁরই পুরানো ছাত্র, সে এখন বিখ্যাত লোক, খ্যাতনামা সাংবাদিক। সীতেশের দক্ষতা দেখে দীপ্তি দেখে—কর্ম্মক্ষমতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেকেণ্ড মাষ্টার বাঁচলেন না, তিন মাসের মধ্যেই মারা গেলেন; তখন তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সীতেশকে স্থায়ী সেকেণ্ড মাষ্টার করে নিযুক্ত করলেন। ময়দান ক্লাব যখন সীতেশ প্রথম করেছিল—তখন তিনি খুসী হয়েছিলেন। তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন ময়দান ক্লাবের। আশপাশের সুন্দর জায়গা আবিষ্কার করে সেখানে গিয়ে ক্লাবের অধিবেশন হয়। আবৃত্তি হয়, গান হয়, মুখে মুখে রচনা করে অভিনয় হয়। সীতেশ বক্তৃতা করে, ছেলেরাও করে।

হঠাৎ কিছুদিন আগে তিনি অনুভব করলেন—শীতের রাত্রে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটি যেটির উত্তাপ আরম্ভে প্রাণ-সঞ্জীবনী বলে মনে হয়েছিল সেটি যেন অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে বিস্তার লাভ করতে উদ্যত হয়েছে।

আগুনটায় খোঁচা দিয়েছিলেন—কিশোরী পণ্ডিত।

ফার্ষ্ট ক্লাসের জীবেন কবিতা লেখে, গল্প লেখে। তার ধাতুরূপের খাতা সংশোধন করবার সময় খাতার পাতায় একটা কবিতার খসড়া দেখতে পেয়েছিলেন হেডপণ্ডিত। আজকালকার কবিতা তিনি বোঝেন না, ছন্দ নেই, মিল নেই—অর্থ করতে গেলে মনে হয় অথৈ জলে ডুবে যাচ্ছেন তিনি, নিজের নাম বাপের নাম—সব ভুলে যাচ্ছেন। তবুও জীবনে লিখেছে—কি লিখেছে পড়ে দেখেছিলেন। কিঞ্চিৎ রসিকতা করবার অভিপ্রায় ছিল। কিশোরী কাব্যতীর্থ রসিকতায় বিখ্যাত। কিন্তু কবিতা পড়ে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে খাতাটা দুমড়ে টেবিলের উপর আছড়ে মাড়িতে মাড়িতে ঘষে—অল্পক্ষণ স্থির হয়ে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—

—অ বাবা গোপাল, অ জীবেন—শোন তো মাণিক।

পণ্ডিত কবিতাটা দেখেছেন বা পড়েছেন এটা জীবেন বুঝতে পারেনি। সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

—অঁ—। কাছে এস গোপাল—বুকে নি পরাণটা জুড়িয়ে নি। আহা গোপাল রে!

—কি বলছেন স্যার?

—বলছি—আমার চোদ্দ পুরুষের ছেরাদ্দ করে তোমার ছাপ্পান্ন পুরুষের মুখে ছাই দিয়ে—হ্যাঁ বাবা আমার বরাহ-গোপাল—তুমি কোন্ পচা বিল থেকে ধম্মশালুক ফুল তুলে চিনেছ বাবা মাণিক? এ কি লিখেছ? এ্যাঁ? কি?

হে নূতন যুগের মানুষ বিধাতা—
তোমার আবির্ভাবে—
ধর্ম্মের ভণ্ডামির পালা হল শেষ।

কুৎসিৎ কুচক্রের চক্রান্তের দাঁতালো চক্রের
দাঁতগুলো ভেঙে গেল; কুবলয় হাতীর
দাঁত টেনে যেমন ভেঙেছিল কৃষ্ণ—
তেমনি তুমি দিলে ভেঙে চক্রান্তের চাকার দাঁত।
অনাচার-শোষণ-পীড়ন এই দাঁতগুলো।
জেরুজালেম মক্কা কাশীর মন্দিরচূড়া
তোমার আবির্ভাবে ভেঙে পড়ল—পড়ছে—পড়বে।

আর পড়তে পারেননি। দারুণ ক্রোধে আবার টেবিলের উপর খাতাটা আছড়ে—জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোর জ্যাঠাকে পড়িয়েছি, বাবাকে পড়িয়েছি, তোর ঠাকুরদাদা আমাকে দাদা বলত। তোর ঠাকুমা এমন ভালমানুষ—ওরে শুদ্ধাচারিণী মানুষ! অরে—অ পেল্লাদ অরে অ—বরাহ্-গোপাল—ধম্মের শালুক চিনতে গিয়ে শুধু পাঁক ঘেঁটে এলি বাপ—আর ফতোয়া দিলি শালুক ফুলের গন্ধ পাঁকের গন্ধ, বর্ণ পাঁকের বর্ণ, পাঁপড়িগুলোও পাঁকের? বলিহারি বাপ—কুলকজ্জল—বৈজ্ঞানিক গবেষণাটা করেছিস ভাল; ওরে ও বরাহ্—তোর ঠাকুরদাদার বাবা যে পণ্ডিত মানুষ ছিলেন—গুরুগিরি করতেন; তোর ঠাকুরদাদা ছিল পূজুরী বামুন। তোর বাপ জ্যাঠাকে পূজোর দক্ষিণে—আর আতপ-বেচা পয়সায় ইংরিজী ক-খ শিখিয়েছিল রে—মানে ইংরেজী ইংরেজী।

জীবেন থৈ হারিয়ে যেন অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছিল—প্রত্যুত্তরে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত মরিয়ার মত বলেছিল—বিজ্ঞান মিথ্যে বলে না। সে ঠাকুরদাদাই হোক আর তার বাপই হোক—বিজ্ঞানের সন্ধানী-আলোতে তাদের সত্য চেহারাই ধরা পড়েছে।

এবার খাতাখানা পণ্ডিত মশাই ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে চলে এসেছিলেন—বলেছিলেন—দাঁড়া হাত ধুয়ে আসি। পরের ঘণ্টাতেই তিনি এসে চন্দ্রভূষণবাবুকে বলেছিলেন—সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন মাষ্টারমশাই—অর্দ্ধেক ত্যাগ করলেও আর রক্ষা নাই। ওটাকে তাড়ান ইস্কুল থেকে। জীবনেটাকে।

চন্দ্রভূষণবাবু হেসে বলেছিলেন—ওরা ছেলেমানুষ, আজকাল সাহিত্যে যা দেখছে—কাগজে যা পড়ছে—সেইটেই ফ্যাশনের মত অনুকরণ করছে। ও হয় তো কোন আধুনিক কবির অনুকরণ করেছে। ওর ওপর এতটা জোর দেওয়া আপনার ঠিক হয়নি।

—উঁ-হু। উঁহু। ভেবে দেখুন আপনি! ভেবে দেখুন! চলে গিয়েছিলেন পণ্ডিত নিজের ক্লাসে।

তাতেও চন্দ্রভূষণবাবু হেসেছিলেন। বিজ্ঞানের নূতন অভ্যুদয়ে খানিকটা এমন উগ্রতা খুবই স্বাভাবিক। আর জীবেন? এই তো বছরখানেক আগে জীবেন আগমনী কবিতা লিখেছিল—ইস্কুলের হাতেলেখা ম্যাগাজিনে :

চিন্ময়ী তুমি মৃন্ময়ী হলে—হও মা এবার জীবন্ময়ী।

ভক্তি ও বিশ্বাসের আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছিল সে কবিতায়। পণ্ডিতমশায় ভুল করেছেন—আকাশের রক্তাভা দেখে ঠাউরেছেন—দিগন্তে আগুন লেগেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ—ইংরিজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমাজের রূপান্তরে—দুঃখ পেয়েছেন। মুখের উপলব্ধির আনন্দের হাসিটুকু মুহূর্ত্তে

কৌতুক হাস্যে রূপ নিয়েছিল, একটি সরস রসিকতা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল;—পণ্ডিতমশায় নিজেই এই রসিকতাটি করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে ছেলেরা পরীক্ষার সময় কোশ্চেন কঠিন হয়েছে বলে আপত্তি করে ; বেশী করে ফেলকরা ছেলেরাই। পণ্ডিত বলেন—ভাল করে অনুধাবন করে দেখ বৎস। রক্তসন্ধ্যা—বাবারা—রক্তসন্ধ্যা। ঘরে আগুন লাগেনি। কোশ্চেনটা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে। দুবার পড়। পড়লেই দেখবে—জল অথৈ নয়—এক হাঁটু—দিব্যি পার হয়ে যাবে হেঁটে। আঃ ঘর পুড়ে পুড়ে তুই বাবাদের মন চকাভকা হয়ে আছে। জানিসতো ঘর-পোড়া গরু রক্তসন্ধ্যে দেখেও ভাবে ঘরে আগুন লেগেছে। কবার গৃহদগ্ধ হয়েছে বাবা ধূর্জ্জটির বাহন?

মানে ষাঁড়!

ওই রক্তসন্ধ্যার উপমাটা দিয়ে রসিকতা করবার কথায় তাঁর মনে কৌতুক জেগে উঠেছিল। ঠিক এই মুহূর্তেই এসে ঘরে ঢুকেছিলেন—সেকেণ্ড মাষ্টার সীতেশবাবু। তাঁর পিছনে জীবেন-ভূপেশ-দীপু-ফিনা-পিণ্টু-নিতু। সীতেশবাবুর মুখের হাসিতে কখনও ভাটা পড়ে না; ঠোঁট দুটির কিনারা পরিপূর্ণ করে হাসিটি ছলছল করে। তিনি বলেছিলেন—এই নিন মাষ্টার মশাই—ছেলেরা আপনার কাছে এসেছে। ওদের মনে অত্যন্ত আঘাত লেগেছে। পণ্ডিতমশাই সাধুভাষায় ওদের কটুবাক্য বলেছেন—মানে গালাগাল করেছেন ; ওদের বিশ্বাসে আঘাত করেছেন। আপনার সামনে আসতে ওরা একটু ভয় পাচ্ছিল—আমি শুনে ওদের নিয়ে এলাম। আপনি শুনুন ওদের কথা।

উপলব্ধির আনন্দ—রসিকতার কৌতুক—মুহূর্তে একটা চকিত আশঙ্কার ঝাঁকি খেয়ে যেন মিলিয়ে গিয়েছিল; মনে হয়েছিল সামনের চেয়ারে ঝুলানো তাঁর গলার পাকানো চাদরটা অকস্মাৎ সাপ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে, ঝুলে থাকা মুখটার কয়েকটা সুতো বাতাসে কাঁপছে—সে যেন সুতো নয়—সাপটা চেরা জিভ নাড়ছে।

পরমুহূর্তে তিনি আত্মসম্বরণ করে গম্ভীরভাবে ছেলেদের বলেছিলেন—ওয়েল কাম ইন। ছেলেরা এসে বাড়িয়ে দিয়েছিল একখানা গুড়নো ফুলস্ক্যাপ কাগজ। দরখাস্ত।

সীতেশবাবু হেসেই বলেছিলেন—আমিই বললাম—মুখে বলতে তোমাদের গোলমাল হবে—তোমরা লিখে আন। লিখে এনেছে ওরা।

চন্দ্রভূষণবাবু তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়েছিলেন—আপনার ক্লাস নেই? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল—নেই, এ ঘণ্টা তাঁর বিশ্রাম। তিনি দরখাস্তখানি নিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। দরখাস্তে শুধু অভিযোগই নাই—এ অভিযোগের প্রতিকারে তাদের দাবীও তারা জানিয়েছে। অভিযোগ—পণ্ডিত মশায়ের বলা ঘটনার থেকে অনেক বেশী। অনেক বিকৃত। এ ঘটনাই একমাত্র অভিযোগের কেন্দ্র নয়।

'পণ্ডিত মশায় বৃদ্ধ হয়েছেন—তিনি নিতান্তই সেকেলে মনোভাব-সম্পন্ন। তিনি পাঠ্যবিষয় অবহেলা করে অধিকাংশ সময় একালের সমস্ত কিছুকে ব্যঙ্গ করে গল্প বলে থাকেন। অনেক গল্প তাঁর একালের রুচিতে অশ্লীল।' এছাড়া আজকের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ—'জীবেনের বিজ্ঞান-বিশ্বাসে তিনি আঘাত করেছেন। তিনি তার বাপ পিতামহ প্রপিতামহ তুলে ব্যঙ্গ করেছেন।' এবং আরও অনেক সূক্ষ্ম তীক্ষ্নাগ্র

অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে ছোট অভিযোগ। "সংস্কৃত ভাষা শেখাতে গিয়ে তিনি ধর্ম্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন; বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নিন্দা করে থাকেন। তিনি ইংরাজী জানেন না। ফলে ইংরাজী সংস্কৃত অনুবাদে তাদের অসুবিধা হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।" দাবী করেছে—"এর প্রতিকার চাই।" ইঙ্গিতে বলেছে পণ্ডিত মশায়ের স্থানে তারা যোগ্যতর একালের পণ্ডিত চায়। প্রত্যক্ষ দাবী করেছে—জীবেনকে তার পিতামহ প্রপিতামহ তুলে যে ব্যঙ্গ করেছেন—তা তাঁকে প্রত্যাহার করতে হবে।

পড়তে পড়তে বৃদ্ধবয়সেও তাঁর দুই কানের পাতা গরম হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দরখাস্তখানির মধ্যে কোথাও যেন বাঁধনের এতটুকু শিথিলতা নাই; নিপুণ গ্রন্থিতে গাঁথা, নিপুণ রচনায় রচিত, সর্ব্বোপরি প্রথম পংক্তি থেকে শেষপর্য্যন্ত কোথাও একবিন্দু বেদনা নাই, আছে ক্ষোভ,—ঔদ্ধত্য।

চোখ তুলে তিনি ছেলেদের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখের দিকে তারা তাকাতে পারছে না, মাটির দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের অন্তরের উত্তাপ তিনি অনুভব করলেন। এমন উত্তাপ ছেলেদের মধ্যে উনপঞ্চাশ বছর ধরে তিনি মধ্যে মধ্যে অনুভব করেছেন। কত মতিভ্রান্ত বিকৃত প্রকৃতির ছাত্র নিয়েই না তিনি এই স্কুল চালিয়ে এলেন। তাদের শাসন করেছেন—নিজের অন্তরে দুঃখ পেয়েছেন। কত সময় এক একজনের আচরণে তিনি রাগে প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। আবার নিষ্ঠুর বেদনায় চোখে জল এসেছে। রাত্রে ঘুম হয়নি। নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছেন। কিন্তু এমন দলবদ্ধ ছাত্রের যুদ্ধের আহ্বান তাঁর কাছে এই নতুন এই প্রথম।

তাঁর চোখের দিকে তারা তাকাতে পারছে না, মাটির দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে।

আবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—উনপঞ্চাশ বছরের মধ্যে আজও পর্য্যন্ত স্কুলে কখনও ছাত্রেরা বা কোন ছাত্র এই ভাবে শিক্ষকের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেনি। তোমরা প্রথম।

ছেলেরা চুপ করেই ছিল, কোন উত্তর দেয়নি।

তিনি আবার বলেছিলেন—পণ্ডিত মশায়ের চেয়ে যোগ্য সংস্কৃত শিক্ষক অবশ্যই আছেন কিন্তু আজও

আমি দেখিনি। আজ পর্য্যন্ত এ স্কুল থেকে যত ছেলে সংস্কৃতে ষ্টার পেয়েছে—অন্য কোন বিষয়ে তত ছেলে ষ্টার পায়নি।

আবার তিনি বলেছিলেন—গত বছরের পরীক্ষার ফলেও তাই হয়েছে। সংস্কৃতে চারটি ছেলে ষ্টার পেয়েছে। পাঁচটি ছেলে ফেল হয়েছে—তার মধ্যে একটি ছেলে সংস্কৃতে ফেল করেছে! আমি কি করে তোমাদের কথা মানব যে, পণ্ডিত মশায় বৃদ্ধ হয়ে অক্ষম হয়েছেন। তিনি বৃদ্ধ, তিনি অবশ্যই সেকালের লোক। মনোভাব সেকেলে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তোমাদের কথাই মেনে নিয়ে বলছি—তাঁর সঙ্গে যদি সম্বন্ধ হয় পাঠ দেওয়া আর নেওয়ার—পড়ার আর পড়ানোর, তা হলে তাঁর মনোভাব নিয়ে বিচারের প্রয়োজন কি? তিনি একালের সমস্ত কিছুকে ব্যঙ্গ করেন? অশ্লীল রসিকতা করেন?

উত্তেজনায় তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন।

—আমি প্রত্যাশা করিনি। এ আমি—। তোমরা পণ্ডিত মশায়ের টিকি ফোঁটা মালা নিয়ে যে সব মন্তব্য কর, তাঁকে অসভ্য বর্ব্বর বল—সে আমি জানি। তিনি অশ্লীল রসিকতা করেন? তিনি—।

তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ক্ষোভে ক্রোধে।

—তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন? এও একটা অভিযোগ? ওঃ! তোমরা ধর্ম্ম মান না? ঈশ্বর মান না? বিজ্ঞান মান? তোমরা কতটুকু পড়েছ বিজ্ঞান? তোমরা প্রত্যেকটি ছাত্র যে যে পরিবারে জন্মেছ—মানুষ হচ্ছ—তার প্রত্যেকটি পরিবারে ধর্ম্মাচরণ রয়েছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রয়েছে, পূজা রয়েছে—পার্ব্বণ রয়েছে। তোমরা বলেছ—দাবী জানিয়েছ—সে সব উঠিয়ে দিতে? সংস্কৃত ভাষা ধর্ম্মদর্শন ধর্ম্মজীবন নিয়ে সমৃদ্ধ—সেই তার প্রাণশক্তি; সে ভাষা শিক্ষা দিতে ধর্ম্মশিক্ষা দেন তিনি এটাও তাঁর অপরাধ?

ছেলেগুলির মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

সীতেশবাবু মাথা হেঁট করে কিছু লিখেই যাচ্ছিলেন। এদিকের আলোচনায় তাঁর যেন কোন আকর্ষণই ছিল না। এবার হঠাৎ মুখ তুলে সেই হেসেই বললেন—বিচারটা একটু একপেশে হয়ে যাচ্ছে মাষ্টার মশাই। ধর্ম্মবিচারেও একালে সেকালে অনেকটা প্রভেদ হয়নি কি? রাবণের দশটা মাথা কুড়িটা হাত—এ সেকালে যেমন বিশ্বাস করত—একালেও তাই করে কি? সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যাও কি বদলায়নি? একটা মানুষের মস্তিষ্কে দশটা মানুষের বুদ্ধি, দেহে দশটা মানুষের শক্তি—এই ব্যাখ্যা কি চলছে না আজ? বানর বলতে—সত্যিকারের বানরকে ছেড়ে কি আমরা তাদের অনার্য্য জাতি বলে ব্যাখ্যা করছি না?

কথাগুলি শেষ করেই তিনি লেখা কাগজখানা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতেই বলেছিলেন—আমাকে মাফ করবেন। আমি বোধ হয় অনধিকার-চর্চ্চা করেছি।

বলেই তিনি বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

হেডমাষ্টার মশায় আত্ম-সম্বরণ করে ছেলেদের বলেছিলেন—আমি মনে করি, মহাকাব্য পুরাণ এ পড়তে গেলে তাতে যা আছে তাই মেনে নিয়ে পড়তে হবে। তার মধ্য থেকেই তার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হবে। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অদগ্ধ অক্ষত দেহে কেউ ফিরে আসতে পারে কি না এ বিচার করে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পড়া চলে না। কিন্তু সে থাক।

তিনি বলেই চলেছিলেন—জীবেনের সঙ্গে যা হয়েছিল পণ্ডিতমশায়ের সে আমি শুনেছি। পণ্ডিতমশাই

আমাকে বলেছেন। ব্যাপারটার মূল সেখানেই। জীবেন বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে ভালো কথা। কিন্তু কাশী জগন্নাথের মন্দির ভাঙবার কল্পনাটা ভালো কথা নয়। পণ্ডিতমশায় তাতেই বোধ করি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমিও ক্ষুব্ধ হতাম। কারণ, গতবার জীবেন পূজোর কাগজে আগমনী কবিতা লিখেছে। গত সরস্বতী পূজোতে সব থেকে বেশী নেচেছে। জীবেনদের বাড়ীতে আমি জানি শালগ্রাম শিলা আছেন। আর জীবেন—তুমি কি বলেছ—যে বিজ্ঞানের সত্য-সন্ধানী আলোয় তুমি তোমার প্রপিতামহ পিতামহের সত্য চেহারা দেখতে পেয়েছ? অর্থাৎ ভণ্ড চেহারা বা ঐ রকম ধরণের চেহারা—ধর্ম্মের নামে তাঁরা যজমানদের উপর অত্যাচার করতেন? পণ্ডিতমশায় তো এই নিয়েই তোমার পিতামহ প্রপিতামহের কথা বলেছেন?

জীবেনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল।

চন্দ্রবাবু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—কাঁদছ? কেঁদো না। যাও ক্লাসে যাও। যা সম্পূর্ণ বোঝনি—জাননি—তাই নিয়ে চর্চ্চা করতে গিয়েছ, ঠকেছ। এখন শেখ, পড়, ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ। পড়ে যাও। কবিতা লেখ—যা জান তাই নিয়ে। আর একটা কথা বলে দি। পণ্ডিতমশায়ের মত ভালোমানুষ—শুদ্ধ মানুষ—এ আমি দেখিনি। এবং ধর্ম্মকে ঘৃণা করবার আগে তাকে অবিশ্বাস করবার আগে তাকে ভালো করে জানো, বোঝো। তার মূলকে সন্ধান করো। তারপর অবিশ্বাস হয় ছেড়ে দিয়ো। যাও!

সেদিন শেষ ঘণ্টায় সমস্ত ইস্কুলের ছাত্রকে সমবেত করে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন—ওই কথাগুলিই। ছাত্রদের কর্ত্তব্য বুঝিয়েছিলেন।

ঠিক তার দুদিন পর থেকে তিনি লক্ষ্য করলেন, জীবেনদের দলটি স্তোত্র পাঠ শেষ হবার পর ইস্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকছে। শনিবারে ধর্ম্মের ক্লাসে দেখলেন জীবেনরা নেই, চলে গেছে।

এটা তাঁর অসহ্য হয়েছিল।

আজ উনপঞ্চাশ বছর ধরে স্তোত্র পাঠ বাধ্যতামূলক। ষোল বছর ধরে চলে আসছে ধর্ম্মসভা। তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছেন বুঝেছেন—এর মধ্যে আছে পবিত্রতা-নম্রতা-পরিচ্ছন্নতা-শুভ্রতা। আছে শান্তি, আছে তৃপ্তি, আছে প্রসন্নতা, আছে শুচিতা। অন্ধ বিশ্বাসের কথা নেই, লোকাচারের বন্ধন নেই, পীড়ন নেই। আজও পর্য্যন্ত কোন দিন কোন ছাত্র এতে আপত্তি করেনি, ইচ্ছা করে দেরী করে আসেনি অনুপস্থিত হবার জন্য; ইচ্ছা করে কেউ চলে যায়নি বিনা অনুমতিতে।

পরের সোমবারে তিনি আপিসে বসেই ডাকলেন—কেষ্ট!

কেষ্ট এসে দাঁড়াতেই বললেন—এই ছেলেদের ডেকে নিয়ে এস। নাম-লেখা কাগজ হাতে তুলে দিলেন।

জীবেনরা এসে দাঁড়াল।

তিনি প্রশ্ন করলেন—আজ এক সপ্তাহ তোমরা স্তোত্র পাঠের সময় থাক না কেন? জীবেন!

—আসতে দেরী হয়ে যায় স্যার।

—সে তো ইচ্ছে করে!

চুপ করে রইল ছেলেরা।

—ধর্ম্মসভাতেও তোমরা ছিলে না এ শনিবারে।

এবার জীবেন বললে—আমাদের ভালো লাগে না।

—হোয়াট?

—আমরা বিশ্বাস করি না ধর্ম্মে।

—কিন্তু এ স্কুলে এ কম্পালসারি। আজ আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। This is the second time. তৃতীয়বারে আমি ক্ষমা করব না।

আবারও সেদিন তিনি তাদের বুঝিয়েছিলেন—তিনি নিজে যা বুঝেছেন—জেনেছেন। যা বুঝে যা জেনে তিনি এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তাঁর এই উনপঞ্চাশ বছরের শিক্ষক-জীবনে এর ফল যা পেয়েছেন তাও বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমাকে বিশ্বাস করো। আমি বলছি তোমাদের। ধর্ম্ম নিয়ে গোঁড়ামি যত খারাপ—বিজ্ঞান নিয়ে গোঁড়ামিও তেমনি খারাপ। বিজ্ঞান তোমরা কতটুকু শিখেছ, কতটুকু জেনেছ?

ছেলেরা উত্তর দেয়নি। চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল। সেই চুপ করে থাকাটাই তাদের উত্তর। সেটা বুঝতে তাঁর দেরী হয়নি। তিনি কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন—তা না হলে এ স্কুলে তোমাদের পড়া চলবে না। এই আমার শেষ কথা। যাও।

ছেলেরা চলে গিয়েছিল।

এর পর দিন-কয়েক তারা নিয়ম মতই স্তোত্র-ক্লাসে এসেছিল। তিনি খুসী হয়েছিলেন।

হঠাৎ সুকুমার ছেলেটি সেদিন এসে তাঁকে প্রশ্ন করলে—ধর্ম্মসভা—স্তোত্র-পাঠ উঠে যাবে স্যার? ঈশ্বর নাই? জীবেনদা—ভুপেশ দা'রা বলছে! ওরা উঠিয়ে দেবে!

তিনি বলেছিলেন—না।

তাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি স্কুলে পাঠিয়ে নিজে আপিসে বসে কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন কি করবে ওরা। ওরা শিক্ষা-বিভাগে দরখাস্ত করবে। স্তোত্র-পাঠ—ধর্ম্মসভা শিক্ষা-বিভাগের পাঠ্য-সূচীর বাইরের জিনিষ। সুতরাং ওসবে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে তিনি পারেন না। তিনি স্থির করলেন—সরকারী গ্র্যাণ্ট ছেড়ে দেবেন। নিজে তিনি মাইনে নেবেন না। মাইনে তিনি আজ ষোল বৎসরই এক রকম নেননি। নিজের মাইনের টাকা দান করে তিনি বিভিন্ন ফাণ্ড খুলেছেন। ব্রজকিশোরের নামে তিনি বৃত্তি স্থাপন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে দু' বছরের জন্য মাসিক দশ টাকা বৃত্তি দিয়ে থাকেন। দুটি গরীব ভালোছেলের বোর্ডিংয়ের খরচ তিনি দিয়ে থাকেন। প্রাক্তন দরিদ্র শিক্ষকদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করেছেন—তাতে মাসিক কুড়ি টাকা তিনি চাঁদা দেন। থাকবে এ সব এখন থাকবে। বিনা সরকারী সাহায্যেই তিনি ইস্কুল চালাবেন। মাষ্টার মশায়দের বলবেন—তাঁরা নিশ্চয় তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন। তিনি লড়াই করবেন। ভগবানের নাম নিয়ে তিনি ইস্কুল আরম্ভ করেছিলেন। ভগবানের নাম তিনি উঠিয়ে দিতে দেবেন না।

সীতেশবাবুকে ডেকে তিনি বললেন—আপনাকে একটা অনুরোধ করব সীতেশবাবু।

—বলুন।

—আপনার ময়দান ক্লাব আপনি বন্ধ করুন।

—বন্ধ করব?

—হ্যাঁ। আমি এ নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাইনে, শুধু বলতে চাই এটা আপনি বন্ধ করুন।

সীতেশবাবু বললেন—ক্লাব আমি উদ্যোগী হয়ে গড়ে দিয়েছি কিন্তু ক্লাব আমার নয়, ক্লাব ছেলেদের। বন্ধ করা না-করা তাদের ইচ্ছায় নির্ভর করে মাষ্টার-মশাই। আপনি আমাকে বলছেন—আমি যোগ দেব না এই পর্য্যন্ত বলতে পারি। আমি প্রেসিডেণ্ট আছি—ছেড়ে দেব।

সেই দিনই রাত্রে তিনি খবর পেলেন—সুকুমারকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করেছে জীবেনরা কয়েক জনে।

হেড পণ্ডিতমশাই খবর নিয়ে এলেন।

সন্ধ্যার পর বোর্ডিং ইনস্‌পেকশন করে চন্দ্রভূষণবাবু ঘরে বসে এই সব কথাই ভাবছিলেন। উনপঞ্চাশ বছর কত বিচিত্র চরিত্রের ছেলে দেখে এলেন। আজ উনিশ শো পাঁচ সালের নবগ্রাম। সমাজ বিকৃত—ধর্ম্ম বিকৃত। ছেলেরা বারো বছর না-পার হতেই তামাক ধরত। অধিকাংশই তখন বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের উঁচু জাতের ছেলে।

হৃষিকেশ দুটো সিঁথি চিরে টেরী কেটে আসত। মাঝখানের চুল গুড়িয়ে পাকিয়ে রাখত। তার মধ্যে রাখত সে বার্ডশাই লুকিয়ে। বার্ডশাই সে পকেটে রাখত না।

চণ্ডীপুরের সরোজাক্ষের দেড় হাত লম্বা ভাল কলি হুঁকো ছিল। এক একদিন তিনি কেষ্টকে নিয়ে ছেলেদের ঘর-বাক্স খানাতল্লাস করতেন। দশ বারোটা হুঁকো, দেড় সের দু'সের তামাক, কল্কে টিকে নিয়ে আসতেন। সরোজাক্ষ ভাত খাবার পর চীৎকার করে কেঁদেছিল—মরে যাব। আমি মরে যাব।

চীৎকার শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন—কি হল?

—পেটে যন্ত্রণা। মরে যাব। আমি মরে যাব।

এক একদিন তিনি কেষ্টকে নিয়ে ছেলেদের ঘর-বাক্স খানাতল্লাস করতেন।

উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি ডাক্তার ডেকেছিলেন। সরোজাক্ষকে দেখে ডাক্তার এসে বলেছিল—ছেলেটা ছেলেবেলা থেকে তামাক খায় মাষ্টার-মশাই। তামাক খেতে পায়নি আজ, মানসিক যন্ত্রণা—সত্যিসত্যিই বোধ হয় দেহের যন্ত্রণায় দাঁড়িয়েছে। ওর তামাক চাই।

কেষ্টকে ডেকে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কেষ্ট, যাও ওর হুঁকোটা বেছে ওকে দিয়ে এস। তামাক সেজেই নিয়ে যাও।

কেষ্ট যাচ্ছিল—সরোজাক্ষের হুঁকো নিয়ে। তিনি আবার ডেকে বলেছিলেন—হুঁকোগুলো সবই নিয়ে যাও।

পরদিন তিনি তামাক খাওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নিজেও তামাক ছেড়ে দিয়েছিলেন। তামাক খাওয়া জীবনে তাঁর বিলাস ছিল।

নবগ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় মেলা হয়। মেলায় সাতদিন মেতে থাকত' উরু। মেলার আগের দিনই উরু মাথায় সাবান দিয়ে চুল রুখু করে—বগলে রসুন চেপে ইস্কুলে এসে বলত—জ্বর হয়েছে স্যার। ধরতে পারলেন না প্রথম প্রথম। ভাবতেন সত্যিই জ্বর হয়েছে উরুর।

সিদ্ধি খেয়ে কুৎসিৎ কেলেঙ্কারী করেছিল এখানকার বর্দ্ধিষ্ণু ধনীর ঘরের ছেলে। পড়াশুনায় কিন্তু সে ভালো ছেলে। তিনি তাকে বেত মেরে জর্জ্জরিত করে ইস্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

নবগ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ছেলেরা ছিল উদ্ধত, সম্পদের অহঙ্কারে যত অহঙ্কৃত—তত ছিল তাদের পড়ায় অবহেলা। তাদের তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এর জন্য নবগ্রামের ভদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন তাঁকে প্রায় যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি কোনদিন নতি স্বীকার করেননি। কোনদিন না।

ইস্কুলের দুঃসময় গেছে। সে দুঃসময়ের হেতুর অন্যতম হেতু এই নবগ্রামের ভদ্র সম্প্রদায়ের ছেলে। উনিশ শো ষোল সালে গৌরীকান্তকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ছেলেটির। সাময়িক ভাবে ইস্কুলের এড্ বন্ধ হল। তিনি পুলিশের কাছে বলেছিলেন—গৌরীকান্তকে তিনি জানেন, ভালো করে জানেন, এমন অপরাধ সে করেনি। করতে পারে না। তবে মানুষের সেবা-ধর্ম্ম যদি অপরাধ হয়—সে অপরাধ গৌরীকান্ত করেছে।

নবগ্রামের ওই একটি ছেলে। গৌরীকান্তকে স্মরণ করে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। গৌরীকান্তের জন্যে পুলিশের ভয়ে অনেক ছেলে ইস্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে সময়। তার উপর স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল সেবার অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। আঠারোটি ছেলের মধ্যে চারটি ছেলে মাত্র পাশ করেছিল। ইস্কুলের ছাত্র-সংখ্যা দু' শো থেকে নেমে এল এক শো কুড়ি পঁচিশে। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে নতুন হাই ইস্কুল হল। সেদিন তিনি ভিক্ষার ঝুলি তুলে নিয়েছিলেন কাঁধে, আর হাতে নিয়েছিলেন কলম; সাধারণের কাছে ভিক্ষা করে ইস্কুল চালিয়েছিলেন—সরকারের সঙ্গে এড্ বন্ধের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। দু' বছর পর সে এড্ আদায় করেছিলেন। একসঙ্গে দু' বছরের টাকা। সেই টাকায় ইস্কুলের নতুন বাড়ী হয়েছিল। নতুন বাড়ীর জন্য তিনি কয়লার ব্যবসায়ী ছাত্রদের কাছে ইট পোড়াবার কয়লা ভিক্ষা করেছিলেন, এখানে যারা ইট পাড়ে পোড়ায়—তাদের বাড়ী গিয়ে বলেছিলেন—এ ইস্কুলে তোমাদের ছেলেদের পড়ার সুবিধে করে দেব, হাফ ফ্রি করে দেব তোমাদের, কম মজুরীতে ইট পুড়িয়ে দিতে হবে। দিয়েছিল তারা। এ স্কুলের—। চন্দ্রভূষণবাবু ঘরখানার চারিদিক চেয়ে দেখলেন। প্রতিটি ইট তিনি দেখে দিয়েছিলেন—নরম ইট আধপোড়া ইট তিনি বেছে বেছে ফেলে দিতেন।

ওই স্কুলের আয়রণ চেষ্ট!

ওটা হয়েছে উনিশ শো আঠারো সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জরিমানার টাকায়। ছেলেরা টেষ্টের কোশ্চেন চুরি করেছিল। প্রতিটি ছেলের দশ টাকা হিসেবে জরিমানা করেছিলেন। পরীক্ষার খাতা দেখেই তিনি বুঝেছিলেন—কোশ্চেন জেনে ছেলেরা উত্তর লিখেছে।

তিনি ছেলেদের ডেকে বলেছিলেন—আমি শুধু বলছি—তোমরা আমার পা ছুঁয়ে বল। সত্য কথা বল।

স্বীকার করেছিল ছেলেরা।

তিনি বলেছিলেন—আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু অপরাধের শাস্তি নিতে হবে তোমাদের। ভবিষ্যতে ছেলেরা আর চুরি করতে না পারে এর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। সাজা দিতেই হবে। দশ টাকা ফাইন দিতে হবে প্রত্যেককে।

দুটি গরীব ভালো ছেলের ফাইনের টাকা তিনি নিজে দিয়েছিলেন। নবগ্রামের বাবুদের ছেলে ছিল একটি—তাকে তিনি এ্যালাও করেননি। আর করেননি বোর্ডিংয়ের একটি ধনীর ছেলেকে। এরাই ছিল পাণ্ডা, এবং পড়ায় ছিল কাঁচা। তা নিয়েও অনেক ক্ষোভ হয়েছিল। তাতে তিনি হার মানেননি। কোন আপোষ করেননি।

ব্রজকিশোরের সঙ্গে তিনি আপোষ করেননি। একমাত্র ছেলে ব্রজকিশোর।

তিনি আপোষ করবেন না। কখনও না। কিছুতে না।

চন্দ্রভূষণবাবু ডাকলেন—কেষ্ট!

—আজ্ঞে!

—আলো নিয়ে সঙ্গে এস। দেখ, হেড পণ্ডিতমশায় কোথায়। ডাক তাঁকে, সুকুমারকে দেখতে যাব আমি।

—এই রাত্রে?

—হ্যাঁ রাত্রেই যাব।

তিনি ডেকে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে আসেন। [পৃষ্ঠা ৩৩৮

হাসলেন তিনি। রাত্রি আর দিন! কেষ্ট বুড়ো হয়েছে, ভুলে গেছে। রাত্রি বারোটায় সংবাদ পেয়েছেন, গ্রামান্তরে একটি ভালোছেলের কঠিন অসুখ! তিনি দেখতে গেছেন। কেষ্টই সঙ্গে গিয়েছে। ডাক্তার নিয়ে গেছেন। বোর্ডিংয়ের ছেলের টাইফয়েড, রাত্রে দু'বার গিয়ে খবর নিয়েছেন। কতদিন এমনি উঠে নিঃশব্দ

পদসঞ্চারে বোর্ডিংয়ের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছেন। ঘরে আলোর ছটা পেয়ে ডেকেছেন—এত রাত্রে আলো জেলে কি করছ? পড়ছ? না। অসুখ করবে, শুয়ে পড়। নিজের হাতে আলো নিভিয়ে দিয়ে এসেছেন। ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ এপ্রিল তিনটে মাস—নিয়মিত নিত্য তিনি বোর্ডিংয়ের ঘরে ঘরে কান পেতে শুনে আসেন, আজও আসেন। তখন সদ্য ঘর ছেড়ে আসে নতুন ছেলেরা। ভর্ত্তি হয়। প্রথম প্রথম নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। মা ছেড়ে আসে! রাত্রে ঘুম আসে না। সকলে ঘুমিয়ে গেলে তারা কাঁদে! অস্ফুট কণ্ঠে মধ্যে মধ্যে মাকে ডাকে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তিনি ডেকে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে আসেন। এককালে নবগ্রামের পথে বের হতেন তিনি। ছেলেদের আড্ডাখানাগুলি জানা ছিল তাঁর। তাস চলত, পাশা চলত। গল্প হৈ-চৈ করত গ্রামের ছেলেরা। তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতেন—

—অনেক রাত্রি হয়েছে কিশোরী। ঘুমিয়ে পড়। No more boys, no more.

বলেই চলে আসতেন। কোথাও শুধু গলা ঝেড়ে সাড়াটুকু দিয়েই চলে আসতেন।

সুকুকে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে।

খেজুরের ডাল দিয়ে পিঠখানা প্রায় রক্তাক্ত করে দিয়েছে। লম্বা রক্তমুখী দাগে পিঠখানা ক্ষতবিক্ষত।

স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। সুকু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

চন্দ্রভূষণবাবুর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। বার্দ্ধক্যের পীত পাণ্ডুর দীপ্তিহীন চোখ দুটি অস্বাভাবিক দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। হেড পণ্ডিতমশায় ভয় পেলেন। চন্দ্রভূষণবাবুর এ দৃষ্টি অন্যে চেনে না, তিনি চেনেন।

ব্রজকিশোরকে চন্দ্রভূষণবাবু যেদিন বলেছিলেন—বেরিয়ে যা তুই, ঘর থেকে বেরিয়ে যা। সেদিন তিনি তাঁর চোখে এই দৃষ্টি দেখেছিলেন।

নবগ্রামের বাবুদের একটি ভালো ছেলেকে সিদ্ধি খেয়ে কুৎসিৎ ব্যবহারের জন্য হলে দাঁড়া করিয়ে বেতের ঘায়ে জর্জ্জরিত করে দিয়েছিলেন যেদিন—সেদিন এই দৃষ্টি তাঁর চোখে তিনি দেখেছিলেন। হেড পণ্ডিত সভয়ে ডাকলেন—মাষ্টার মশাই!

চন্দ্রভূষণবাবু কথার উত্তর দিলেন না। দীর্ঘ পদক্ষেপে নীরবে স্কুলে ফিরে এলেন তিনি।

পরের দিন স্তোত্রপাঠের পরই তিনি বললেন—তোমরা হলে এসে দাঁড়াও। কেষ্ট! আমার বেত নিয়ে এস।

—জীবেন চ্যাটার্জ্জী, ভূপেশ গাঙ্গুলী, দীপেন মিত্র, নিতু দত্ত! দাঁড়াও এদিকে এসে। কেষ্ট—টুল দাও চারখানা। দাঁড়াও তোমরা টুলের উপর!

পণ্ডিত শিউরে উঠলেন—চন্দ্রবাবুর চোখে সেই দৃষ্টি!—মাষ্টার মশাই! মাষ্টার মশাই!

গ্রাহ্য করলেন না চন্দ্রবাবু।

এ অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করবেন না। আপোষ তিনি করবেন না।

সেকেণ্ড মাষ্টার এগিয়ে এলেন।—মাষ্টার মশাই!

—Please, Please—আমার কর্ত্তব্যে আপনি বাধা দেবেন না সীতেশবাবু।

বেত মেরেই ক্ষান্ত হননি তিনি। তাদের স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন। এ স্কুলে তাদের স্থান তিনি দেবেন না। কখনও না, কিছুতেই না। আদর্শের বিপক্ষে কখনও তিনি আপোষ করেননি। একটা সংঘর্ষ তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন—জীবনে ভূপেশ ছেলেদের পাণ্ডা, নবগ্রামের ছেলে, ছেলেদের তারা মাতাতে পারে, প্রয়োজন হলে ভয় দেখাতে পারে, মেরে সাজা দিতে পারে। জীবেন কবিতা লেখে বলে ছেলেদের প্রিয়ও বটে। তার উপর সীতেশবাবু আছেন পিছনে। কিন্তু এমন প্রচণ্ড হতে পারে এ সংঘর্ষ, এ তিনি কল্পনা করতে পারেননি। হোক—সে সংঘর্ষ হোক কল্পনাতীত, তবু তিনি আপোষ করবেন না।

উঠে পড়লেন তিনি চেয়ার থেকে।

সেকেণ্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ল। তাঁর ক্লাস নাইনে ইংরিজীর ক্লাস। চেম্বার্স ডিকসনারী, নোটের খাতা, ইংরিজী সিলেকসন নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

প্রকাণ্ড হল ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। হলের মাঝখান দিয়েই পথ।

সেই ঘড়ির পেণ্ডুলামের টক্ টক্ শব্দটা ক্রমান্বয়ে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। ব্রজকিশোরের মৃত্যু-রাত্রির স্মৃতি জড়ানো রয়েছে ওই শব্দটার মধ্যে। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বুক চিরে বেরিয়ে এল। ব্রজকিশোর! ব্রজকিশোর নেই—ইস্কুল—নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ—এও থাকবে না? কি নিয়ে থাকবেন তিনি? পরমুহূর্তেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন, নিজেকে শক্ত করে তুললেন। না—যাক। আদর্শের জন্য তিনি ব্রজকিশোরকে ত্যাগ করেছিলেন—আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে নবগ্রাম বিদ্যাপীঠকেও বাঁচিয়ে রাখতে চান না। দীর্ঘপদক্ষেপে তিনি হাঁটতে সুরু করলেন। ব্রজকিশোর এম.এ. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। নবগ্রামের বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে তার গোপন গাঢ় অন্তরঙ্গতা ছিল। এই ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই বন্ধুত্ব। তিনি এটা পছন্দ করতেন না। ব্রজকিশোরের অনুরাগের কারণ বুঝতে তাঁর ভুল হয়নি। নবগ্রামের সম্পন্ন ঘরের সন্তানগুলির প্রধান আকর্ষণ তাদের পোষাক, তাদের রুচি, তাদের চালচলন। তিনি বলতেন—খোলস। ঈশপের সিংহ-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের গল্প পড়েছ? অবশ্য গর্দ্দভ সকলে নয়, খাঁটি সিংহও দু' একজন আছে। এবং চামড়া গায়ে গর্দ্দভের স্থলে নেকড়ে চিতাবাঘও আছে, তবুও ওদের সঙ্গে সঙ্গ করো না। ওদের পথ আমাদের পথ এক নয়। ওরা চায় সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা। আর কিছু না। আমি চাই সত্যকারের বিদ্যা। তোমাকে তাই চাইতে হবে। নবগ্রামের বাবুরা জাতে ব্রাহ্মণ কিন্তু কাজে ওরা ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের পেশা নিয়েছে। ওরা ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ আমরা। কায়স্থ হয়েও তপস্যা করে ব্রাহ্মণ হয়েছি। তোমাকে সেই ব্রাহ্মণ হতে হবে।

স্কুল-জীবনে ব্রজকিশোরকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। ব্রজকিশোর অবশ্য গোপন বন্ধুত্ব গোপন রাখতেই পেরেছিল, অতি সুকৌশলে—গোপন রেখেছিল। একদিনের জন্যও ব্রজকিশোর ওদের গায়ের গন্ধ গায়ে নিয়ে আসেনি, কোন দিন ওদের বর্ণাঢ্য জামা-কাপড়ের ছাপ ওর গায়ে দেখতে পাননি। কখনও বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ পাননি, ব্রজকিশোরের জামার রঙের সঙ্গে ঢঙের সঙ্গে ওদের পোষাকের সাদৃশ্য দেখেননি। সেই ব্রজকিশোর কলকাতায় কলেজে পড়তে গেল। ডিষ্টিংশনের সঙ্গে বি-এ পাশ করলে। এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হল। হঠাৎ একদিন গুজব শুনলেন—ব্রজকিশোর পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু নবগ্রামের সুরেনের সঙ্গে কয়লার ব্যবসা করতে নেমেছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এও সম্ভব? ব্রজকিশোর—তাঁর এত কল্পনার ব্রজকিশোর—? তিনি ছুটে গিয়েছিলেন কলকাতায়! নিজের চোখে যাচাই করে—দেখে আসবেন।

কলকাতায় পৌঁছে ইউনিভারসিটি ঘুরে ব্রজকিশোরের বাকী মাইনে এবং অনুপস্থিতির দিনের হিসেব নিয়ে তার মেসে এসে উঠেছিলেন। বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে। তখনও ফেরেনি ব্রজকিশোর। ব্রজকিশোরের দরজায় একটা কাঠের বোর্ড টাঙানো ছিল—কোল-মার্চেন্ট ব্রোকার কলিয়ারি-এজেন্ট। তিনি আর দাঁড়াননি, একখানা কাগজে তাঁর নাম লিখে চাকরের হাতে দিয়েই চলে এসেছিলেন।

তারপর ব্রজকিশোরের সঙ্গে সুদীর্ঘ পত্রালাপ। পত্রে ব্রজকিশোর লিখেছিল—আপনি আমাকে শেষ পর্য্যন্ত স্কুল-মাষ্টারী করিতে বাধ্য করিবেন বলিয়াই আমি এম-এ পড়া ছাড়িয়াছি। স্কুলমাষ্টারী আপনার যত ভালোই লাগুক আমার ভালো লাগে না। আপনি জীবনে যাহাকে বিলাস বলেন আমি তাহাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আপনি দুঃখের মধ্যে আনন্দ অনুভব করেন—ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরব অনুভব করেন—সে অনুভূতি আমার নাই—আমি দুঃখকে দুঃখই বলি—কষ্ট পাই; ত্যাগের অপেক্ষা অর্জ্জনের গৌরবকে আমি ছোট মনে করি না। আমাকে আপনি ক্ষমা করিবেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন, আমার সে বয়স হইয়াছে। আমি আমার পথ বাছিয়া লইয়াছি।

তিনি আপিসে বসেই তার উত্তর লিখেছিলেন—যে পথ তুমি বাছিয়া লইয়াছ সে পথ ও আমার পথ বিপরীতমুখী। সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে আর দেখা হইবে না—এটা তুমি ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিয়াই পত্র লিখিয়াছ বলিয়া মনে করি। অতঃপর যে পত্র তুমি আমার পাইবে—জানিবে সে পত্র আমার শেষ শয্যায় শুইয়া লেখা পত্র।

পণ্ডিত কিশোরীমোহন সচকিত হয়ে তাঁকে ডেকেছিলেন—মাষ্টারমশাই!

পত্র লেখার মধ্যে চন্দ্রভূষণবাবু এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে—পণ্ডিত কখন এসেছিলেন—জানতেই পারেন নাই।

চোখ তুলে চন্দ্রভূষণবাবু বলেছিলেন—পণ্ডিত মশাই!

—কি হয়েছে মাষ্টার মশাই!

—কিছু হয়নি তো!

—হয়েছে। আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি। এমন মূর্ত্তি এমন দৃষ্টিতো কখনও আপনার দেখিনি। কি হয়েছে—বলুন?

চন্দ্রবাবু চিঠি দুখানা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। চিঠি দুখানা পড়ে পণ্ডিত বলেছিলেন—কিন্তু এ কি পত্র আপনি লিখলেন? না—না—।

—ঠিক লিখেছি। দিন।

—না—না—না মাষ্টারমশাই!

—ওর মুখ আমি দেখব না পণ্ডিত মশায়। সেই মৃত্যুকালে যদি ও আসে—তো—। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—আমি খবর পেয়েছি, ব্রজকিশোর মদ্য পান করতে ধরেছে। সুরেনদের

ফার্ম থেকে হোটেলে সাহেবদের পার্টি দিয়েছিল, সেই পার্টিতে—। নিজের চোখে দেখেছেন এমন মানুষ আমাকে বলেছেন।

পত্রখানা উল্টোদিক থেকে সত্য হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যু-শয্যায় দেখতে আসার বদলে ব্রজকিশোর নিজে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তাঁকে দেখা দিতে এল। টাইফয়েডে আক্রান্ত ব্রজকিশোরকে সুরেন এসে পৌছে দিয়ে গিয়েছিল। ব্রজকিশোর কেঁদেছিল, মাফ চেয়েছিল তাঁর কাছে। বলেছিল আমি ভাল হয়ে উঠে আবার আমি কলেজে ভর্ত্তি হব।

ব্রজকিশোরের মৃত্যু হয়েছিল ভোর রাত্রে। সেবা যারা করছিল, তারা তখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঢুলছে। তিনি শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। অকস্মাৎ জীবন-দীপ নিভে গেল। অত্যন্ত নিঃশব্দতার সঙ্গে—অগোচরে তিনি তাকিয়ে থেকেও ঠিক বুঝতে পারেননি। ঠিক দিন শেষে রাত্রি নামার মত। আলো ম্লান হয়ে আসে ক্ষণে ক্ষণে—তারপর হঠাৎ যে কখন অন্ধকার ঘনিয়ে রাত্রি নামে ঠিক বোঝা যায় না। ঠিক তেমনি। তিনি বুঝতে পেরে চাদরখানি টেনে গলা পর্য্যন্ত ঢেকে দিয়েছিলেন।

পণ্ডিতমশায় ছিলেন তাঁর পাশে। তিনিই প্রথম জেগেছিলেন। আর্ত্তস্বরে তিনি ডেকে উঠেছিলেন—মাষ্টারমশাই। কি হল? কিশোর? কিশোর?

মৃদুস্বরে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—নেই। চলুন ইস্কুলের সিঁড়িতে গিয়ে বসি।

ইস্কুলের সিঁড়িতে দুজনেই নির্ব্বাক হয়ে বসেছিলেন। নিস্তব্ধ শেষ রাত্রি, বায়ুস্তরে অন্ধকারে—পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে অণু-পরমাণুতে অনেক স্তব্ধতা ক্লান্তি! তারই মধ্যে তাঁরা যেন ডুবে যাচ্ছিলেন, হারিয়ে যাচ্ছিলেন। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনিই প্রথম বলেছিলেন—সিঁড়িগুলি বড় কম চওড়া। পুরনোও হয়েছে, ফেটেছে। এবার ভেঙে সিঁড়িগুলি বেশ চওড়া

অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা। হেডমাষ্টার ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। [পৃষ্ঠা ৩৪২

করে করাতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে আবার বলেছিলেন—গোড়াতে প্ল্যান তো ভালো হয়নি, অনেক খুঁত থেকে গিয়েছে। এ সবগুলি ভেঙে-চুরে এবার ঠিক করতে হবে।

পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন—ইস্কুলের কথা এখন থাক মাষ্টারমশাই।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—ব্রজকিশোর গেল—এখন এই ইস্কুলই সম্বল রইল পণ্ডিতমশায়। বুড়ো বয়সে খেতেও দেবে। দেবে না? অক্ষম হলেও আমাকে একটা পেনসন দেবে না? তা দেবে। ইস্কুলেই দেহ রাখব, ছেলেরাই সৎকার করবে, ওরাই শ্রাদ্ধ করবে। ওর কথা ছাড়া আর কোন্ কথা কইব?

একটু হেসেছিলেন।

আজ সেই ইস্কুল—। সেও কি?

নিস্তব্ধ হলে ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দ করে চলছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে—ব্রজকিশোরের মৃত্যু-রাত্রির কথা। ঠিক তেমনি।

সামনে ক'মাস পরেই গোল্ডেন জুবিলী!

হঠাৎ তিনি ঘুরলেন। বারান্দায় এসে খড়খড়িতে ঝোলানো পেটা ঘণ্টাটার ফাঁস থেকে কাঠের হাতুড়িটা খুলে নিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন।

মাষ্টারেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন—কে ঘণ্টা বাজাচ্ছে! ওই ছেলেরা নিশ্চয়! ওদের দুষ্ট বুদ্ধির কি সীমা-পরিসীমা আছে! পণ্ডিত বলতে বলতেই এলেন—পাষণ্ডের দল সব। হতভাগারা! কুষ্মাণ্ড কোথাকার!

অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা। হেডমাষ্টার ঘণ্টা বাজাচ্ছেন!

—ছুটি। কেষ্ট দরজা বন্ধ কর।

আপিসে এসে তিনি কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে বসলেন।

পণ্ডিত বললেন—ইস্কুলের লম্বা ছুটি দিয়ে দেবেন বোধ হয়। নয় তো বন্ধ!

* * * *

না।

চন্দ্রবাবু রেজিগনেশন লেটার লিখছিলেন। চিঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন। সেই পোষাকেই দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়লেন পথে। সেক্রেটারীর বাড়ী।

ছেলেরা ফিরে আসুক—ইস্কুল বাঁচুক। আমার আদর্শ ওরা মানছে না, আমার কাল গত হয়েছে! আমি চলে যাচ্ছি—ইস্কুল বাঁচুক।

সেক্রেটারী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এ কি হয়?

—হয়। তাই নিয়ম। এই হবে।

—সামনে জুবিলী?

—হবে। করবে ওরা।

—অন্তত ততদিন থাকুন।

—না।

মাষ্টারেরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন—উনি তো রইলেনই। কাছেই ওই বাড়ী।

হাসলেন চন্দ্রবাবু। বিচিত্র হাসি।

জুবিলী হয়ে গেল সেদিন। কিন্তু চন্দ্রবাবু আসেননি। তিনি কাশীতে চলে গেছেন। তাঁর পত্র একখানি এসেছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন লেখা, একটু বদল করে দিয়েছিলেন—

যখন আমার চরণ চিহ্ন পড়ে না আর এই ঘাটে—

তখন নাই বা মনে রাখলে!

তর্কে বহু দূর

পীঠস্থান

গুরু নানক ঘুরতে ঘুরতে এক বিখ্যাত মসজিদে এসে উপস্থিত হলেন। মসজিদের পশ্চিম দিকে যে পুণ্যস্থান ছিল, সেদিকে পা করে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে একজন মৌলভী এসে নানককে টেনে তুল্লো। ধমক দিয়ে বল্লো, পাপিষ্ঠ, ঈশ্বরের দিকে পা করে শুতে লজ্জা করে না। নানক হেসে বললেন, ভাই আমি তো অন্যায় করেছি কিন্তু তুমি একটা কাজ কর.. যেদিকে ঈশ্বর নেই, সেদিকে আমার পা-টা ঘুরিয়ে রাখ।

নানকের কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পেরে মৌলভী লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চায়।

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভগবান

তোমার পাঁটাদের ওপর কতো দয়া। কত্তো দয়া।

মানুসদের সগ্গে যাবার জন্নে কতো তো কসটো করতে হয়? ছেলেমানুসদের বাপমায়ের কথা শুনতে হয়, খেলার কুডুল দিয়ে বাগানের গাচ কেটে ফেলে বলতে হয় আমিই কেটেচি। মেয়েদের কতো কসটো কোরে পতিভোকতি করতে হয়। বড়দের নৈবিদ্যির কথা না ভেবে ঠাকুর পুজো করতে হয়। মুনিদের চারিদিকে আগুন কোরে তোপিস্যে করতে হয়। তবে তো মরে গেলে সগ্গে যায়?

পাঁটাদের তো ওসব কিচ্ছু করতে হয় না ভগবান। নাপিয়ে কুদিয়ে যা ইচ্ছে তাই কোরে বেড়ালো। কারুর বেগুন চারা মুরিয়ে দিলে, কারুর কচি সাগ খেয়ে ফেললে, কারুর উঠোনে ঢুকে সোসটি পুজোর খই ছড়িয়ে কলা নিয়ে পালালো। যেন ধরাটাকে সরা দেখে বেড়াচ্চে, তবুও কত ভালোবাসো ওদের। একটুও পাপ দাও না তো। তারপর দুগ্গা পুজো এলো কালি পুজো এল। হাঁড়িকাট পোতা হোল। তারপর কাঁসর ঘনটা বাজল তারপর সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা। ভ্যাঁ কচ। তক্ষুণি উদিকে সগ্গ থেকে বিশটুদুত রথ নিয়ে এল বাজনা বাদ্দি কোরে সোজা একেবারে ইনদ্রের সভায় নিয়ে গিয়ে উপোসথিত। কত জন্ম ঘুরে পাঁটা হোয়ে জন্মেছিল তো। আবার যে দেবতাকে সেই দেবতা। পাপ না কচু! গিয়ে দেখো দিব্যি মালা-গলায় দিয়ে অমিরতি খাচ্চে।

কত দয়া করে তুমি চমৎকার ব্যাবোসতা কোরে দিয়েছিলে ভগবান। কত্তো ভালোবেসে। তা যা চারপো কলি পড়েচে, লোকে আর কি সে ব্যাবোসতা দেবে টেঁকতে? সেই কথাই তোমায় নিকচি ভগবান।

আমাদেরও ভুটুটার এবারে সগ্গে যাবার কথা ছিল। ভুটু হচ্চে আমাদের রামছাগলী সৈরুভির ছানা

ভগবান। তিনটি হয়েছিল তা দুটি তো শেয়ালের পেটে গেল। ইনিও যেতেন তা মাসিমা তাড়াতাড়ি মাকালির নামে মানত করিয়ে দিলেন। যেমন ছানা দুটোকে শেয়ালে নিয়ে গেল, তেমনি আবার এই সময় সিঁড়ি দিয়ে নাবতে গিয়ে ঠাকুরদাদা পা মচকে সজ্জ্যেসায়ী হলেন তো। মাসিমা তারকেরসর থেকে ফিরে মার সংগে দেখা করতে এসেছিলেন। খুব সেয়ানা মেয়ে মানুস তো। বললেন—কাতু, দেখচিস কি পোড়া শেয়ালে কচি পাঁটার সদ পেয়েচে। উটিকেও সরাবে, তার চেয়ে তাউই মশাই-এর পা মচকেচে তুই ওটাকে মা কালির কাচে মানত করে দে। তোর পাঁটাও বেঁচে যাবে, ওঁর পাটাও সিগ্গির সিগ্গির সেরে যাবে। পাঁটা না বাঁচে শেয়ালের গেরাস থেকে মাকালি নিজের ধন নিজে না বাঁচাতে পারেন, পায়ের মচকানিটা তো সারিয়ে দিতেই হবে। অধম্ম তো করতে পারেন না জগজ্জননি হয়ে।

বিধবা মানুষ তিত্থিধম্ম নিয়েই থাকেন মাসিমা এসব খুব বোঝেন তো। ওই করলেন মা। এক বছর পরে আবার সিদিন মাসিমা পুসকর তিত্থে মাথা মুড়িয়ে এলেন তো। সে সময় ঠাকুরমার তিন দিন থেকে পেটে বেদনা হয়ে এখন-তখন। মা মাসিমাকে জিগ্গেস করলেন দিদি সৈরুভির তিনটে বাচ্চাই এবার বেঁচে গেচে, একটাকে না হয় মা দুগ্গার নামে মানৎ করে দি? মা সেরে উঠুন তাড়াতাড়ি। মাসিমা বললেন এই বুদধি নিয়ে তোমরা চালিয়েচ সংসার। তিনটি পাঁটা হয়েচে মসতো বড় সমপত্তি। লুটিয়ে দি। কেন ঐ পাঁটাটার কি হয়েচে? মা বললেন ওটা আর বছর মাকালিকে মানৎ করলুম না? মাসিমা বললেন—তা আর বছর থেকে এ বছর এই এক বছরের একটা পাঁটা হোল তো? আবার ঐটেকেই এ বছর থেকে আসচে বছর পজ্জন্ত আবুইমার নামে মানৎ করে দে। হোল না তোর দু বছরের দুটো পাঁটা? তবে মা দুগ্গার নামে নয়। দুই সতিন তো। ঝগড়া বাধিয়ে আবার অনথ কোরে বসিস নে যেন। ঐ মাকালির নামেই দে মানৎ করে।

বড় বোনই তো। এলোধাবারি খরচ করে, হিসেব বোঝে না বলে খানিকটা ধমকও দিলেন মাকে। উনি তিত্থিধম্ম নিয়েই থাকেন সাধুসন্নিসি দেখে বেড়াচ্চেন, ওঁর কথার ওপর ঠাকুরমা ঠাকুরদাদা বাবা মা কেউই তো কথা কন না। ভুটুকে ওবারই বলি না দিয়ে আবার মাকালির জন্নে জিয়ে রাখা হোল।

কি চমৎকার যে হয়েচে ভুটুটা তোমায় কি বলব ভগবান। ইয়া লাস এই নিটোল সরির, গায়ে মাচি বসলে পিচলে পড়ে। তুমি একদিন মাচির রুপ ধরে দেখেই যেওনা বিসসাস না হয় তো। দাদা একদিন হাত পা বেঁধে সরজু সিং-এর কয়লা ওজন করবার পাল্লায় চড়িয়ে দেখলে না? পাককা ন সের। তা হবে না কেন ভগবান? একে রামছাগল তাতে এক বছর আরও বেড়ে গেল তো। সরিরের কথা ছেড়ে দাও, ওর এক একটা ঠাং-এর ওজনই হবে তিন সের করে চার সের করে। আর আমরা সেবাও তো খুব করি। কোথায় কচি ঘাস রে, কোথায় কুঁড়ো রে, কোথায় ছোলা রে চোপোর দিন তো জুগিয়েই যাচ্চি। আমি তুতি, বাঁটুল, মিনু সব্বাই আমরা। তুতি বলে যতো খাওয়াবি তত মাল ছাড়বে সগ্গে যাবার সময়। মরে গেলে আরও ভারি হয়ে যায় তো? তখন ঐ ন সের আঠারো সের হয়ে যাবে। কবজি ডুবিয়ে খাবি। তুতিটা যেন কি ভগবান। ওরকম করে কখনও খাব খাব বলতে আচে? মহাপ্পেসাদ নয়? আর পাঁটারা তো দেবতাও। বলিদানের পর সগ্গে গিয়ে যখন টেরটি পাওয়াবেন তখন বুঝবেন বাছাধন। আমার কি? আমার তো ভুটুকে দেখে মুখে নালও আসে না কিচ্ছু না। আসতে আচে কখনও ভগবান। ছিঃ।

কিন্তু সগ্গ আর কোথায় যেতে পাচ্চেন ভগবান? বলিদান নিয়ে যে গোলমাল বেঁধে গেল ইদিকে। আর বছর থেকেই সুরু হয়েছিল গোলমালটা। তা শেষ পর্যন্ত একরকম করে সামলে গেল। যারা বলেছিল কালিপুজোয় বলিদান হতে পারে না বোষ্টমাপটির দল তারা তো একরকম জিতেই গিয়েছিল মিটিং-এ। শেষকালে পেসিডেন্ট নিজের ভোট দিয়ে তাদের কুপোকাৎ কোরে দিয়ে সেই বলিদান কায়েম রাখলেন তো।

এবার কিনতু কোন আশা নেই ভগবান, তাই ভুটুর জন্নে ভয়ংকর মনটা খারাপ হয়ে আচে। তাই তোমায় তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে বসেচি। আহা অবোলা জীব ও কি অতশত বোঝে তোমাদের সাকতো পাটি আর বোসটোম পাটি বাপু? কত জম্মের পাপে এই ছাগল হোয়ে জম্ম, আর কেন ওকে ভালোয় ভালোয় যেতে দাও তোমরা। কি কসটো যে হচ্চে আমাদের ভুটুটার জন্নে ভগবান। আমার বাঁটুলের মিনুর তুতির বিশুর সব্বার। বাঁটুলের দিদিমা আবার ঐটুকু বয়েসেই ওর পৈতে দিয়ে দিলে তো কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে। এক বচ্ছর আবার ব্রেন্মা-মাংস খেতে পাবে না। ভুটুর এক আধ টুকরো মহাপ্পেসাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিল বেচারি। তা সে আশায় বুঝি জলানজলি দিতে হোল। বলিদান হোলে তবে তো মহাপ্পেসাদ। তা তোমায় বললুম না? সে বলিদান তো এবার বনদো হতে চলল। পেসিডেন্টই তো নিজের ভোট দিয়ে গেল বছরে বোসটোম পাটির ওদের হারিয়ে বলিদানটা কোন রকমে রাখলেন। তা সেই পেসিডেন্টই তো এবার উলটে গেচেন। এবার একেবারে বোসটোম পাটির দলের দিকে। খাওনা কত খাবে সবাই আক আর চালকুমরোর বলিদান।

"পাককা ন সের।" [পৃষ্ঠা ৩৪৫

আহা পেসিডেন্টেরই বা দোষ দি কি করে ভগবান? ওবিসসি ভুটে সগ্গে যেতে পাবে না বলে রাগ

আমার খুবই হচ্চে তবে দুখখুও তো হয়। ওঁর নাতি বিমল আমাদের কেলাসে পড়ে তো, সেই বলছিল। বিমল খুব দুখখু করে বললে ভাই পোনু সবাই তো বলে দাদু একেবারে ডিগবাজি খেয়ে মাংসখোরদের দিক থেকে মালপো-খোরদের দিকে চলে গেল এবার। তা তুই বিচার করে দেখ না দাদুর আর গরজটা কি? আর বছর যে ওদের জিতিয়ে দিলে নিজের ভোটটা দিয়ে তা আর বছর পজ্জন্ত নিজের সাতটা দাঁতও তো ছিল। ওপরে চারটে নিচে তিনটে। তা মাকালির যদি তাই ইচ্ছে তো একেবারে সব কটি নিম্মুল করে দিতে গেলেন কেন? মাড়োর দুটি ছেড়ে দিয়েচেন তাও সুদু ওপরে। তারা মাংস চিবুবে কি একটু অসাবধান হলে নিচের মাড়িটাকে পেঁট পেঁট করে সুদু বিঁদতে আচে। এই তাদের কাজ। যে দাদু অত করে নিজের ভোট দিয়ে মার জন্নে বলিদানটা বজায় রাখলেন লুভিস্‌টি বুড়ো বলে চারিদিকে কত ঠাট্টাও উঠল, তার প্রতি মার এই বিচার হোল? তুই বলনা ভাই পোনু। নইলে যে দাদু আমার এক সময় বলিদান দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা আসতো মহাপ্পেসাদ একলা খেয়েচে, সেই আজ চালকুমরোদের দলে চলে যেতে চাইচে। অভিমান হয় না মাকালির ওপর?

আমি তবুও একটু বললুম ভগবান। ভুটুর কথা ভেবে রাগও তো হচ্ছিল। বললুম কেন আজকাল বেশ ভালো করে বাঁদাতেও তো পারা যাচ্চে দাঁত। তোর দাদু জমিদার মানুষ একেবারে কলকাতার সায়েবি দোকান থেকে বাঁদিয়ে আনতে পারে তো। বিমল বললে তাতো এনেচেই। দাদু কি বসে আচে? তবে সে ভগবানের দাঁত আর এ চিনেবাড়ির দাঁত। এক হয় কখনও? কলকাতার ঠিয়েটার দেখে এসে তোর এখেনকার জেলেপাড়ার যাত্রা দেখে মন উঠতে পারে?

মরুক গে কারুর ঘরের কথায় থাকতে আচে ভগবান? কার দাঁত আচে আর দাঁত নেই তার সংগে আমার কি সমপরকো বলো না। আমার দুখখু ভুটুর বুঝি আর হোল না সগ্গে যাওয়া। দুবচর হয়ে গেল। এখনও কোন রকমে বুদধিমান আচে এর পর বোকা পাঁটা হয়ে যাবে তো। গায়ে বিকটেল গণদো ওকে কি আর সগ্গের তিসিমানার মধ্যে ঢুকতে দেবে দেবদুতেরা ভগবান?

এবারে বোসটোম পাটিরা জিতবেই ভগবান। সুদু যদি তুমি দয়া করে ওবিনেস হাজরাকে জিতিয়ে দাও তো সামলায় এবারটা। সেই কথা বলতেই এই চিঠি নিখতে বসেচি এত কসটো করে তাড়াতাড়ি।

আজ আমাদের বৈঠকখানায় কালিপুজোর রিহারসেল বসেছিল ভগবান। ঠিয়েটার হবে তো চনদ্রো গুপতোর ডি এল রায়। কাকে কোন পাট দেওয়া হবে তাই ঠিক করবার জন্নে আজ রিহারসেল বসেছিল। রিহারসেল আর বসবে কি ছাই বলিদান ভালো কি মোনদো তাই নিয়ে তক্ক বেধে গেল। আজকাল যেখেনেই যাও ঐ কথা তো।

বাঁটুলের দাদা রঘুদা বললে কালিপুজো করতে যাচ্চ তাতে পাঁটার নাম গনদো নেই এ পুজো পুজোই নয়। মাকালিকে ওদিকে চটিয়ে ছেঁড়া শিনের সামনে দাসুর হাত-পা ছ্যাতরানো ওরিএনটাল নাচ দেখিয়ে কাজ আদায় করবে সে ভাঁওতায় ভোলবার মেয়ে নয় তিনি। সুতরাং যেমন বলিদান তুলে দিচ্ছ সব্বাই তেমনি ঠিয়েটারও দাও তুলে। অনতোতো শম্মা তো নেই এর মধ্যে। খাঁড়া কোথায় একটু বেধে গেল তাইতেই চটে খুন সামাল সামাল রব উঠে যায় আর এ একেবারে মুলে হাবাত বলিদানই বনদো। কে এ ঝনঝাটের মধ্যে থাকতে যাবে বাবা?

দাসু বললে বলিদান মানে কি বল দিকিন? ভারি তো টিকি দুলিয়ে চানক্য পোনডিতের পাট করতে যাচ্চিস। বলিদান মানে বেচারি ছাগলির বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে এসে কোপ দেওয়া না? তার তো কেউ

বলবার নেই।

বিশুর ছোট কাকা সতু বললে, ভারি তো মানে বাংলাতে বসেচিস আর সাসতোর দেখাচ্চিস। মার সামনে ঐ একটা কোপের দাম জানিস? একেবারে বৈকুনঠো। হুজুগে মেতে বনদো করতো যাচ্চিস, ইদিকে পেটে বোমা মারলে তো এক অকখর সংসকৃতো বেরোয় না। পুরুত-মশাইকে জিগ্যেস করগে যা বুঝিয়ে দেবে তারপর তক্ক করতে আসিস।

দাসু বললে—পুরুতমশাইকে বৈকুনঠে পাঠিয়ে দে না। দক্ষিণে কাপড় চোপড় নৈবিদ্যি কিছুই দিতে হবে না।

তুতির দাদা গোজুদা বললে তার চেয়ে সগ্গে ওর ঠাকুরদাকেই দিক না পাটিয়ে হাঁড়িকাটে ফেলে। বুড়ো মানুষ আজ বাত তো কাল অমলোসুল তো পরশু হাঁপানির টান তার চেয়ে দিব্বি ইনদ্রোসভায় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গড়গড়া টানবে আর উব্বোসির নাচ দেখবে।

গোজুদার সঙ্গে সতুকাকার বড্ড ঝগড়া তো কে ভালো মেয়ের পাটটা নেবে তাই নিয়ে। সতুকাকা চটে উঠল খবরদার বাপ ঠাকুরদা তোলবি নি গোজু। ভালো হবে না।

আমার দাদা সেকরেটারি তো অত ঝগড়া চায় না বললে বাপের কথা তো বলেনি তুমি টেনে আনচ কেন?

সতুকাকা বললে বাকিটা কি রাখলে হিরুদা। ঠাকুদ্দা হোল বাবার বাবা। আমি ওর জিভ টেনে নোব।

গোজুদা বললে। নে, জিভ টানে সব মেয়া।

এর পর যেমন অন্ন অন্ন দিন হয় ভগবান। এর দিক থেকেও একেবারে অনেক জনে হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল—রঘুদা, নরুদা, জিতেন, নিবারণ, যতে লাট আরও অনেক সব। ওর দিক থেকেও অনেক জনে হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল। বেঁটে আশু, দাসুদা পচা গোবরদা বিধু আরও অনেক সব। তারপর কেউ কেউ দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কেউ কেউ জামার আসতিন গোটাতে আরম্ভ করলে তারপর আমরা খড়খড়ি দেওয়া জানলার বাইরে নুকিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলচি হে ভগবান যেন লেগে যায় অহিংস আনদোলন যেন লেগে যায় অহিংস আনদোলন এমন সময় ওপাড়ার মজুমদার মশাই এসে বললেন কৈ হে হিরু আচো? এই যে রয়েচ দেখচি একবার উঠবে তোমার সংগে বিসেস দরকার আচে একটু। দাদা জিগ্গেস করলে দেরি হবে মজুমদার মশাই? মজুমদার মশাই বললেন তা একটু হবে। দাদা এদের বললে তাহ'লে আজ না হয় বনদোই থাক। মজুমদার মশাই সবার দিকে চেয়ে হেসে বললেন এত কাচাকাচি এসে বনদো থাকবে? বাইরে থেকে যেমন শুনছিলুম মনে হোল তো আরম্ভ হয়ে গেচে যুদধের সিন। বুঝি ফাঁকি পড়লুম। উনি আবার খুব আমুদে মানুস তো।

ঝগড়া একবার এই রকম আচমকা বনদো হয়ে গেলে আবার কি কোরে কোন কথা বোলে আরমভো করতে হবে সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না তো ভগবান। একটু নজ্জা নজ্জাও করে। ওরা এক এক কোরে উঠে গেল। নিবারণ উঠে যাচ্ছিল, রঘুদা বললে একটু বসবে না নিবারণ। এক সংগে যেতুম। একটু চোখ টিপেও দিলে। নিবারণ যতে লাটকে বললে তাহলে যতিন একটু দাঁড়িয়ে যা না। একটু চোখ টিপেও দিলে। যতে লাট নোরুকে বললে নোরু চললি নাকি? বলে আবার ওদের মতন একটু চোখ টিপেও দিলে। সতুকাকা সিগরেট ধরিয়ে পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল তো? জুতো পরতে পরতে এদের

দিকে চাইতে ওরা সবাই মিলে চোখ টিপে দিলে। সতুকাকা আবার জুতো ছেড়ে এসে বসল। ততক্ষণে আর সবাই চলে গেচে তো। একটু এদিক ওদিক চেয়ে জিগ্যেস করলে কি ব্যাপার? রঘুদা বললে মজুমদার মশাই যখন এসেছিল তখন একটা কিছু ব্যাপার আচেই। এ আবার আজকাল ওবিনেশ হাজরার দিকে ভিড়েচে তো। একটু বসেই যাও না, হিরুদা আসুক। আমায় টিপেও দিয়ে গেল। বরং তাসটা পাড় না ততক্ষণ। এক হাত হোক।

দাদা অনেকক্ষণ পরে এল ভগবান। তারপর একবার সবার দিকে চেয়ে বললে তোরা সবাই এদিককারই তো দেখচি। তাহলে শোন। ওবিনাশ হাজরা এবার পেসিডেণ্ট হতে চায় চৌধুরিমশায়ের সংগে টেক্কা দিয়ে। আরও অনেক কথা বললে ভগবান। আরও চুপি চুপি। চোরা বাজারে টাকা করে এখন একটু শক হয়েচে। ওকে ভালো কোরে দুইতে হবে। আরও অনেক কথা ভগবান।

আমার যে কি কসটো হোচ্ছিল ভগবান তোমায় কি বলব। সত্তি সত্তি সত্তি। এই তিন সত্তি গালচি। কিন্তু আমি কি করব? আমায় যে সবাই পেচন থেকে চেপে ধরেচে দুসটুমি করে শোনবার জন্নে। বাঁটলু, বিশু, মিনু খুদে তুতি। আমি চেঁচালে ওর আবার ধমক খাবে তো। পরের ছেলে আমাদের বাড়ি এসে। তার ওপর তুতিকে আবার আমি লব করি তো। বড় হলে বিয়ে করব।

"বাপের কতা তো বলেনি, তুমি টেনে আনচ কেন?" [পৃষ্ঠা ৩৪৮

দাদাদের অনেক কথা হোল ভগবান। অত কথা তোমায় লেখবার সময় নেই আর ঘোঁরার প্রবনধো তো অনেক বড় হয় না। দাদাকে তাই বলেচি কিনা। তোমার সব শোনবার দরকারও নেই। ওবিনেশ হাজরাকে পেসিডেণ্ট করলে বলিদানের ব্যাবোসতা একেবারে পাকা। চৌধুরি মশাইকে ডাউন করতে পারলে ওঁর সংগে চারজন বেরিয়ে যাবে। ওঁর চারজন মোসায়েব যাদব পাল, রমেশ চৌধুরি, সতিনাথ আর বেজেন রায়। তেমনি ওবিনেশ হাজরা এলে ওর চারজন মোসায়েব এসে বসবে তাদের জায়গায়।

তোলো তোমরা কি কোরে বলিদান তুলবে। আর ওবিনেশ হাজরা বলেচে পাকা এসটেজ্ঞ করে দেবে। মেয়েদের বসবার জায়গাটা বাঁধিয়ে দেবে। দাদারা ঠিক করেচে ওর ভোটের জন্নে উঠে পড়ে লাগবে।

লোকে বলবে দেখেচ টাকার লোভে চোরাবাজারীর দিকে ঢলল সবাই। তা বলুক গে লোকে সব রকম বলে। তেমনি দাদাদেরও তো বলবার মুখ আচে—তোমাদের চৌধুরি মশায়ের যত দিন দাঁত ছিল ততদিন কালিপুজো। দাঁত গেল তো রাতারাতি তার জায়গায় কেসটো ঠাকুরটিকে এনে বসিয়ে দিয়ে বোসটোম বনে গেল? পুজো না খেলা?

তাই তোমায় তাড়াতাড়ি লিখতে বসেচি ভগবান। ওবিনেশ হাজরাকে জিতিয়ে দিও। চৌধুরি মশাই যদি চেসটা করতে যায় ওঁর ঐ দুটো দাঁতে এমন জনব্রোনা লাগিয়ে দিও যে যেন টের না পান কোথায় দিয়ে কালিপুজোটা গেল বেরিয়ে।

আহা দিও গো দিও। নৈলে আমাদের দুঃখি ভুটের এ জম্মে আর সগ্গে যাওয়া যে হবে না ভগবান।

তর্কে বহু দূর

রাজার শিক্ষা

নগ্নসন্ন্যাসী ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রায়ই কাশীর গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। উজ্জয়িনীর রাজা একদিন নৌকো-বিহার করতে করতে তাঁকে দেখতে পান এবং নৌকোতে তুলে নেন। রাজা তাঁকে চিনতেন না, তাই নানাভাবে তাঁকে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ স্বামীজি রাজার কোমর থেকে একটা দামী ছোরা তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। সেই সোনায়-মোড়া ছোরাটি রাজা বৃটীশ-সরকারের কাছ থেকে সম্মানরূপে পেয়েছিলেন। সেই অমূল্য ছোরাটি এইভাবে গঙ্গার জলে হারিয়ে যেতে দেখে, রাজা ভীষণ রেগে উঠলেন। চীৎকার করতে লাগলেন। তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামী গঙ্গার জলে হাত ডুবিয়ে দুটি ছোরা তুল্লেন, দুটি একেবারে একরকম দেখতে। স্বামীজি হাসতে হাসতে রাজাকে বল্লেন, কোন্‌টি তোমার ছোরা, চিনে দাও! রাজার মুখে তখন আর কোন কথা সরে না। তিনি স্বামীজির পায়ে লুটিয়ে পড়েন।

তিন প্রভু

—শ্রীকালিদাস রায়

দীর্ঘ পথের দুঃসহ-ক্লেশ সহি'
গৌড় হইতে আধমণ চাল পুরীধামে আনি' বহি',
গদাধরে সঁপি' বলেন নিতাই—"করি' কিছু রন্ধন,
শ্রীগোপীনাথের ভোগে কর নিবেদন।"

গদাধর প্রেমাকুল,
কহিলেন—"এযে বড় দুর্লভ সুগন্ধ তণ্ডুল
কেমন করিয়া দাদা,—
এর অন্নের রাখি বল' মর্য্যাদা?
এর উপযোগী ব্যঞ্জন নাই ঘরে,"
নিতাই বলেন—"ভক্তির রূপে ব্যঞ্জন অন্তরে।"
হাসি' গদাধর টোকাটি লইয়া হাতে
গেলেন তখন কুটীরের পশ্চাতে ;

আনিলেন তুলে অজানা বন্য-শাক
তাই করিলেন পাক।

পাকের অর্থ সিদ্ধ করিয়া লবণের সংযোগ,
ভাবিলেন শেষে ইহাতে কি হবে শ্রীগোপীনাথের ভোগ?
বাড়ীর উঠানে তেঁতুলের গাছ, চড়ি' তায় কোনমতে
কচি কচি পাতা ছিঁড়ে এনে গাছ হ'তে
নুন দিয়া তাই বাটি'
ব্যঞ্জন এক বানালেন পরিপাটী।

কুন্দশুভ্র অন্নের কূট রচি' কদলীর পাতে
তুলসী-পত্র দুটি রাখিলেন তাতে।
শ্রীগোপীনাথের ভোগ হ'ল যবে সারা
'হরি হরি' বলি' গৌর এলেন ভাবাবেশে মাতোয়ারা!
কহিলেন প্রভু—"প্রসাদ-গন্ধ আমারে আনিল ডাকি',
মোরে দিয়ে ভাই ফাঁকি,
তোমরা দুজনে প্রসাদ লুটিবে তাও কি কখনো হয়?
তাও কি এ প্রাণে সয়?"

কহিল নিতাই—"অতি দীন আয়োজন,
অন্নই আছে, নাই কোন ব্যঞ্জন।
তোমার যোগ্য ভোগ্য-ত হেথা নাই,
তোমারে ডাকিতে সাহস করেনি তাই গদাধর ভাই!"
কহিলেন প্রভু—"তুলসী-পত্র রয়েছে ভোগের 'পরে
কোন্ মূঢ় বলো তাহার উপরও ব্যঞ্জন খোঁজ করে!
জগদানন্দ ভোজনবিলাসী আমারে করিতে চায়,
তোমরাও মোরে ভুল বুঝিয়াছ হায়!
এমন প্রসাদ মিলিবে কি মোর কভু?"

তিনভাগ করি' ভোজন করিতে বসিলেন তিন প্রভু।
মুখে গ্রাস তুলি' শচীনন্দন কহিলেন—"গদাধর,

প্রসাদান্নের গন্ধে আমার পুলকিত কলেবর।
কোথা পেলে হেন শাক্?
তোমার শাক যে স্মরায় আমার মায়ের হাতের পাক!
রাঁধিতে তুমি কি শিখেছ বৃন্দাবনে?
তেঁতুল-পাতার হেন ব্যঞ্জন খাই নাই এ-জীবনে।
মম রসনার সংজ্ঞা হরেছে বহুবিধ উপচার,
তেঁতুল-পাতার এই চাটনিতে জড়তা ঘুচিল তার।

আজি মোর মনে পড়ে
শান্তিপুরের ভোজনোৎসব অদ্বৈতের ঘরে!
মোরে বাসুদেব সার্বভৌম করিল নিমন্ত্রণ,
মনে পড়ে সেই ষাঠীর মাতার অপূর্ব রন্ধন,
নানা উপচারে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
পানিহাটি গ্রামে পুলিন ভোজন রাজকীয় আয়োজন,
তাও স্মরে মোর মন।
বছর বছর রাঘব-গৃহিণী সযতনে ঝালি ভরি'
কত উপাদেয় খাদ্য পাঠায় তাহাও স্মরণ করি।
খাইতেছি যাহা আজ
সবারে হারালো, সে সবেরে দিল লাজ।

শুন গদাধর, হেন ব্যঞ্জন অন্ন অমৃতোপম,
কখনো কোথাও পরশ করেনি এই রসনারে মম।
মাতৃভূমির মাটির মমতা, মায়ের আশীর্বাদ,
দীর্ঘপথের শ্রমজলে স্নাত নিতাই ভায়ের সাধ,
শ্রীগোপীনাথের প্রসাদী করুণাসুধা
হরিল আমার চিরদিনকার ক্ষুধা।

বন্য-শাকের তেঁতুল-পাতার ব্যঞ্জনে প্রতিকণা
তোমার প্রেমের পরশে পেয়েছে লোকাতীত ব্যঞ্জনা।
হেন উপচার সমাবেশ কোথা মিলেছে কলার পাতে?
গৌর নিতাই আর গদাধর তিন ভাই একসাথে
পাশাপাশি বসি' যাহা সম্ভোগ করে
পরমানন্দ ভরে।"
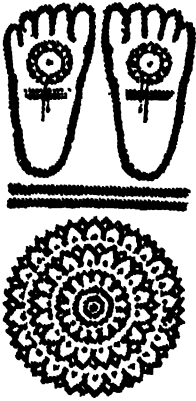
দেখিতে দেখিতে ভক্তের দল আসিল সেথায় ছুটি'
হাত পাতি' চায় প্রসাদের কণা দুটি
'টোটা' হল আজ পরমতীর্থ ত্রি-প্রভুর সমাবেশে,
অন্নের কণা না পাইয়া তারা শেষে
এঁটোপাতা লয়ে করিতে লাগিল ছেঁড়াছেঁড়ি কাড়াকাড়ি
দেখি' তায় বাড়াবাড়ি
নিতাই গদাই দোঁহে জুড়িলেন হরিনাম-কীর্ত্তন
হইলেন গোরা ভাব-ঘোরে নিমগন!

তর্কে বহু দূর

চির-মুক্ত

স্বামী তুরীয়ানন্দ কোলাপুর রাজ্যের সীমান্তে গাছতলায় বসে আছেন। যে কাছে আসে, তাকে উপদেশ দেন, বলেন, তোমার ভয় কি. তুমি তো মুক্ত! এমন সময় রাজা শিকার করে ফিরছিলেন। স্বামীজির মুখে সেই কথা শুনে রাজা বল্লেন, তুমি পাগলের মত এ কি বলছো? স্বামীজি বলেন শুধু, আমি চির-মুক্ত। রাজা বিদ্রূপ করে বলেন, দেখি কেমন তুমি চির-মুক্ত। এই বলে সঙ্গের সৈন্যদের আদেশ করলেন স্বামীজিকে বাঁধতে। সৈন্যরা স্বামীজিকে বেঁধে নিয়ে এলো। রাজা একটা অন্ধকার ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখলেন। সভাসদদের নিয়ে তিনি গল্প করতে বসেছেন, বলেন, আজ সেই সন্ন্যাসীটার বুজরুকী আমি বন্ধ করেছি। এমন সময় দেখেন, হাসতে হাসতে স্বামী তুরীয়ানন্দ আসছেন। রাজা অবাক হয়ে যান। স্বামীজি তেমনি হাসতে হাসতে বলেন, রাজা, তোমার বন্দীশালা পড়ে রইলো, আমি চল্লুম। দেখতে দেখতে সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে যান।

—যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

ছোটদের আমি ভালবাসি। পূজাবার্ষিকী বাহির হইবে আর তাহারা আমার লেখা ম্যাজিকের খেলা পাইবে না—একথা ভাবিতেও পারি না। কাজেই সোজা কয়েকটি নূতন খেলার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

জলের গ্লাস অদৃশ্য করা
(Vanishing glass of water)

জলের গ্লাস অদৃশ্য করার খেলাটি নূতন নয়—ইতিপূর্ব্বে আমি আমার একটি প্রবন্ধে তারপর পুস্তকে এই খেলার গোপন কৌশল প্রকাশ করিয়াছি। সেখানে একটি জলপূর্ণ গ্লাসকে রুমাল দিয়া ঢাকিয়া পরে সেই রুমালটি দর্শকদের সম্মুখে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেখান হয় যে জলের গ্লাস অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সেখানে খেলা শেষ করিবার পর রুমালটি দর্শকদের নিকট দেওয়া যায় না, কারণ উহার মধ্যে রিং বা চাকি সেলাই করা থাকে। বর্ত্তমানে এই খেলাটির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে এবং আমার পাঠক-পাঠিকাদিগকে সেই নূতন অতি আধুনিক উপায়ে জলের গ্লাস অদৃশ্য করার খেলাটি শিখাইয়া দিতেছি।

যাদুকরের টেবিলের উপর একটি কাঁচের গ্লাস বসান রহিয়াছে—যাদুকর উহার মধ্যে কিছু জল

অথবা দুধ বা অন্য কোনও তরল পদার্থ ঢালিয়া দিলেন এবং একটি রুমাল দিয়া উহা ঢাকিয়া দিলেন। রুমাল-ঢাকা অবস্থায় জলের গ্লাসটি টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া যাদুকর তাঁহার দর্শকদের নিকট আনিলেন এবং বাহির হইতে হাত দিয়া অনুভব করিতে বলিলেন যে সত্যিই জলের গ্লাস উহার মধ্যে আছে কিনা। দর্শকগণ উহা ভালরূপে দেখিয়া স্বীকার করিলেন যে সত্য সত্যই গ্লাসটি ঐ রুমালের মধ্যে রহিয়াছে।
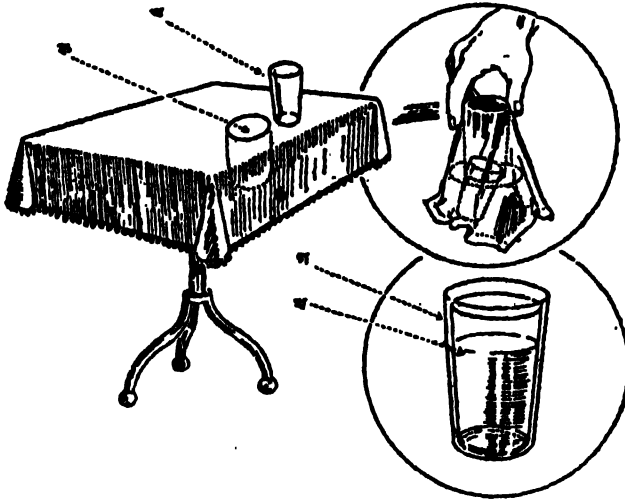
'ফেক্' (নকল) গ্লাসের সাহায্যে আসল গ্লাস অদৃশ্য করা হচ্ছে।

এক্ষণে যাদুকর রুমালের মধ্যে নীচ হইতে হাত ঢুকাইয়া দিয়া অপর হাতে রুমালটি উঁচু করিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণ মনে করিলেন যে, যাদুকর এইবার জলপূর্ণ গ্লাস আর একবার সকলকে দেখাইবার জন্য বাহির করিয়া আনিতেছেন। সমস্ত ব্যাপারই সর্ব্বসমক্ষে একদম পাদ-প্রদীপের নিকট আসিয়া করা হইতেছে। যাদুকর তৎক্ষণাৎ রুমালটি ঝাড়িয়া দর্শকদের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য! জলসহ কাঁচের গ্লাস অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! রুমালটিতে কোনপ্রকার কৌশলই করা নাই, সকলেই হতবাক হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন, বিশেষ করিয়া যাঁহারা পূর্ব্বেকার প্রণালীতে খেলাটি জানিতেন। এইবার খেলাটির গুপ্তকৌশল প্রকাশ করা যাইতেছে।

টেবিলটিতে পূর্ব্ব হইতেই একটি গর্ত্ত করিয়া রাখিতে হয়—এই ধরণের গর্ত্তের নাম ইংরাজীতে "সারভেন্টি" (Servante). টেবিলের উপর গর্ত্তকরা থাকে এবং উহার নীচে ঐ মাপে থলে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। টেবিলক্লথের উপর নানারূপ ডিজাইন করা থাকে, কাজেই ঐ ছিদ্র নজরে পড়ে না। চিত্রে ঐ ছিদ্রটিকে 'ক' দ্বারা দেখান হইয়াছে এবং নীচে রাবারের একটি থলিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে জলপূর্ণ গ্লাসটি পড়িলে জল নীচে না পড়ে।

গ্লাসটিতে কৌশল আছে। উহা একটি সাধারণ বড় কাঁচের গ্লাস এবং উহার বাহিরে একটি মোটা সেলুলয়েডের খোল দিয়া বেড় বা খোলস তৈয়ারী আছে। ইংরাজীতে এই ধরণের খোলসকে 'ফেক' (fake) বলে। আসল গ্লাসের উপরে খাপের মত 'ফেক' গ্লাস পরাইয়া টেবিলের উপর প্রথম চিত্রের ন্যায় বসাইয়া রাখিতে হয়। সর্ব্বসমক্ষে উহাতে জল ঢালিয়া তারপর উহাকে রুমাল চাপা দিতে হয়। রুমাল চাপা দিয়া গ্লাসটি একটু পেছন দিকে সরাইয়া লইলেই আসল গ্লাস নীচে থলেতে পড়িয়া যাইবে।

চিত্রে দেখান হইয়াছে 'খ' আসল গ্লাস যাহাতে জল রহিয়াছে, 'গ' উহার বাহিরের কৃত্রিম 'ফেক' গ্লাস।

যাদুকর এই 'ফেক' গ্লাস রুমাল চাপা দিয়া সর্ব্বসমক্ষে লইয়া যাইবেন এবং এইটিই সকলে হাতে অনুভব করিয়া দেখিবেন সত্যিকার গ্লাস ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। পরের অংশ অত্যন্ত সহজ। সকলকে পরীক্ষা করাইবার পর যাদুকর রুমালের নীচে হাত দিয়া গ্লাস বাহির করিবার ছলে ঐ নকল গ্লাসটি হাতের মধ্যে চুড়ির মতন করিয়া গড়িয়া লইবেন এবং রুমালটি ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া দিবেন। দর্শকগণ কেহই আস্তিনের দিকে তাকায় না, কারণ জলপূর্ণ গ্লাস ঐখানে কখনও লুকান যাইবে না। সকলেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া আছেন।

হুডিনীর চালাকী

(Production from Bowl)

যাদুকর হুডিনীর নাম পৃথিবীখ্যাত। তিনি এই খেলাটি আমেরিকায় হিপোড্রোম থিয়েটারে দেখাইয়া রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ষ্টেজের উপর একটি ম্যাজিকের টেবিল রহিয়াছে—যাদুকর সেই টেবিলের উপর একটি ফ্রেমে বাঁধান কাঁচ পাতিয়া দিলেন তারপর উহার উপর একটি বড় কাঁচের পাত্র বসাইয়া দিলেন। সর্ব্বসমক্ষে সেই কাঁচের পাত্রে জল ঢালিয়া দেওয়া হইল এবং উহাতে কিছু কালি ঢালিয়া দিয়া জলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করা হইল। যাদুকর ঐ কালো জলে হাত দিয়া দেখাইলেন যে উহা কাঁচের বাটিতে কালো জল মাত্র। তারপর তিনি দ্বিতীয় বার হাত

কালো জলের মধ্য হইতে শুকনো রুমাল বাহির হইতেছে।

ডুবাইয়া জলের মধ্য হইতে নানা রং-এর শুকনো রুমাল বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন এবং টানিয়া আনিয়া একটি চেয়ারের উপর স্তূপ করিয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পর সেই রুমালগুলি নাড়াচাড়া করিতেই

উহার মধ্য হইতে এক বিরাট ঈগলপাখী বাহির হইয়া পড়িল। হুডিনীর হাতে এই খেলা অত্যন্ত চমকপ্রদ হইত, কারণ তিনি তৎকালে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর ছিলেন এবং তাঁহার প্রদর্শনভঙ্গী ছিল অনন্যসাধারণ। খেলাটির কৌশল কিন্তু মোটেই কঠিন নহে।

টেবিলটি যাদুকরের টেবিল, উহার উপরে ছিদ্র করা আছে এবং তলায় থলের মধ্যে অনেক রুমাল আগে হইতেই লুকান আছে। যাদুকর ঐ রুমালগুলিই টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছেন মাত্র।

ছবির সাহায্যে যাদুকরের কৌশল প্রকাশ।

কাঁচের বাটীটি সাধারণ মনে হইলেও তাহা নহে। উহার মধ্যখানে বড় ছিদ্র করা আছে এবং সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া টেবিলের মধ্যকার রুমাল টানিয়া বাহির করা হয়। এই ছিদ্রের উপরে একটি কাঁচের অথবা সেলুলয়েড বা প্লাষ্টিকের একটি "সিলিণ্ডার" বেড় আটকাইয়া দিতে হয়—চিত্রে উহা ভালভাবে দেখান হইয়াছে।
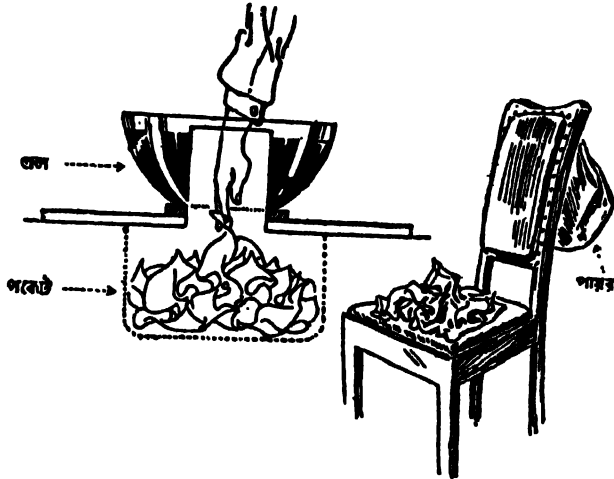
কাঁচের পাত্রে জল ঢালিলে উহা ঐ সিলিণ্ডারের চারিপাশে থাকে এবং দর্শকগণ মনে করেন উহাতে বাটীটি ভর্ত্তি হইয়াছে। মধ্যখানের কাটাটা নজরে পড়ে না। পরে কালি গুলিয়া দিলে সেই কালো জলের মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া দিয়া চিত্রের ন্যায় রুমাল বাহির করিলে দর্শকগণ মনে করিবে ঐ বাটীর জল হইতেই অতগুলি শুকনো রুমাল বাহির হইতেছে। রুমালগুলি টানিয়া আনিয়া একটা চেয়ারের উপর জমা করিতে হয় এবং জমা করা রুমালগুলি উঠাইবার সময় চেয়ারের পেছন হইতে পুঁটুলিবাঁধা ঈগলপাখীটি তুলিয়া লইতে হয়।

বলা বাহুল্য, চেয়ারের পেছনে পূর্ব্ব হইতেই ঈগলপাখী পুঁটুলি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। পুঁটুলিটি একটা পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। সাধারণ পেরেকের মাথা কাটিয়া প্লেন করিয়া লইতে হয়। আমি সাধারণতঃ গ্রামোফোনের পিন দিয়া এই কাজ করি—উহা মাথা সমান প্লেন, কাজেই সহজে সমাধা হয়। হুডিনীর প্রদর্শন-ভঙ্গী ছিল উচ্চশ্রেণীর এবং তিনি একটি পোষা ঈগলপাখী এই খেলায় ব্যবহার করিতেন। পৃথিবীর অন্য কোনও যাদুকর ঈগলপাখী ব্যবহার করেন না। আমরা সাধারতঃ হাঁস, পায়রা, খরগোস প্রভৃতি বাহির করিয়া থাকি।

ফ্রেমটিতে যে কাঁচ লাগান থাকে উহা একটু সরাইয়া (slide করিয়া) লইতে হয়। দর্শকগণ উহা বুঝিতে পারেন না এবং আরও অবাক হন। ম্যাজিকের আসল কথাই প্রদর্শন-ভঙ্গী বা showmanship

এবং যাঁহার প্রদর্শন-চাতুর্য্য যত ভাল হইবে তিনি তত ভাল যাদুকর হইবেন। বিলাতে ও আমেরিকায় যাদুকর-সম্মিলনীতে খেলায় কৌশল অপেক্ষা এই প্রদর্শন-ভঙ্গীর উপরই জোর বেশী দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও All India Magicians' Club (নিখিল ভারত যাদুকর সম্মিলনী) তাঁহার সভ্যদিগকে বিশেষভাবে আমেরিকার মত শিক্ষাদানে সচেষ্ট হইয়াছেন।

তর্কে বহু দূর

সবচেয়ে অলৌকিক

ভক্ত রাম দত্তের ভৃত্য রাখতুরামকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অ, আ, ক, খ, শেখাচ্ছেন। রাখতুরাম শত চেষ্টা করেও ক বলতে পারে না, হয়ে যায় কা। রাখতুরাম জীবনে বই ছোঁয় নি। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেন, যা বেটা তোকে পড়তে হবে না। রাখতুরাম হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, সেই ভালো মোশাই। সে শুধু ঠাকুরের সেবা করে। ঠাকুর ছাড়া বিশ্ব-সংসারে তার আর কিছু নেই।

সেই বর্ণজ্ঞানহীন হিন্দুস্থানী ভৃত্য রাখতুরাম ঠাকুরের দয়ায় হলো লাটু মহারাজ—যাঁর পায়ের কাছে বসে ভারতের জ্ঞানী-গুণীরা বেদ-বেদান্তের চরম কথা শুনেছেন। বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের অপরূপ অলৌকিক ক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন হলো লাটু মহারাজ। ঠাকুরের সেবায় ঠাকুরের ধ্যানে লাটু মহারাজের মুখের চেহারা পর্য্যন্ত ঠাকুরের মতন হয়ে গিয়েছিল।

আগমনী

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

ও পাষাণী প্রাণময়ী!
জানে না যে তোমা বই—
সে জাতির ঘরে বর্ব্বরের ডরে
নারী-চোখে ঘুম নাই।
শক্তি, এ সমাজে থাকা নাহি সাজে,
দ্বিধা-লাজ পরিহর,
উড়াও ঝাণ্ডা, ঘুরাও খাণ্ডা,
পশুরে মানুষ কর।
পশুবল ভীত, না হোক্ বিজিত,
হটিছে পিছনে ক্রমে,
অত্যাচার যত হবে প্রতিহত
এ কথা ভোলে না ভ্রমে!
নব আগমনী করে তারি ধ্বনি
অকাল বোধন মা'র,
কবি জানে নারে কারে থুয়ে কারে
বন্দন-গীতি তার!